বিদ্রোহী ভারত

[illegible] গুপ্ত

রায়-পণ্ডিত পাবলিকেশনস্

বিক্রয়কেন্দ্র
পাইওনীয়ার পাবলিশার্স
৪৪।১ বি বেনেটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬০

প্রাপ্তিস্থান
র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব। কলিকাতা ৭৩
নিউ বুক সেন্টার। কলিকাতা ৯

প্রকাশক
ফটিক রায়
রায়-পণ্ডিত পাবলিকেশনস
৪৪/১ বি বেনেটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নিরঞ্জন চৌধুরী
৮৩ বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
স্বপন চাকী

বিদ্রোহী ভারত

প্রথম পর্ব

১৯৪৭ সাল!

শোনা যাচ্ছে, এতদিন পরে শ্বেতাংগরা নাকি ভারতভূমি হ'তে চির-বিদায় নেবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কাকে প্রণাম জানাই? নব উদয়ের পথে শুনি কার বাণী?—প্রণাম লহ। লহ প্রণাম!······কিন্তু···

প্রণাম জানাই তাদের সবার আগে, যারা বুকের রক্ত ঢেলে, অত্যাচারী শাসক-গোষ্ঠীর বন্দুকের গুলিতে, ফাঁসীর দড়িতে গলা দিয়ে, মুক্তি-সংগ্রামের পাষাণবেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়ে বার বার গেয়ে গেল জীবনের জয়গান।

হাঁ! তাদেরই জানাই আমার প্রণাম: আর নোয়াই আমার মাথা সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মাটির 'পরে।

নতুন দিনের ইতিহাস রচিত হবে, তাই বৈদেশিক ইতিহাসকারীদের কলংক-কালীতে মসীকৃষ্ণ ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, সপ্তসূর্যের অরুণ রাগে, স্বাধীনতার তোরণ-প্রান্তে উপনীত, কাদের কণ্ঠে শুনি অর্ধশতাব্দী পূর্বের সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমের উচ্চারিত সেই লোকোত্তর সংগীতের মূর্ছনা:

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

এ সংগীত ত ভুলবার নয়। তাই ত একদা পদদলিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ভারতের হাজারো জনগণের একজনের অন্তরের অন্তস্থল ভেদ করে যে সংগীত জেগেছিল, আজ তাই শুনি কণ্ঠে কণ্ঠে দিকে দিকে আকাশ-বাতাস প্লাবিত করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে:

সপ্তকোটিকণ্ঠ কল-কল নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্।

চোখের সামনে দেখছি, প্রায় দুই শত বৎসর অতীতের কৃষ্ণ যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে: তামসী রজনীর মর্মস্থল ভেদ করে কার ঐ অশ্রুত বিলাপধ্বনি শুনি: আর না! আর না! আর না হোসেন কুলি! তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক!

কার ?—কার···এ কণ্ঠস্বর ?

জাফরগঞ্জ রাজপ্রাসাদের ভগ্ন মৃত্তিকাস্তূপ হ'তে নিধূম সর্পিল বহ্নিশিখার মত কে অদেহী তুমি, এমনি করে আজিও কার উদ্দেশে প্রেরণ করছো এ আত্ম-নিবেদন! চিনেছি তোমায়! বাংলা বিহার উড়িষ্যার তরুণ কিশোর নবাব, আলীবর্দীর স্নেহের পুত্তলী, নবাব মনসুরুল মুলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলীখাঁ মীরজা মোহম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর!

বাইরে অশান্ত বৃষ্টি-ঝরা রজনী: মাঝে মাঝে বিদ্যুতালোকে আকাশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেন চোখ ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে। ছবি একটার পর একটা ভেসে উঠছে: ১৭৫৭ সাল, ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে ঘন নিবিড় আম্রকাননের ছায়ায় বীর সৈনিক মীরমদন কামানের গোলায় ভগ্ন-উরু, রক্তাপ্লুত, ভুলুণ্ঠিত!

বীর বাঙ্গালী সেনাপতি মোহনলাল তখনও আপ্রাণ যুদ্ধ করে চলেছে। আর অদূরে কারা তোমরা পটে আঁকা ছবির মত রণসজ্জায় সেজেও দাঁড়িয়ে আছো: মীরজাফর, ইয়ার-লতিফ, রায়দুর্লভ!···সৈনিক, ভুলেছো কি কেমন করে যুদ্ধ করতে হয়?

ডুবে গেল! বাংলার স্বাধীনতারবি লজ্জায় রাঙা হয়ে অস্তাচলে গেল।

দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছে: হতভাগ্য নবাব ক্রুর স্বদেশদ্রোহীদের হীন চক্রান্তে মাত্র দুইশত অশ্বারোহী নিয়ে, হাতীর পিঠে চেপে যুদ্ধভুমি হ'তে প্রস্থান করলেন। অস্তগমনোন্মুখ শেষ স্বাধীন নবাব ফিরে এলেন মনসুরগঞ্জ রাজপ্রাসাদে! মনে হয়ত ছিল তখনও ক্ষীণ আশা! অস্তাচলমুখী নির্মম নিয়তির গতিরোধ করবেন। নবাবের আদেশে রাজভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হলো: দাও, দাও! বিলিয়ে দাও, অগণিত অর্থ জনে-জনে অকাতরে, কোন কার্পণ্য করো না। সঞ্চিত অর্থ দাও বিলিয়ে, অর্থেরই কাঙাল এরা। নাও —যার যত খুশী অর্থ নাও। এ ত তোমাদেরই, শুধু এ সব-কিছুরই বিনিময়ে, সৈনিকের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অসিহস্তে রণাংগনে আবার ঝাঁপিয়ে পড়। শ্বেত বণিকের লালসার হোমানল হ'তে তোমাদের জন্মভুমিকে রক্ষা করো বন্ধু। রক্ষা করো!

কিন্তু না,···শুনলে না, কেউ সে কথা শুনলে না। তাই গভীর রাত্রে হতভাগ্য নবাব পথের ফকিরের বেশে অতি গোপনে হীরাঝিলের বিচিত্র রাজ-প্রাসাদ ও মণিমাণিক্যখচিত মোগল মসনদকে পশ্চাতে ফেলে রাজধানীর জনহীন পথে এসে দাঁড়ালেন।

সবাই নবাবকে আজ ত্যাগ করেছে, ত্যাগ করেনি কেবল চিরসহচরী বেগম লুৎফউন্নিসা আর একজন পুরাতন প্রতিহারী।

: লুৎফা?

: বল।

: ফিরে যাও তুমি প্রাসাদে। কোথায় আমার সঙ্গে যাবে তুমি! নিশীথের

এই জনহীন পথ। আজ আর আমি বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা নবাব সিরাজউদ্দৌলা নই। আমি কপর্দকহীন ভাগ্যবিড়ম্বিত পলাতক সামান্য একজন নাগরিক মাত্র।

কি জবাব দিয়েছিলেন সেদিন নবাবের হতভাগিনী বেগম? কেউ কি জানে? কেউ কি শুনেছে? হাঁ, শুনেছিল সেদিন নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকার, আর কালো আকাশের পটে অগণিত তারার দল। নির্বাক্ দর্শী! আজও তোমরা তেমনি আছো?

* * খোলা বাতায়ন-পথে তাকালাম। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন এক সময়। মেঘজাল ছিন্ন করে বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশের বুকে জেগেছে আবার বিক্ষিপ্ত তারকার দল তেমনি সেরাত্রের মত। মন চলেছে কোথায়? একখানি নৌকা ধীরে মন্থরগতিতে পাল তুলে মহানন্দার স্রোত অতিক্রম করে, কালিন্দীর জল-প্রবাহ উত্তীর্ণ হয়ে, রাজমহলের কাছে, শুষ্কপ্রায় সংকীর্ণ স্রোতা নাজিরপুর মোহনায় এসে আটকে গেল। ছোট একটি পল্লী। বখরা বরহাল। নৌকার মধ্যে কে ঐ অধোবদনে বসে? সিরাজ না?…হাঁ, পলাশী প্রান্তরের অস্তমিত রবি। সিরাজ তখন ভাবছেন: কোনমতে যদি পশ্চিমমাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে মঁসিয়ে লার কাছে যেতে পারি, তাহলে তার সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে পাটনা চলে যাবো। সেখানে রামনারায়ণের সৈন্যরা আছে। আবার তাহলে একবার শেষবারের মত চেষ্টা করতে পারবো।

নিয়তি বোধ হয় অলক্ষ্যে বসে হাসলেন নিষ্ঠুর হাসি। সিরাজ ত জানতেন না, ঠিক ঐ সময় খুব নিকটেই তাঁর খোঁজে মীর দাউদ ও মীরকাশিম সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে আছে। মীরকাশিমের কাছে সংবাদ পেঁাছাতে দেরি হলো না। দানশার বিখ্যাত মসজিদের কয়েকজন লোকের মনে নৌকারোহী নবাবকে দেখে সন্দেহ হওয়ায়, তারাই গিয়ে সংবাদ দিল গোপনে পারিতোষিকের লোভে।

সিরাজ বন্দী হলেন সপরিবারে।

শেষ আশার ক্ষীণ আলোক-শিখাটুকুও নির্বাপিত হলো নির্মম নিয়তির ফুৎকারে!

* * *

সেদিনও ছিল এমনি নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি!

অগণিত হীরার কুচির মত নক্ষত্র-খচিত আকাশপটের তলায়, মুর্শিদাবাদের নবাবহীন হীরাঝিল প্রাসাদ নিঃশব্দে রোদন করছিল। এমন সময় কারারক্ষিগণে পরিবেষ্টিত সামান্য দস্যু তস্করের মতই শৃংখলগত পুরুষসিংহকে এনে দাঁড় করানো হলো মীরজাফরের সম্মুখে!

কে? মীরজাফর! তুমি? তুমিই কি আজ আমার বিচারক? আমারই মসনদে বসে আজ তুমি আমারই বিচার করবে? ধন, মান, প্রতিপত্তি, কিছুই —কিছুই আর আমার অভিপ্রেত নয়। শুধু আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। শুধু আমায় বেঁচে থাকতে দাও!

অশ্রুঝরা কণ্ঠের সে শেষ মিনতি মীরজাফর হয়ত সহ্য করতে পারলে না।

তাই চিৎকার করে উঠ্ল: রক্ষী, নিয়ে যাও! একে স্থানান্তরে নিয়ে যাও! পারছি না, এ দৃশ্য আর আমি দেখতে পারছি না!

নিঃশব্দে ক্লাইভের প্রবেশ।

মীরজাফর ও ক্লাইভ, পরামর্শ-সভা বসল।

সিরাজের বেঁচে থাকা চলতে পারে না। যতদিন সিরাজ বেঁচে থাকবে ততদিন বিশ্বাস নেই। সিরাজের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে। মৃত্যু! একমাত্র মৃত্যুই ওর শেষ পরিণাম।

স্বাক্ষরিত হয়ে গেল মৃত্যু-দণ্ডাদেশ।

তারপর।...

জাফরগঞ্জ রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিম্নতল নিভৃত ক্ষুদ্র কক্ষ। একাকী বন্দী সিরাজ। ভাগ্যবিড়ম্বিত তরুণ কিশোর নবাব!

অন্ধকারে চুপি চুপি চোরের মত উন্মত্ত তীক্ষ্ণ তরবারি হাতে কে ঐ কুৎসিত ভয়ংকর কারাকক্ষে প্রবেশ করছে? মহম্মদী বেগ্ না? আলীবর্দী ও সিরাজের অনুকম্পায় প্রতিপালিত ও অন্নে পুষ্ট দুরাত্মা মহম্মদী বেগ! রুপালী চক্রের কি মোহিনী যাদু!

কে, মহম্মদী বেগ? তুমি! তুমি! তুমিই কি শেষে আমাকে হত্যা করতে এলে? কেন? এরা কি আজ আমাকে এই বহু বিস্তৃত জন্মভূমির কোন নিভৃত কুটীরে যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও করে দিতে পারলে না?

কিন্তু আত্মবিভ্রম, সেও বুঝি মুহূর্তের জন্য। হে মহামান্য রাজাধিরাজ! হে রক্তযজ্ঞের প্রথম হোতা! তোমার এ কাতরোক্তি তো শোভা পায় না!

অস্তাচল-মুখী শেষ আলোর রক্তিম রশ্মি তাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে: না, না! আমি বাঁচতে পারি না! তা কখনোই হ'তে পারে না! আর কোন অপরাধ না করে থাকি হোসেন কুলি, তোমাকে যে হত্যা করেছি একদিন, অন্তত তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যও এ জীবনের অবসান হোক।

উন্মত্ত শয়তানের খরসানের উপর্যুপরি আঘাতে সেই অন্ধকার ধূলিমলিন কারাকক্ষতলে রক্তাক্ত নবাবের ফুল্লকুসুমের মত দেহখানি লুটিয়ে পড়ল: আর না! আর না হোসেন কুলি! তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক!

ভাবছি, যুগান্তরে কালপ্রবাহমধ্যে সত্যিই কি সে মহাজীবনের অবসান ঘটেছে!

ক্লাইভ, মীরজাফর প্রভৃতির চক্রান্ত, মহম্মদী বেগের তীক্ষ্ণ তরবারি সত্যিই নির্বাপিত করেছে সেই মহা জ্যোতিষ্মান্ অগ্নিস্ফুলিংগকে! না, তা হয়নি। কাল মহাকাল তার সাক্ষী! বিষ্ণুচক্রের মুখে খণ্ডিত সতীদেহের মত মহম্মদী বেগের অস্ত্রাঘাতেও সেই শাশ্বত জ্যোতির্ময় দেহাতীত আত্মা অণুপরমাণুতে বিভক্ত হয়ে, শত শত অনির্বাণ অগ্নিস্ফুলিংগের মতই ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলল বিপ্লবের আগুন!

* * *

কিন্তু কি দেখছিলাম?

হাঁ, রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশদ্রোহীর দল দানবীয় বিজয় উল্লাসে, সেই হতভাগ্য নবাবের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে চাপিয়ে নগর প্রদক্ষিণে বের হয়েছে ! মুর্শিদাবাদের রাজপথের ধূলি হতে এখনও সে রক্তধারা শুকিয়ে যায়নি ।

এদেশবাসী বুঝতে পারেনি সেদিন, কি মহাপাপের বীজ ভারতের মাটিতে তারা রোপণ করলে। বুঝতে পারলে তখন, যখন সেই বীজ হ'তে সহস্র শাখায়-প্রশাখায় অত্যাচারের এক মহীরুহ উজ্জীবিত হয়ে উঠল কুখ্যাত ব্রিটিশ-শক্তির অভ্যুত্থানের সাথে সাথে ! স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভী মুষ্টিমেয় ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের জন্মভূমিকে বিদেশী বণিকের হাতে তুলে দিয়ে যে অত্যাচারের হোমানল জ্বালাল, সেই অগ্নিযজ্ঞে প্রথম শহীদ আত্মবলিদান দিল মীরকাশিম ! হাঁ ! মীরকাশিম !

খণ্ড খণ্ড ভাসমান মেঘান্তরালে একটু আগের মেঘমুক্ত আকাশের তারকাগুলি আবার অবলুপ্ত হয়ে গেছে ।

বাতায়ন-পথে নিশীথের শ্রান্ত বাতাস কার অশ্রুত কান্নার ধ্বনি ভাসিয়ে আনে ?

দরজায় কার করাঘাত শুনছি না ? না, মনের ভুল । মনে পড়ছে দিল্লীর বিখ্যাত জুম্মা মসজিদে কে এক পাগল পথিক, মাথার চুল এলোমেলো, রুক্ষ, গায়ে একখানি দামী শতছিন্ন শাল, দিল্লীর বাদশাহর প্রতীক্ষায় দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে ।

সম্রাট্ আসছেন ! এই হট্ যাও ! হট্ যাও ! ধাক্কা খেয়ে পাগল পড়ে গেল, শক্ত কঠিন পাথরে কপাল কেটে রক্ত ঝরছে ।

রক্ত ! রক্ত ! সিরাজের রক্ত ! আজিও শুকায়নি । মীরকাশিম, রক্ত দিতে হবে ! আরো রক্ত দিতে হবে ! দেশদ্রোহিতার পাপ আজিও স্খালন হয়নি !

মীরজাফরকে গদিচ্যুত করে চতুর ইংরাজ তোমায় বসিয়েছিল মোগল মসনদে । তারা আশা করেছিল, তাদের হাতের ক্রীড়নক হয়েই তুমি থাকবে ।

কিন্তু তারা ত জানত না, সিরাজের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিষাক্ত ধূমেই তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল । এবং যে মুহূর্তে তারা বুঝলে, তাদের ক্রীড়নক হয়ে মসনদের শোভাবর্ধন মাত্র করতে তুমি ইচ্ছুক নও, সুরু হলো রেষারেষি, মন কষাকষি, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ । ১৭৬৫ খৃঃ আবার স্বদেশবাসীর চক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকতায় উদয়নালা দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মীরকাশিমের শোচনীয় অবসান ঘটল । কৃষ্ণ ঘনান্ধকারে প্রথম প্রদীপশিখাটি জ্বলে উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতার বিষ ফুৎকারে নির্বাপিত হলো ।

স্বাধীনতা-যজ্ঞের পাষাণ-বেদীমূলে প্রথম শহীদের রক্তে আঁকা হলো প্রথম রক্ত আলিম্পন । পরবর্তী পৌনে দুই শত বৎসর ব্যাপী পরাধীনতার বুনিয়াদ আরো দৃঢ় হলো ।

তারপর আবার একদিন ১৭৭৫ খৃঃ ৫ই আগস্টের কালরাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। ভোরের প্রথম আলোয় কে তুমি সদ্যস্নাত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পবিত্র হরিনাম করতে করতে দধীচির মত প্রাণ দিতে, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ফাঁসীর আসামী, ইংরাজের সৃষ্ট প্রথম ফাঁসীমঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছো? চিনি! তোমায় চিনি! মহারাজ নন্দকুমার!

মুক্তিযজ্ঞের দ্বিতীয় শহীদ, তোমায় প্রণাম জানাই।

* * ১৯৩৮ খৃঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের জলপাইগুড়ি অধিবেশনে শরৎচন্দ্র বসু সভাপতি হয়েছিলেন।

সেই সভাতেই বাংলার বিপ্লবী নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, ইংরাজকে ছয় মাসের নোটিশে ভারত ছাড়বার দাবী জানিয়ে।

১৯৩৯ খৃঃ ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হলেন চিরপ্রিয় সুভাষ। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা, তারই তলে দাঁড়িয়ে কম্বুনিনাদে সুভাষ বললেনঃ ভারত ছাড়ো, কুইট ইণ্ডিয়া।

কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতায় অনুমোদিত হল না সে প্রস্তাব।

ভাবছিলাম সেই কথাই ১৯৪৭ এর জুলাইয়ের এক ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-মেদুর প্রভাতে।

বন্ধুবর নন্দদুলাল এসে ঘরে প্রবেশ করলঃ বীরু, এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস ভাই!

ঃ এত সকালে? ব্যাপার কি?

ঃ কাল সারাটা রাত ঘুমাতে পারিনি, ভাবছিলাম বাংলা ত দ্বিধাবিভক্ত হলো; এবারে কোথায় যাই, পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে?

ঃ তা কি স্থির হলো?

ঃ অনেক ভেবে দেখলাম ভাই! শেষটায় কি স্থির করেছি জানিস?

ঃ কি?

ঃ ও পাকিস্তানও যা হিন্দুস্থানও তাই! মারামারি কাটাকাটি সর্বত্র। ঝামেলা কোন 'স্থানেই' কম নয়। তাই ভাবছি একটা নৌকা দীর্ঘকালের জন্য ভাড়া করে গঙ্গাবক্ষে ভেসে পড়ি। কারণ গঙ্গার জলে কেউই পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের দাবী নিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করতে আসবে না। কিন্তু যাক্ সে কথা। কাল হঠাৎ কলেজ স্ট্রীটে কার সঙ্গে দেখা হলো জানিস?

ঃ কার সঙ্গে?

ঃ মাস্টারদার সঙ্গে।

ঃ কোন্ মাস্টারদা?

ঃ আমাদের সৃষ্টিধর সান্যাল। লাটসাহেবের গাড়ীতে বোমা ফেলার জন্য যার ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল, পরে সে আদেশ রদ হয়ে হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এবারের মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছিলেন; তারপর আবার গত আগস্ট আন্দোলনে বন্দী হন। কিছুদিন হলো মাস্টারদা মুক্তি পেয়ে ফিরে

এসেছেন। কিন্তু আমাকে চিনতে পারলেন না।

মাস্টারদা!...চোখে কি আবার গতরাত্রের স্বপ্ন নেমে আসছে নাকি? হাওয়ার বেগে পিছনপানে ছুটে চলেছি। কেবলই মনে পড়ছে ফাঁসীর আসামী মহারাজ নন্দকুমারের কথা!...

অনেক দূরে; অতীতের অস্পষ্ট ছায়ালিপি!

১৭০৫ খৃঃ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ভদ্রপুরে ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের কক্ষ আলো করে একটি শিশু জন্মাল—নন্দকুমার।

মুর্শিদ কুলিখাঁ, আলীবর্দী প্রভৃতির অধীনে পদ্মনাভ একজন বেতনভুক তহসিলদার মাত্র ছিলেন।

ছেলেটি ক্রমে বড় হয়। কিন্তু খেলার দলে সকলের 'পরে কর্তৃত্ব করবার কি একটা অদমনীয় সহজাত প্রবৃত্তি তাঁর।

সেদিনকার অসহায় শিশু আজ যুবক। পদ্মনাভের চেষ্টাতেই ঘোড়াঘাট, ফতেসিং, সাতমাইকা এই তিনটি পরগণার নায়েব।

তারপর একদিন আলীবর্দীর চক্রান্তে নবাব সরফরাজ খাঁ নিহত হলে আলীবর্দী বসলেন মসনদে।

মসনদে বসবার সময় যারা ছিল তাঁর পাশে, কাউকেই আজ তিনি ভোলেন নি। নন্দকুমারও পুরস্কৃত হলেন। হিজলী ও মহিষাদলের নায়েবী পেলেন।

তারপর বর্গীর হাঙ্গামা। বর্গী এলো দেশে! পিসিমা আমাদের ছোটবেলার সেই ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে আমাদের এক ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াতেন কতদিন শুনেছি:—

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে!

বাংলার প্রতি কুটীরে কুটীরে উঠেছে হাহাকার।

নবাব আলীবর্দী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে, রাজ্যপাট ফেলে রেখে, দিনের পর দিন বর্গীদমনে অসিহস্তে এদিক্ ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। জলের মতই প্রচুর অর্থব্যয় হচ্ছে, রাজকোষ শূন্য হয়ে যায় দিনের পর দিন। টাকা তারো টাকা চাই! আলীবর্দী প্রজাদের 'পরে নূতন করে এক খাজনা বসালেন, নূতন উপায়ে অর্থাগমের জন্য।

আলীবর্দীর পরোয়ানা এলো নন্দকুমারের কাছে: নবাবের খাজনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে হবে।

একে ত বর্গীর হাঙ্গামা, যথেচ্ছ অত্যাচার, আজ এর ঘর পুড়ছে, কাল ওর ধনদৌলত লুণ্ঠিত হচ্ছে, তার উপরে বোঝার 'পরে শাকের আঁটি—আলীবর্দীর নতুন কর।

কে দেবে খাজনা? লোকে খেতে পায় না, সদা শংকিত, নন্দকুমার শূন্য-হাতে ফিরে এলেন।

তক্তাউসের 'পরে বসে তুমি নবাব খাজনা জারী করেছো। কিন্তু তোমার প্রজাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই দুর্দিনের বাজারে পেটের ভাত যোগাড় করতে হচ্ছে, তাদের দুঃখে দয়ালু ব্রাহ্মণের প্রাণ কেঁদে উঠল। রিক্তহস্তে ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন। কিন্তু নবাবের রোষবহ্নি হতে মুক্তি পেলেন না, তাঁকে কার্যচ্যুত করা হলো। তিনি বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হলেন। সোনার প্রাসাদে পীড়িতের আর্তনাদ পেঁছায় না!

নবাব হুকুম দিলেন: যতদিন না খাজনার টাকা আদায় হবে. প্রত্যহ তাকে নবাব দরবারে আনিয়ে বেত্রাঘাত করা হবে। সংবাদ পেয়ে পিতা পদ্মনাভ এসে আশি হাজার টাকা খেসারত দিয়ে পুত্রকে মুক্ত করলেন নবাবের রোষবহ্নি হতে।

*

সহসা একটা প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। নন্দদুলাল চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল: ঐ আবার বুঝি কোথায় বোমা ফাটল রে! এখুনি মিলিটারী প্রভুদের আগমন হবে, চলবে গোলাগুলি!

হলোও তাই, একটু পরেই দুম্ দুম্ দুড়ুম···রাইফেলের গুলি চলবার আওয়াজ কানে এল।

মিলিটারী পুলিস ফায়ার করছে।

ছুটে জানালার কাছে গেলাম। বড় রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে জনতা!

দুম্ দুম্ দুড়ুম···আবার গুলির আওয়াজ!

পিসিমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল: হতচ্ছাড়া আবাগীর বেটারা যাবো যাবো করছে, তা গেলেও তো পারে চলে! দেখ্ সন্তু, ও তোদের রেডিওটা বেচে ফেল বাপু! কেবল রোজ রোজ কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে। আর তোদের খবরের কাগজওয়ালাদেরও বলিহারি যাই বাপু! নতুন মন্ত্রী বললে না, তিন দিনের মধ্যে গোলমাল না থামাতে পারলে ছেড়ে দেবে কাজ!

পিসিমার একটানা খেদোক্তি শুনে হাসি পেল।

বাইরে প্রচণ্ড বেগে কড়া নাড়ার শব্দ এল।

একটু পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ, সেই সঙ্গে কবিতার দুটি চরণ কানে এল:

কে কহ এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ! নিজ কর্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।

চমকে উঠলাম। মাস্টারদার গলা! সত্যি মাস্টারদাই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। আবৃত্তি তখনও থামেনি:

কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগি,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজঙ্গে? কি কুক্ষণে তোরা দুখে দুখী,
পাবক-শিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে!

* * আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ মসনদে বসেছেন। সংবাদ এসেছে বণিক ইংরাজ তার বিনানুমতিতেই কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করছে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতই সিরাজ এ সংবাদে জ্বলে উঠেছেন। পরোয়ানা গেল, দুর্গ এই মুহূর্তে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দাও। ইংরাজরা লিখে পাঠাল : সে কি! এমন মিথ্যা কথা কে রটালে? নূতন দুর্গ ত আমরা তৈরী করছি না, পুরাতন মেরামত করিয়ে নিচ্ছি মাত্র! আর, দেরি নয়, নবাবের ফৌজ চলে এলো কলকাতায়। যুদ্ধে হেরে ইংরাজরা কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল।

*

প্রশ্ন করলাম : কবে ফিরলেন মাস্টারদা? বসুন!

: হ্যাঁরে, সত্যিই কি আবার ভারত স্বাধীন হতে চলল! ইংরাজরা কি এতদিনে সত্যিই এ দেশ ছেড়ে যাবে?

অগ্নিযুগের ছেলে এই মাস্টারদা! দীর্ঘকাল সরকারের জেলখানায় ঘানি টেনেছেন। বুকের হাড় প্রত্যেকটি গোনা যায়। কথা কইতে গেলে হাঁফ ধরছে। মাথার চুলের এক-তৃতীয়াংশ প্রায় পেকে সাদা হয়ে গেছে। প্রাণরস নিংড়ে নেওয়া হয়েছে।

মাস্টারদা বলেন : দীর্ঘ তিরিশ বছর যা স্বপ্ন দেখেছি, এতদিনে তা সত্যি সফল হবে! ব্রিটিশের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বসে দিন গুনেছি—একটি দুটি করে দিন গুনেছি; সূর্য-সারথির রথচক্রের ধ্বনি শোনবার আশায় আশায়!...গঙ্গার পাড়ে ঐ যে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, কবে আবার সেখানে আমাদের কামান বসবে! ইউনিয়ান জ্যাক টেনে ফেলে দিয়ে সেখানে কবে আবার উড়বে ভারতের জাতীয় পতাকা!

সিরাজের অনুগ্রহে নন্দকুমার আবার চাকরি পেলেন, হুগলীর ফৌজদারের পদ। দেওয়ান মানিকচাঁদ ও নন্দকুমারের উপর ভার দেওয়া হলো, ইংরাজদের প্রতি কড়া শাসন ও দৃষ্টি রাখতে।

দূরদর্শী নন্দকুমার কলকাতা রক্ষার জন্য বজবজের দুর্গ মেরামত করে সেখানে রসদ, গোলাবারুদ ও সৈন্য রাখলেন। কলকাতার দক্ষিণ দিকে গঙ্গা। পলাতক ইংরাজরা আবার যাতে না এসে গোলমাল বাধাতে পারে, সেই জন্য গঙ্গার দুই তীরে 'তালা' ও 'আলিগড়' নামে দুটি দুর্গ নির্মাণ করালেন। এদিকে তখন পলাতক ইংরাজরা ফলতায় গিয়ে মাদ্রাজের বাণিজ্য-কুঠী হতে সৈন্যদের আসবার অপেক্ষায় কাল গুনছে।

সিরাজ দেওয়ান মানিকচাঁদের উপর কলকাতা রক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। মানিকচাঁদ গোপনে ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সহসা অতর্কিতে এলো মাদ্রাজ হতে অনেক নূতন ইংরাজ সৈন্য। বজবজের দুর্গ আক্রান্ত হয়েছে।

মানিকচাঁদের সহায়তায় বজবজের দুর্গ ইংরাজ সৈন্য দখল করে নিল। কলকাতাও তাদের অধিকারে এল; কারণ মানিকচাঁদ তখন মুর্শিদাবাদে পলাতক,

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নবাব দরবারে উপস্থিত। কলকাতা দখল করে ইংরাজদের লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হুগলীর উপরে, কিন্তু নন্দকুমারের কামানের মুখে তারা আবার কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

এইভাবে নানা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের শত্রুতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমন সময় ইংরাজদের মত ফরাসীদেরও লোলুপ দৃষ্টি স্বর্ণপ্রসূ ভারতের উপরে এসে পড়েছে।

ফরাসী ও ইংরাজের মধ্যে বাধল স্বার্থের সংঘাত। রণসাজে সজ্জিত দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। বাজল রণভেরী, ছুট্‌লো কামান, ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মীমাংসা হোক, কে নেবে ভারত! কালনেমির লংকা ভাগ!

মীরজাফর, জগৎশেঠ, ইয়ারলতিফদের অভাব কোনদিনই হয় না। ফরাসী সেনানীদের মধ্যে 'টেরানু' গোপনে ইংরাজদের সঙ্গে হাত মিলাল। ঘরের শত্রু বিভীষণ টেরানুর সহায়তায় ফরাসীরা ইংরাজদের হাতে পরাজিত হলো।

নিরপেক্ষর মত দূরে দাঁড়িয়ে সসৈন্যে নন্দকুমার দুই পক্ষের যুদ্ধ দেখলেন।

নন্দকুমারের শত্রুর ত অভাব ছিল না; গোপনে সিরাজের কাছে সংবাদ পেঁছাল, বারো হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে নন্দকুমার নাকি ফরাসীরের সাহায্য করেন নি। সিরাজের রোষে নন্দকুমার পদচ্যুত হলেন। কিছুকাল পরে পলাশীর প্রান্তরে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল।

সিরাজের হত্যার পর ইংরাজের উচ্ছিষ্টলোভী স্বর্ণগর্দভ মীরজাফরকে ক্লাইভ্ মসনদে বসালেন। কিন্তু চারিদিকে বিশৃংখলা, ক্লাইভ আর উপায়ান্তর না দেখে আবার ডেকে আনলেন নন্দকুমারকেই, তহশীলদারের পদে তাঁকে নিযুক্ত করে।

মাস্টারদার কণ্ঠস্বর আবার কানে এল: তাহলে ব্রিটিশ ভারতের সব্‌শেষ গভর্ণর জেনারেল এ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটান।

আর সর্বপ্রথম এদেশে কে গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসেছিলেন?

বিলাতের সুবিখ্যাত পার্লামেণ্ট মহাসভা।

ভারত হতে প্রভূত অর্থ শোষণ করে, কোটিপতি হয়ে এদেশের সর্বপ্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস স্বদেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে ও তাঁর বাল্যবন্ধু ইম্পেকে ছি ছি করছে কেন?

একদিন এদেশের প্রকাশ্য বিচারসভায় নন্দকুমারের অভিযোগে অভিযুক্ত হেস্টিংস যখন ফ্রান্সিস্, ক্লেভারিং ও মন্‌সনের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে আদেশ পেলো কোম্পানীর যত টাকা হেস্টিংস আত্মসাৎ করেছে, সব ফিরিয়ে দিতে হবে, হেস্টিংস যথার্থই দোষী, তখন জোর গলায় হেস্টিংস বলেছিল: আমি ভারতের কোম্পানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মচারী, সুতরাং বোর্ডের বিচার মেনে নিতে আমি এতটুকুও বাধ্য নই। আজ তাঁকে তাঁর দেশভূমে, তাঁরই স্বদেশবাসী

টেনে এনে পার্লামেণ্টের বিচারসভায় দোষী বলে দাঁড় করিয়েছেন। পার্লামেণ্ট মহাসভায় লোক গিস্‌গিস্‌ করছে।

চারিদিকে ভীষণ চাঞ্চল্য, একশত ষাটজন লর্ড সেই বিচারসভায় উপস্থিত।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ সাতটি বছর ধরে বিচার চললো।

মুগ্ধ হয়ে স্বদেশবাসী শুনতে লাগল মনস্বী বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্কের ওজস্বিনী বক্তৃতা—Impeachment of Warren Hastings. বিচারের রায় দেওয়া হলো, হেস্টিংস নির্দোষ,—যদিও দেশের লোকেরা তাঁকে সমর্থন করে নাই।

সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ফকির হলো হেস্টিংস।

কিন্তু কেন? শুধু কি পরস্ব অপহরণই সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে ছিল অভিযোগ? ভারতের সর্বপ্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস পথের ফকির হয়ে দুঃখদৈন্যে দুর্দশায় অসহ্য লাঞ্ছনার কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে কবে মহাকালের স্রোতে ভেসে গেছে। কিন্তু জাল মকদ্দমার অভিযোগে সেদিন যে ব্রাহ্মণকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল,সেই ৫ই আগস্ট ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রভাত আজিও ফিরে আসে শতাব্দীর একটি বৎসরের প্রতি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে, স্মরণ করিয়ে দেয় রক্তরাঙা সেই মুহূর্তটি।…ভুলি নাই, ওরে ভুলি নাই!

হেস্টিংস, তুমি ভুল করেছিলে অর্থের লোভে ব্রাহ্মণের রক্তপাত করে।

১৭৭৫ খৃঃ ৬ই মে রাত্রি দশটার সময় অকস্মাৎ মহারাজ নন্দকুমারকে ইংরাজের কারাগারে বন্দী করা হলো। বিদ্যুদ্‌বেগে সহরের সর্বত্র সেই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

মহারাজের মত একজন নিষ্ঠাবান্‌ ধার্মিক ব্রাহ্মণ কি এমন দোষে দোষী হতে পারেন যার জন্য তাঁকে বন্দী হতে হলো! এমন কি জামিন পর্যন্তও দেওয়া হবে না তাঁকে!

হেস্টিংসের পরম শত্রু মহারাজ নন্দকুমার। মীরজাফর যখন বাংলার মসনদে, নন্দকুমার তহশীলদার, হেস্টিংস তখন মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট।

নন্দকুমারের হাতে খাজনা আদায়ের ভার, কাজেই অর্থগৃধ্নু হেস্টিংসের সর্বপ্রকার উপরি আয়ের পথ বন্ধ। আবার স্বয়ং ক্লাইভ নন্দকুমারের পক্ষে থাকায় হেস্টিংস নির্বিষ সর্পের মত কেবলই গর্জায়। অসন্তোষের হয় সূত্রপাত।

তারপর মীরজাফরকে গদীচ্যুত করে মীরকাশিমকে আবার যখন ইংরাজরা মসনদে বসাল, নন্দকুমার ইংরাজদের পক্ষপাতদুষ্ট অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করতে পারলেন না।

তিনি বুঝেছিলেন, হিন্দু মুসলমান এদেশের অধিবাসী যখন, প্রকৃতপক্ষে তখন তারাই এদেশের প্রকৃত মালিক, প্রকৃত শাসনকর্তা। এ দেশের রাজা হওয়ার প্রকৃত অধিকার কেবলমাত্র তাদেরই। ইংরাজ এসেছে সেই কোন্‌ সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে বাণিজ্য করতে। বেশ ত, বাণিজ্য করতে চায় বাণিজ্য করুক, কিন্তু এ দেশের শাসনব্যাপারে তারা কোন্‌ অধিকারে হস্তক্ষেপ

করতে আসে ! এ শুধু অন্যায়ই নয়, অবিচার। এর আশু প্রতিকার চাই।···

দেশের বড় বড় জমিদার, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের কাছে গোপনে গোপনে নন্দকুমারের আবেদন-লিপি যেতে লাগল : সংঘবদ্ধ হও ! বিদেশী বণিকের যথেচ্ছাচার কেন আমরা মাথা পেতে নেবো !

কলকাতার গভর্ণর তখন ভানসিটার্ট। দৈবক্রমে নন্দকুমারের একখানা চিঠি ভানসিটার্টের হাতে গিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমার, রায়দুর্লভ প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী লোকের বাড়ীঘর সার্চ করে ভানসিটার্ট অনেক কাগজপত্র নিয়ে গেল। সেই সব কাগজপত্রের অনুবাদের ভার পড়ল হেস্টিংসের উপরে। কিছুকাল প্রহরীবেষ্টিত থেকে নন্দকুমার সেবারে কোনমতে মুক্তি পান ! কিন্তু দেশের ডাক যার দু'কান ভরে বেজেছে, সে কি চুপ করে থাকতে পারে ?

মীরজাফরের নামের মোহরাংকিত করে এদেশের ইংরাজ কর্মচারীদের অকথ্য অত্যাচার বর্ণনা করে মহারাজ নন্দকুমার এবারে বিলাতে দু'খানা চিঠি লিখলেন : একখানা ক্লাইভের কাছে, দ্বিতীয় পত্রটি ডাইরেক্টার সভার সভ্যদের কাছে।

ইতিমধ্যে মীরকাশিম কিছুকালের জন্য মসনদে বসেছেন তখন। এ চিঠি দু'খানা ভানসিটার্টের শ্যেনদৃষ্টি এড়াল না।

এবারে আর নজরবন্দী না রেখে ভানসিটার্ট নন্দকুমারকে বন্দী করল।

কিছুকাল পরে আবার মুক্তি পেলেন মহারাজ।

দেশের মুষ্টিমেয় বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে মীরকাশিম মসনদচ্যুত হলেন; মীরজাফরকে ডেকে আবার মসনদে বসানো হলো।

মসনদ নিয়ে যেন পুতুল খেলা চলেছে।

পুতুল খেলা চলতে থাকুক, আমরা এগিয়ে চলি : শিপাহ্‌শলার মীরজাফর মসনদে বসেই নন্দকুমারকে সাদরে আহ্বান করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মন্ত্রিত্ব ও দেওয়ানীর পদ দিলেন।

সুদূর দিল্লী থেকে বাদশা এক সনন্দ পাঠালেন : সাত হাজার সৈন্যের নায়কপদে অভিষিক্ত করে নন্দকুমারকে 'মহারাজা' উপাধি দেওয়া হলো।

দেশের লোকেরা মহারাজের এ পদোন্নতিতে বিশেষ উৎফুল্ল হলেও, এদেশের ইংরাজ কর্মচারীদের বুকগুলো হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যেতে লাগল। হিংসার অগ্ন্যুত্তপ্ত বিষপাত্র হতে সূক্ষ্ম তন্তুর মত অসংখ্য ধুম্রশিখা নির্গত হয়ে ক্রমে সেটা আকার নিচ্ছে, একটা শক্ত কঠিন পাকানো রশির মত। অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে দুটি শ্বেত ধবল হস্ত ! দুটি হস্তের দশটি আঙ্গুল ও তার রক্তিমাভ নখরগুলি যেন হিংসায় লোলিহান হয়ে উঠছে। পাকানো রশিটিতে ক্রমাগত ফাঁস পড়াচ্ছে।

সাত সমুদ্র তের নদীর পার হতে আসছে একটা বিষাক্ত ঝড়ো হাওয়া।

সোনার ভারতভূমি পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

শ্যামল ভূমি রক্তে লাল হয়ে উঠবে। উঠবেই বা না কেন ? আজ ত আর

সে দরদী দেশপ্রেমিক তরুণ কিশোর নবাব সিরাজ নেই!

কে আজ আর সিংহনাদে বলবে: ইউরোপীয়গণকে শাসন করবার জন্য আর কিছুরই দরকার নেই, কেবল একজোড়া চটিজুতো। কোথায় তুমি নবাব! কোথায় তোমার সেই চটিজুতো!

পাশের বাড়ীতে ভীষণ একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে; কৌতুহল-প্রিয় হুজুগে বাঙ্গালীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে!

কয়েকজন গোরা সার্জেণ্ট ও পাঠান সৈনিক পাশের বাড়ীর অন্দরে জোর করে ঢুকে বাড়ীর কর্তাকে বেদম প্রহার করছে। একটু আগে রাস্তায় যে বোমাটা ফেটেছে, তাদের ধারণা সেটা ঐ বাড়ীর ভিতর থেকেই নিক্ষেপ করা হয়েছে। অকাট্য যুক্তি!...

মাস্টারদা ইতিমধ্যে কখন একসময় আমার শয্যাটার 'পরে টান্ টান্ হয়ে শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করেছেন, বন্ধু নন্দদুলাল অন্তর্হিত হয়েছে।

হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থাতেই নাক ডাকানো বন্ধ করে মুদ্রিত চোখে মাস্টারদার প্রশ্ন শুনে চম্‌কে উঠলাম: নিরীহ ভদ্রসন্তানটি এখনো নির্বিকারভাবে পড়ে পড়ে বন্দুকের গুঁতো ও কিল চড় লাথি হজম করছেন ত?

* * * কি পাপে লিখিলা

এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

নাঃ, বেটারা দেখছি ঘুমটাই আমার মাটি করে দিলে। একা না পারিস, সকলে মিলেমিশে ওগুলোকে বেশ করে ঘাকতক দিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দে না! যাবেই যখন বলেছে, দু'দণ্ড আগেই না হয় বের করে দে জোর করে। সংঘবন্ধ হয়ে একসাথে মিলে গলাধাক্কা দিতে হবে।

মহারাজ নন্দকুমারের স্মৃতির পাশাপাশি যেন একটা গেরুয়া রংয়ের পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে উড়তে হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

কশানদীর কালো জলধারা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে! 'কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে?'

ইংরাজ মহাপ্রভুদের সু(?) শাসনে দেবতার রোষবহ্নির মধ্যে এল ইংরাজী ১৭৭২ সাল আর বাংলা ১১৭৬ সন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

পলাশীর প্রহসন, সিরাজের হত্যা, অবলুপ্ত মীরকাশিম! দেশদ্রোহীর দল বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে! কোম্পানীর শক্তিদণ্ডের নীচে শত লাঞ্ছনা অত্যাচার ও জুলুমে দেশের লোকের প্রাণ কণ্ঠাগত।

কোম্পানীর কোন সুনির্দিষ্ট শাসনবিধি বা নিয়ম-কানুন নেই; একমাত্র লক্ষ্য যে কোন উপায়েই হোক ছলে বলে কৌশলে খাজনা আদায় করা।

১১৭৪ সালে দেশে ভাল ফসল হয়নি; সুতরাং ১১৭৫ সালেই দেশে চাল বেশ মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছিল। ঐ দুর্দিনেও কোম্পানীর লোকদের খাজনা আদায় চলল পুরোদমে। অনেকেই অর্ধাশনে, অনশনে দিনপাত করতে সুরু করেছে

তখন। এলো ১১৭৫ সাল, বর্ষাসমাগমে বাংলার আকাশ নব নীরদমালায় ঢেকে গেল। নেমে এলো অজস্র ধারায় বৃষ্টি। মনের পাতায় লাগল আশার রঙিন স্বপ্নের ছোঁওয়া।

কিন্তু সে স্বপ্ন ক্ষণিকের বিদ্যুৎঝিলিক হেনে মিলিয়ে গেল, আশ্বিন কার্তিক মাসে বিন্দুমাত্রও বৃষ্টিপাত হলো না।

মাঠে মাঠে ধানের সবুজ চারাগুলো জলাভাবে শুকিয়ে কুঁকড়ে গেল। অগ্ন্যুত্তপ্ত রুক্ষ ধরিত্রীর বুকখানা ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে গেল, আর সেই ফাটল দিয়ে নির্ধূম অগ্নিশিখার মত তপ্ত হাওয়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারিদিকে হাহাকার করে।

ধরিত্রীমাতা বিদীর্ণ বক্ষে লক্ষ লক্ষ অশরীরী বাহু প্রসারিত করে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন—দে জল! দে জল! দেশের এতবড় দুর্দিনে মহম্মদ রেজা খাঁ, অন্যান্য শ্বেতাংগ কর্মচারী ও দেশীয় একদল হীন উচ্ছিষ্ট-লোভী একত্রে মিলিত হয়ে সহস্র সহস্র ক্ষুধাপীড়িত আবালবৃদ্ধবনিতার মুখের গ্রাস আগে হতেই ক্রয় করে নিজেদের ভাণ্ডার ভরিয়ে রেখে দিয়েছিল। এখন সেই সব সঞ্চিত শস্য বেশী মূল্যে বেচে দু'হাতে অর্থ উপায় করতে লাগল। দেশের চারিদিকে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অগণিত নরনারী বালক বৃদ্ধ যুবা শিশু একমুষ্টি অন্নের জন্য কেউ ঘাস পাতা চিবিয়ে খেয়ে, কেউ স্ত্রী বোন পুত্র কন্যা বেচে বাঁচবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে।

জনহীন পরিত্যক্ত গ্রাম নগর! রাস্তার দুধারে, কুটীরের দাওয়ায় মৃতদেহ পড়ে পচে ফুলে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়! দেখতে দেখতে এককোটি বাঙ্গালী সেই দুর্ভিক্ষের অনলশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ভাবছো, বাংলার লোকসংখ্যা তখন কত ছিল? তিন কোটি।

সেই কংকাল-স্তূপের মধ্য হতে জন্ম নিল গেরুয়া আগুনের লক্ষ লক্ষ শিখা। শ্বেতাংগদের এ দেশে দীর্ঘ পনের বৎসরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল যেন একখানা তীক্ষ্ন বাঁকা তলোয়ার।

মুক্তির বাণী বয়ে নিয়ে এল একদল ঘরছাড়া সর্বত্যাগী গেরুয়া বসনধারী তরুণ সন্ন্যাসী।

মাত্র পনের বৎসর আগে ১৭৫৭ খৃঃ যে মনসুরগঞ্জ রাজপ্রাসাদের নবাবের উন্মুক্ত ধনভাণ্ডারের বহু বৎসরের স্তূপীকৃত মণি-মাণিক্য ও ধনসম্ভার জনগণের মনে যে সাড়া সেদিন জাগাতে পারেনি, আজ ১৭৭২ খৃঃ বঙ্গভূমের পোড়া মাটির বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কংকালস্তূপ হতে সেই সাড়া আচমকা মেঘেছাওয়া আকাশের বজ্রবিদ্যুতের মতই গুরু গুরু রবে ডেকে উঠল। পরশক্তির তলে পিষ্ট ভারতে প্রথম সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন—বিদেশী ঐতিহাসিকরা বলেছে Sannyasi Rebellion—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। আর বাংলার তদানীন্তন প্রথম জেনারেল হেস্টিংস বলেছে—"A set of lawless benditti।"

আশ্চর্য ত কিছুই নয়! এরাই ত ১৯৪৫ সনে বাংলার তথা ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক সুভাষকে বলেছে ভারতীয় কুইসলিং! তা বলে বলুক! আমরা ত জানি! আমরা ত ভুলিনি!

সেদিন সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের রিক্ত গেরুয়া বসনের মধ্যে যে অগ্নির প্রচ্ছন্ন আভাস দেখা দিয়েছিল, সমগ্র দেশ সে আভায় রক্তরাঙা হয়ে উঠেছিল। সে ত বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়!

নিপীড়িত শৃংখলিত ভারতমাতার শতসহস্র অত্যাচার-জর্জরিত বুভুক্ষিত সন্তানের বুকভাঙা আর্তনাদ। মুক্তিযজ্ঞের প্রথম অগ্নিশিখা। শৃংখলিত জননীকে মুক্ত করবার প্রথম মিলিত প্রচেষ্টা।

পাশের বাড়ীর বৌটি কাঁদছে।

তার স্বামীকে ও প্রাপ্তবয়স্ক দুটি ছেলেকে মিলিটারী ও পাঠান পুলিস মারধর করে শেষে বোধ হয় থানায় নিয়ে চলে গেছে।

মাস্টারদা ইনিমধ্যে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, নাক-ডাকা শুরু হয়েছে। বড় রাস্তাটা একেবারে খালি—জনশূন্য খাঁ খাঁ করছে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। বোধ হয় এর মধ্যেই 'কারফিউ' জারী হয়েছে।

কেবল মাঝে মাঝে এক-আধটা সৈন্যভর্তি মিলিটারী ট্রাক সগর্জনে ছুটে চলেছে।

বৃটিশের মারণ অস্ত্র।

রেডিওতে সংবাদ জানানো হচ্ছেঃ অল ইণ্ডিয়া রেডিও খবর বলছি, আজকের মোটামুটি খবর, মধ্যবর্তী সরকারের কংগ্রেসী সদস্যরা পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেছেন। মুসলিম লীগ এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি।...

নির্বিকার মাস্টারদার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে বলে ত মনে হয় না। পরিশ্রান্ত সৈনিক নিদ্রাভিভুত।

একদিন এরাই ত দলে দলে সংঘবদ্ধ হয়ে এদেশের বৃটিশ শক্তিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল; জেবলেছিল এদেশের বুকে বিপ্লবের আগুন, ভারতকে আবার স্বাধীন করতে হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

কত তরুণ কিশোর যুবা সে স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীমূলে দিয়ে গেল আত্মাহুতি।

এ প্রেরণা তাদের কে যুগিয়ে ছিল? কে?...কারা?...

ফিরে তাকাই। অতীত দিনের আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। দেখছি এক বিরাট গেরুয়া মিছিল।

দলে দলে মুক্তিকামী সন্ন্যাসী ফকির, ডাক দিয়ে যায় তারাঃ জাগো! জাগো বঙ্গসন্তান! এদেশ তোমাদের! তোমাদের যারা বঞ্চিত করেছে, তাদের ক্ষমা করো না। যারা তোমাদের ক্ষুধার অন্ন, মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে, তাদের ক্ষমা করো না। সংঘবদ্ধ হও! অত্যাচারীর কণ্ঠ টিপে ধর!

কোন গভীর অরণ্যে বা কোন ভগ্ন কুটীরে বা কোন লুপ্তপ্রায় মন্দিরে হয়ত

ছিল তাদের আস্তানা।

কোথায় তারা? মুক্তিকামী সন্ন্যাসী কোথায় তোমরা?

যেখানে অত্যাচার—যেখানে অনিয়ম সেখানেই তারা!

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে পীড়িত, বুভুক্ষু, অত্যাচারিত ভীরু দেশবাসী সেদিন নূতন ঊষার আলোয় নূতন দিনের স্বপ্ন দেখছিল কি?…

সত্যই কি এতদিন পরে নৃমুণ্ডমালিনী, শ্মশানবাসিনী ভৈরবী মায়ের সন্তানরা শ্বেতদ্বীপের অসুর ধ্বংসে উন্মুক্ত খরসান হাতে এগিয়ে এল!

কোম্পানীর কর্তারা বিচলিত ত্রস্ত ভীত শঙ্কিত। গেল রাজ্য! গেল মান! চারিদিকে বসিয়েছে প্রচণ্ড কড়া পহরা। স্থানীয় অধিবাসীদের 'পরে কঠিন নির্দেশ জারি হয়েছে, সন্ন্যাসী ফকিরদের কাউকে কোথাও দেখতে পেলেই তখুনি যেন রাজদ্বারে সংবাদ প্রেরিত হয়।

ওরা দস্যু! ওরা তস্কর! খুনে—ডাকাত!

কোম্পানী ওদের সমূলে ধ্বংস করে আবার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, কুটীরে কুটীরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়। চির শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী। এ সংবাদ সেদিন তাদের কাছে আর গোপন ছিল না।…

নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সন্তান-সৈনিকরা ছড়িয়ে পড়েছে।

অপ্রতিহত ওদের গতি। বন্যার মত প্রচণ্ড—ঝড়ের মত দুর্বার।

ধরণীর গৃহজাত শস্য ও অর্থ লুঠ করে ওরা বুভুক্ষিত ক্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে।…

কোম্পানীর মাল, রসদ, গোলাগুলি অতর্কিতে লুঠ করে নিয়ে কোথায় আত্মগোপন করছে, কেউ জানতে পারে না, কেউ ধরতে পারে না।

রংপুরের নিকটবর্তী কোন স্থানে ক্যাপ্টেন টমাস্ ও তার অধীনস্থ পরগণা সেপাইদের সঙ্গে প্রায় ৩০ হাজার সন্ন্যাসী সন্তানদের সম্মুখযুদ্ধ হয়ে গেল।

কোম্পানীর সেপাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। ক্যাঃ টমাস্ মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলে পড়ল। রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল।

দমন-নীতি-বিশারদ শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক সন্ন্যাসীদের দমন করতেই হবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা।

একদিকে নতুন বলে বলীয়ান বাংলার নতুন শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দল। তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে উচ্ছিষ্ট-লোভী অনেক বিশ্বাসঘাতক এদেশের ধনিক সম্প্রদায় ও বেতনভুক্ দেশীয় পরগণা সেপাই; অন্যদিকে মুষ্টিমেয় সহায়-সম্পদহীন, মুক্তিকামী তরুণ সন্ন্যাসী সৈনিকের দল।

আবার আর একদল সন্ন্যাসী সৈনিকদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে ক্যাপ্টেন এড্ওয়ার্ডস ও তার অধীনস্থ সমগ্র সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল।

শ্বেতাঙ্গ কর্তারা সংবাদ পেলো, ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করতে উদ্যত হয়ে হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ কয়েক দল সন্তান সন্ন্যাসী তাদের গতি পরিবর্তন করে রংপুর ও দিনাজপুর পরগণার মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

আরো কয়েক দল সন্ন্যাসী সন্তান পূর্ণিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে অত্যাচারী

ধনীদের অর্থ ও শস্য লুঠ করে নিচ্ছে।

সদলবলে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ক্যাপ্টেন ব্রুক তখন রাজমহলের নিকটবর্তী প্যানিটিতে (Panity) অবস্থান করছে।

পূর্ণিয়ার কালেকটার সন্ন্যাসী-দমনে ব্যর্থ হয়ে আর উপায়ান্তর না দেখে ক্যাঃ ব্রুকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা জানিয়ে এক পত্র প্রেরণ করলে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট তার অধীনস্থ ঊনবিংশতি ব্যাটালীয়ান সৈন্য নিয়ে, দেশের সর্বত্র হন্যে কুকুরের মত আজ এখানে, কাল সেখানে সন্ন্যাসী সৈনিকদের খোঁজে পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। যেখানেই সে গিয়ে উপস্থিত হয়, শোনে এই সবে কিছুদিন হলো সন্ন্যাসী সৈন্যের দল সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

ওয়ারেন হেস্টিংস। আবার সেই ওয়ারেন হেস্টিংস! তারই আদেশে এক ব্যাটালীয়ান সৈন্য ক্যাঃ স্টুয়ার্টের সৈন্যদলের সাহায্যার্থে প্রেরিত হলো। আর একদল সৈন্যকে আদেশ দেওয়া হলো, তারা যেন দিনাজপুর স্টেশন থেকে টাইরুট (Tyroot) ও পূর্ণিয়ার উত্তর সীমান্ত দিয়ে মার্চ করে অগ্রসর হয়। ঐ পথ ধরে অগ্রসর হয়ে সৈন্যরা সন্ন্যাসীদের অগ্রগমনে বাধা দেবে। শেষোক্ত দলের 'পরে আরো নির্দেশ ছিল, পথে তাদের কোথাও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ভালই, নচেৎ তারা সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করে কুচবিহার পর্যন্ত অগ্রসর হবে। সেখানে ক্যাঃ জোনসের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাদের সাহায্য করবে।

ক্যাঃ ব্রুকের নিকট সংবাদ এলো, দলে দলে সন্ন্যাসী সৈনিক কশা নদী অতিক্রম করে পূর্ণিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে।···মুহূর্ত মাত্র আর বিলম্ব না করে তক্ষুণি ক্যাঃ ব্রুক তার নবগঠিত লাইট ইন্‌ফেনট্রি সৈন্যবাহিনী নিয়ে কশা (Cossa) নদীর পাড়ে এসে উপস্থিত হলো। দেখলে, অদূরে সন্ন্যাসীরা দলে দলে নদী অতিক্রম করছে।

ইংরাজের কামান গর্জে উঠ্‌ল।

প্রত্যুত্তর জানাল সন্ন্যাসীদের কামান ও বন্দুকের অগ্নিগোলকে। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ!

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকদের বুকের রক্তে কশা নদীর কালো জল রক্ত-রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

ছলে বলে পশুশক্তির হাতে সন্ন্যাসী সৈনিকেরা প্রাণ দিল। এমনি করে বহু যুদ্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত একদিন কোম্পানীর কামানের মুখে প্রথম সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৭৭৩ খৃঃ বিলাতে সে সংবাদ পেঁৗছেছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস। বার বার ঘুরে ফিরে ঐ শয়তানের প্রতিচ্ছবি মনের পাতায় ভেসে উঠ্‌ছে।

ভারতের ভাগ্যাকাশে লোকটা যেন একটা ধূমকেতুর মতই উদয় হয়েছিল! ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কয়েক বৎসর পরেই সে কলকাতার গভর্ণর হয়ে এলো। কোম্পানীর অধীনে হেস্টিংস যখন সামান্য মাহিনায় সাধারণ একজন কর্মচারী,

তখন হতেই সে বিরূপ নন্দকুমারের প্রতি।

এখন হাতে ক্ষমতা পেয়ে হেস্টিংস বদ্ধপরিকর হলো, মহারাজ নন্দকুমারকে ধ্বংস করতেই হবে, তা সে যে উপায়েই হোক, ছলে বলে কৌশলে। ১৭৭৫ খৃঃ ৬ই মে'র কালরাত্রিরও আগে, প্রকাশ্য বিচার-সভায় ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং ও মনসন নন্দকুমারের অভিযোগে হেস্টিংসকে একবাক্যে যখন দোষী সাব্যস্ত করেছিল, সে অভিযোগগুলোও ত সামান্য নয়! সেই অভিযোগগুলোই হেস্টিংসের চরিত্রের সাক্ষ্য দেবে চিরকাল। ১৭৭৫ খৃঃ ১১ই মার্চ মহারাজ নন্দকুমার ইংরাজের সুবিচারের দরবারে একটি দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। প্রথমতঃ ছিল তাতে হেস্টিংসের লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য দুর্ব্যবহারের কথা। তারপর মহারাজ লিখেছিলেন, গভর্ণর হেস্টিংসের বিরুদ্ধে একটি আধটি অভিযোগ নয়, অসংখ্য অভিযোগ। "মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের নামে হেস্টিংসের অভিযোগ অনেক, তারা দু'জনে নাকি কোম্পানীর রাজস্বের বহু টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং সেই মুহূর্তেই তাদের পদচ্যুত করে আমায় নায়েব সুবাদারের পদে নিযুক্ত করতে চান। তখন হেস্টিংসের অনুরোধেই আমি রেজা খাঁর প্রদত্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা করে বুঝতে পারি, রেজা খাঁ কোম্পানীর রাজস্বের প্রায় তিন কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। উপায়ান্তর না দেখে রেজা খাঁ তখন হেস্টিংসকে এগার লক্ষ টাকা ও আমাকে দুই লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি রেজা খাঁর এ হীন প্রস্তাবে সম্মত হতে পারিনি। এর পর কি যে হলো জানি না। কিছুদিন পরে আশ্চর্য উপায়ে রেজা খাঁ মুক্তি পেয়ে গেল। এতে করে কি প্রমাণিত হয় না যে, নিশ্চয়ই হেস্টিংসের মত একজন পরস্ব-অপহরণকারী অর্থপিশাচ বেশ মোটা টাকা রেজা খাঁর নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণ না করে রেজা খাঁকে মুক্তি দেয়নি? কিছুদিন আগে ত সে-ই তার দুষ্কর্মের সাথী ছিল। যখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় আগে হতেই দেশের বহু ধান কিনে রেজা খাঁ গোলাজাত করে রেখে, পরে দুর্ভিক্ষের সময় সেই ধান চতুর্গুণ মূল্যে বেচে প্রভূত অর্থ পায়, তারও বেশী অংশটাই ত তাকে হেস্টিংস প্রভৃতি ইংরাজদের মুখ বন্ধ রাখবার জন্য দিতে হয়েছিল। মানি হেস্টিংস গভর্ণর। এ হতভাগ্য দেশবাসীর 'পরে অসীম তার ক্ষমতা! সেই ক্ষমতারই কি সে অপপ্রয়োগ করেনি, যখন একান্ত অন্যায় ভাবেই, কেবলমাত্র ক্ষমতার জোরে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া, অশেষ গুণবতী মহারাণী ভবানীর কোন প্রকার ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও তাঁর 'বহরেবন্দ' পরগণার জমিদারী ছিনিয়ে নিয়ে, তার প্রিয় বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারের ছেলে লোকনাথ পোদ্দার হাতে তুলে দিলে? কেন? তার কারণ লোকনাথ ও তার পিতা হেস্টিংসের চিরআজ্ঞাবহ। এবং ঐ পথ দিয়ে তার অনেক অর্থাগম হবে, এই আশাতেই না? কি অন্যায় করেছিলেন মুর্শিদাবাদের নাবালক নবাব সুজাউদ্দৌলার গর্ভধারিণী, যাতে করে সেই মহিলাকে নবাবের অভিভাবিকার পদ হতে জোরপূর্বক অপসারণ করে

মীরজাফরের বেগম মণিবেগমকে নবাবের অভিভাবিকার পদে হেস্টিংস বসিয়ে এলেন? সেখানেও সেই রজতচক্রের খেলা। আড়াই লক্ষ টাকা ও ৫৩৯২টি মোহর ও ৫৭০টি আধুলির বিনিময়ে হেস্টিংস অনায়াসেই এই পাপানুষ্ঠান করেছে। মোহর ও আধুলিগুলো হেস্টিংসের হাতে পেঁছে দেয় আমারই গোমস্তা চৈতন্যনাথ, হেস্টিংসের ভৃত্য জগন্নাথ এবং কান্ত পোদ্দারের ছেলে ঐ লোকনাথ। মুর্শিদাবাদ থেকেই হেস্টিংসকে মণিবেগম একলক্ষ টাকা উৎকোচ দেন, বাকী দেড় লক্ষ টাকা হেস্টিংসের আদেশমত কান্ত পোদ্দারের গোমস্তা মনুরসিংয়ের মারফৎ পেঁছে দেওয়া হয়েছিল। এর সাক্ষী আমি ও আমার পুত্র গুরুদাস। স্বয়ং মণিবেগমও একথা আমায় জানিয়েছিলেন। দিল্লীর বাদশা আমাকে একখানা মূল্যবান পাল্কী উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পাল্কীটি পাটনায় এসে পেঁছাতেই, সিতাব রায় জোর করে সেটি আটক করেছেন শুনে, হেস্টিংসকে এর প্রতিকারার্থে জানাই। হেস্টিংস তখন সেই পাল্কীটি পাটনা থেকে আনিয়ে নিজেই দখল করলে। কত আর বলব হেস্টিংসের কুকীর্তির কথা। হেস্টিংস বেশ ভাল ভাবেই জানে, তার কুকীর্তির এমন অনেক কথাই আমি জানি, তাই সে সর্বদা আমার ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট।'

নন্দকুমারের আনীত এ নিদারুণ অভিযোগে মনসন প্রভৃতির সুবিচারে সেদিন অপদস্থ হেস্টিংসের মনে যে প্রতিহিংসার অনল জ্বালাল, তারই নির্বাণ লাভ হলো ১৭৭৫ খৃস্টাব্দের ৫ই আগস্ট রাত্রি প্রভাতে।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

১৭৭৫ খৃঃ ৬ই মে রাত্রি দশ ঘটিকায় মহারাজ নন্দকুমার ইংরাজের কারাগারে বন্দী হলেন জাল দলিলের অভিযোগে।

দলিল জাল! বিলাতের আইনে তখন জাল করবার অপরাধে চরম দণ্ড ফাঁসী দেওয়া হতো।

ঐ হত্যাযজ্ঞের চক্রান্তে প্রধান চক্রী ছিল সেদিন কারা? জান তাদের নাম? মোহনপ্রসাদ, রাজারাজবল্লভ, গোবিন্দসিংহ, কান্ত পোদ্দার, হেস্টিংস বোর্ডের জনৈক্য সভ্য মিঃ বারওয়েল ও স্বয়ং শয়তান-চূড়ামণি জালিয়াৎ গভর্ণর হেস্টিংস।

বিচিত্র সে কাহিনী!

হে মৃত্যুঞ্জয়ী মহারাজ! তোমার আত্মা শান্তিলাভ করেছে কিনা জানি না! পরদেশী বণিকের কথা ছেড়েই দিই, কিন্তু সেই বিদেশীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, সেদিন তোমারই স্বদেশবাসী ভাইরা যারা তোমার গলায় জড়িয়েছিল ফাঁসীর দড়ি, তাদের কি তুমি ক্ষমা করেছো? হে ব্রাহ্মণ! নির্দোষী তোমার রক্তপাত করে যে মহাপাপ সেদিন আমরা করেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত কি আজও আমাদের শেষ হয়নি? ব্রহ্মহত্যার সে মহাপাপের স্খালন কি আজও হলো না?

জানি না কোন অদৃশ্য লোকের মৃত্যুহীন দেশে আজ তুমি বসে আছো!

চেয়ে দেখো মহারাজ, তোমার স্বপ্ন আজ সত্যিই বুঝি সফল হতে চলেছে। তুমি সেদিন যখন একটি মাত্র হেস্টিংসকে তাড়াতে চেয়েছিলে, তোমার কথা সেদিন আমরা কেউ শুনিনি। কিন্তু আজ আমরা এদেশ হতে সমস্ত হেস্টিংস গোষ্ঠীকেই তাড়াতে বদ্ধপরিকর। আজ আমাদের ক্ষমা করো মহারাজ। অদৃশ্য লোক হ'তে পাঠাও তোমার আশীর্বাদ।

প্রচেষ্টা আমাদের সফল হোক!

যে জাল দলিলের অভিযোগে মহারাজকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে অভিযোগ ইতিপূর্বে আরো একবার হেস্টিংস মহারাজের বিরুদ্ধে এনেছিল। কিন্তু সেবারে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগবার ভয়ে হেস্টিংসকে সে অভিযোগ তুলে নিতে হ'য়েছিল। দীর্ঘকাল পরে সেই পুরাতন অভিযোগে মহারাজকে বন্দী করা হলো।

মীরকাশিম তখন মসনদে। সেই সময় বুলাকীদাস নামে একজন ধনী শেঠের কাছে মহারাজ তার নিজস্ব কিছু মূল্যবান হীরা-জহরতের অলংকার বিক্রী করতে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজের যখন যুদ্ধ বাধল এবং মীরকাশিম মসনদচ্যুত হলেন, সেই সময় মীরকাশিমের দলের লোক বলে বুলাকীদাসের কুঠীও লুণ্ঠন করা হয়। সেই লুণ্ঠনের সময় বুলাকী-দাসের অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে মহারাজের গচ্ছিত হীরা-জহরতের অলংকারগুলিও লুণ্ঠিত হয়।

অভাবিত দুর্ঘটনায় হৃতসর্বস্ব ধর্মভীরু সৎপ্রকৃতি বুলাকীদাস মহারাজের গচ্ছিত অলংকারগুলি বা তার বিনিময়ে অর্থ না দিতে পেরে মহারাজকে সে সময় একখানা দলিল লিখে দেয় যে, বুলাকীর দুই লক্ষ টাকা কোম্পানীর কাছে পাওনা আছে। সেই টাকা আদায় হলে মহারাজের গচ্ছিত অলংকারের নির্ধারিত মূল্য বাবদ ৫০ হাজার টাকা সে মহারাজকে শোধ করে দেবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে বুলাকীদাসের জীবিত অবস্থায় কোম্পানীর সে টাকা আদায় হলো না। অবশেষে তাঁর মৃত্যুর পর মহারাজ অনেক কষ্টে কোম্পানীর কাছ হতে বুলাকীর প্রাপ্য ঐ দুই লক্ষ টাকা আদায় করে বুলাকীর বিধবা স্ত্রীর হাতে টাকাটা তুলে দেন। বুলাকীর স্ত্রী ঐ টাকা পেয়ে তখন মহারাজের দেনা শোধ করে দিলেন আর মহারাজ বুলাকীর দেওয়া দলিলখানি বুলাকীর উত্তরাধিকারীদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন।

এরপর অনেক দিন চলে গেল। বুলাকীর স্ত্রীর মৃত্যু হলো।

সেই দলিলের কথাও আর কেউ ভাবেনি।

মোহনপ্রসাদের নাম আগেই বলেছি। মোহনপ্রসাদের মত পরশ্রীকাতর, হীন ও জঘন্য চরিত্রের লোক বড় একটা দেখা যেত না।

এই মোহনপ্রসাদ ছিল হেস্টিংসের একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরামর্শ-দাতা। মোহনপ্রসাদ ঐ দলিলের কথা সবই জানত; কারণ সে ছিল বুলাকীর জ্ঞাতিদের মোক্তার।

প্রথম বারেও ঐ মোহনপ্রসাদের পরামর্শেই, অর্থের লোভে বুলাকীর

জ্ঞাতিরা মহারাজের বিরুদ্ধে জাল দলিলের মকদ্দমা এনেছিল, এবারেও হেস্টিংসের পরামর্শে মোহনপ্রসাদই মহারাজের বিরুদ্ধে জাল দলিলের মকদ্দমা আনল সুপ্রীম কোর্টে।

মহারাজের বিচার হবে!

* * *

মাস্টারদার ঘুম ভেঙে গেছে। বসে বসে হাই তুলছেন।

ঃ কি, ঘুম হলো মাস্টারদা?

ঃ হ্যাঁ। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে, কিছু খাওয়াতে পারিস্?

ভৃত্য এসে জানাল, বেলা হয়েছে, পিসিমা স্নান করতে বললেন।

ঃ হ্যাঁরে, সদর দরজা ছাড়া তোর বাড়ী থেকে আর বের হবার অন্য কোন রাস্তা আছে?

ঃ কেন বল ত?

ঃ সদর রাস্তায় কারফিউ, না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তবে! শিয়ালদহ স্টেশনে একবার যেতেই হবে যে। ঢাকা জেল থেকে বিনয় মুক্তি পেয়েছে, সে আজ কলকাতায় এসে পেঁছাবে কথা আছে। বিনয়ের আবার টি. বি. ফ্লেয়ার আপ্ করেছে। আর হয়ত বেশিদিন বাঁচবে না। কি রে? বোকার মত চেয়ে আছিস্ কেন? আমাদের বিনয় বোসকে মনে নেই তোর? প্রথম সন্ত্রাসবাদের হিড়িকে আন্দামানে গেছিল, তারপর অসুখ হওয়ায় মুক্তি পায়। পরে ১৯৪২এর আন্দোলনে আবার গ্রেপ্তার হয়।

ঃ হাঁ, আছে বই কি। তার দাদা অসীমের ফাঁসী হয়েছিল না?

ঃ হাঁ। অসীমের ছোট ভাই বিনয়।

বিচার-প্রহসন শেষ হয়েছে।

৮ই জুন সুপ্রিম কোর্টে মহারাজের বিচার শুরু হয়েছিল, এবং ১৬ই জুন পর্যন্ত কোনমতে সেই বিচারের প্রহসন চালিয়ে মকদ্দমার নিষ্পত্তি করা হলো মহারাজের প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাদেশ দিয়ে। ফাঁসীর দিন ধার্য হয়েছে। ১৭৭৫ খৃঃ ৫ই আগষ্ট।

তাড়াতাড়ি কোনমতে স্নান করে আহার-পর্ব সেরে নেওয়া গেল। বিনয় বোসকে আনতে যেতে হবে শিয়ালদহ স্টেশনে।

বিনয় বোসকে ভুলিনি। রংপুর জিলা ইস্কুলে আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ত। বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে; বেঁটে খাটো রোগা পাতলা। মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গোল গোল সরলতা মাখানো দুটি চোখ। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। স্থানীয় তরুণ সমিতির একজন পাণ্ডা ছিল সে।

চমৎকার ছোরা আর লাঠি খেলতে পারত। বিনয়ের সঙ্গে আলাপও হয় সে এক বিচিত্র উপায়ে।

আমার বাবা রংপুরে বদলী হয়ে গেছেন। তখন শীতকাল। বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়ে সবে ছাত্ররা নতুন ক্লাসে উঠেছে। পড়াশুনার তেমন চাড় নেই কারও।

ক্লাসের সব ছেলেদের সঙ্গে ভাল করে তখনও আলাপ-পরিচয় হয়নি। পিসেমশাই স্থানীয় একজন উকিল, তাঁর ছেলে কানু আমারই সহপাঠী।

কানুই বিকালের দিকে আমাকে তরুণ সমিতিতে নিয়ে গেল, স্থানীয় কিশোরদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে।

অত্যাসন্ন শীতের সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া পৃথিবীর বুকের 'পরে একটু একটু করে ঘন হয়ে আসছে।

চেরা বাঁশের বেড়া দেওয়া প্রায় দুই কাঠা জমির 'পরে তরুণ সমিতি। রাণীগঞ্জের টাইল ছাওয়া পাকা ভিত ও দেওয়ালের ছোট একখানা ঘর। ঘরের মধ্যে খানকয়েক আলমারী বইভর্তি। সমিতির লাইব্রেরী। সামনের খোলা মাঠের মধ্যে দুটি অল্প বয়সের ছেলেকে একটি কিশোর লাঠির প্যাঁচ শেখাচ্ছিল।

কিশোরের মাথার উপর, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে তেল-চুকচুকে একখানা লাঠি বনবন্ শব্দে চক্রাকারে ঘুরছে। একটা সোঁ সোঁ শব্দ কেবল শোনা যাচ্ছে।

মুগ্ধ হলাম। এইটুকু বেঁটে খাটো পাতলা চেহারার কিশোরটি কেমন করে লাঠিটা অবলীলাক্রমে ঘুরাচ্ছে।

শুনলাম ছেলেটির নাম বিনয়। স্থানীয় লোকেরা বলে লেঠেল বিনয়। প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল পুলিন দাশের কোন্ এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। কিশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল সে বয়সটা আমার।

মা-বাবাকে লুকিয়ে সবে কয়েকখানা নভেল পড়েছি। সব চাইতে ভাল লেগেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'!

ঘুরে ঘুরে আলমারীর বইগুলো দেখছি। হঠাৎ পাশ হ'তে কে যেন প্রশ্ন করলে: কি বই খুঁজছো ভাই?

কি মিষ্টি কণ্ঠস্বর! ফিরে তাকালাম—লেঠেল বিনয় বোস।

এই বোধ হয় লাঠিখেলা শেষ করে এসেছে, ঐ শীতের সন্ধ্যায়ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, মুক্তার দানার মত। বললাম: না, এমনি দেখছি।

: কি ধরণের বই তোমার পড়তে সব চাইতে বেশী ভাল লাগে বল ত?

প্রশ্নটা যেন অতর্কিতে এসে আমায় বিচলিত করে তুলল। কি জবাব দেবো ভাবছি।

বিনয় হেসে ফেললে: কি কি বই পড়েছো?

ভাবছি কি জবাব দেবো। আবার সে-ই প্রশ্ন করলে: 'আনন্দমঠ' পড়েছো? অক্ষয় মৈত্রের 'সিরাজউদ্দৌলা'! রমেশচন্দ্রের 'মহারাষ্ট্রীয় জীবন-প্রভাত'!

: একমাত্র প্রথমটি ছাড়া বাকী বইগুলো কই পড়িনি ত।

: পড়ে দেখো, কি চমৎকার বইগুলো!

বিনয় আবার হেসে ফেললে, বললে : বুঝেছি পড়নি বইগুলো। আরো অনেক অনেক বই আছে।

: তুমি বুঝি ও-সব বই পড়েছো ?

: হ্যাঁ।

: বইগুলো কোন্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় ? তোমাদের এখানে আছে ?

: এখানে নেই, তবে আছে। আরো অনেক বই আছে, সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে, নিষিদ্ধ! লুকিয়ে গোপনে পড়তে হবে।

বিনয়ের সঙ্গে আলাপ জমে উঠতে দেরি হলো না। অত্যন্ত মিশুক ছেলেটি, সামান্য আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়েই সে যেন মুহূর্তে আমায় আপনার করে নিল।

: আমার নাম বীরেশ্বর সেন।

: বাঃ, বেশ! আমার নাম···

বাধা দিলাম : জানি তোমার নাম। তোমার নাম ত লেঠেল বিনয়!

বিনয় হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল : কে বললে তোমায় ?

: শুনেছি, সত্যি বলিনি ?

: হ্যাঁ, বিনয় বোস।

বাসায় ফিরে এলাম সে রাত্রে। কিন্তু মনটা যেন নানা এলোমেলো চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বিনয় বোস! এই বয়সে সমবয়সী কত ছেলের সঙ্গেই না আলাপ হয়েছে, কিন্তু বিনয় যেন তাদের কেউ নয়। একেবারে আলাদা। কি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ক্লাস সিক্সে একটা ইংরাজী কবিতা পড়েছিলুম, মনে পড়ছে সেই কবিতাটা—

The boy stood on the burning deck······

দিন দুই পরে রাত্রি বোধ করি দশটা সোয়া দশটা হবে, বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, পড়বার ঘরে একা বসে কি একখানা পড়ার বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি, এবারে শুতে যাবো। টুক্ টুক্ করে দরজার কপাটের গায়ে সাবধানী শব্দ শোনা গেল, কে ?

হয়ত মনের ভুল। বাইরে কিছুর শব্দ।

আবার সেই শব্দ। উঠে দরজাটা খুলেই দেখি দরজার উপরে দাঁড়িয়ে বিনয়।

: এ কি বিনয়! এত রাত্রে ?

: ভিতরে চল। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমার পিছনে সর্বদা পুলিসের টিকটিকি ঘোরে।

: পুলিসের টিক্‌টিকি, সে আবার কি ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বিনয় হেসে ফেললে : জান না সে বিচিত্র জীবটিকে ; তারাও মানুষের মতই জীব! মীরজাফর উমিচাঁদ তাদেরই সগোত্র। স্পাই। ইংরাজের গুপ্তচর।

বাইরে শীতের রাত্রি যেন থম্‌থম্ করছে। কোথায় কোন্ পত্রান্তরাল হতে

করুণ কান্নার মত একটা ঝিঁঝি পোকা একটানা ডেকে চলেছে।

মাঝে মাঝে খোলা বাতায়ন-পথে শীতের হিমেল বায়ু টেবিল ল্যাম্পের আলোর শিখাটা কাঁপিয়ে যাচ্ছে।

গায়ে জড়ানো চেক-কাটা মলিন র‍্যাপারের তলা থেকে অতি সন্তর্পণে খবরের কাগজে মোড়া একখানা বই বিনয় বের করল: এই নাও, তোমায় বলেছিলাম, বইখানা পড়ে দেখো। বাতির আলোয় খবরের কাগজের মোড়কটা খুলতেই চমকে গেলাম।

মলাটটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কব্জী পর্যন্ত একখানি দৃঢ় মুষ্টি দেখা যাচ্ছে, সেই মুষ্টিতে বদ্ধ একটি রিভলবার। রিভলবারের চোং দিয়ে ধোঁয়া উঠছে চক্রাকারে। উপরে রক্তের মত লাল কালীতে লেখা বইটার নাম।

বিনয় চলে গেল।

সেই রাত্রেই বইখানা আগাগোড়া পড়ে ফেললাম।

একটা নতুন জগতের দরজা যেন চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেছে। মনে পড়ছে, বঙ্কিমের আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সন্তানদের কথা।

শুনতে পাচ্ছি রিভলভারের গর্জন—দুড়ুম্ দুড়ুম্।

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাগলা ঘণ্টি বাজছে, ঢং ঢং ঢং···

বাসুকী আর পৃথিবীর ভার বইতে পারছে না। নড়ে উঠেছে তার সহস্র ফণা। সহস্র চোখে ছুটছে যেন লক্ষ্য কোটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

* * *

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার শেষ হয়েছে। বিচারই বটে। শহরের যত নামকরা বদমায়েস গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক তারাই মহারাজের বিরুদ্ধে একের পর এক এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেল। বিচারের ফলাফল যে কি দাঁড় করানো হবে শেষ পর্যন্ত, সে ত আগে হতেই স্থির করে রাখা হয়েছিল।

হেস্টিংসের বাল্যবন্ধু ইলাইজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি।

১৬ই জুন রায় দেওয়া হলো: মৃত্যুদণ্ড!

নির্ভীক ব্রাহ্মণ একটি কাতর শব্দ পর্যন্ত না ক'রে স্থির অকম্পিত হৃদয়ে মৃত্যুর আদেশ মাথা পেতে নিলেন।

আত্মীয়-স্বজন ও দেশের লোকেরা বেদনায় হাহাকার করে উঠল।

একমাত্র হেস্টিংসের দল ছাড়া, সেদিন সে বিচার-সভায় এমন একটি প্রাণীও ছিল না, এ নির্মম হত্যাদেশে যাদের চোখ দুটি নিষ্ফল বেদনায় অশ্রুসজল হয়ে ওঠেনি। শুনলে ঘৃণায় শিউরে উঠতে হয়, কোন কোন জঘন্য চরিত্রের স্বজাতিদ্রোহী ইংরাজ, উচ্ছিষ্টলোভী পাপিষ্ঠ বাঙ্গালী, তারা নাকি বিচারকের ন্যায়বিচারের প্রশংসা করে বিচারককে অভিনন্দন-পত্র দিতেও ইতস্তত বোধ করেনি।

হেস্টিংসের মনস্কামনা পূর্ণ হলো!

মহারাজ আপীল করতে চাইলেন; কিন্তু বিচারকরা মৃত্যুপথ-যাত্রীর শেষ প্রার্থনা নাকচ করে দিল।

মহারাজ নিঃশব্দে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শেষের দিনটির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৪ঠা আগস্ট সন্ধ্যায় মহারাজ আহ্নিকাদি সমাপ্ত করে স্বীয় পুত্র গুরুদাসকে ডেকে অনেক উপদেশ দিলেনঃ দুঃখ করো না বাবা, নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না। অন্যায়কে কখনো সহ্য করো না। সাশ্রুনেত্রে পুত্র পিতার অন্তিম বাণী শুনে গেল।

বড় রাস্তায় 'কারফিউ', বের হবার উপায় নেই; পিছনের দরজা দিয়ে কোনমতে এ-গলি সে গলি পেরিয়ে আমি ও মাস্টারদা দু'জনে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে পড়লাম।

আজকাল কলকাতার রাস্তায় লোকচলাচল তেমন বিশেষ হয় না। লীগ গভর্ণমেণ্টের আওতায় অবাধে গুণ্ডার দল প্রকাশ্যে দিনের আলোতেই ছোরা-ছুরি হেনে রক্তহোলী খেলে বেড়াচ্ছে।

পথিক সদা সশঙ্কিত, কখন অতর্কিতে কোন্ ফাঁকে চোরাগোপ্তা আঘাত খেতে হয়।

ট্রাম-বাসও নিয়মিত চলে না।

শিয়ালদহের মোড়ে এসে দেখি, একটা দোকান দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ফায়ার ব্রিগেড এখনো এসে পৌঁছাতে পারেনি।

পাঞ্জাবী পুলিস ও লাল পাগড়ীতে স্থানটি সরগম। গা ঢাকা দিয়ে স্টেশনে এসে হাজির হলাম।

স্টেশনে এসে শোনা গেল, নির্দিষ্ট ট্রেন আসতে এখনও আধ ঘণ্টার উপরে দেরি।

দীর্ঘ কারাবাসের পর রাজবন্দী ফিরে আসছে। কি দিয়ে তোমায় অভ্যর্থনা জানাবো।

বিনয় কোনদিনও বলেনি, পরে অন্যের মুখেই শুনেছিলাম, বিনয়ের দাদা অসীমের কোন্ এক ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার অপরাধে ফাঁসি হয়ে গেছিল।

সেই হতেই বিনয়দের বাড়ীতে সর্বদা পুলিসের উৎপাত লেগে থাকত।

যেবারে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই, সেবারে বিনয় গ্রেপ্তার হয়। সে নাকি ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দলে।

বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

আন্দামানে অন্তরীণ থাকার সময়েই বিনয়ের বুকে যক্ষ্মার বীজাণু এসে বাসা বাধে। শেষের দিকে বাড়াবাড়ি হওয়ায় অন্তরীণের মেয়াদ পূর্ণ না হতেই এক বছর আগে ওকে চিকিৎসার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। সেটা ১৯৪১ সাল। মুক্তি পেয়ে ও মামার বাড়ীতে মেদিনীপুর চলে যায়। আবার ১৯৪২-এর শেষের দিকে অল্পকে আগস্ট আন্দোলনের সময় কারারুদ্ধ হয়।

ইণ্টারিম (মধ্যবর্তী) গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা আসায়, অনেক রাজবন্দীর সঙ্গে সেও এতদিনে মুক্তি পেল।

যথাসময়ে ট্রেন এলো; একটা ইণ্টার ক্লাস কমপার্টমেণ্ট হতে বিনয় নামল।

প্রথমটায় চিনতে পারিনি, এই কি সেই বিনয় !

আগস্ট আন্দোলনের বন্দী মাস্টারদাও বিনয়ের সঙ্গে ঢাকার জেলে অনেকদিন ছিলেন, তিনিই আহ্বান জানালেন।

দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে বিনয়কে দেখছি। শেষ দেখেছিলাম, আদালতে যেদিন তার প্রতি দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়। একান্ত নির্বিকারভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দ্বীপান্তরের আসামী। প্রথমবার মুক্তির পর ঘটনাচক্রে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি।

শরীরে আর কিছু নেই বললেও চলে, শুধুমাত্র দেহের হাড় কয়খানি সার।

একটা মলিন খদ্দরের হাফসার্ট গায়ে, পরিধানে মলিন একখানা ধুতি।

চোখ দুটো আরো বড় বড় হয়েছে, একটা অদ্ভুত আলোয় চোখ দুটো যেন মনে হয় দুই খণ্ড কাচের মত ঝক্ঝক্ করে জ্বলছে। অন্তরের সমগ্র প্রতিচ্ছবি যেন দু'টি চোখের দৃষ্টি জুড়ে ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কাসির ধমকে বিনয় যেন নুয়ে পড়ল। খক্ খক্ করে কাসছে। শুক্নো কাসি, বুকের পাঁজরাগুলো বুঝি ওর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

কাসতে কাসতে একদলা রক্ত উঠে এল। তাড়াতাড়ি ও পকেট হ'তে একটা মলিন ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করে মুখটা চেপে ধরল। ন্যাকড়াটা রক্তে লাল হয়ে ভিজে গেল।

রক্তদান এখনও শেষ হয়নি কি? ছিন্নমস্তার পিপাসা মিটবে কবে?

বিনয় ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে, জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে বললে ঃ কাসিটা একেবারে কমে গেছিল, পরশু থেকে আবার শুরু হয়েছে দাদা !

ঃ উঠতে পারবি ? নে আমার হাত ধর্।—মাস্টারদা হাতটা বাড়িয়ে দেন।

ঃ এখনও অতটা দুর্বল হয়ে পড়িনি দাদা ! উঠ্তে পারবো। বিনয় উঠে দাঁড়াল। এবং এতক্ষণে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলে ঃ কে, বীরেশ্বর নয় ?

ঃ হ্যাঁ, চিনতে পেরেছো ? বললাম।

ম্লান হাসির একটা উচ্ছ্বাসে মুখখানা ভরে গেল ঃ কাউকেই ভুলিনি ভাই, মনে আছে, সবাইকেই মনে আছে।

স্টেশন থেকে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সী ভাড়া করতে যাচ্ছিলাম ; বিনয় বাধা দিল ঃ না না, ট্যাক্সি দিয়ে কি হবে ? হেঁটেই যেতে পারবো।

ঃ বলছো কি ? এই শরীরে হাঁটবে কি করে ?

ঃ ভয় নেই। চলই না, পরীক্ষা করে না হয় দেখবে। মৃদু হেসে বিনয় জবাব দেয়।

আগেই ঠিক হয়েছিল, বিনয়কে নিয়ে আমাদের ওখানে গিয়েই ওঠা হবে। কেননা এই শরীরে হোটেলে ওঠা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

সত্যি ! আশ্চর্য হয়ে গেলাম, বিনয় যখন আগাগোড়া পথ ঐ শরীরে হেঁটে চলে এল।

সন্ধ্যার দিকে জ্বর এলো।

ডাক্তার ডাকবার কথা বলতেই বিনয় বললে: ব্যস্ত হয়ো না বীরু। এ রোগের ধারাই এমনি। তাছাড়া প্রত্যহই ত এমনি সন্ধ্যার দিকে গা হাত পা মুখ জ্বালা করে জ্বর আসে, শেষরাত্রের দিকে আবার ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।

কত রাত্রি হবে কে জানে?

নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকারে এত বড় কলকাতা শহরটা যেন অসাড় হয়ে গেছে।

দাঙ্গা বাঁধার পর হ'তে সন্ধ্যা হতেই কলকাতা শহরটা এমনি স্তব্ধ হয়ে যায়।

ব্রিটিশ প্রভুরা এখনও ত শাসনের লাগামটা ধরে আছে দৃঢ়মুষ্টিতে, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর এ দুর্দশা কেন?

পুরাতন কলকাতা কি আবার ফিরে এল? সেই নবাবী আমলের কলকাতা। ট্রামের শব্দ নেই, ট্যাক্সির ভেপু নেই, নেই রিক্সার টুং টাং আওয়াজ।

অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দম্ আটকে আসে।

মাস্টারদা চলে গেছেন; বলে গেছেন কাল সকালের দিকে আবার আসবেন।

বিনয় জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্নের মত শয্যার 'পরে পড়ে আছে। একাকী তার শিয়রের ধারে বসে আছি।

এক সময় বসে থাকতে থাকতেই কখন তন্দ্রামত এসে গেছিল, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। পুবের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। একটা চাপা লালচে আভা দেখা যায়।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্টের রাত্রি প্রভাত হয়েছে, ৫ই আগস্ট।

প্রাতঃস্নান সেরে মৃদু কণ্ঠে হরিনাম করতে করতে মহারাজ পাল্কীতে গিয়ে উপবেশন করলেন।

খিদিরপুরের পুলের পূর্বদিকে কুলিরবাজার নামে যে স্থানটি পরিচিত, সেইখানেই তৈরি হয়েছে ফাঁসীর মঞ্চ: এই দেশে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ফাঁসীর মঞ্চ! আর এদেশে ইংরাজের তৈরি প্রথম ফাঁসীর দড়িটি কণ্ঠে পরতে চলেছেন, —নির্ভীক এক বাঙালী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ! ভোর না হতেই প্রকাশ্য ফাঁসীর মঞ্চের চারিপাশে দলে দলে লোক এসে ভিড় করছে। অগণিত জনসমুদ্রের ঢেউ। অন্তর দিয়ে একদিন যারা তাঁকে ভালবাসত দুঃখে দৈন্যে দুর্দিনে যিনি অকাতরে স্নেহ করুণা ভালবাসা দিয়ে করেছেন তাদের অভিষিক্ত, আজ সেই সদাচারই তেজস্বী নির্ভীক ব্রাহ্মণ মিথ্যা এক জাল মামলার অভিযোগে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে এসেছেন, তাদেরই চোখের সামনে।

আজ বুঝি তাই আর্ত বেদনার ভাষাহীন মূক ক্রন্দনে সবাই পাষাণ হয়ে গেছে। সকলের মুখেই বিষণ্ণ ম্লান ছায়া।

মহারাজের ফাঁসীর সম্পর্কে একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে।

মহারাজ নাকি ইংরাজদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, কোন ব্রাহ্মণকে দিয়েই যেন তার গলায় ফাঁসীর দড়িটি পরানো হয়।

যদি সে কথা সত্যিই হয়, তবে কি আশায় ব্রাহ্মণ এ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, জানি না। যা হোক, প্রথমটায় নাকি কোন ব্রাহ্মণই ঐ হীন প্রস্তাবে সম্মত হননি। অবশেষে নাকি বরাহনগরবাসী জনৈক লোভী ব্রাহ্মণ (?) ঐ জঘন্য কাজ করেছিলেন।

মহম্মদী বেগ, তোমার দুঃখ আর বোধ হয় রইলো না! জানি না এই প্রবাদের মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে! সত্যিই যদি এমনি ঘটে থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণ নয়, চণ্ডাল! উপবীতে তার কোন অধিকার নেই!

কোথায় চলেছ ব্রাহ্মণ? ফাঁসীর মঞ্চের দিকেই এগিয়ে চলেছো কি? এখনো তোমার মুখে ক্ষমা-সুন্দর হাসি? কোথা হ'তে এ হাসি পেলে ব্রাহ্মণ?...

আত্মীয়-স্বজন ও পুত্র গুরুদাসকে শেষ বিদায় জানিয়ে মহারাজ মঞ্চের 'পরে উঠে দাঁড়ালেন।

ফাঁসীর মঞ্চের অদূরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ মহারাজের অনুরোধে শেষকৃত্যের জন্য গঙ্গাতীরে শবদেহ বহন করে নিয়ে যাবেন, সাশ্রুনেত্রে নতমস্তকে অপেক্ষা করছেন।

নির্ভিক অকম্পিত মহারাজের হাস্যদীপ্ত মুখখানা একখানা কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হলো।...

স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় শহীদ মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

শৃংখলিত জননী কেঁদে উঠলেন।

বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে অন্ধকার আবার ঘনিয়ে এল।

ভোরের নির্মল আলোয় ঘরখানি ভরে গেছে।

ইতিমধ্যে বিনয়েরও কখন এক সময় ঘুম ভেঙে গেছে, স্থিরনেত্রে সে আমার দিকে তাকিয়ে।

ঃ স্থির হয়ে বসে অমন করে কি ভাবছিলি রে বীরু!

ঃ কিছু না। এখন তুমি কেমন বোধ করছো ভাই? প্রশ্ন করলাম।

ঃ ভাল। একটু জল দিতে পার ভাই?

ঃ চা আনতে বলব?

ঃ চা? বেশ আন। ভৃত্যকে চা আনবার জন্য আদেশ দিলাম।

ঃ তোমার ভাল চিকিৎসা হওয়া একান্ত দরকার বিনয়।

ঃ চিকিৎসা! না ভাই, আর ঝামেলা করো না। শেষের কয়টা দিন একটু নিশ্চিন্তে থাকতে চাই।

ঃ তা হয় না কবি। তা হয় না। চমকে উঠলাম, চেয়ে দেখি ইতিমধ্যে কখন এক সময় মাস্টারদা এসে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করেছেন। বিনয় এককালে নাকি কবিতা লিখত, তাই মাঝে মাঝে মাস্টারদা বিনয়কে কবি বলে ডাকতেন। মাস্টারদা তখন বলছেন—

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা।—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥

ঃ না, আমরা নই দাদা! নতুন দিনের কবি আসছে, নতুন দিনের গান শোনাতে। নতুন স্বর্গ রচিত হবে, আবার তারই ভিত গড়া চলেছে, তখন দেখবে আপনা হতেই এসেছে সে বিশ্বাসের ছবি।

ঃ তা হয় না ভাই, তা হয় না। নূতন ত আসবেই, তাই বলে তোমাদের প্রয়োজনও ত ফুরায়নি! নূতনের দলকে তোমরা শোনাবে সেই পুরানো দিনের গান, যে গানের সুর হতেই আজ জন্ম নিতে চলেছে আজিকার এই নতুন গীতিকা। চারণ কবির কণ্ঠে এ যুগের ভারতবাসী শুনবে সেই গান। কিন্তু যাক্ সে কথা। ডাঃ বোসকে সংবাদ দিয়ে এসেছি। দশটার পরে তিনি তোমাকে দেখতে আসবেন।

ঃ কিন্তু দাদা!…

ঃ ওরে পাগল, আর 'কিন্তু' নয়। কেন এ অভিমান? দেশের জন্য প্রাণ দিতে বসেছিস, তবে শেষ মুহূর্তে এ সংকোচ কেন?

ঃ আমাদের কাজ কি ফুরায়নি দাদা?

ঃ না ভাই, ফুরায়নি। এবারই ত তোদের আসছে সব চাইতে বড় কাজ। এই ব্রিটিশ যাবার আগে সমগ্র ভারতকে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে যাচ্ছে, একে আবার গড়ে তুলতে হবে অখণ্ড ভারতে, অখণ্ড হিন্দুস্থানই আমাদের চিরদিনের স্বপ্ন!

অদ্ভুত এই মাস্টারদা! প্রৌঢ় হয়ে গেছে, মাথার চুল প্রায় সব পেকে এলো। মুখে দেখা দিয়েছে বার্ধক্যের বলিরেখা, তবু দেখছে নতুন দিনের স্বপ্ন!

তা ছাড়া ভেবে দেখ, ব্রিটিশের দীর্ঘ পোণে দুইশত বর্ষের নিরন্তর শাসনে ভারতবর্ষের বুকখানা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। প্রথম যখন বণিকের পসরা নিয়ে ওরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছিল, ভেবে দেখ একবার সে দিনের কথা!

১৮০৭ খৃঃ হিসাব করে দেখা গেছিল, এ দেশ হতে পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসর এক হাজার পঁচাশি কোটি টাকা বিলাতে চলে গেছে। অথচ আশ্চর্য, তখনও এই ভারতবর্ষের খুব সামান্য অংশই ইংরাজের কবলিত হয়েছে।

ভারতকে নিয়ত চারিদিক হতে নানা উপায়ে শোষণ করে করে ইংরাজের

ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ হচ্ছে, আর ভারতবাসী ক্রমশঃ নিঃস্ব হতে নিঃস্বতর হয়ে পড়ছে। অথচ সেদিন এর প্রতিকারের কোন উপায়ই আমাদের হাতে ছিল না।

ক্রমে এ দেশের সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্যই কোম্পানির লোকেরা একচেটিয়া করে নিল, এবং সেই শিল্প ও বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে চলল শ্বেতাঙ্গ রক্তচোষার দিগ্বিজয়।

পিসিমার কলকণ্ঠস্বর কানে এল ঃ ওমা! সতী! হঠাৎ!

সতী এসেছে! সতী আমার বোন। আমরা এক ভাই ও একটি বোন। বি. এ. বি. টি. পাস দিয়ে ও বহরমপুরে কোন এক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। বিবাহ করেনি। বাবা জীবিত অবস্থায় অনেকবার ওর বিবাহের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হয়নি।

ঃ দাদা কোথায় পিসি ?

ঃ ওপরের ঘরে আছে, যা। দেখ না গিয়ে কোথা হতে এক কেসো রোগী ধরে এনেছে। কাল থেকে ত তাই নিয়েই ব্যস্ত।

ঃ কেসো রোগী আবার কোথা হতে এল ?

ঃ কি জানি বাছা, তোমরা দু'টি ভাইবোন যে কি বিচিত্র ধাতুতে গড়া, তা এক ঈশ্বরই বলতে পারেন। বিয়ে-থা ত করলিনে, বাউণ্ডুলের মত ছন্নছাড়া হয়েই রইলি। আমি ম'লে তোদের কি অবস্থা হবে তাই ভাবি!

ঃ সন্তু কোথায় পিসি ? তাকে যে দেখছি নে!

সন্তু—শ্রীমান সন্তোষ, পিসিমার মা-মরা নাতি ; আমার ভাগ্নে।

ঃ কি জানি কোথায় ?

আমি বিনয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পিসির মধুর বাক্যগুলি নিশ্চয়ই ওর কানে গেছে।

মাস্টারদার কথা ভাবিনে। এসবের তিনি অনেক উর্ধ্বে। সত্যিই তাই। আরাম-কেদারাটার উপর শুয়ে কি একখানা ইংরাজী বই নিয়ে ইতিমধ্যে কখন ডুবে গেছেন।

বিনয়ের চক্ষু দু'টি বোজা। মুখের 'পরে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্যই নেই।

হুড়মুড় করে সতী এসে ঘরে প্রবেশ করল ঃ দাদা!

পরক্ষণেই শয্যায় শায়িত বিনয়ের দিকে তাকিয়ে ও যেন পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর বিস্মিত কণ্ঠ চিরে শুধু একটা অর্ধস্ফুট শব্দ বের হয়ে এল ঃ ও কে! ও কে শুয়ে দাদা ?

ঃ সতী! আমি বিনয়। আমায় চিনতে পারছো না ?

ঃ বিনয় তুমি ? তুমি তাহলে সত্যই এতদিনে ফিরে এলে ?

ঃ হ্যাঁ, ছেড়ে দিল। ম্লান হাসি হাসলে বিনয়।

সতীর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। অদম্য একটা আবেগ ও যেন কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারছে না। চোখ দুটো ওর যেন কেমন চক্‌চক্ করছে। শেষ পর্যন্ত ও কেঁদে ফেলবে নাকি! না না, আমার বোন এমন মেলো-ড্রামাটিক হবে না নিশ্চয়ই।

অসংকোচে সতী এসে বিনয়ের শিয়রের ধারে বসলো। ধীরে তার ডান হাতখানি বিনয়ের রোগতপ্ত কপালের 'পরে রেখে মৃদু সংযত স্বরে বললে : আমি ভেবেছিলাম, এতবড় কলকাতা শহরে তোমাকে খুঁজে বের করবো কেমন করে। একবারও কি ভেবেছি, তুমি আমারই ঘরে এসে শয্যা নেবে। জান, এই ঘরটা আমিই ব্যবহার করতাম! সেবারে কয়েক মাসের জন্য যখন তুমি ছাড়া পেয়ে এলে, তখন আমি রোগে শয্যাগত, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যখন উঠলাম, শুরু হলো মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আবার তুমি হলে বন্দী, আবার দূরে সরে গেলে।

সতী বিনয়ের রুক্ষ চুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে মৃদুকণ্ঠে বলে : তোমার এতদিনকার স্বপ্ন সত্যিই সফল হতে চলেছে বিনয়, ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে যাবে!

: ও জাতকে বিশ্বাস করো সতী? দেখছো না, যাবার আগে কেমন এক নতুন খেলা শুরু করেছে! কোথায় গিয়ে এ খেলা শেষ হবে কে জানে!

: ভয় নেই বিনয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধ বোধ করি অত্যাসন্ন। দেখছো না, দিকে দিকে কেমন পাঁয়তারা কষাকষি চলেছে! আমেরিকার 'এ্যাটম্ বম্'কে রাশিয়া ডরায় না।

এ কি সতীর বিনয়কে সান্ত্বনা দেওয়া!

: মাস্টারদাকে প্রণাম করেছো সতী?

: মাস্টারদা!...

: হ্যাঁ, ঐ যে চেয়ারে বসে।

সতী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মাস্টারদার পায়ের ধুলো নিতে যেতেই মাস্টারদা বাধা দিলেন : থাক্ ভাই থাক্! তুমি এসেছো, এবারে আমি বিনয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ওর ভার তোমারই হাতে তুলে দিলাম বোন।

: জেলে বসে বিনয় যে চিঠিগুলো লিখত, সেসব আপনার কথাতেই ভরা থাকত, দূর হতে কতদিন আপনাকে প্রণাম জানিয়েছি। আজ সজীব আমার কল্পনাকে প্রণামে বাধা দেবেন না দাদা!...সতী বলে।

: আমায় নয় ভাই! তপস্বিনী তুমি, প্রণাম জানাও তোমার সেই অন্তর-দেবতাকে, যিনি তোমার সুদীর্ঘ-তপস্যাকে সার্থক করে তুলেছেন।

: সেদিন সত্যিই যদি এসে থাকে দাদা, তবে প্রণাম জানাবো বই কি!

: সত্যিই সেদিন এসেছে বোন! চেয়ে দেখ, নতুন ঊষার নতুন আলোয় ভারতের আকাশ এবারে রাঙা হয়ে উঠল বলে। এত প্রাণদান, এ কি ব্যর্থ হবার ভাই? যুগের সঞ্চিত মণিকোঠায় কিছু হারায়নি। কিছুই ব্যর্থ হয়নি। না, ব্যর্থ হয়নি!

সেদিনের কথা, যখন এদেশের বস্ত্রশিল্পে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন এনেছিল। কারণ তখনকার দিনে দেশের তাঁতীদের টাকা দাদন দিয়ে কোম্পানীর লোকেরা কাপড় বুনিয়ে নিত। ফলে কোম্পানীর লোকেদের কাপড়ের চাহিদা যত

বাড়তে লাগল, তাঁতীদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রাটাও সেই অনুপাত বেড়ে যেতে লাগল।

শোনা যায় তাদের সেই বিশ্রী অত্যাচার না সহ্য করতে পেরেই এ দেশের তাঁতীরা নিজেরাই নিজেদের হাতের বুড়ো আঙুল নাকি কেটে ফেলে।

এদিকে ইংলণ্ডের বাজারে বাংলা বস্ত্রের আমদানী ক্রমে বেড়ে চলেছে।

সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন দেখে ইউরোপবাসীরা মুগ্ধ বিস্মিত!

ঐ সময় বিলাতে একপ্রকার নতুন ধরনের চরখা ও তাঁত আবিষ্কৃত হয়, সেই সঙ্গে বস্ত্রশিল্পের যাদুমন্ত্র দেশবাসী শিখতে থাকে। দেশের ধনিক সম্প্রদায় সরকারের অনুমতি নিয়ে বস্ত্রশিল্প চালু করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু দেখা গেল ও দেশের তৈরী বস্ত্র ভারত হতে আমদানী করা বস্ত্রের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কি সৌন্দর্যে, কি সৌষ্ঠবে, কি মূল্যে, কোন দিক দিয়েই ওদেশের তৈরী বস্ত্র ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। তখন বিলাতের কর্তারা ভারতীয় বস্ত্রের উপর অত্যন্ত উঁচুহারে শুল্ক (ট্যাক্স) বসালেন। ক্রমে ঐ শুল্ক এত বেড়ে যায় যে, কাপড়ের দাম নীট্ মূল্যের চাইতে তিনগুণ পর্যন্ত বেশী হয়েছিল। এইভাবেই অত্যন্ত গর্হিত উপায়ে অত্যাচার করে যে বস্ত্র-শিল্প একদিন ভারতের গৌরবস্থানীয় ছিল, টুঁটি টিপে তাকে ধ্বংস করে ফেলা হলো। একথা কি ভুলবার!…না কেউ আমরা ভুলতে পারি!

কল্যাণকে অনেকদিন চিঠি লিখি না। কল্যাণ আমার বন্ধুর ছেলে, বয়স তার মাত্র ১৫ বৎসর, সামনের বার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। হিস্ট্রি তার প্রিয় সাবজেক্ট। ঐ বয়সেই দেশ-বিদেশের কত যে ঐতিহাসিক কাহিনী পড়েছে ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

স্নেহের কল্যাণ,

অনেক দিন তোমার চিঠি পেয়েছি, কিন্তু জবাব দিতে পারিনি। আমার নতুন বই 'বিদ্রোহী ভারত' তোমার খুব ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম। দেশকে বুঝতে হলে, দেশকে সবার আগে ভাল করে জানতে হবে, চিনতে হবে। আমাদের দেশে যত ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই বিদেশী ঐতিহাসিকদের রচনাকে ভিত্তি করে। এ দেশকে যারা শাসন করে ভোগ করতে এসেছে, তাদের চোখের দৃষ্টিভঙ্গী কখনই সোজা ও সরল পথ ধরে চলতে পারে না। অথচ দুঃখ ছিল এতদিন এই যে সেই ইতিহাসকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে এদেশের লোকদের আবার নতুন করে ইতিহাস লিখবার সামান্য মাত্র প্রচেষ্টাকেও এরা এতদিন ক্ষমার চোখে দেখেনি। 'প্রেস আইন', 'ভারত রক্ষা আইন', নানা আইনের ফাঁদ পেতে এরা চিরদিন আমাদের কণ্ঠের ও কলমের দাবীকে দাবিয়ে রেখেছে! কিন্তু তথাপি এদেশে সাহিত্যিকরা চুপ করে থাকেনি। পরাধীনতার জ্বালায় বুকখানা যখন এদের পুড়ে খাঁক হয়ে গেছে, তখুনি সেই রুদ্ধ জ্বালা বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', অক্ষয় মৈত্রের 'সিরাজউদ্দৌল্লা', 'মীরকাশিম', রজনী গুপ্তের 'সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস' এগুলো পড়লেই

তার কতকটা আভাস পাবে। কিন্তু সেদিনের সে ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোও স্বতঃস্ফূর্ত নয়; অনেক জায়গায় তাঁদের নিষ্ঠুর সত্যকে বাধ্য হয়েই এড়িয়ে চলতে হয়েছে। আজ আর সেদিন নেই, তাই আবার আমাদের নতুন করে সে পুরাতন ইতিহাসকে ঢেলে সাজাতে হবে। দীর্ঘ পৌনে দুই শত বৎসর ধরে যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আজ আমরা বর্তমানের পটভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছি, সে বিপর্যয়ের কথা যেন আমরা আজ ভুলে না যাই। ভারতের তোমরা ভাবী সন্তান, আজ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি না বদলায়, তাহলে তোমরা পিছিয়ে পড়বে। সত্যিকারের জীবন বর্তমানের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলার মধ্যেই! গতবার পুজার সময় যখন তোমাদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তুমি জানতে চেয়েছিলে, কেমন করে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তি এদেশে ক্রমে বিস্তারলাভ করে। সেই কথাই আজ তোমাকে সংক্ষেপে বলবো। সিপাহশালার মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বজাতদ্রোহীর চক্রান্তে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল, পরবর্তীকালে সেই কালো মেঘই ভারতের আকাশের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঢেকে ফেললে। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। বণিকের মানদণ্ড যখন সত্যসত্যই রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হলো, তখন সেই বাংলা দেশকে ভিত্তি করেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের লোলুপ হস্ত ভারতের দিকে দিকে প্রসারিত করে। মারাঠা বীরদের কথা তুমি অনেক শুনেছো। পাণিপথের যুদ্ধের পর পেশোয়া প্রথম মাধব রাও চেষ্টা করলেন মারাঠার হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে। দেখতে দেখতে পেশোয়ার সৈন্যদল ও মহাদাজী সিন্ধিয়া প্রভৃতি রণকুশলী সেনানায়কদের সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণাপথে লুপ্ত মারাঠাশক্তি আবার মাথা তুলে দাঁড়াল নূতন গৌরবে। কিন্তু যার অক্লান্ত সাধনায় মারাঠাশক্তি আবার নূতন দিনের স্বপ্ন দেখছিল, সেই দেশপ্রেমিক মাধব রাওয়ের আকস্মিক মৃত্যু ও তার খুল্লতাত রঘুনাথের চক্রান্তে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যগগনে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মৃত পেশোয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও ১৭৭২ খৃঃ তখন পেশোয়ার পদ অলংকৃত করলেন বটে, কিন্তু রঘুনাথের চক্রান্তে তাকেও মৃত্যুবরণ করে নিতে হলো।

নিহত নারায়ণ রাওর শিশুপুত্র দ্বিতীয় মাধব রাও (১৮৭৪-৮৬) পেশোয়া বলে ঘোষিত হন। ঐ নিষ্পাপ শিশু মাধব রাওয়ের বিরুদ্ধেও রঘুনাথের চক্রান্ত কম ছিল না। কিন্তু মহারাষ্ট্রের ঐ দুর্দিনে যে কূটনীতিজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ঐ বালক পেশোয়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর নামও তোমার জানা প্রয়োজন: বালাজী জনার্দন (নানাসাহেব)। রঘুনাথ যখন দেখলেন তার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, তিনি সোজা চলে গেলেন বোম্বাইয়ে। সেখানে গিয়ে সেখানকার ইংরাজদের দয়ার প্রার্থী হলেন। মহারাষ্ট্রের ভাগ্য-গগনেও দ্বিতীয় মীরজাফর রঘুনাথের চক্রান্তে দ্বিতীয় পলাশীর সম্ভাবনা দেখা দিল।

লোলুপ ইংরাজের লোলুপ হস্ত সহজেই রঘুনাথের সঙ্গে সহর্ষে করমর্দন করলে।

ভাবছি আজকের মত পত্র লেখা এই পর্যন্তই থাক, সকালে আবার লিখবো! হঠাৎ পাশের ঘর হতে টুক্‌রো টুক্‌রো কয়েকটা কথার আওয়াজ কানে এলো।

সতীর গলা : একটু ঘুমবার চেষ্টা করো বিনয়!

: এই দীর্ঘ ঊনচল্লিশ বছরের জীবনের এমনি কত রজনীই আমার নিদ্রাহীন কেটে গেল সতী! আন্দমানে গিয়ে প্রথম দিকে ঘানি টানতে হতো কলুর বলদের মত। ঘানি টেনে সরষে পিষে পিষে পরিশ্রান্ত আমরা তেল বের করেছি, সেই তেল দিয়ে হয়ত তোমরা এদেশে বসে তরকারী ভেজে খেয়েছো। নারিকেলের ছোব্‌ড়া থেকে দড়ি তৈরী করে পাকিয়েছি। ঘানি টানতে টানতেই একদিন বুকে ব্যথা উঠ্‌ল; তারপর দেখা দিল কাশি এবং তার কিছুদিন পরে কাসির সঙ্গে রক্তের ছিটে।

: কিন্তু তুমি তো কোন দিন এসব কথা আমায় জানাওনি বিনয়!

: জানাব! কিন্তু কেন জানাব বল তো? আন্দামানের বন্দীদের কথা ভেবে ক'জন ভারতবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে সেদিন!

: কিন্তু আজকের দিনের কথা একবার ভেবে দেখো বিনয়! সেদিন আমাদের কণ্ঠের বাণীকে এরা রুদ্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু রুদ্ধ হয়েও তা হারায়নি। নিঃশব্দে ফল্গুর ধারার মত গোপনে বয়ে গেছে। আজ সেই ফল্গুধারা প্রবল স্রোতে আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করতে চলেছে। তোমাদের প্রাণদান ব্যর্থ হয়নি। দেশ তোমাদের ভোলেনি! তোমাদের বাদ দিয়ে তো দেশ নয়।—না, নিশ্চয়ই নয়। তোমাদের কাউকে বাদ দিয়েই দেশ নয়।

না, ঘুম হবে না, চিঠিটা শেষই করে ফেলি। কলমটা আবার তুলে নিলাম : না, সতীর কথাই ঠিক! তোমাদের আমরা ভুলিনি।

*　　　*　　　*

ভুলিনি সেই হায়দার আলি ও মহীশূর-শার্দূল টিপু সুলতানের কথা। সে কি ভোলবার! মনে পড়ছে বই কি!

নিদ্রাহীন দু'চোখের ক্লান্ত পাতার 'পরে স্বপ্ন রচনা চলেছে। হাঁ, স্বপ্ন দেখছি। ১৯৪৭এর জুনের রাত্রি নয়, ১৭৯২এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী, এক গভীর স্তব্ধ রাত্রি।

উঃ, কি অন্ধকার! চোখ বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে।

সুদূর মহীশূরে ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সে রাত্রিও কি এমনি অন্ধ অন্ধকারে জমাট বেঁধে গিয়েছিল বেদনার ও অশ্রুর হিম-স্পর্শে। একা একা অন্ধের মত অজান্তেই যেন হেঁটে চলেছি শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ ছেড়ে! হাতে একখানি সন্ধিপত্র, পশ্চাতের দিকে ফিরে তাকালাম : অন্ধকার আকাশের তলে শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গশিখরে কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। দুর্গলক্ষ্মী নিঃশব্দে রোদন করছেন। আজ এতকাল পরেও সেই অন্তর্হিতা দুর্গলক্ষ্মীর অশ্রুত কান্নার ধ্বনি যেন দীর্ঘ দেড় শতাব্দীর বিস্মৃতির দুয়ার ঠেলে কানে এসে সর্বাঙ্গ

আমার কাঁপিয়ে তুলছে।

কেন চলেছি ? কোথায় চলেছি ? কোন্ মর্ম-পীড়িতের বুকভাঙা হাহাকার নিয়ে চলেছি !

নিঃশব্দে মাথার উপরে কালো আকাশের দিকে তাকালাম, কালপুরুষ জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে।

মাত্র কয়েকদিন আগেকার কথা মনে পড়ছে : শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ। দুর্ভেদ্য। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ করেছে ইংরাজ সেনাপতি কর্ণওয়ালিশ তার বিপুল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আর তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে স্বদেশদ্রোহী উচ্ছিষ্টলোভী নিজাম ও মহারাষ্ট্র।

হয় আত্মসমর্পণ, না হয় তিল তিল করে মৃত্যুকে বরণ।

তাই যেতে হয়েছিল ব্রিটিশ সৈন্য-শিবিরে।

সেদিনের কথা কি ভুলতে পারবো ? ব্রিটিশ সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করে নত মস্তকে জানালাম : সুলতান আত্মসমর্পণে প্রস্তুত, আমি তারই প্রেরিত উকিল। অবরোধ তুলে নেওয়া হোক।

ধূর্ত কর্ণওয়ালিশ মৃদু হেসে বললে : সুসংবাদ। আমরাও প্রস্তুত। তবে···

: তবে ?

: কয়েকটি শর্ত আছে তার পূর্বে, তোমাদের মহামান্য সুলতান কি তাতে রাজী হবেন ?

: সর্ত ! কি সর্ত ?

: আমরা একটি সন্ধিপত্র রচনা করেছি। সেই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী প্রথমতঃ সুলতানকে তার বৃহৎ রাজ্যখণ্ডের অর্ধেক ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করে দিতে হবে, দ্বিতীয়তঃ সুলতানকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং ঐ সন্ধির ও যুদ্ধ-বিরতির জামীন স্বরূপ সুলতানের দুই কিশোর কুমার আব্দুল খালেক ও মঈজুদ্দীনকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে হবে এবং এই পত্রে সুলতানকে সর্বাগ্রে সাক্ষর করতে হবে।

হয়ত আর উপায়ান্তর না দেখেই রণক্লান্ত মহীশূর-শার্দুল টিপু সুলতান দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে আজ যখন দেখতে পেলেন তাঁর দেশবাসী নিজাম ও মহারাষ্ট্রও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তখন বুকভরা বেদনায় ও অশ্রুভরা আঁখিতে সেই হীন শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে দিলেন।

অস্তাচলমুখী মহীশূর-রবি। কদিনই বা হবে, যেদিন ব্রিটিশের সঙ্গে রণশ্রান্ত বৃদ্ধ হায়দর আলী শয্যাশায়ী, পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল যে তরুণ যুবক দীর্ঘ উন্নত পেশল বক্ষ, প্রশস্ত ললাট এবং যার প্রথম আঘাতেই তাঞ্জোরে ব্রিটিশশক্তি পর্যুদস্ত হয়েছিল (১৭৮২)।

আজ তারই সমাধির প্রথম ইষ্টকটি প্রোথিত হলো।

দুম্ দুম্···কোথায় বুঝি বোমা ফাটল আবার। নিশীথিনীর স্তব্ধ বুক-

খানা কেঁপে উঠল।

কাঁপছে মেদিনী থরথর করে! শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ হতে কামানের বজ্রনির্ঘোষ বলে দিলে, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সুলতানের অন্তঃপুর হতে সুলতান কুমারেরা ব্রিটিশের সৈন্যশিবিরের দিকে রওনা হলো, শার্দুল-শাবক আসছে আত্মসমর্পণ করতে।

অন্তঃপুর হতে ক্রন্দন-ধ্বনি আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

এখনও কি পাশের বাড়ির বউটি কাঁদছেন? হাঁ তাই তো! তার বৃদ্ধ স্বামীর মুক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু পুত্র দু'টিকে পুলিস ছেড়ে দেয়নি।

কর্ণওয়ালিশ কতকাল আর তুমি বেঁচে থাকবে? আজিও কি তোমার মৃত্যুর সময় হয়নি?

ঃ দাদা?

চমকে উঠলাম। কখন নিঃশব্দে সতী এসে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছে।

কলমটা এক পাশে নামিয়ে রেখে সতীর মুখের দিকে তাকালাম।

ঃ এখনও জেগে বসে বসে লিখছো দাদা! ঘুমাবে কখন? একটু থেমে আবার বললে ঃ বিনয় বোধ হয় ঘুমিয়েছে দাদা! ও-ঘর থেকে দেখলাম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে।

ঃ বোস বোন!

সতী একটা চেয়ারের উপর বসল।

ঃ কাল হয়তো তোমার সঙ্গে কথা বলবার সময় পাবো না দাদা। যে প্রশ্ন তুমি বহুবার আমাকে করতে এসেও চুপ করে গেছ এবং আমিও জবাব দিইনি, সেই কথাটাই আজ তোমাকে বলতে এসেছি দাদা।

ঃ যে কথাটা এতকাল তুই বলবার প্রয়োজন বোধ করিসনি, আজই বা কেন সেই কথাটা বলবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিস্ ভাই? থাক না।

ঃ দাদাভাই, তুমিও আমায় বুঝবে না? তুমিও আমার 'পরে অভিমান করে আজকের দিনে দূরে সরে যাবে? আজ বাবা বেঁচে নেই—

সতীর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে ঃ আমায় তুমি ভুল বুঝো না দাদা!

ঃ ভুল বোঝার কথা থাক। তুই কি আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিস বোন?

ঃ না দাদা, বিদায় নয়, তবে যাবার আগে তোমায় শুধু জানিয়ে যেতে এসেছি। তার কারণ আজকের এই যাবার দিনে তোমার আশীর্বাদ না পেলে যাত্রাই যে আমার নিষ্ফল হয়ে যাবে।

ঃ আশীর্বাদ চিরদিনই তোকে আমি করেছি বোন, আজও করবো। যা সত্য, যা মঙ্গল, তাতে যেন তুই দূরে না সরে থাকিস!

ঃ শুধু কি ঐটুকুই তোমার আজকের দিনে বলবার ছিল দাদা? আর কি কিছুই বলবার নেই?

ঃ না।

ঃ তবে আমি যাই।

ঃ আয়।

সতী তখন নিঃশব্দে একটু আগে ঘরের মধ্যে যেমন এসে প্রবেশ করেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

মনে মনে বললাম ঃ দুঃখ করিসনে বোন। আমার এতদিনকার মূলগত সংস্কার, যাকে আঁকড়ে ধরে জীবনের এই দীর্ঘ পথ চ'লে এলাম, তাকে ভুলতে পারছি না বটে, কিন্তু অনাগত কালের নারী তোকেও অস্বীকার করতে পারলাম না। তুই তো জানিস্ সমাজের বন্ধন আমার নেই। তবু যে সমাজকে তোরা আজ নতুন করে গড়ে তুলতে চলেছিস, সে যেন তোদের ব্যর্থ না হয় এইটুকুই শুধু প্রার্থনা রইলো।

১৭৯২, ২৬শে ফেব্রুয়ারী। ব্রিটিশ-শিবিরে উৎসুক দর্শকমণ্ডলী।

দেবশিশুর মতই দু'টি কিশোরকুমার সুলতানের প্রধান উকিল গুলাম আলীর সঙ্গে এসে শিবিরে প্রবেশ করল। পরিধানে তাদের শ্বেতশুভ্র মসলিনের গাউন। গলায় বহুমূল্য মুক্তার মালা। শিরে রক্তের মত লাল রেশমী পাগড়ী। পাগড়ীতেও মুক্তার ঝালর। কে এরা ?

টিপুর দুই কুমার।

সাহেব, সুলতানের এই দুই কিশোর পুত্র। আজ প্রাতেও এরা আমার প্রভু সুলতানের পুত্র ছিল, কিন্তু আজ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে, তোমাদের হাতে এদের তুলে দিতে এসেছি।

কিন্তু এত করেও কি মহীশূর রক্ষা হলো ?

আবার ১৭৯৯ খৃঃ যুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠল।

সেই শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ।

৪ঠা মে মহাবীর টিপু চতুর্থ মহীশূর-যুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস নিলেন।

নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চলেছে সতীরা।

অন্যায়কে যে সমাজ সহ্য করবে না, অত্যাচারকে মাথা পেতে স্বীকার করে নেবে না।

একদল মাথা নেড়ে নীতির দোহাই পেড়ে আর একদলের দাবীকে অস্বীকার করতে পারবে না।

সত্য যা, স্বতঃস্ফূর্ত যা, তাকে স্বীকার করে এরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে শতাব্দীর কবরের ঠাণ্ডা মাটিতে।

পুরানো মাটির বুকে তাই নব অঙ্কুরের প্রাণ-স্পন্দন।

শিলালিপি থাক।

শিলালিপিতে আজ আর এদের প্রয়োজন নেই।

নতুন করে পৃথিবীর বুকে শুরু হবে নতুন মানুষের জয়যাত্রা ঃ আজ তারই

ইশারা দিকে দিকে, সতী বুঝি তারই ইশারা দিয়ে গেল!...

আবার কানে এলো পাশের ঘর হ'তে সতী ও বিনয়ের টুকরো টুকরো কথার আওয়াজ।

ঃ আমি কখনো ভাবিনি ১৯৪১ সালের শেষের দিকে দীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দ বছর পরে দ্বীপান্তরের মেয়াদের ১৫ বছর না পূর্ণ হতেই ওরা আমায় ছেড়ে দেবে। বুকের অসুখটা নাকি তখন আমার খুব বেড়ে গেছে। মেদিনীপুরে চলে এলাম, ঝাড়গ্রামে মামার একটা বাড়ি ছিল। মাস তিনেক সেখানে গিয়ে থাকতেই অসুখ আমার কোথায় পালিয়ে গেল। আবার ফিরে পেলাম আমার চৌদ্দ বছর আগেকার হারানো উদ্ধত যৌবনকে। বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না, চলে এলাম মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরে তখন জেগেছে এক নব-জীবনের সাড়া। ঘুমন্ত কংগ্রেস ঘোষণা করলে হঠাৎ ভারত ছাড়ো—Quit India! এ কয়েক মাসে যেন ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, খুঁজে পেলাম নিজেকে।

ঃ একবারও কি আমার কথা মনে পড়েনি তোমার, বিনয়?

ঃ বিপ্লবীর তো ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখতে নেই, সতী!

ঃ ঘরের কথাই শুধু তুমি ভাবলে চিরকাল, বিনয়! অথচ তুমি হয়ত জান না, ঘর বাঁধবার স্বপ্ন আমি কোনদিনই দেখিনি। তোমাকে পেয়েছিলাম আমি ঘরের বাইরে, তাই কোন দিনই ক্ষুদ্র ঘরের আবেষ্টনীর মধ্যে তোমায় আমি কল্পনা করিনি বিনয়। ঘরের বাইরের মুক্ত উদার আকাশের তলে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখেছি, যেখানে পথে পথে কণ্টক ভরা, প্রতি মুহূর্তে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত্যা। কিন্তু ওকথা যাক্। সারাটা রাত্রি তুমি ঘুমালে না। রাত্রি তো পুইয়ে এলো। এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

ঃ আমাদের বিদ্রোহী কবি নজরুলের সেই কবিতাটা জান, সতী?

ঃ কোন্‌টা?

ঃ সেই যে—

আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেই দিন হবো শান্ত,
যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।...

দেশ স্বাধীন হতে চললো, কিন্তু সত্যিই কি দুঃখের—উৎপীড়নের অবসান হবে!...কি আমরা পাচ্ছি? একদল শক্তিমান লোকের হাতে যাচ্ছে শাসনদণ্ড। এই কি People's government-এর স্বরূপ! এই কি জহরলালের People's Raj! ইদানীং জেলে বসে বসে একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবতাম সতী, এমন একটি government আমাদের প্রয়োজন, যেখানে সকলের সমান অধিকার থাকবে। সে government কোন একটা বিশেষ দলের নয়, সর্বকালের, সর্বদলের, জনসাধারণের—

হঠাৎ একটা কাশির ধমক এসে বিনয়ের কণ্ঠের বাকি কথাগুলো শেষ হতে পারলে না। খক্ খক্ করে কাসছে বিনয়।

বিনয় কাসছে, বুকের পাঁজরাগুলো গুঁড়িয়ে গেল বুঝি! তাড়াতাড়ি শয্যা হতে উঠে পাশের ঘরে এলাম।

অসহ্য ক্লান্তিতে মুখখানা যেন নীল হয়ে গেছে।

শুধু বিনয়ের মুখখানাই নীল হয়নি।

চোখের সামনে দেখছি, শস্যশ্যামলা বাংলার বুকখানাও যেন বেদনায় নীল হয়ে গেল।

বাংলার উর্বর মাটি, এখানে সোনা ফলে; কিন্তু মাঠে মাঠে সোনালী ধান কই? কই সেই চোখ-জুড়ানো, মন-ভুলানো হরিৎ ক্ষেত্র?

শ্বেতাঙ্গদের নীলের নেশায় পেয়েছে। শস্য চাই না, শুধু চাষ কর নীলের। শ্বেতাঙ্গদের শোষণ-নীতির নব-কল্পিত একটি প্রবাহ এসে বাংলার বুকে ঢুকেছে। নিশ্চিন্তে বসে থাকবার লোক তো শ্বেতাঙ্গরা নয়, তাই বুঝি বাংলার বস্ত্রশিল্পের দুর্দিনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হতে ইংরাজরা প্রচুর পরিমাণে তুলো বিলাতে রপ্তানী করতে লাগল।

আর সেই সঙ্গে লুপ্তপ্রায় বস্ত্রশিল্পের কবরের মাটিতে লাঙ্গলের তীক্ষ্ন ফলা চালিয়ে রোপণ করলে বিষাক্ত নীলের বীজ; শুরু হলো নীলের চাষ। সে বিষের ক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে বাংলার বেদনার আর অবধি রইল না। এদেশে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের বহুবিধ শোষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই নীলচাষ।

ঐ নীলের চাষ করতে গিয়ে নীলকরেরা যে জঘন্য অত্যাচার দিনের পর দিন বাংলার শত শত অসহায় চাষীদের 'পরে চালাতে শুরু করলে, তারই বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন আবার একদিন পরবর্তীকালে দেখা দিল, তাই নীলবিদ্রোহ বা নীল-আন্দোলন। কিন্তু পুরাতন ইতিবৃত্তের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, তারও আগে—অনেক আগে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকেরা সাগরজলে জাহাজ ভাসিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে প্রথম ভারতবর্ষে পেঁছোয়। পরবর্তীকালে এদেরই সাহায্যে ইউরোপীয় দেশগুলির নীল রঙের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও পরে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের প্রচেষ্টায় ভারতের মাটিতে নীলের চাষ বিশেষ ভাবে বর্ধিত হয়। মাথার উপরে চাইলেই দেখি আকাশ নীল! কিন্তু সেই আকাশের শান্ত নীলিমাকে জয় করবার জন্য যখন ধরিত্রীর বক্ষ-বিদারণ করে নীল রঙের সংগ্রহ শুরু হলো, তখন সেই শান্তি পরিণত হলো দুঃসহ ব্যথায়। যে ব্যথার ক্ষত দুষ্ট ব্রণের চিহ্নের মতই আজিও বাংলার বহু স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে নীলকুঠী নামে সাক্ষ্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখো ভাল করে, কান পেতে শোন, আজিও হয়ত শুনতে পাবে, কোন গভীর রজনীতে সেইসব ভগ্নপ্রায় নীলকুঠির ইষ্টকস্তূপ হ'তে নীলকরের অত্যাচারের নির্মম কশাঘাতের জ্বালায় সেযুগের জর্জরিত বাংলার চাষীভাইদের অদেহী আত্মার অশ্রুত বিলাপধ্বনি! ভারতের নানাস্থানে, সুমাত্রা, জাভা, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়-উপদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তখন নীলের চাষ চলছে। কারণ তখনও কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরীর কথা কেউ ভাবেনি। একপ্রকার গুল্মজাতীয় গাছ হতেই নীল তৈরী হচ্ছে বলেই চলেছে

-নীলের চাষ।

বাংলা দেশ! সে যে সুজলা সুফলা! তাই তো বাংলা দেশের উৎপন্ন নীলই হয়েছিল সর্বোৎকৃষ্ট। সে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা, যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম বাংলার সোনার মাটিতে লাঙল চালিয়ে নীলের নেশায় মেতে ওঠে।

নেশা বইকি! তবে সেটা নীলের নয়—রৌপ্যচক্রের, কারণ নীলের চাষ মুখ্য হলেও গৌণ ছিল অর্থ, এবং ঐ নীলের ব্যবসাতে ইউরোপীয় বণিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতো কিন্তু রায়তদের ভাগ্যে পরিবর্তে জুটতো অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার, অসহ দুঃখ ও লাঞ্ছনা।

হিসাবের অংক: ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মোট ১,৬৮৮,৬৪২ একর জমিতে নাকি নীলের চাষ হতো। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৩৭,৪৪০ হন্দর পরিমাণ নীল। তার মধ্যে আবার হিসাবে দেখা গেছে, ১৬৬,৪৩০ হন্দর নীল শুধু কলকাতা হতেই রপ্তানী হয়েছিল। ঐ পরিমাণের প্রায় সবটুকুই উৎপন্ন হয়েছিল বাংলা দেশের মাটিতেই লাঙ্গল চালিয়ে। ১৮৫০-১৮৬০ এই সময়ের মধ্যেই বাংলার মাটিতে নীলের চাষের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়।

রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন, নীলের চাষের দ্বারা জনসাধারণ নাকি উপকৃতই হচ্ছে। কিন্তু কুড়ি বছরও তারপর গেল না, নীলের বেদনায় আর্ত চাষী-ভাইদের হাহাকারে বাংলার মাটি ও আকাশ বেদনায় নীল হয়ে উঠল।

বাংলায় নীলচাষের ইতিবৃত্তের পাতাগুলো রক্তরঞ্জিত হয়ে আছে—নীলকরদের অকথিত নিপীড়নের কলংক মসীতে।

প্রথমে কোম্পানীর লোকেরাই এদেশে নীলের চাষ শুরু করে, সেকথা সকলেই জানে, পরে নীলের ব্যবসাধিকার উঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, সাগর-পারের শ্বেতদ্বীপ হতে ছুটে এল অসংখ্য বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ বাংলা দেশে নীলের চাষ করতে।

লাভের অংকের মোহিনী মায়ায় দূর দেশে বসেও তাদের চোখে লোভের আগুন জ্বালিয়েছিল।

বেলা দশটার সময় মাস্টারদার সঙ্গে ডাঃ বোস এলেন; বুকের ব্যাধিতে বিশেষজ্ঞ ডাঃ বোস। সৌম্য শান্ত চেহারা। বেঁটেখাটো মানুষটি, একটি সাদা জিনের প্যান্ট ও সাদা টুইলের হাফশার্ট পরিচ্ছদ, গলায় ঝুলছে স্টেথো-স্কোপটি। সদাহাস্যময়।

হাসতে-হাসতেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন: কই সান্যাল, তোমার রোগী কই? পরক্ষণেই শয্যায় শায়িত বিনয়ের দিকে নজর পড়তেই, মুহূর্তের জন্যই যেন মুখখানির উপরে তাঁর একখানা কালো ছায়া পড়েই আবার প্রফুল্ল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন: আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আপনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন!

বিনয়ের মুখে সেই চিরাচরিত শান্ত স্নিগ্ধ হাসি: হতাশ! না, ডাঃ বোস।

ঃ দেখুন শরীর থাকলেই ব্যাধিও থাকবেই। আপনার সব কথাই আমি সান্ন্যালের কাছে শুনেছি। কিন্তু যাক সে-সব কথা, বর্তমানে আপনার কি কষ্ট বলুন তো !

ঃ কষ্ট ! কষ্ট আমার বিশেষ কিছু নেই ডাক্তারবাবু। মাঝে মাঝে যখন কাসিটা আসে কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। খানিকটা রক্ত পড়ে গেলেই আবার একটু আরাম বোধ করি। এ ছাড়া কষ্ট আমার কিছু নেই।

ডাঃ বোস অনেকক্ষণ ধরে বিনয়কে পরীক্ষা করলেন ঃ কিছুদিন বাইরে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারেন না ? সব চিন্তা-ভাবনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে একবারে পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন। দুধ, ঘি, মাখন, ছানা যা খেতে পারেন সব খাবেন।

ঃ দুধ, ঘি, মাখন, ছানা কোথায় পাব ডাঃ বোস ?

ঃ সেজন্য তোমায় চিন্তা করতে হবে না, বিনয় ! কথাটা বললে সতী।

ঃ সেজন্য চিন্তা করবো না, বল কি সতী !…বিনয় সতীর মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে তাকায়।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু আমার বর্তমান পুঁজি তো মাত্র তিন টাকা বারো আনা আর দুটো পয়সা। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও নেই, কোন বড়লোক আত্মীয় নেই, যার আকস্মিক মৃত্যুতে হঠাৎ একটা অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে এমন কোন সম্ভাবনাও নেই।

ঃ না-ই থাক, তবু তোমাকে যাবার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

ঃ বেশ, করবো না।

আমরা কেউই এর মধ্যে একটি কথাও বলিনি, তাছাড়া বলবার কিই বা আছে।

সতী আর বিনয়ের কথা।

বিনয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, শয্যার 'পরে যেন একেবারে লীন হয়ে গেছে ; চক্ষু দু'টি নিমীলিত। প্রচণ্ড ঝড়ে যেন প্রকাণ্ড একটি মহীরুহ একেবারে মাটির বুকে অবলুণ্ঠিত। পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোকদুঃখ, বেদনা ওকে যেন আর স্পর্শও করতে পারে না। একটু আগে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে যে প্রশ্নের মীমাংসা ও খুঁজছিল, তারও যেন আর কোন প্রয়োজন এখন আর ওর কাছে নেই।

সেই রংপুরের কৈশোরের বন্ধু বিনয়। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসত। সতীর তখন বয়স কতই বা ? আট কি নয় বৎসর।

ম্যাট্রিক পাস দিয়ে দু'জনেই রংপুর কলেজে ভর্তি হলাম। তখনও আগের মতই ও আমাদের বাসায় যখন-তখন যাতায়াত করত।

এরই মধ্যে কখন কোন্ ফাঁকে সতী ও বিনয়ের মধ্যে এমন একটি মধুর অথচ চিরস্থায়া অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, কোনদিনই তো তার এতটুকু আভাসও পাইনি।

বাইরের ঘরে যখন আমি আর বিনয় নানা বিষয় নিয়ে তর্ক আলোচনা

করতাম, তখন দেখতাম একপাশে সতীও বসে বসে আমাদের তর্ক-আলোচনা শুনছে।

তারপর যে বছর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই, বিনয় ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী হলো—অপরাধ, তার নাকি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

অগ্নিশিখার মতই উদ্ধত ও প্রাণবান ছিল বিনয়। জানতাম সে গোপন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সে সম্পর্কে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনদিন কোন কথাই হয়নি। ওদিকটা যেন বিনয় বরাবর কতকটা ইচ্ছা করেই সযত্নে আমার কাছ হতে এড়িয়ে চলত। তাই বিনয় যখন গ্রেপ্তার হলো ও বিচারে তার দীর্ঘ পনের বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর হলো, তখন বিস্মিত হইনি। আন্দামানে যাওয়ার আগে বিনয়ের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। ভুলিনি সে চিঠিটা ঃ

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল
২৩শে জুলাই, রাত্রি বারোটা

ভাই বীরু,

দ্বীপান্তরের বাঁশী বেজেছে। দু'একদিনের মধ্যেই কালাপানিতে হয়ত ভাসবে জাহাজ। দোষী-নির্দোষের কোন কথা নয়, কেবল একটা কথাই মনে পড়ছে, শৃংখায়িত মায়ের মুক্তির জন্য যারাই ব্রতী হবে, তাদেরই কি এমনি করে কণ্ঠরোধ করা হবে? এর কি কোন প্রতিকারই নেই? কবে আমরা সংঘবদ্ধ হবো। চির আশাবাদী আমরা তাই হতাশ হই না। যদি আর কোন দিন ফিরে না-ও আসি, তবে এই আশাই নিয়ে যাবো, আমরা গেলেও আমাদের এই চেষ্টা বেঁচে থাকবে। হয়ত কালের গতির সঙ্গে সেই চেষ্টা নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। তা হোক, সেও আমাদের শৃংখলিতা জননীর মুক্তির স্বপ্ন। আর একটা কথা ঃ সতীকে বলো সে ভুল পথে চলেছে। ও পথের অনেক দুঃখ। তার প্রয়োজন বাইরে নয়, ঘরে। সেখানেই যেন সে ফিরে যায়। ছেলেমানুষ—আজও সে বুঝতে পারছে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা রইলো, সে যেন নিজেকে চিনতে পারে। পথভ্রান্তির বেদনা তাকে যেন সইতে না হয়! ভালবাসা রইলো। বিদায়।

বিনয়ের সেদিনকার সেই সংক্ষিপ্ত চিঠির ইঙ্গিতটা আজ স্পষ্ট হয়ে চোখের ওপরে ফুটে উঠ্ছে।

ঃ ডাঃ বোস, পুরীতে আমার এক বান্ধবীর একেবারে সমুদ্রের তীরেই একটা বাড়ী আছে, সেখানে বিনয় যেতে পারে? প্রশ্ন করলে সতী।

ঃ পুরী? সে তো খুব ভালো জায়গা। বেশ তো সেখানেই নিয়ে যান।

ঃ এ অবস্থায় গাড়ীর জার্নি সহ্য হবে তো?

ঃ না, ক্ষতি কি? নিয়ে যান।

ঃ ওকে কিছু খাবার ওষুধ দেবেন না?

ঃ হাঁ, লিখে দিয়ে যাবো।

যাক্, বিনয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু সতী? একটিমাত্র

বোন আমার কোথায় চলেছে ? আমি যে সতীর জন্য দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করলাম, সেও কি এই মুহূর্তটির জন্যই !

বিনয়ের পরিণতি কোথায় সে তো আজ আর কারও চিন্তার অপেক্ষা রাখে না। যে অবলম্বনকে সে আজ পর্যন্ত এমনি করে আঁকড়ে রয়েছে, সেই অবলম্বন যখন আর দু'দিন পরে চিতাভস্মে মিলিয়ে যাবে, সেদিনকার সে দুঃসহ দুঃখকে ও ভুলবে কি করে ?

সেই চরম বঞ্চনার দিনে কি থাকবে ওর সান্ত্বনা ?

ঃ কিন্তু কেন তুমি আজও এমনি করে মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছো সতী ?

ঃ মরীচিকা তুমি কাকে বলছো বিনয় ? সতী জবাব দেয় ঃ মানুষ কি তার সারাটা জীবন ধরে কখনো মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াতে পারে ? তোমাদের সেদিনকার সে স্বর্ণমৃগ আজ কি সত্য হতে চলেনি ? মরীচিকা বলছো যাকে, সেও তো আমাদের মনের কল্পনার একটা রূপ। সেও তো মিথ্যা নয়।

ঃ হয়ত মিথ্যা নয়। হয়ত বা সবই সত্যি !

ঃ না, মিথ্যা নয়। কিছুই মিথ্যা হয় না।

দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে খণ্ডে খণ্ডে ভারতের বুকে যে বারে বারে বিপ্লব এসেছে, মিলিত জনগণের শত শত কণ্ঠ চিরে বারে বারে যে দাবী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, তাও মিথ্যা হয়নি, হয়নি ব্যর্থ।

তিলে তিলে যুগের সঞ্চিত সে দাবীই আজ এতকাল পরে আবার সাম্রাজ্য-বাদীদের সিংহাসনের ভিতে ভাঙন ধরিয়েছে।

আবার ফিরে যাই সেই খণ্ড খণ্ড বিপ্লবের স্মৃতির দুয়ার ঠেলে।

শ্বেতবণিকের রক্তকণিকায় ছড়িয়ে পড়েছে নীলের নেশা। সাময়িক ভাবে নীলকরদের সুবিধার জন্য একটা আইনও পাস হলো।

নীলকরদের সঙ্গে নীলের চাষীরা চুক্তিভঙ্গ করলে ফৌজদারী আইনের বলে দণ্ডিত হবে।

কিন্তু বেশীদিন ঐ আইন চালানো গেল না, উঠিয়ে দিতে হলো একান্ত বাধ্য হয়েই। নীলচক্রের নিষ্পেষণে ঘরে ঘরে শুনছি কৃষাণ-ভাইদের হাহাকার।

সে হাহাকার শুনবে কে ? শ্বেতাঙ্গদের ঘরে ঘরে তখন রৌপ্যচক্রের উৎসব। রুশিয়ার 'সাফ' ও আমেরিকার 'নিগ্রো' দাসেদের মত মর্মান্তিক নীলচাষীদের অবস্থা। অথচ কেউ তাদের পাশে দাঁড়াবার নেই।

টাকা দাদন দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে নীল চাষের জন্য হতভাগ্য গরীব চাষী ভাইদের প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। আশানুরূপ ফসল না হলে, পরের বছরের জন্য আবার সেই সব চাষীকেই নীল-উৎপাদনে বাধ্য করা হচ্ছে।

নীলচাষের জন্য দশ বৎসরের চুক্তি।

এইভাবেই নানারকম চক্রান্ত করে বাধ্যতামূলকভাবে পাকে-প্রকারে নীল-চাষীদের নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণত করা হচ্ছে।

এক-একজন শ্বেতাঙ্গ নীলকর নীলচাষের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপায় করে জমিদারী ও তালুকদারী কিনে বেশ শক্ত হয়েই পাকাপোক্ত ভাবে নীলের চাষ নিয়ে মেতে উঠেছে।

এতে আরো সুবিধা এই, যে-সব তালুকদার ও জমিদার শ্বেতাঙ্গরা তাদের জমিদারীর প্রজাদের বাধ্য করে বেগার খাটায়, চুক্তিভঙ্গ করলেই তারা চুক্তিভঙ্গকারী হিসাবে পাইক-পেয়াদা দিয়ে প্রজাদের বেঁধে এনে নীলকুঠির অন্ধকার কারাকক্ষে কয়েদ করে তাদের ওপরে অশেষ যন্ত্রণা ও অবাধে উৎপীড়ন চালায়।

নীলকুঠির কয়েদঘরের সে ভয়াবহ স্মৃতি ভাবতেও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

দিনের পর দিন এই অত্যাচার ও লাঞ্ছনা : কালো রক্তও লাল হয়ে উঠল।

অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শকে প্রথম প্রকাশ্যভাবে নীলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজন বাঙালী সন্তানের লেখনী গর্জে উঠল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপার হরফে প্রকাশিত হলো সর্বপ্রথম এতকাল পরে নীলের বেদনা-করুণ কাহিনী. নীলের ইতিহাসে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে : সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত।

কিছুই বাদ দেন নি অক্ষয়কুমার, সব কিছু প্রকাশ্যে উদ্ঘাটন করে দিলেন। কিন্তু হলে কি হবে, এদিকে যে তখন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাইবিদ্রোহের সময় হতেই মফঃস্বল অঞ্চলে নীলকরদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেয়েছে। একে শয়তান, তার উপরে আবার সরকার-দত্ত ক্ষমতা। শত লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত নীলচাষীদের দুর্দশা ঐ ব্যাপারে আরো চরমে উঠল।

এবারে সত্যি অত্যাচারের চক্রঘর্ষণে বেরিয়ে এলো বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এদিকে ঐ সময় বারাসাত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাস্‌লি ইডেন এক পরোয়ানা জারী করলেন : নিজ জমিতে নীলচাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন। কৃষাণদের উপরে ঐ ব্যাপারে কোন জোরজুলুম খাটবে না। তাহলে সেটা হবে বে-আইনী।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অনুমান প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ অত্যাচারিত নীলচাষীর পঞ্চাশ লক্ষ্য কণ্ঠ চিরে তীব্র প্রতিবাদ বের হয়ে এলো : নীলচাষ আর আমরা করবো না—করবো না আর নীলের চাষ।

দেখতে পাচ্ছি এক বিরাট জনতা!

শহীদ চাষীভাই বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নেতৃত্বের কণ্টকমুকুট মাথায় পরে এগিয়ে এল যশোহরের চৌগাছায়, তাদের ঘিরে দাঁড়াল হাজার হাজার নীলচাষী। সমবেতকণ্ঠে ধ্বনিত হলো আবার তাদের দাবী : বন্ধ করো নীলের চাষ। নীলের চাষ আর করবো না।

চারিদিকে প্রতিবাদের অগ্নিবাণী ছড়িয়ে পড়ল : বন্ধ করো নীলের অত্যাচার।

বিষ্ণুচরণ কারারুদ্ধ হলো।

ক্ষেপে গেল যতেক নীলচাষী : মরি সেও ভাল, নীলচাষ আর করবো না।

লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ঐসময় সরকারের ডাক-বিভাগে সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্ট। কার্য-ব্যাপদেশে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান। স্বচক্ষে তিনি দেখলেন নীলকরের অকথ্য অত্যাচার।

কবিহৃদয় মন্থন করে নীল-অত্যাচারের কাহিনী প্রতিফলিত হলো তাঁর 'নীলদর্পণ নাটকে (বাংলা ১২৬৭ সন, ইংরেজী ১৮৬০)

জেমস লং নামে একজন সহৃদয় ইংরাজ, তাঁকেও বিচলিত করলো নীলকরদের বর্বরতা।

তিনি বাংলার অমর কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা শ্রীমধুসূদনকে বললেন : নীলদর্পনের ইংরেজী অনুবাদ করো, আমি পুস্তক প্রকাশ করবো।

বাংলা কবির বিদেশী অনুবাদ পড়ে সবাই শিউরে উঠল।

নীলকররা জ্বলে উঠ্‌ল ঐ অনুবাদ পড়ে। সর্বনাশ!

লংএর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে তারা মামলা দায়ের করল।

বিচারে লংএর প্রতি এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হলো।

বাঙালী তখনও মরে নি, টাকার থলি নিয়ে এগিয়ে এলেন বাংলার আর একজন কৃতী সন্তান, বাংলাভাষার মহাভারতের রচয়িতা মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য আর একজন মহাপ্রাণ দরদী বঙ্গসন্তান মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ঐ ব্যাপারের কিছুদিন আগে নীলচাষীদের অত্যাচারের কথা জনসাধারণের গোচরীভূত করেছেন।

লং সাহেবেরও কারাদণ্ড হলো, মহাপ্রাণ হরিশ্চন্দ্রও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

বাঙালী কবি বড় দুঃখে গাইলেন সেদিন :

"নীল-বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার।

অসময়ে হরিশ ম'লো, লংএর হলো কারাগার।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কমিশন বিশারদ ইংরাজ নীল-কমিশন বসালে। নিরপেক্ষ বিচারের ভান করে ইংরাজ আজ পর্যন্ত এদেশে অনেক কমিশনই বসিয়েছে, সাইমন কমিশন, ক্রিপস্‌ কমিশন—কত বলবো! নীল-কমিশন বোধ হয় তাদের প্রথম কমিশন।

সাক্ষীদের নির্ভীক সাক্ষ্যে নীলচাষীদের প্রতি নীলকরদের অত্যাচার ও তাদের দুঃখের কাহিনী সবই প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত নীলকমিশন কি স্থির করলে?

নীলচাষের আবশ্যকতা অপরিহার্য। অতএব!…অলমতি! তবে একটা কিছু তো করা চাই—কমিশন বসল এত হৈ-হৈ করে যখন!…

সত্যিই নাকি নীলচাষীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে! তাই কমিশন সিদ্ধান্ত করেছে, নীলচাষীদের অভাব-অভিযোগ ও তার বিচারের জন্য

গভর্ণমেণ্ট আদালত প্রতিষ্ঠা করবেন, বেশী পুলিস মোতায়েন হবে : এমন কি জায়গায় জায়গায় সৈন্য মোতায়েনেরও ব্যবস্থা হলো। ব্যস, আর কি! এবার আর নীলচাষীদের কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

নিশ্চয়ই তারা এবার নিশ্চিন্ত হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তা হলো বৈকি! লাঞ্ছিত নীলকরদের প্রধূমিত বহ্নিশিখা প্রতিহিংসার ঘৃতাহুতিতে দাউ দাউ করে লেলিহান হয়ে উঠল।

চুক্তিভঙ্গের মকন্দমা নীলচাষীদের বিরুদ্ধে এনে বহু নীলচাষীকে নীল-করেরা গৃহহারা সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিতে লাগল।

এদিকে নানা বিপর্যয়ে বাংলায় নীলচাষের ক্রমে অবনতিও ঘটতে শুরু করেছিল।

কিন্তু কেন?

প্রথমতঃ বাংলাদেশে দরিদ্র চাষীদের প্রতি নীলকুঠীর শ্বেতাঙ্গদের বর্বরোচিত অত্যাচার, দ্বিতীয়তঃ বাংলায় যখন নীলকরদের অত্যাচার ক্রমে চরমে উঠছিল, সেই সময় বিহারেও নীল-উৎপাদন শুরু হয়, তৃতীয়তঃ জার্মানি বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে অনেক সহজ ও কম মূল্যে নীল তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো।

সর্বশেষে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রং প্রস্তুত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় নীলের চাষ একেবারে থেমে গেল।

নীল-বেদনার্ত বাংলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

দুই

সতী চিঠি পেয়েছে, তার বান্ধবীর বাড়ী খালি আছে যখন সে অনায়াসেই সেখানে গিয়ে যতদিন খুশি থাকতে পারে, এর জন্য আবার চিঠি লিখবারই বা কি প্রয়োজন ছিল! বিনয় কিন্তু সেই যে সেদিন সতীর প্রতিবাদে চুপ করে গেছে, আর মুখ খোলেনি। চিরদিনই স্বল্পভাষী সে।

আসন্ন পুরী-যাত্রার আয়োজনে সতী অত্যন্ত ব্যস্ত।

আগামী কাল সন্ধ্যার ট্রেনে সতী আর বিনয় পুরী রওনা হবে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে, বার্থও রিজার্ভ হয়েছে।

বিনয় বলে: সত্যিই তাহলে আমাকে পুরী যেতে হবে সতী তোমার সঙ্গে?

: তবে?

: কিন্তু আমি ভাবছি, এর এমন কি প্রয়োজন ছিল!

: সে চিন্তার ভারটা আমার কাঁধেই তুলে দিয়ে একেবারে ভারমুক্ত হও না কেন?—সতী মুখটা ভার করে জবাব দেয়।

বাইরে দুম্ দুম্ রাইফেলের গুলির আওয়াজ, নিশীথ রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতাকে যেন সহসা দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল একটা পৈশাচিক নৃশংসতা।

মিলিটারী পুলিশ ফায়ারিং করছে।

যুদ্ধ কি থামেনি? মহানগরীর বুকে এ তবে কিসের কোলাহল?

শান্তির প্রচেষ্টা এমনি করেই কি চিরদিন ব্যর্থ হবে বার বাব?

অন্ধকারে খোলা জানালা-পথে দৃষ্টিপাত করে উৎকণ্ঠিত সতী বললে: মিলিটারী পুলিশ ফায়ার করছে। মহানগরী তো নয়, যেন যুদ্ধের ফ্রন্ট্ লাইন।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ মরণ-কামড়।

: ষোলই আগস্টের আর কত দেরি, সতী?

: দেরি আছে।

সন্ধ্যা থেকেই পিসিমা বকে চলেছেন আপন মনে: ওরে ওরা কি কোন দিন আপন হয়? হয় না, হয় না। ওদের জাতই আলাদা। দয়ামায়া কি ওদের প্রাণে আছে? দেড় বছরের খোকনকে ফেলে সেই যে চলে গেল!···

সতী বিনয়কে নিয়ে পুরী চলেছে, ব্যাপারটা পিসিমার একেবারেই মনঃপুত হয়নি। এ কিছুতেই হতে পারে না। কথাটা তাঁর কানে যেতেই প্রতিবাদ করেছেন: ধর্ম নেই? লোকে শুনলে বলবেই বা কি! গায়ে যে থুতু দেবে, আবাগী!

সতী বলেছে: সে থুতু আমার গায়ে বসবে না, পিসি, ভয় নেই—পিছলে পড়ে যাবে।

: ওলো অত অহংকার ভাল না। পিসি ঝংকার দিয়ে ওঠেন।

: আমার মনে যেখানে কোন গ্লানি নেই, সেখানে ধর্মের ও সমাজের খোলসটাকে নিয়ে আর যে-ই পারুক আমি আত্মনিগ্রহ সইতে পারবো না। ভগবান—যাঁর চোখে কোন-কিছুই গোপন থাকে না, তিনি তাহলে আমায় কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

: বীরু! তুইও কি চুপ করেই থাকবি?

পিসি বোধ হয় সতীর সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়েই আমার কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

: আমি? আমি কি বলব পিসি?

: মেয়েটা তাহলে এমনি করেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই তুই দেখবি? একটা কথাও তুই বলবি নে?

: যে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে, তাকে তুমি আটকাবে কেমন করে, পিসি? তা ছাড়া তার বয়স হয়েছে, নিজের ভালমন্দ বোঝবার মত ক্ষমতাও হয়েছে।

: বীরু, অবুঝ হোস্ নে। বোনকে বুঝিয়ে বল বাবা—এতে মঙ্গল নেই।

: মিথ্যে তুমি ভাবনা করছো, পিসি! সতীকে তুমিও জান, আমিও জানি। নিন্দাগ্লানির স্পর্শের সে বাইরে। ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত যদি সে তোমাদের সমাজ ও ধর্মকে বাঁচিয়ে চলে আসতে পেরে থাকে, তবে জীবনের বাকী কটা দিনও তার আটকাবে না।

যুগ এগিয়ে চলেছে। যুগের ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সমাজ, ধর্ম আর কৃষ্টিও এগিয়ে চলেছে।

নূতন যুগের নূতন পৃথিবী আবার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার মধ্যে ভ্রূণের আকারে জন্ম নেবে। এবার আর হয়ত সূর্যের অগ্নিপিণ্ড হ'তে বিচ্যুত হয়ে নয়—নিজের সত্তায়, নিজের গৌরবে, নিজস্ব বাষ্পীয় তরঙ্গাঘাতে। মহাজলধির মধ্যে দেখা দেবে আবার সাগুদানার মত প্রথম প্রাণস্পন্দন, ধরণীর গর্ভে পলিমাটির নরম আস্তরণের অনেক তলায় কোন অন্ধকারে জারকরস সঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু পুরাতন অতীত, আজ যার কঙ্কালস্তূপের 'পরে ধীরে ধীরে নব চেতনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নূতন পৃথিবীর স্পন্দন শুনছি, সেই অতীত! তাকে কি ভুলতে পারবো? ধনিক রাজ্যলোভীদের সুতীব্র নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পৃথিবী! বৈষম্য নয় এবার আর, এবারে সাম্য!...তোমার আমার, আর দশ জনের পেতে হবে সমান অধিকার। তোমার রক্ত-জল-করা লাঙ্গলের ফলায় দীর্ণ ধরিত্রী মুঠো মুঠো করে সোনার ফসল তোমায় দিয়েছে, সেই ফসলের প্রতিটি শস্য এবারে সমান ভাগে ভাগ হবে। জমির মালিকানাস্বত্বের দাবীতে আজ আর তোমার শ্রমকে, তোমার রৌদ্র-বৃষ্টি-জলে সিক্ত দিনগুলিকে অস্বীকার করা চলবে না। চলবে না আর সোনার প্রাসাদের লৌহফটকের সম্মুখে ভিক্ষুকের একমুষ্টি ক্ষুধার তণ্ডুল-ভিক্ষাকে অস্বীকার করা।

তীক্ষ্ণ শাবল-কাস্তে-লাঙ্গলের আঘাতে ফেনিল সুরার বেলোয়ারী পাত্র ভেঙে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়বে!

তাই—তাইতো যারা বারে বারে ডাক দিয়ে গেল তাদের স্মরণ করি।

স্বপ্নের মত কালের খেয়াতরী বেয়ে চলেছি কালসমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ স্রোতে: উর্বরা ভারতের সোনার মাটি, ফুটে উঠছে তার ওপরে একটি দু'টি করে ভুঁইচাঁপা, তবে স্বাভাবিক রঙে নয়, রক্তের মত লাল আভায়।

কিন্তু কে ছিঁড়ে উপড়ে ফেললে নির্মম হাতে সেই ভুঁইচাঁপাগুলিকে?

ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির চক্রের ঘর্ষণে মুক্তির অশ্রুত আর্তনাদ:

'এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি দণ্ডে পলে পলে,
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে—'

দেখছি সেই রাজপুতবীর পৃথ্বীনারায়ণকে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেজেছে তার অধীনে হাজারে হাজারে গুর্খা সৈন্য। নেপাল রাজ্য অধিকৃত। দুর্ধর্ষ সেই গুর্খা সৈন্য এগিয়ে এসেছে বৃটিশ ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত। লর্ড মিণ্টো ও লর্ড হেস্টিংসের প্রেরিত নেপাল সরকারের নিকট প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়েছে, উপায়ান্তর নেই, ইংরাজ-সেনাপতি যুদ্ধ করেছেন। দিনের পর দিন ইংরাজ ও গুর্খা সৈন্যে যুদ্ধ চলল। দুর্ভেদ্য পর্বতের মত ইংরাজ-সেনাপতি জেনারেল জিলেসপাই কলঙ্গায় পরাজিত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ইংরাজের রক্তপাত!

আবার হেস্টিংসের চিৎকার শোনা গেল : দাও, কামান দেগে পর্বত সব গ‍ুঁড়ো করে ধ‍ুলোর মত উড়িয়ে দাও, দেখি কত শক্তি ধরে ঐ পর্বতবাসী গ‍ুর্খাদল।

পার্বত্য ভূমি রক্তে লাল হয়ে উঠল। ব্রিটিশের কামানের ধোঁয়ায়, বার‍ুদের গন্ধে চারিদিক আবার বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

মলবাও দ‍ুর্গ ব‍ুঝি যায় যায়।

১৮১৬ খ‍ৃষ্টাব্দে বীর গ‍ুর্খা সেনাপতি অমর সিং থাপা শেষবারের মত মরণপণে য‍ুদ্ধ করে চলেছে, হয় ম‍ুক্তি নয় শির।

ম‍ুক্তি তার মিলল না, শির দিয়ে শহীদ ম‍ুক্তির ম‍ূল্য দিয়ে গেল।

মালবাওয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী ধ‍ুলোয় ল‍ুণ্ঠিত হলো। সগোলির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো আবার।

দ‍ুলছে অতীতের যবনিকা : ব্যর্থ হ'চ্ছে ভারতের খণ্ড খণ্ড স্বাধীনতা-স্বপ্ন! ১৮২৪ খ‍ৃঃ—সাহারানপ‍ুর, দিল্লী, মীরাট, ম‍ুরাদাবাদ চিৎকার করে ডাক দিয়ে বলে গেল :

Down with English—ইংরেজ রাজত্বের শেষ হয়েছে, ইংরাজ ধ্বংস হোক্।

১৮২৬-২৭ খ‍ৃঃ—আবার রামোশিদের বিক্ষোভ, উমাজী নায়েক এবারে এগিয়ে এসেছেন। প‍ুনায় জন-জাগরণ!

ভুলিনি তোমায় মহারাজ শিবাজী!

বিক্ষোভের বীজ ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের মাটিতে সর্বত্র।

১৮৩১ খ‍ৃঃ—সে বিক্ষোভের অগ্নিকুণ্ড হতে ঊর্ধ্বে উঠে এল আর একটি শিখা।

বিহারের চিরশান্ত কোল, তাদের ব‍ুকে জেগেছে নবচেতনার সাড়া। কিন্তু তাদেরও কণ্ঠ টিপে ধরলে শ্বেতাঙ্গদের রক্তলোল‍ুপ বাঁকা নখর—হত্যা, অগ্নিদাহ! পাঁচ হাজার বর্গমাইল জ‍ুড়ে রচিত হলো এক বিরাট কবরখানা। আজও সে কবরের মাটির তলায় শহীদদের কঙ্কাল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায়নি।

'পাঞ্জাব সিন্ধ‍ু গ‍ুজরাট মারহাঠা…'

সেই পাঞ্জাব :

'পঞ্চনদীর তীরে,
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গ‍ুর‍ুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ—
নির্মম নির্ভীক।'

বর্ষচক্র ঘ‍ুরে চলেছে : ১৮৩৯—কত দিনেরই বা কথা, মাত্র একশত আট বৎসর। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের ম‍ৃত্যু, খড়্গ সিংহের সিংহাসন-লাভ।

অকর্মণ্য অলস ভীর‍ু খড়্গসিংহ। রণোন্মাদ দ‍ুর্দান্ত খালসা সৈন্য।

চারিদিকে বিশ‍ৃঙ্খল। ১৭৩৩—রণজিতের নাবালক প‍ুত্র দলীপ সিংহকে

সিংহাসনে বসানো হলো ; নাবালক রাজার অভিভাবিকা রণজিৎ-মহিষী রাণী ঝিন্দন। তেজসিংহ ও রাজা লালসিংহ রাজমাতাকে রাজ্যশাসন-ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছেন।

রাণীমার মনে কিন্তু শান্তি নেই। সর্বদা সশঙ্কিতা। শয়নে স্বপনে জাগরণে শ্বেতাঙ্গ-বিভীষিকা। রক্তচোষা ইংরাজ তার শত বাহু মেলে তার বড় সাধের পাঞ্জাবকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, করাল কালদ্রংষ্টা-রেখার মত।

ঃ অনুমতি দিন রাণীমা ! এখনও সময় আছে, শ্বেতাঙ্গদের সমূলে ধ্বংস করে দিই। নইলে পাঞ্জাবকে আর রক্ষা করা বুঝি গেল না।

ঃ পারবে তোমরা তোমাদের দেশের মাটি হ'তে বিদেশীকে সমূলে উৎপাটিত করতে ?

ঃ পারবো মা ! পারবো।

ঃ জয় গুরুজির জয় !

হাজার হাজার খালসা সৈনিকের হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল তীক্ষ্ন খরসান। জয় গুরুজির জয় ! 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

খালসা সেনাপতি সর্দার তেজসিংহ ! রাজা লালসিংহ ! গোপনে গোপনে কিসের পরামর্শ করছো ! গোপনে ইংরাজ-শিবিরে কেন দূত প্রেরণ করছো !

ফিরোজপুরের যুদ্ধক্ষেত্র !

ইংরাজের যুদ্ধশিবিরে রাজা লালসিংহের দূত এলো। এজেন্ট ক্যাঃ নিকলসন সাদরে লালসিংহের দূতকে আহ্বান জানাল ঃ আসুন, আসুন !

ঃ সব ঠিক, নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা লালসিংহ তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরোজপুর ত্যাগ করবেন।

হলোও তাই, লালসিংহ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পলায়ন করলেন, এবং তারপর তেজসিংহ যখন পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন, সম্মুখে তাদের মুষ্টিমেয় পরিশ্রান্ত ইংরাজ-সৈন্য।

তারও সঙ্গে আগেই ইংরাজদের গোপন পরামর্শ হয়ে গেছে। অতএব ফিরোজপুর আর আক্রমণ করা হলো না।

লালসিংহ ও তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় পাঞ্জাবের মাটি বিকিয়ে গেল।

৯ই মার্চ মিঁয়ামীর প্রশস্ত ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের মৃত্যুপত্র রচিত হলো।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমার দলীপসিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৫৪, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অধ্যক্ষতায় এক সভা নিযুক্ত হলো। পাঞ্জাবের রাজ্য-শাসনের ভার তাদেরই ওপরে হলো ন্যস্ত।

মহারাণী ঝিন্দন !

তাঁর মনে শান্তি নেই এতটুকুও। কে যেন বার বার অলক্ষ্যে তাঁর অন্তর-দুয়ারে আঘাত দিয়ে বলছে ঃ সাবধান ! অক্টোপাসের মত অষ্টবাহু বাড়িয়ে আসছে ইংরাজ !

রাণীর কপাল কুঁচকে উঠল।

ইংরাজের প্রতি একটা অপরিসীম ঘৃণায় নিশিদিন তাঁর অন্তর জ্বলতে লাগল।

অন্তরের সেই অগ্নি-আভা বাইরেও বুঝি প্রকাশ পেল।

সহসা একদিন ঝিন্দনের ভ্রাতা রেসিডেন্টের এক আদেশপত্র নিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে এসে দেখা দিলেন।

কি সংবাদ!

অযোধ্যা হতে মা-জননী জানকীর বিসর্জন।

পাঞ্জাব-লক্ষ্মীর প্রতি নির্দেশ হয়েছে—চিরনির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা।

নির্ভীক বীরজায়া অটল তেজস্বিতার সঙ্গে বিনা আইনে, বিনা বিচারে কেবলমাত্র ইংরাজ-প্রতিনিধির সন্দেহের জন্য নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

রাজলক্ষ্মী পাঞ্জাবের রাজপ্রাসাদ ও প্রিয়পুত্র দলীপকে ছেড়ে মুসলমান অধিবাসীগণে পরিবেষ্টিত নির্জন শেখপুরের এক কদর্য গৃহে বন্দিনী হলেন।

কিন্তু এত করেও পাঞ্জাব রেসিডেন্টের মনঃপুত হলো না। শেখপুর নয়, দূরে আরো দূরে, পাঞ্জাবের বাইরে রাণী ঝিন্দনকে সরাতে হবে।

এদিকে পাঞ্জাবের সঙ্গে সঙ্গে মুলতানের মাটিতেও রক্তবীজ ছড়ানো হলো।

চারিদিকে ব্রিটিশের আধিপত্য ও অন্যায় জুলুম।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা সাবন মল্লর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মুলরাজ দেওয়ানী-পদ পেয়েছেন।

লাহোর দরবার মুলরাজের কোষাগারে অনেক অর্থ আছে ভেবে মুলরাজের নিকট দেওয়ানী-পদের নজরানা স্বরূপ ৩০ লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। লাহোর দরবারের মন্ত্রী রাজা লালসিংহ মিয়াঁমীর সন্ধির পর সৈন্য প্রেরণ করলেন মুলরাজের নিকট হতে সেই টাকা আদায় করতে।

মুলরাজের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

ঝঙ্গে যুদ্ধ হলোঃ লালসিংহের সৈন্য-বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করলো।

ইংরেজের করঘটিত ব্যাপারে ও লাহোর দরবারে আপীল করবার ব্যবস্থা থাকায় রাজ্যশাসন-ব্যাপারে মুলরাজের কোন সত্যিকারের ক্ষমতাই নেই শাসন-কর্তা হিসাবে। তার আইনের পরেও লাহোর দরবারের আইন চোখ রাঙাবে, এ অবস্থায় একমাত্র পন্থা হচ্ছে পদত্যাগপত্র দাখিল করা। দরবারও তাই চাইছিল, সাগ্রহে পদত্যাগপত্র তারা গ্রহণ করে সর্দার খাঁ সিংহকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আদেশপত্র নিয়ে বানস আগ্নু ও লেঃ আণ্ডারসনের সঙ্গে পাঁচশত সিপাহী মুলতানের দিকে অগ্রসর হলো।

আসছে এগিয়ে সদলবলে সর্দার খাঁ সিংহ ব্রিটিশের সনন্দ নিয়ে।

* * *

সতী ও বিনয় কালই চলে যাবে।

দেশের মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখছে নতুন করে ঘর বাঁধবার। সতীও

পুরাতন ঘর ছেড়ে চলেছে নতুন ভিটের সন্ধানে।

পিছু ডেকে তার অমঙ্গল করবো না।

আজ মা-বাবা বেঁচে থাকলে কি করতেন জানি না। পুরাতনকে আজ বর্জন করবার দিন এসেছে।

মাথার মধ্যে হাজারো চিন্তা একটার পর একটা ভিড় করছে এসে। পুরাতনকে আজ সত্যিই বিদায় নিতে হবে।

মুলতানের দুর্গদ্বারে বহুকণ্ঠের মিলিত শব্দ।

মুলরাজ দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নিঃশব্দে দুর্গ সমর্পণের পর সর্দার খাঁ ও তার লোকেরা দুর্গ হ'তে প্রত্যাবর্তন করছেন। সহসা দুর্গ হতে বন্দুক গর্জে উঠল—দুম্ দুম্ দুড়ুম! মুলতানবাসীদের শান্ত বুকের মধ্যে যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল, সহসা তা সহস্র লেলিহান শিখায় দুর্গপ্রাকার রাঙিয়ে তুলল।

সর্দার খাঁর সঙ্গে আগত ইংরেজ কর্মচারীরা বন্দুকের গুলিতে আহত, রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মুলরাজ কোন প্রতিবাদ না করে অশ্বের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন নিজ উদ্যানবাটীর দিকে।

রাত্রি প্রভাত হলো।

দুর্গে মুলতান সৈনিকদের চলেছে রণসজ্জা, এ অত্যাচার তারা সইবে না। বিদেশীকে তারা নিজ গৃহে অনধিকার প্রবেশ করতে দেবে না।

সমস্ত দিন ধরে দুর্গে চলল বীর সৈনিকদের রণসজ্জা। চলল পরামর্শ। ক্রমে দিনমণি অস্ত গেলেন।

রাত্রি গভীর। বিশ্বচরাচর নিশীথের শান্তিময় ক্রোড়ে নিদ্রামগ্ন।

ইংরাজ-শিবিরে আহত আগ্নু ও আণ্ডার্সন!

সহসা এমন সময়ে অতর্কিতে ইংরাজ-শিবির মুলতানের সৈনিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলো।

রণোন্মত্ত সৈনিকেরা এতদিনের পুঞ্জীভূত ঘৃণার শোধ নিল আহত আগ্নু ও আণ্ডার্সনকে সঙ্গীনের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে।

এবারে স্বয়ং মুলরাজ আর স্থির না থেকে সৈন্যদের অগ্রভাগে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

মুলতানে জ্বলল যুদ্ধের আগুন।

ওদিকে পাঞ্জাবে বীর শিখ সৈনিকেরাও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ইংরাজের সঙ্গে আবার সম্মুখ-সমরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পাঞ্জাবের রাজলক্ষ্মীকে শেখপুরে বন্দিনী করেও ইংরাজ রেসিডেণ্ট সন্তুষ্ট নয়।

একদা যিনি রাণীর গৌরবে রাজ-অন্তঃপুরে লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন, আজ তিনি শেখপুরের এক কদর্য গৃহে ভাগ্যবিড়ম্বনায় ব্রিটিশের হীন চক্রান্তে শ্রীহীনা।

ঐশ্বর্যচ্যুতা রাজলক্ষ্মীর শেখপুরেও স্থান হলো না।

জন্মভূমি হ'তে জননীর নির্বাসন-দণ্ডলিপি স্বাক্ষরিত হয়ে এলো স্বীয় গর্ভজাত প্রিয় পুত্রের মোহরাঙ্কিত হয়ে।

শেখপুরের নির্জন কুটীরদ্বারে ব্রিটিশ সৈনিকের করাঘাত শোনা গেল। অশ্রুসজল চোখে রাণী আবার নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা মাথা পেতে নিলেন। প্রথমে ফিরোজপুর, সেখান হতে বারাণসীতে পাঞ্জাব-লক্ষ্মী নির্বাসিতা হলেন। প্রহরী নিযুক্ত হলো—জর্জ ম্যাক্‌গ্রেগার নামে একজন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষ। এত বড় অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেদিন পাঞ্জাবের একজন শিখ সৈনিকও প্রতিবাদ করলে না বটে, কিন্তু রুদ্ধ বিষসর্পের মত মনে মনে গর্জাতে লাগল। একদা গুরু গোবিন্দ সিংহ পাঞ্জাবের শিরায় শিরায় যে তেজ সংক্রামিত করে-ছিলেন, তারই অলৌকিক শক্তিতে খালসা বীরদের অসি-নির্মুক্ত তুষানল প্রচণ্ড হুতাশনে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

বিদ্রোহী মুলতানের সঙ্গে পাঞ্জাবও গর্জন করে উঠল।

ইংরাজ সৈন্য মুলতানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

৭ই সেপ্টেম্বর ইংরাজের কামান গর্জে উঠল।

দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে মুলরাজ ২২শে জানুয়ারী পরাভূত হলেন।

মুলতানের স্বাধীনতার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

শিখদের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ চলেছে।

চিলিয়ানবালায় শিখরা জয়ী হলো বটে, কিন্তু ১৮৫৯, ২১শে ফেব্রুয়ারী গুজরাটের যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হলো।

১৪ই মার্চ শিখ-নেতারা আত্মসমর্পণ করলেন ব্রিটিশের কাছে :

'আমরা আমাদের স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। ভাগ্যক্রমে আজ আমরা পরাজিত। আমরা যা করেছি তার জন্য এতটুকু অনুতপ্ত বা দুঃখিত নই। আজ যা করেছি, ক্ষমতা থাকলে কালও আবার তা করবো।' বলতে বলতে বীর শিখ সেনাপতিরা একে একে আপনাদের অস্ত্র ভূমিতে নামিয়ে রাখলেন।

৩০শে মার্চ ব্রিটিশের বিজয়ঘোষণা জানিয়ে দিল : রণজিতের দুর্ভেদ্য দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন।

জগৎপ্রসিদ্ধ কহীনুর-মণি যা একদা মহারাজ রণজিৎ অতি গৌরবে বাহুতে ধারণ করতেন, সেও ব্রিটিশের করায়ত্ত হলো।

কহীনুর !…জগতের সেরা মণি কহীনুর।

মনে পড়ছে কোন্ এক ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করেছিল : মহারাজ, যে মহামূল্য মণিটি আপনি আপনার বাহুতে ধারণ করেছেন, তার দাম কত হবে ?

মৃদু হেসে পাঞ্জাব-কেশরী বললেন : ইস্‌কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি।

দামী কথা বটে !

কারণ যখন যে মণিটির অধিকারী হয়েছেন, তিনিই পূর্বাধিকারীর নিকট হতে স্বীয় বাহুবলেই ছিনিয়ে নিয়েছেন। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তা এ তো

সামান্য একটি মণি।

গোলকুণ্ডার মাটির অন্ধকারে ছিল মণিটা। প্রথম মণিটি সেখান হ'তে পাওয়ার পর মহারাজ কর্ণের কর্ণভূষণ হলো। কর্ণের পর মণিটি শিরোভূষণ হলো উজ্জয়িনীরাজের। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন যখন মালবদেশ অধিকার করলেন, তখন মণিটি হলো তার অঙ্গভূষণ; কালচক্র ঘুরে চলে। পাঠান রাজত্বের ধ্বংসের মাটিতে মুঘলশক্তি দেখা দিল, মণি এলো মুঘল সম্রাটের অধিকারে।

ঝড়ের বেগে নাদির শাহ ইতিহাসের পটভূমিকায় এসে দেখা দিল। পরাজিত মুঘল-সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হতে মণিটি এলো নাদির শাহের হাতে। নাদিরকে হত্যা করে কাবুলের আহম্মদ শাহ ছিনিয়ে নিলেন মণিটি। আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর মণিটি এলো তাঁর পুত্র শাহ সুজার হাতে। শাহ্ সুজাকে পরাজিত করে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ বাহুতে ধারণ করলেন সেই মণি।

সেই মণি আজ পাঞ্জাবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গেল শ্বেতাঙ্গদের কবলে। বহু-মানে ইংলণ্ডেশ্বরী সেই মণি শিরোভূষণ করে নিলেন—পাঁচ জুতির বিনিময়ে।

ভারতবাসী নিশ্চয়ই সেই মণির কথা ভোলেনি।

তাদের নির্বাসিত রত্নটিকে নিশ্চয়ই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

রক্তরাঙা পাঞ্জাবের বুকে ব্রিটিশের ঝাণ্ডা উড়ছে।

রাজ্যচ্যুত দলীপের বয়স মাত্র এগার বৎসর। তার বাসস্থান এখন আর পাঞ্জাবের রাজপ্রাসাদে নয়—ফতেগড়ে।

রাজ্যচ্যুত ভাগ্যবিড়ম্বিত পাঞ্জাবের অধীশ্বরের উপরে ইংরাজদের একটা কর্তব্য আছে তো। স্যার জন লজিন নামে এক ইংরাজ মহাত্মা তাঁকে শিক্ষা দিতে এলেন। শিক্ষা পূর্ণ হলো; পাঞ্জাব-কেশরীর পুত্র স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। পরের বছরই স্বীয় জন্মভূমি হতে কৌশলে বিতাড়িত হয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইংলণ্ডে চলে গেলেন।

অভাগিনী নির্বাসিতা জননী যখন সে সংবাদ শুনলেন, স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁকেও ছুটে যেতে হলো প্রিয় পুত্রের পাশে।

তারপর?

যে তেজোদৃপ্তা মহীয়সী নারীর জন্য একদা প্রভুভক্ত খালসা সৈন্যরা তরবারি হাতে অনল-যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আজ সেই হৃতসর্বস্ব পাঞ্জাবের রাজলক্ষ্মী, পাঞ্জাবকেশরীর প্রিয়তমা, বারিধিবেষ্টিত, অপরিচিত, স্বজন-পরিত্যক্ত, অজ্ঞাত নির্জন স্থানে কাল-সাগরের অনন্ত স্রোতে নিঃশেষে হারিয়ে গেলেন। আর দলীপ? প্রতিনিয়ত জন্মভূমির ডাক তাঁর দু'কান ভরে বাজছিল।

"প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ,

* * * আমার ইচ্ছা না থাকলেও আমি সদ্গুরুর ইচ্ছায় ইংলণ্ড ত্যাগ করে আবার ভারতে গিয়ে সামান্য ভাবে বাস করবো। * * খালসাগণ! আমি আমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করার জন্যে

আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। কিন্তু আমি যখন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হই তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল। আমি বোম্বাই এ পৌঁছেই শিখধর্ম গ্রহণ করবো।* * বাবা নানকের অনুশাসন অনুসারে চলবো এবং গুরু-গোবিন্দ সিংহের আদেশ পালন করবো।* * ভারতসম্রাজ্ঞীর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তার সমুচিত পুরস্কার পেয়েছি। সদ্‌গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ওয়া গুরুজীকি ফতে।

প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ,

আমি আপনাদের রক্তমাংসের দলীপ সিংহ।"

কিন্তু ইংরাজের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে দলীপের স্বদেশবাসীর প্রতি শেষ চিঠিখানা যেতে পারলে না।

পরবাসী বহুকাল পরে স্বদেশের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, আদন নগরে ইংরাজ তার গতিরোধ করলে।

হতভাগ্য মুকুটহীন স্বধর্মভ্রষ্ট পাঞ্জাবের অধীশ্বরের জন্মভূমিতে আর প্রত্যাবর্তন করা হলো না। প্যারী নগরীর মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস নিলেন।

দিন যায়। কারও জন্যই বসে থাকে না।

রণজিতের শাসিত শিখগণ ধীরে ধীরে একে একে ব্রিটিশের পতাকাতলে এসে জড়ো হচ্ছে।

যে সমস্ত পরাক্রান্ত খালসা সৈন্য একদা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে শংকাকুল করে তুলেছিল, যে দুর্ধর্ষ জাতি একদিন অদম্য তেজ, অবিচলিত সাহস, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে গুরুগোবিন্দের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বীরেন্দ্র-সমাজে বরণীয় হয়ে উঠেছিল, যাদের তুর্যনিনাদে একদিন পঞ্চনদ সচকিত হয়ে উঠেছে, যাদের উন্মুক্ত খরসানমুখে একদিন পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্য বার বার পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায়নি, আজ তারাই ব্রিটিশের পতাকাবাহী, ব্রিটিশের অধীনে শিখ-বাহিনী।

লর্ড ডালহৌসীর ক্ষুধা কিন্তু তবু মিটল না।

দেখতে পাচ্ছি তার ক্ষুধা-লোলুপ দৃষ্টি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হচ্ছে।

এবার আর সম্মুখ-সমরে নয়। অতীব হীন চক্রান্তজালে সে মুখব্যাদান করছে।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

আবহমান কাল হতে ভারতে হিন্দুদের ঔরসজাত পুত্রের অভাব হলে অনেকেই দত্তক পুত্র গ্রহণ করে পুত্রসাধ মিটিয়েছে। হিন্দু-আইনানুযায়ী সেই দত্তক পুত্রই হয় পিতার সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী পরবর্তীকালে। কিন্তু সহসা লর্ড ডালহৌসির অপূর্ব পরিকল্পনায় স্থির হয়ে গেল—দত্তক পুত্র ব্রিটিশ আইনে সিদ্ধ নয়।

যেহেতু তাদের নিজস্ব আইনানুযায়ী এ দেশের সকলকে চলতে হবে, সেই হেতুই যে সমস্ত রাজ্য সর্বোপরিতন ব্রিটিশ-শক্তির আশ্রিত, সেই সমস্ত রাজ্যের অধিপতিদের ঔরসজাত পুত্রের অভাব হলে, তারা যে সমস্ত দত্তক পুত্র গ্রহণ

করবেন, সেই দত্তক পুত্রের গ্রহণ-ব্যাপার ব্রিটিশ-প্রভুর অনুমোদিত না হলে, তাদের রাজ্য ব্রিটিশরাজের অধীনে যাবে।

এবারে আর আগ্নেয় অস্ত্র নয়, সূক্ষ্ম নীতির দোহাই দিয়ে জবরদস্তি! নীতিবিশারদ শ্বেতাঙ্গ জাতি দীর্ঘ পৌনে দুই শত বৎসর ধরে নীতির লৌহ-শৃংখল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে ভারতে।

যাহোক।

ব্রিটিশের বিজয়পতাকা উড়ছে সেতারায়, ঝাঁসীতে।

সেতারা! প্রসন্নসলিলা কৃষ্ণার জলপ্রপাত-বিধৌত মহাবলেশ্বর পর্বতমালার শীতল ছায়ায় যেন নিদ্রাভিভূত সেতারা: যে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযজ্ঞের শহীদের মাতৃভূমির শৃংখলপাশ মোচনের অসীম পরাক্রম, তেজোদৃপ্ত গরিমা, অতুল্য বীরত্ব একদা ভারতে দুর্দান্ত মুঘল-শক্তিকে কম্পিত ও বিধ্বস্ত করে তুলেছিল, একদা যার সুতীক্ষ্ম অসিমুখে হিমালয় হ'তে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত ঝলকিত হয়ে উঠেছিল, সেই হিন্দুকুলগৌরব মহাপরাক্রান্ত শিবাজীর প্রিয়তম স্থান সেতারা।

সেই শিবাজীরই বংশধর প্রতাপসিংহ আজ সেতারার গদিতে অধিষ্ঠিত—কিন্তু ব্রিটিশের ভয়ে কম্পমান।

১৮১৯এর সন্ধিশর্ত ইংরাজ বাহাদুর আজ আর মেনে নিতে রাজী নয়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

অভিযোগ! অভিযোগ! কত অভিযোগ! সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মীরকাশিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ!

গোয়ার পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে, প্রতাপসিংহ তুমি দোষী বই কি! প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র!

প্রতাপসিংহ: কিন্তু বিশ্বাস করো তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কোন ষড়যন্ত্রই করিনি। আজ দীর্ঘ বিশ বৎসর তোমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে আমি আবদ্ধ। তোমাদের এই দীর্ঘকাল ধরে কত সাহায্য করেছি। তোমরা পরদেশী, তবু তোমাদের সাহায্য করতে কোনদিন এতটুকু কার্পণ্য করিনি, এই কি তার পুরস্কার! বিনা বিচারে, বিনা আইনে আজ তোমরা আমাকে আমার পূর্ব-পুরুষের রাজ্য হতে বিতাড়িত করতে চাও!

আইন! বিচার! আইন আবার কি? বিচারই বা কি? তোমার যাওয়া প্রয়োজন—সেই তো আমাদের আইন! সেই তো আমাদের বিচার!

রাত্রি গভীর।

ব্রিটিশের সৈন্যেরা এসে প্রতাপকে তো বন্দী করলে।

নগর হ'তে কয়েক মাইল দূরে একটা অন্ধকার পশু রাখার কুটীরের মধ্যে প্রতাপসিংহকে এনে বন্দী করে রাখা হলো। চারিদিকে ব্রিটিশের কড়া পাহারা।

ওদিকে ব্রিটিশ সৈন্যরা নগর অবরোধ করে রাজপ্রাসাদ অধিকার করেছে। প্রতাপের ধনাগার লুণ্ঠন চলছে।

কিন্তু সেতারার গদিতে একজনকে বসানোই চাই !

একজন মীরজাফরের প্রয়োজন।

প্রতাপের ভ্রাতা আপা সাহেব পেশবা বাজীরাওয়ের হাতে বন্দী। তাকে এনে সেতারার গদিতে বসাও।

সিংহাসনচ্যুত, স্বীয় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত সুদূর বারাণসীতে অশ্রুমোচন করছেন শিবাজীর বংশধর প্রতাপ।

ইংরাজের তাঁবেদারী সিংহাসনে আরোহণের রাজকীয় অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো সেতারায়।

সতী আর বিনয়ের যাবার সময় হয়েছে।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

যাওয়ার আগে সতী পিসিমাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল, কিন্তু পিসিমা মুখ গম্ভীর করে চুপ করে রইলেন।

একটি আশীর্বাণীও তাঁর দৃঢ়বন্ধ ওষ্ঠ হতে বের হলো না।

ঃ দাদা।···

ঃ কে, সতী ? আয় ! তোদের ট্রেনের সময় হয়েছে, না ?

ঃ দাদা, একটা অনুরোধ আমি করবো।

ঃ অত কিন্তু করছিস কেন ? বল না।

ঃ আমাদের সঙ্গে স্টেশনে যাবে ?

ঃ আমার যাওয়ার কি একান্তই দরকার, ভাই !

সতীর মুখের দিকে তাকালাম। মুখখানি যেন কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে।

চোখের পাতাদুটো যেন কেমন ভারী ভারী মনে হচ্ছে। সতী কি কাঁদছিল নাকি ! সাধারণ একখানি গেরুয়া রং-এর শাড়ি পরিধানে।

মাথার রুক্ষ চুল বিস্রস্ত। হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি।

বাইরে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নেমে আসছে।

ঃ তুই একটু অপেক্ষা কর ভাই, আমি স্নানটা সেরে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

ঝড়ের মত মাস্টারদা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে—'

পরক্ষণেই দণ্ডায়মান সতীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই বলে ওঠেন ঃ এ কি, এখনো প্রস্তুত হওনি, সতী ? পুরীর গাড়ী ছাড়বার তো আর বেশী দেরি নেই। আমি কোথায় ছুটতে ছুটতে এলাম—তোমাদের যাত্রাপথে শুভেচ্ছা জানাতে ! চল চল ! শুভস্য শীঘ্রম্‌ ! শুভকাজে বিলম্ব বিধেয় নয়।

ঃ ভাবছিলাম যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলো না, দাদা। আপনার পায়ের ধুলো নেওয়া হল না।

ঃ না না, পায়ের ধুলো নয়। আর নত হওয়া নয়। মেরুদণ্ড সোজা

করে দাঁড়াতে হবে। ভাবীকালের অনাগত জননী! চেয়ে দেখি, দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিণী শত্রুমর্দিনী মৃগেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধরূপী গণেশ। বঙ্কিমের মত আমায় দিব্যচক্ষে দেখতে দাও—তোমাদের সর্ব নারীর মধ্যে সর্বকালের সেই সুবর্ণময়ী দেশপ্রতিমা।

সতীর দুই চক্ষুর প্রান্ত বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু পড়ছে।

ঃ আশীর্বাদ করুন দাদা, তাই যেন পারি।

মাস্টারদা নীরবে শুধু সতীর পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন।

আজকের মেয়ে সতীর অশ্রুমোচনের মধ্য দিয়ে আমি দেখছি সেতারার অশ্রুমোচন, ঝাঁসীর অশ্রুমোচন।

এক-একটি ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছে, আর তার মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে অত্যাসন্ন এক ভয়াবহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ!

সেই লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রক্তরাঙা ইতিহাস।

১৮৪৮-এ অপুত্রক অবস্থায় আপা সাহেবের মৃত্যু হলো। এদিকে অপুত্রক রাজ্যচ্যুত নির্বাসিত প্রতাপ একটি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করলেন না তাঁর দত্তক-গ্রহণ!

সুতরাং…

তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ডালহৌসীর স্বাক্ষরিত মন্তব্য-লিপি পাঠ করছি ঃ সেতারারাজ কোন উত্তরাধিকারী না রেখে পরলোক গমন করায় উক্ত প্রদেশ ব্রিটিশরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৮১৯-এর সন্ধি শর্তকে পদদলিত করে সেতারায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হলো।

কুক্ষিগত সেতারা, এবারে ঝাঁসীর পালা।

ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ।

ব্রিটিশের এজেণ্ট বিধবা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ঝাঁসী রাজ্যও তাদের চাই। কারণ ঝাঁসীরাজেরও কোন ঔরসজাত পুত্র নেই। দত্তক পুত্র তো আর গদিতে বসতে পারে না। সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরালে লক্ষ্মীবাঈ দাঁড়িয়ে। বজ্রগম্ভীর স্বরে লক্ষ্মীর কণ্ঠ শোনা গেল—'মেরী ঝাঁসী দিউঙ্গী নেহি।'

মেরী ঝাঁসী দিউঙ্গী নেহি!

কে তুমি বীরজায়া বীরাঙ্গনা বীরেন্দ্র-নন্দিনী!…

* * *

সতী আর বিনয় চলে গেছে। একটু পরে মাস্টারদাও চলে গেলেন। পিসিমা বোধ হয় পুজোর ঘরে গিয়ে আহ্নিকে বসেছেন। এত বড় বাড়ীটা একেবারে নিঝুম।

কোথাও কোন সাড়াশব্দটি পর্যন্ত নেই। সতীর এই আকস্মিক ভাবে চলে যাওয়ার মধ্যে যেন কোথায় একটা বিরাট বেদনা মনের মধ্যে অনুভব করছি।

শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে স্টেশনে যেতে পারি নি।

রাত্রি আটটার মধ্যে 'কারফিউ', ফিরতে রাত্রি হলে মুস্কিল হবে।

সন্তু এসে জানাল : ভাত এখন খাবে কি?

: না রে, আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রাখতে বল গে।

সন্তু চলে গেল।

লক্ষ্মীবাঈয়ের আপত্তি বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে গেল।

লর্ড ডালহৌসীর লালসার আগুনে ঝাঁসীকেও গ্রাস করল।

সেতারা গেল এবং ঝাঁসীও গেল বটে, কিন্তু ঝাঁসীর সেই সর্বনাশের ভিতর দিয়ে যে অগ্নিশিখা লক্ষ্মীর অন্তরে জ্বলে উঠল, কেউ কি সেদিন সে অগ্নিশিখার এতটুকু আভাসও পেয়েছিল!

১৮৫৪তে ভোঁসলা বংশীয়দের রাজ্যও উত্তরাধিকারীর অভাব দেখিয়ে কোম্পানীর কুক্ষিগত হলো।

কেরৌলী রাজ্যের দত্তক পুত্র ভরতপালের গদীর দাবীকেও যথাসময়ে কণ্ঠ টিপে কেরৌলী রাজ্য কোম্পানী অধিকার করে।

একদা মহীশূরাধিপতি টিপুকে বিধ্বস্ত করবার জন্য যে নিজাম বাহাদুর ইংরাজশক্তির পাশে এসে অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়িয়েছিল, এবারে সেই নিজামের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল।

ঋণের দায়ে শস্যশালী বিস্তৃত ভুভাগ 'বেরার' ইংরাজের তুষ্টিসাধনে তুলে দিতে হলো।

বিশ্বাসঘাতকার যোগ্যতম পারিতোষিক।

সেতারা, ঝাঁসী, নাগপুর, কেরৌলী, বেরার—একে একে সব গেছে ব্রিটিশের হাতে; পুনা ছিল বাকী, পুনাও গেল।

বাজীরাওর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ দত্তকে পুত্র শ্রীমন্ত ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব যখন গদীতে উপবেশনে উদ্যত, এমন সময় বজ্রের মত ডালহৌসীর নির্দেশ এসে পৌছাল : পেশবা ৪৩ বৎসর কাল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ভোগ করেছেন। তাকে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করতে হয় নি। তার কোন ঔরস-জাত পুত্রও বর্তমান নেই। মৃত্যুকালে তিনি আপনার পরিবারবর্গের জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গেছেন।

এখন পেশবার যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বর্তমান আছে, গভর্ণমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে তাদের কোনরূপ দাবী নেই। গভর্ণমেণ্টের দয়ার উপরেও তারা কোনরূপ দাবী উপস্থিত করতে পারেন না, ইত্যাদি। নানা সাহেবের সকল আশাই ডালহৌসীর লেখনীর আঘাতে ধূলিসাৎ হলো।

রক্তবিপ্লবের আর একটি বীজ ভারতের মাটিতে রোপিত হলো!

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য পত্তনের দুর্নিবার ক্ষুধা যখন দেশের পর দেশ অনায়াসেই গ্রাস করে চলেছে, তখন দেখতে পাচ্ছি বিপ্লবের মেঘ ঘনিয়ে আসছে সাঁওতাল পরগণার ভাগ্যাকাশে।

চির শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতাল!

কিন্তু ইংরাজদের অত্যাচারের নির্মম রথচক্রের নিষ্পেষণে সেই নিরীহ শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরাও একদিন বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

চারিদিকে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অত্যাচার ও দমননীতি, অর্থাভাব, উপযুক্ত খাদ্যাভাব ক্রমে জনসাধারণেরও বুঝি সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।

ধিকি ধিকি করে অসন্তোষের আগুন জ্বলতে জ্বলতে সহসা প্রচণ্ড লেলিহান শিখায় আকাশ লাল হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা কি ভারতবাসী কেউ ভুলেছে! ভুলেছে কি কেউ ব্রিটিশের সেই নির্লজ্জ উক্তি: যুদ্ধের দরুণ সাহায্য অসম্ভব!

কলকাতার রাস্তা ফুটপাথে অগণিত বুভুক্ষু নরনারী শিশু-যুবার কঙ্কালে ভরে উঠেছে।

শীর্ণ কঙ্কালসার বাহু প্রসারিত করে সেই ক্ষুধার কান্না: মাগো চারটি ভাত দে মা, একটু ফ্যান দে মা!...

ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা!

১৮৫৪-এ খাদ্য-সঙ্কটের কিছু উন্নতি হয়েছিল বটে সামান্য কয়েক দিনের জন্য, ঐ সময় দেশে ফসলও ভাল হয়েছিল। তাছাড়া সাঁওতালদের দেশে ঐ সময় দুই শত মাইল দীর্ঘ একটি রেল লাইনের পত্তন শুরু হয়। রেল লাইন তৈরীর কাজে ছেলে-বুড়ো সাঁওতালরা সকলেই কুলী-কামিনের কাজ পেল।

কিন্তু যে অসন্তোষের আগুন এতদিন ধরে ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল অনির্বাণ, সহসা প্রচণ্ড লেলিহান শিখায় ঊর্ধমুখী হয়ে উঠল সে আগুন।

দিকে দিকে সেই লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৫৫ খৃঃ কালো পাথরের নির্লিপ্ততা প্রচণ্ড আঘাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল: ছিঁড়ে ফেল এ দাসত্বের লৌহ-শৃঙ্খল! সইব না এ অধীনতা! আমরা স্বাধীন। আমরা মুক্ত! মুক্তি-সংগ্রামে ৩০,০০০ হাজার সাঁওতাল শহীদ—বুকে তাদের স্বাধীনতার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, হাতে আয়ুধ, দেশী সৈন্যের দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কলকাতা অভিমুখে তারা বিজয় অভিযান শুরু করলে।

কালো কুচকুচে মসৃণ পাথরের মত পেশল বলিষ্ঠ দেহ। প্রতিটি মাংসপেশী প্রখর শক্তিমদিরায় ভরপুর, হাতে তীক্ষ্ন বর্শা, পৃষ্ঠে তীরধনু নবোদিত সূর্য-কিরণে ঝিলিক হানছে।

মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিকামী!

অশিক্ষিত সাঁওতাল, তবু পরাধীনতার গ্লানি তারা সইতে চায় নি।

দ্রুত সেই সংবাদ কলকাতায় কোম্পানীর বড়কর্তাদের নিকট গিয়ে পেঁছিল।

কলকাতা হতে দশ হাজার শিক্ষিত সুসজ্জিত সৈন্য কামান গোলাগুলি বন্দুক নিয়ে চলে এল মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎপাটিত করতে।

অবমানিত, পদদলিত, অত্যাচারে জর্জরিত মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকের দল কাউকে সেদিন ক্ষমার চোখে দেখে নি। বিশেষ করে যেসব দেশের স্বজাতি-দ্রোহী ইংরাজ-পদলেহী ধনিক ও জমিদার গোষ্ঠী, যারা শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর হাতে

হাত মিলিয়ে দেশের উপর, স্বজাতির উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল, যেমন নারায়ণপুরের জমিদার, বিদ্রোহীরা তাকে ধরে প্রথমে তার পা দু'টো কেটে ফেলে বললে : এর দাম চার আনা। জঙ্ঘা দুটো কেটে বললে : এর দাম আট আনা। দুটি হাত কেটে ফেলে বললে : এর দাম বারো আনা। মাথা দেহচ্যুত করে বললে : এর দাম তুমি এতদিন ধরে যত অত্যাচার আমাদের ওপরে করেছো তারই শোধ হলো।

এদিকে দেখতে দেখতে সুসজ্জিত ইংরাজ-সৈন্য এসে গেছে। শুরু হলো দু'পক্ষে যুদ্ধ।

একদিকে হাজারে হাজারে দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত অশিক্ষিত সাঁওতাল, অন্যদিকে সুশিক্ষিত ব্রিটিশ-বাহিনী।

মুহুর্মুহু ইংরাজের কামান গর্জায়। অবিশ্রাম গোলাগুলি ছোটে।

রক্তে লাল হয়ে যায় নিষ্পাপ ধরণীর মাটি। কতক্ষণ যুঝবে তারা!

একে একে সাঁওতাল সৈনিকেরা মুক্তির পাষাণবেদী-মূলে প্রাণ দিতে লাগল সম্মুখ-সমরে!

কেউ এক পাও পিছিয়ে গেল না।

রণভূমি মৃতদেহে স্তূপাকার হ'য়ে উঠ্‌ল।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ভীরু যে প্রদীপশিখাটি জ্বলে উঠেছিল, ক্ষণিকের তরে নিভে গেল তা অকস্মাৎ মুহুর্মুহু অগ্নিগোলকের বিষাক্ত ফুৎকারে। শৃংখলিতা ভারতমাতা অশ্রুমোচন করলেন।

মীরজাফর, ইয়ার লতিফ্‌ প্রভৃতির রোপিত বিষের বীজ হতে যে ভারতের মাটিতে কাল অঙ্কুরোদগম হয়েছিল, শাখায় প্রশাখায় ক্রমেই তা শোষণে শোষণে ভারতের সোনার মাটি ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। পলাশীর প্রান্তর হ'তে ক্রমে ভারতের সর্বত্র প্রসারিত হতে চলেছে সেই শোষণের মূল।

অযোধ্যা।...এবারে লর্ড ডালহৌসীর অযোধ্যা গ্রাসের ষড়যন্ত্র। ভারতে ইংরাজ শাসনে ডালহৌসীর তুলনা নেই। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ এসে গেলো।

পাঞ্জাবকে গ্রাস করার সময় ডালহৌসী কারণ দেখাল : রাজদ্রোহিতা। ঝাঁসী, কেরোলী, নাগপুর গ্রাস করতে হলো, কারণ আইন-সঙ্গত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নেই।

কিন্তু অযোধ্যা! উপরিউক্ত দুয়ের কোন প্যাঁচেই তো ফাঁসানো যায় না।

তবে!

অতি প্রাচীনকাল হতেই অযোধ্যার অতুল বৈভবরাশি ইতিহাসে পরিকীর্তিত। ইতিহাস-বিশ্রুত অতুল বৈভবই হলো শেষ পর্যন্ত অযোধ্যার পতনের হেতু! তার সম্পত্তি-বাহুল্যই হলো সর্বনাশের প্রধানতম কারণ!

ডালহৌসীর বেলোয়ারী পেয়ালায় রঙিন সুরার বুদ্বুদগুলোয় প্রতিফলিত হচ্ছে অযোধ্যার হীরা-মণি-মাণিক্যের অগ্নিজ্যোতি!

লোভের আগুন শিরায় শিরায় বহে যায়।

দরায়ুস-দুহিতা যদি সুন্দরী না হতেন, তাহলে সেকেন্দর শাহের ধর্ম

ইতিহাসে বরণীয় হতো না। তেমনি অযোধ্যা যদি সুসমৃদ্ধ, সুব্যবস্থিত ও সর্বাংশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রিয়-নিকেতন না হতো, লর্ড ডালহৌসীর লেলিহান জিহ্বাও সেদিকে প্রসারিত হতো না।

মীরকাশিম যখন ইংরাজের সঙ্গে স্বজাতিদ্রোহীদের হীন চক্রান্তে পরাজিত ও মসনদ-চ্যুত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, নবাব মীরকাশিমকে আশ্রয় তো দিলেনই, ইংরাজদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন।

১৭৬৪, ২৩শে অক্টোবর বক্সারে যুদ্ধ হলো ; নবাব পরাজিত হয়ে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

সন্ধি হলো : শত্রুর আক্রমণ হতে মিত্ররাজ্য রক্ষা করতে ব্রিটিশ কোম্পানীর যে সমস্ত সৈন্য এবার হতে অযোধ্যায় থাকবে, নবাব প্রতিশ্রুতি দিলেন সেই সৈন্যবাহিনীর সমুদয় ব্যয়ভার স্বীয় ধনাগার হতে দেবেন। এ ছাড়া কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে হঠকারিতার খেসারত দেবেন।

মূর্খ নবাব! ১৭৭২ অব্দে যখন মহীশূরাধিপতি হায়দার তাকে একখানা পত্র দিয়েছিলেন : নবাব, আপনি এত সৈন্য ও অধিক যুদ্ধোপকরণের অধীশ্বর হয়েও ইংরাজ-বণিকের অধীনতা স্বীকার করে নত হয়ে আছেন কেমন করে আমি ভেবে পাই না। এ যে নিজভূমে পরবাসী! আমার দিকে আমি যেমন ইংরাজদের পযুর্দস্ত করছি, আপনিও সেই রকম তাদের আক্রমণ করুন। দূর করে দিন বিদেশীদের।

হায়দার জবাব পেলেন : প্রিয় সুলতান! যে সমস্ত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ আমার অধিকারে আছে বলে আপনি জানেন, তা কেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শত্রুদের ধ্বংসের জন্যই। অন্য কোনপ্রকারে ওদের আমি কাজে লাগাবো একথা কখনো আপনি ভাববেন না।

দুর্ভাগ্য এই চিঠিই ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের হাতে গিয়ে পড়ল।

রেসিডেণ্ট গভর্ণর জেনারেলকে চিঠির বিষয় জানাতে এতটুকুও দেরি করল না।

কিন্তু কি ফল হলো তাতে?

সন্ধির তিন বৎসরের মধ্যেই নবাবের বিরুদ্ধে একটা গুজব শোনা গেল, তিনি নাকি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করছেন।

কৈফিয়ৎ তলব হলো।

কোম্পানীর উচ্ছিষ্টলোভী মেরুদণ্ডহীন নবাব কৈফিয়ৎ দিয়েছিল বৈকি তার আনুগত্যের অসংখ্য প্রমাণ দিয়ে।

কিন্তু মেয়েলী কান্না ব্যর্থ হলো। অনেক অনুসন্ধান হলো, অবশেষে আবার নতুন করে সন্ধি হলো : নবাব ৩৫ সহস্রের বেশী সৈন্য রাখতে পারবেন না।

কিন্তু যে লোভের আগুন একবার ব্রিটিশদের মনে জ্বলেছে, তা তো নিভল না। অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর পুচ্ছতাড়ন চলছে। নবাবের অধিকৃত

চুনার দুর্গ ইংরাজদের চাই।

চুনার দুর্গ যথাসময়ে ইংরাজদের করতলগত হলো।

১৮৪২এ মহম্মদ আলি শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আমজুদ আলি শাহ অযোধ্যার নবাব হন। তারপর ওয়াজিদ আলি এলেন নবাবী মসনদে। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবীর মত অযোধ্যার নবাবী নিয়েও খেলা হলো শুরু। এক নবাবের পর অন্য নবাব অযোধ্যার সিংহাসনে বসেছেন।

১৮৫৪এ জেনারেল আউট্রাম অযোধ্যার রেসিডেণ্ট হয়েছে।

১৮৫৬, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।

রেসিডেণ্ট নবাব ওয়াজিদ আলির সঙ্গে অযোধ্যায় দেখা করতে এসেছে।

রেসিডেণ্টের আদেশে নবাবের প্রাসাদ-দ্বার কামান-শূন্য ও রক্ষীদিগকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।

এত বড় অপমানের পরও রেসিডেণ্টকে নবাব সাদরে দরবারে আহ্বান জানাতে কুণ্ঠাবোধ করলো না।

নবাব! মহামান্য গভর্ণমেণ্ট জেনারেল বাহাদুর এই সন্ধিপত্র আপনার স্বাক্ষরের জন্য পাঠিয়েছেন।

বারেক মাত্র নবাব সন্ধিপত্রের ওপরে চক্ষু বুলিয়েই বুঝলেন, তার নবাবীর অবসান হয়েছে। মহীশুরাধিপতি হায়দারের সনির্বন্ধ অনুরোধকে একদা অবহেলা করে যে মূর্খতা তিনি করেছেন, আজ তারই এসেছে মাশুল দেওয়ার দিন। দেশদ্রোহিতার শাস্তি আজ তাঁকে উষ্ণীষ দিয়ে শোধ করতে হবে।

সাশ্রুনেত্রে নবাব স্বীয় উষ্ণীষ মাথা হতে নামিয়ে রেসিডেণ্টের হাতে তুলে দিলেন।

হতভাগ্য হৃতসর্বস্ব নবাবের অশ্রুমোচনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর সঙ্গে উত্তরে নেপাল পূর্বে গোরক্ষপুর, দক্ষিণে এলাহাবাদ ও পশ্চিমে আজিমগড়, জৌনপুর, ফরাক্কাবাদ এবং শাহাজাঁপুর সীমার মধ্যবর্তী প্রায় ২৪ সহস্র বর্গমাইল পরিমিত বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার করালগ্রাসে পতিত হলো। শুধু বিশাল ভূখণ্ড অযোধ্যাই নয়, সেই সঙ্গে অযোধ্যার অতুল বৈভবও কোম্পানীর ধনাগারে গিয়ে উঠল।

লর্ড ডালহৌসীর কাজ এখনও শেষ হয় নি।

এবারে শুরু হলো সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ভূস্বামীদের ভূমির বন্দোবস্ত করে ও ক্রোক করে।

নব ব্যবস্থার ফলে অচিরে অনেক তালুকদার পৈতৃক সম্পত্তি হতে বিচ্যুত হয়ে সাধারণ লোকের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। অনেকের সম্পত্তি (Sale law) আইনের প্যাঁচে ফেলে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রী করে দেওয়া হলো।

যুক্তি একটা ছিল বৈকি! তালুকদাররা প্রায়ই নির্বোধ, অক্ষম, দুরাচার; অতএব তাদের হাতে অত সম্পত্তি থাকা কি বিধেয়?

কখনই না!

এগিয়ে আসছে ১৮৫৭ সাল।

কালচক্র ঘুরে চলেছে ঃ ঘূর্ণ্যমান চক্রপথে বর্ষিত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

পলাশীর প্রান্তরে ভারতে যে রবি অস্তমিত হয়েছিল, তারপর আর নবপ্রভাতের বন্দনা-গীত গাই নি! দীর্ঘ একশত বৎসর আগে দিন অবসানে যে রাত্রি ঘনিয়ে এসেছিল, সেই রাত্রি দীর্ঘ একশত বৎসর ধরে ক্রমে গাঢ় অমানিশায় পরিণত হয়েছে।

কত লাঞ্ছনা! কত অত্যাচার! কত অশ্রুমোচন!

পৃথিবী, পুরনো পৃথিবী তেমনি ঘুরে চলেছে একঘেয়ে বর্ষচক্রের পথে। অন্ধকারের পটভূমিতে ছায়াছবি সাত সাগর তের নদীর পার হ'তে তীব্র আলোয় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

কেবলই মনে পড়ে, ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না,…পাঞ্জাবের দুর্দশা, মুলতানের রক্তপাত, নির্দোশী মুলরাজের নির্বাসন। সেতারা, ঝাঁসী, নাগপুর, কেরৌলী, তাঞ্জোরের অবলোপ!

সুখৈশ্বর্যে ভরা অযোধ্যা!

সর্বত্র। সর্বত্র উড়ছে ভারতের দিক্ হতে দিগন্তে ব্রিটিশের বিজয় পতাকা।

এ লাঞ্ছনার শেষ কোথায়! যারা একদিন সামান্য বণিকের বেশে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বাংলার মাটিতে এসে পদার্পণ করলে, যারা একদিন ধনরত্নের লোভে কখনো দেশে দেশে দোকানপসার সাজিয়ে, কখনো বা সামান্য ফেরিওলার মত বাংলার পথে পথে ঝাঁকায় কতকগুলো কাচের পুতুল সাজিয়ে গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে ফিরত—বহুৎ আচ্ছা মাল যাতা হ্যায়! আজ সেই বণিক সম্প্রদায়ের এত ক্ষমতা, এত দর্প, এত অত্যাচার কোথা হতে এল!

আমরাই তুলে দিয়েছি তাদের হাতে ক্ষমতা!

মেজর ইবান্স বেল তারস্বরে বলেছেন ঃ ভারতবর্ষ তরবারীর বলে অধিকৃত হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও উহা তরবারীর বলে রক্ষিত হবে।

মেজর সাহেব! একটু ভুল করেছো। কথাটা তরবারী নয়, 'বিশ্বাসঘাতকতা' —'স্বদেশদ্রোহিতা!'

দেখতাম তোমাদের তরবারীর কত জোর, যদি আমরা, মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ না থাকতাম।

মীরকাশিমের দেওয়া পাঞ্জা আমরাই তোমাদের হাতে তুলে না দিলে দেখতাম একবার তোমাদের 'উদয়নালার' বিক্রম।

যে অসির গর্ব তোমরা করো সে অসি ধারণ করেছে কারা? আমরাই! ভুলে যেও না বণিক, ভুলে যেও না আমরাই আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে ভারতের মানচিত্র লাল করে দিয়েছি।

আর তোমরা?

আজ যে কোন একজন শ্বেতাঙ্গ পথ দিয়ে চলে গেলে আমরাই—তোমাদের তাঁবেদার সেপাইরাই তলোয়ার উঠিয়ে তোমাদের সম্মান জানাই। অথচ কোন শ্বেতাঙ্গ অফিসার কোন ভারতীয় অফিসারকে সম্মান দেখানো এতটুকু প্রয়োজন বোধ করে না।

একদিন রাজকোষের ধনরত্ন এদেশেই সঞ্চিত থাকত, দেশের টাকা দেশে থাকত, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অন্যের রত্নভাণ্ডার কেউ ভরিয়ে তুলতো না।

সিরাজদ্দৌলা নেই। সে স্বর্ণভূমি বাংলা দেশও নেই।

পূর্ব স্মৃতি ফিরে আসছে কি!···

সত্যিই কি ফিরে এলাম আবার ১৮৫৭-এর ভারতভূমিতে।···

তা না হলে কি এসব ভাবছি! কি সব চোখের ওপরে ছায়াছবির মত ভেসে ওঠে বার বার।···

সিরাজের সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে। বাংলা আজ হৃতসর্বস্ব। গৌরবচ্যুত!

সে শিল্প নেই। সে বাণিজ্য নেই! নেই সেই বাহুবল। নেই সেই রণকৌশল। বহুদিন হতেই এদেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলে পরিচিত হয়ে এসেছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বহুদিন হতেই হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই হয়ে, বাহুতে বাহুতে মিলিত হয়ে, জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা সগৌরবে বহন করে এসেছে।

কেন তবে সে দেশের আজ এ অধঃপতন? কেন এত অত্যাচার? কেন এ আর্তক্রন্দন?

ভারতবাসী, তোমরাই তোমাদের স্বত্বাধিকার তুলে দিয়েছো শ্বেতাঙ্গদের হাতে! তোমরাই জাফর আলিকে মসনদ-চ্যুত করেছো, তোমরাই মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছো।

যত কিছু অত্যাচার, যত কিছু বিপ্লব শ্বেতাঙ্গরা তোমাদের সাহায্যেই তো করেছে দিনের পর দিন।

একবার মীরজাফরের দেয় টাকা আসতে দেরি হলো, শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরা অমনি ক্ষেপে চিৎকার শুরু করলে সময়মত টাকা হাতে না পেয়ে।

তখন তারাই দেশীয় সেপাইদের কোম্পানীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল।

তারপর যখন টাকা এলো, বেশির ভাগ টাকা পেল গোরা সৈন্যরাই, দেশীয় সৈন্যেরা পেল অপমান ও লাঞ্ছনা। আর ঐ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে দেশীয় সৈন্যরা যখন কয়জন শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে আটক করে এর প্রতিকার চাইল, তখন চব্বিশ জন দেশীয় সেপাইকে তোমাদের সকলের চোখের সামনে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিল, তখনও তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো না।

ঐ শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পরে সেপাইদের ওপরে হুকুম জারী হলো: কোন সেপাই-ই কানে মাকড়ী পরতে পারবে না। তিলকফোঁটা কেউ ধারণ করতে পারবে না। দাড়ি সব সৈনিকদেরই নিয়মিত কামিয়ে ফেলতে হবে। কেউ এবার থেকে নিজেদের ইচ্ছামত পাগড়ী বা টুপি মাথায় পরতে পারবে না। সকলকেই কোম্পানীর দেওয়া টুপি মাথায় পরতে হবে।

বিদ্রোহী সেনানায়ক শ্রীমন্ত নানাসাহেবের সেই সতর্ক বাণী: সাবধান! দেশবাসী সাবধান! ঐ বিচিত্র রকমের টুপি যারা মাথায় দেয়, তারা সহজ নয়। আজিও যদি সাবধান না হও, একদিন ওরা আমাদের সকলকেই ঐ বিচিত্র টুপি

মাথায় পরিয়ে ছাড়বে। ও টুপি নয়, ও দাসত্বের বীজ!

বুঝিনি তখন!

বুঝিনি যে ঠিক তা নয়, বুঝতে চাইনি। অথবা বুঝেও না বোঝবার ভান করেছি। কোম্পানীর রাজত্ব কায়েমী হতে চলেছে। বিষবৃক্ষের শিকড় অক্টোপাশের মত লোলুপ বাহু বিস্তার করে চলেছে ভারতের মাটিতে।

সোনার ভারত শোষণে শোষণে ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ কোম্পানীর অধীনে দেশীয় সেপাইদের মধ্যে একটা প্রবাদ শোনা যাচ্ছে ঃ কোম্পানীর দেওয়া টুপি গরু আর শুয়োরের চামড়ায় তৈরী।

সেপাইরা বেঁকে দাঁড়াল ঃ দেব না মাথায় আমরা কোম্পানীর দেওয়া টুপি! দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষের ধোঁয়া দেখা দিয়েছে।

ভেলোরের দুর্গ!

স্বাধীনতা গেছে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য গেছে, নিজ ভূমে পরবাসী! বিদেশীর পদানত, তাতে নেই কোন দুঃখ বা গ্লানি; কিন্তু ধর্মের হানি, ধর্মান্ধ ভারত-বাসী ক্ষেপে উঠেছে। মহাবীর টিপুর লোকেরা তখন ভেলোরেই।

একসঙ্গে সকলে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কোম্পানীর কামান! লাল রক্তে রাঙা হয়ে গেল ভেলোরের দুর্গের মাটি!

চৌদ্দজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার ও নিরানব্বুই জন গোরা সৈনিকের রক্তেও বুঝি সৈনিকরা শান্ত হলো না।

বহুকাল পরে আবার মহীশুরের দুর্গ-প্রাকারে উড়ছে জাতীয় পতাকা!

আশেপাশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই রক্ত-অভিযান।

কূটচক্রী কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা দেখলে সর্বনাশ। আপোসে নির্বাপিত করতে হবে এ বিদ্রোহানল। হলোও তাই। দেশীয় সৈনিকদের ধর্ম রক্ষার এক মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধূর্ত শ্বেতাঙ্গরা অসন্তোষের আগুন অচিরে নিভিয়ে দিল।

দু'দিনও গেল না; শ্বেতাঙ্গের মৌখিক প্রতিশ্রুতি কোথায় ভেসে গেল! ক্ষণিকের আতঙ্ক উবে যেতেই শ্বেতাঙ্গের নিজমূর্তি আবার প্রকটিত হলো।

যাক্ সে কথা। কি বলছিলাম?

সেই যে মহামান্য ক্লাইভের আমল হতে কোম্পানীর শোষণ শুরু হয়েছিল, সেই শোষণের টানে টানে একে একে দেশীয় রাজ্যগুলির অনেকগুলিই কোম্পানীর কুক্ষিগত হয়েছে। দেশীয় তালুকদারদের মধ্যে জেগেছে হাহাকার। মইনপুরের রাজার স্টেটের ১৫৮টি গ্রামের মধ্যে ১১৬টি গ্রাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন একটি রাজার তালুক হতে ২১৬টি গ্রামের মধ্যে ১৩৮টি গ্রামই ব্রিটিশের অনির্বাণ জঠরানলে অর্থলালসার উপঢৌকন দিয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমগ্র উদ্বৃত্ত করকে তিনভাগে ভাগ করার নোটিশ-জারী হয়েছে। কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

সরকার পাবে সমগ্র উদ্বৃত্ত করের শতকরা ৬৬ অংশ। ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেশীয় তালুকদারেরা পাবে শতকরা মাত্র ১৮ ভাগ এবং সম্পত্তির মালিক

পাবে শতকরা ১৫ ভাগ।

এই নীতির প্যাঁচে পড়ে বহু স্থাবর ভূসম্পত্তি যারা টাকা ধার দিত এমনি সব কোম্পানীর প্রসাদ-তুষ্ট মহাজনদের হাতে ক্রমে চলে গেল। কারণ ঐসব অর্থ-গৃধ্নু মহাজনরাই ভূসম্পত্তি সব বন্ধক রেখে ধার দিত।

অযোধ্যার অবস্থাও সঙ্গীন।

২৫,৫৪৩টি গ্রামের মধ্যে তালুকদারদের অধিকারে রইলো মাত্র ১৩,৬৪০টি গ্রাম। তা থেকে কর পাওয়া যাবে ৬৫,০৬,১৯ টাকা এবং বাকী ১১,৯০৩টি গ্রাম যেগুলো তালুকদারদের দখল থেকে অন্য লোকদের হাতে গিয়ে পড়ল, তার কর ৩২,০৮,১১৯ টাকা।

কত আর বলব! শুধু যে তালুকদারদেরই সংকটময় পরিস্থিতি তা তো নয়, সেই সঙ্গে দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের ওপরেও নানাপ্রকার কর বসিয়ে ও কর নির্ধারণের জন্য নানাভাবে সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করে চলতে থাকে অসহনীয় পীড়ন। কোম্পানীর নিদারুণ অর্থলিপ্সায় নিত্য নতুন শোষণে দেশের সর্বত্র ভয়ংকর অর্থসংকট! ওদিকে কোম্পানীর লোকদের সুপরিচালনা ও সুশাসনের অব্যবস্থার জন্য আবার মহাজনদের নিকট হতে দেশের ভূস্বামীদের অত্যন্ত উঁচুহারে সুদ দিয়ে টাকা কর্জ করতে হচ্ছে! সরকারের মুদ্রাদি প্রচলনের অব্যবস্থার জন্য মুদ্রা-সংকট!

দেশে মুদ্রার চাহিদা বেড়েছে, কিন্তু রৌপ্যের অভাবে টাকশালে পরিমিত মুদ্রা তৈরী হচ্ছে না।

অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছেঃ কম্পানিকা আমলমে রোজগার নেহি!

রাত্রি অনেক হলো, ঢাকা দেওয়া আহার্য এতক্ষণে শুকিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ক্ষুধাও নেই।

আজিও আবার বোধ হয় রাত্রে বৃষ্টি হবে, আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘসঞ্চার হচ্ছে।

উৎপীড়িত জনসংঘের মনেও মেঘসঞ্চার হচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ এসে গেল। ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধের পর দীর্ঘ একশত বৎসর অনন্ত কাল সমুদ্রের বুকে কি একটি বুদ্বুদ মাত্র!—

কত লাঞ্ছনা! কত অত্যাচার! কত অশ্রুমোচন! দীর্ঘ একশত বৎসরের মর্মন্তুদ হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। এই একশত বৎসরের ইতিবৃত্ত কি বলছে?

পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ শক্তি ভারতের মাটিতে যে স্বত্বাধিকারের কালবীজ আমাদের সাহায্যে রোপণ করেছিল, আজ দেখছি সেই বীজের বিষাক্ত রসে ভারতের দিক্ হতে দিগন্তে বিস্ফোটক দেখা দিয়েছে। এবং সেই বিস্ফোটকের সকল বেদনা মন্থন করে ফুটে উঠল একটি রক্তশতদল!

এসো মা জননী! তোমার পূজা করবো আবার রক্তশতদলে।

রক্তশতদলে অঞ্জলি ভরে এনেছি।

কে বলে রে ভোলে নাই
কে বলে রে খোলে নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার

কাদের কণ্ঠে শুনি : Your English tyrants are few in number, murder them ! ধ্বংস করো অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের ।

বজ্রগর্ভ মেঘে মেঘে অশনি-স্ফুরণ !

সংকেত পেঁাছে গেল জনে জনে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ।

রক্তশতদল : ছোট এতটুকু কাগজের টুক্‌রো, কোন কথাই তাতে লেখা নেই, কেবল আঁকা একটি রক্তশতদল ! কি ইঙ্গিত দিচ্ছে ঐ রক্তবর্ণ শতদলটি ?

সব লাল হো যায়গা !—সব লাল হয়ে যাবে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। উঠ ভারতবাসী, জাগ ! হিসাব-নিকাশের দিন এলো ঐ ! দিন আগত ঐ !

একশত বৎসরের জর্জরিত মুমূর্ষু পৃথিবী মুক্তির বেদনায় কাঁপছে !

কবে সে কাঁপুনি জেগেছিল, তারপর দেখতে দেখতে আরো একশত বৎসর প্রায় ঘুরে আসতে চলেছে। তবু পৃথিবীর সেদিনকার সে প্রাণ-স্পন্দন আজিও যেন আমি অনুভব করছি আমার ধমনীতে।

মুক্তির নব চেতনা ! নূতন করে আবার পুরাতন জরাজীর্ণ ভারত জন্ম নেবে তারই উদ্যোগ চলেছে, বাংলা হতে মীরাটে, মীরাট হতে দিল্লীতে, দিল্লী হতে পাঞ্জাবে গোপনে গোপনে, সৈন্যশিবিরে, নগর হতে নগরে, রাজপ্রাসাদ হতে রাজপ্রাসাদে।

নিপীড়িত শত শত কণ্ঠে শুধু শুনি একটিমাত্র ধ্বনি :

—"আসে রাত্রি মহা বিপ্লবের
মশাল জ্বালায়ে রাখো ঘরে ঘরে দৃপ্ত জীবনের।"

ঘরে ঘরে প্রস্তুত হও সবাই। 'সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে।' নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পোড়া ভারতভূমি মুক্তিস্নান করবে লাল রক্তে।

তিন

এবং সেই পরম মুহূর্তটির জন্যই তো আমাদের এ সাধনা ! আমাদের এই সূর্য-তপস্যা !

সূর্য-তপস্যা ! একশত বৎসরের তিমির রাত্রির সূর্য-তপস্যা !

১৮৫৭-এর সূর্য তপস্যা ! রক্ত আবীর কুমকুমে তাই কি দেশের মাটি লাল হয়ে গেল ? সে রক্ত দান ব্যর্থ হয় নি ! সুশান্তর কথাই ঠিক। ব্যর্থ কিছুই হয় না।

কিছুই ব্যর্থ হয়নি।

তাঁতিয়া টোপী, নানা সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাঈ ! বীরগণ জননীরে রক্ত-তিলক ললাটে পরাল। দীর্ঘ আট বৎসর ধরে মহামান্য শ্বেতাঙ্গ লর্ড

ডালহৌসী ভারতের মাটিতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে গিয়েছিল, আজ সেই স্ফুলিঙ্গ হতেই জ্বলে উঠল লেলিহান বহ্নিশিখা।

সেই কিশোর বালক সিরাজের হত্যার দিন হ'তে দীর্ঘ একশত বৎসর পর্যন্ত যারা এদেশে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখে এসেছে, গভর্ণমেণ্টের যথেচ্ছ কার্যকলাপ যাদের হৃদয়ে দিনের পর দিন অপরিসীম আশঙ্কার সঞ্চার করেছে, গভর্ণমেণ্টের অপূর্ব শোষণ-নীতির মহিমায় যারা সম্পত্তি নষ্ট ও পদভ্রষ্ট হয়ে প্রাসাদ ছেড়ে প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, গভর্ণমেণ্টের কুৎসিত অত্যাচারে যারা আজ হৃতসর্বস্ব, আজ সেই শত শত কণ্ঠ চিরে বজ্রগর্ভ বাণী বের হয়ে এল : ব্রিটিশ ধ্বংস হোক।

লক্ষ হাতে লক্ষ তরবারীর ঝিলিক্ হেসে উঠল।

বারুদ ভরাই ছিল, শুধু তাতে অগ্নিস্ফুরণ!

দমদম সেনানিবাস।

এতদিন সৈনিকরা 'ব্রাউন বেস' বন্দুক ব্যবহার করে এসেছে। তার জায়গায় উৎকৃষ্টতর বন্দুক আসছে। ঐ উৎকৃষ্টতর অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী এবার শিক্ষা দেওয়া হবে সৈনিক নিবাসে নিবাসে। তারই তোড়জোড় চলেছে।

এমন সময়ে হঠাৎ শোনা গেল : বসা মিশ্রিত টোটা ছাড়া ঐ নতুন বন্দুক ছোঁড়া নাকি যাবে না। এবং সেই টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হবে।

জানুয়ারী মাস। শীতকাল।

একজন নীচজাতীয় লস্কর একজন ব্রাহ্মণ সেপাইকে বলে : ভাই, তোমার লোটাটা একবার দাও না, একটু জল পান করবো।

: তোর তো আস্পর্ধা কম নয় রে! নীচ জাতি হয়েও ব্রাহ্মণের লোটায় জল পান করতে চাস!

: আরে রেখে দাও তোমার নীচু আর উঁচু জাতি! কোম্পানী এবারে সব এক করে দেবে ঠিক করেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের আর পার্থক্য রাখবে না।

: কি বললি বেটা!

: কেন ঠাকুর, শোন নি? তোমাদের এবারে যে নতুন টোটা দেওয়া হচ্ছে, সে তো গরু আর শুয়োরের চর্বিতে তৈরী হচ্ছে। এত জাতের বড়াই আর কেন!

সর্বনাশ! এ বলে কি! অধীর চিত্তে চিন্তান্বিত ব্রাহ্মণ-সেপাই আর একটি কথাও না বলে নীরবে স্থানত্যাগ করলে।

দেখতে দেখতে দমদমায় সমস্ত সৈনিকদের মধ্যে এ দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না।

নতুন টোটা চালু করে কোম্পানী হিন্দু-মুসলমান সব ভারতীয় সেপাইদেরই জাত মারবার ফন্দি করেছে।

কুচ-কাওয়াজের সময় সৈনিকদের সেবারে বেলোরে যখন গোল টুপি মাথায় দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত সৈনিকেরাই বিরক্ত হয়ে ওঠে। আজ টোটার গুজবে তার চাইতেও ঢের বেশী বিরক্তি ও উদ্বেগের চাঞ্চল্য দেখা গেল সেপাইদের মধ্যে।

কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ার পূর্বেই ঐ পরিকল্পিত সংবাদ এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে, এক নগর হতে অন্য নগরে, এক সৈন্যনিবাস হতে অন্য সৈন্য নিবাসে, মুখে মুখে অনুকূল বায়ুতে দাবানলের মতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অনুকূল বায়ুতে অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ছে। দমদমার কয়েক মাইল উত্তরে ভাগীরথীর তীরবর্তী বারাকপুর তখনকার দিনের বিখ্যাত সেনানিবাস।

বিলম্ব হলো না সেখানেও টোটার সংবাদ পৌঁছাতে।

বারাকপুরের সৈন্যনিবাস অজানিত আশঙ্কায় অত্যাসন্ন মহাপ্রলয়ের অন্ধকার আকাশের মত থম্‌থম্‌ করছে! কখন কি হয়!

চুপি চুপি ফিস্‌-ফিস করে সব কথা বলছে। গোপনে গোপনে বসে পরামর্শ সভা। গভীর রাত্রে ব্যারাকে সৈন্যরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।...

কয়েকদিন পরেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। ব্যারাকপুরের টেলিগ্রাফ স্টেশন পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিন্তু আগুন তাতে নির্বাপিত হলো কি? না, নির্বাপিত তো হলোই না, বরং অনুকূল বাতাসে সেই অগ্নির লোলজিহ্বা প্রসারিত হয়ে চলল।

প্রতি রাত্রেই অদৃশ্য হাতে প্রজ্বলিত অগ্নি-তীর শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের খড়ের চালে নিক্ষিপ্ত হয়ে অগ্নিযজ্ঞ শুরু করলে।

বারাকপুর হতে অগ্নি-তীর নিক্ষিপ্ত হলো বহুদূরবর্তী রাণীগঞ্জের সেনা নিবাসে, সেখান হতে বহরমপুরে।

সৈনিক নিবাসে নিবাসে চলেছে প্রস্তুতি। গোপন লিপির আদান-প্রদান—প্রস্তুত হও! দিন আগত ঐ!

বিদেশী ঐতিহাসিকদের সাফাই শোনবার আজ আর প্রবৃত্তি নেই।

সামান্য টোটার ওপরে সমস্ত দোষারোপ চাপিয়ে এড়িয়ে আজ আর যেতে দেবো না।

কোথায় তোমরা বিদেশী ঐতিহাসিকগণ! জোর গলায় আজ তোমাদের আমরা ডেকে বলছি, সত্যি কথা এবারে লিখতে হবে। পলাশীর ঘন নিবিড় আম্রকাননের ছায়ায় আজ আবার সিরাজের সিংহাসন পাতা হবে। ক্লাইভ হেস্টিংস, ডালহৌসি, কর্ণওয়ালিশ! তোমাদের আজ বিচারের দিন!

যে সভ্যতা ও শিক্ষার বড়াই করো তোমরা, সেই শিক্ষা ও সভ্যতার দোহাই দিয়ে ডাকছি তোমাদের বিদেশী ঐতিহাসিক! বুকে হাত দিয়ে সত্য কথা বলে যাও আজ!

আমাদের দেশের লোকেরা জানুক! শুনুক এ দেশবাসী, কেন জ্বলেছিল প্রলয়ের হোমাগ্নি ১৮৫৭এর ভারতে!

কি ছিল সেদিন আমাদের অভিযোগ!

অভিযোগ একটা-আধটা তো নয়। সে যে অনেক! অনেক!

যারা একদিন নিজেদের দেশকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছিল, নির্বিচারে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সন্তান, যারা একদা তোমাদের জাতীয় পতাকা-তলে

সমবেত হয়, তোমাদেরই দেওয়া হাজারো লাঞ্ছনা ও অকুণ্ঠ অত্যাচার দিনের পর দিন দীর্ঘ একশত বৎসর ধরে সহ্য করে এসেছিল, অকাতরে যারা বীরের মতই বুকের রক্ত দিয়ে হাসিমুখে তোমাদের রাজ্যবিস্তারের লোভের আগুনে শতয় শতয় হাজারে হাজারে দিয়েছে আত্মাহুতি, বিনিময়ে তাদের কি দিয়েছিলে সেদিন? বল! জবাব দাও! চুপ করে আজ আর থাকলে তো চলবে না!

কায়মনোবাক্যে তোমাদের গভর্ণমেণ্টের তুষ্টিসাধন করে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেও শেষ পর্যন্ত দেশীয় সৈনিকদের কারও ভাগ্যেই 'সুবাদার' অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ কোনদিনই ঘটে ওঠে নি। কেন? তারা কোন্ অংশে ন্যূন ছিল তোমাদের গোরা সৈনিকদের চেয়ে শুনি?

সেপাইরা যখন কার্যে নিয়োজিত থাকত, তখন কোন ইংরাজ অফিসার দেখলেই যন্ত্রোত্তোলন করে সম্মান দেখানোর রীতি ছিল, কিন্তু একজনও ইংরাজ-সৈন্য কোন ভারতীয় দেশী অফিসারকে সে সম্মান দিয়েছে কি কোন দিন! অথচ শিষ্টতার গর্ব করো তোমরা শ্বেতাঙ্গ!

ব্রিটিশ কোম্পানীর কার্যানুরোধে দেশীয় সেপাইদের অনেক সময়ই অনেক দূর দেশে নিয়ে যাওয়া হ'তো এবং সেই অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত স্থানে যদি কখনো কোন দেশীয় সেপাই মৃত্যুমুখে পতিত হ'তো, তখন সেই হতভাগ্য দেশীয় সৈনিকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের দুরবস্থার অবধি পর্যন্ত থাকত না।

ইংরাজ আমলের পূর্বে ভারতের তদানীন্তন রাজারা কোন প্রদেশ জয় করলে সেরা সৈনিকদের পুরস্কার স্বরূপ ভূমিদান করতেন। আর তোমরা পিঠ্ চাপড়ে দুটো মিষ্টি কথা বলেই কর্তব্য সম্পাদন করতে।

তখনকার দিনে ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিসেরাও কোম্পানীর সিপাইদের চাইতে বেশী বেতন পেত এবং ঢের বেশী সুখে থাকত। আর তোমাদের তাঁবে আমরা—দেশীয় সেপাইরা পশুর মতই পদদলিত ও অবহেলিত হয়েছি। এমনও শোনা গেছে, সৈন্যাধ্যক্ষ আর্থার ওয়েলেসলি তার আহত দেশীয় সৈন্যদের গুলি করে নির্দয়ভাবে মেরে ফেলতে হুকুম দিয়েছে।

আনুগত্যের কি অপূর্ব প্রতিদান!

আজ যদি তাদের বুকে আগুন জ্বলে থাকে, তবে তার জন্য দায়ী কে?

কারা?···

বেলোরের দেশীয় সেপাইদের অসন্তোষের সংবাদ পেয়ে এ্যাডজুটেণ্ট জেনারেল আগ্নুর অত্যুক্তিকে বিশ্বাস করেই ফিরিঙ্গী ক্রাডক সন্দেহের বশে দুইজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করলে। এই কি বিচার!

বেলোর দুর্গ!

১৪ই জুলাই।···

রাত্রি গভীর, এই কিছুক্ষণ আগে রাত্রি দুটো ঘোষিত হয়েছে।

সহসা নিশুতি রাতের স্তব্ধতাকে দীর্ণবিদীর্ণ করে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল: দুড়ুম! দুড়ুম! প্রহরারত বন্দুকধারী সৈনিকরা প্রথমেই যেসব দেশীয়

সৈন্যরা তাদের দলে আসতে চায়নি, তাদের গুলি করে ধরাশায়ী করছে!—এ তারই বিজ্ঞপ্তি! বন্দুকের গুলির শব্দে নিদ্রাভঙ্গে শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা সন্ত্রস্ত হ'য়ে যে যার শয্যার ওপরে উঠে বসেছে।

কিসের শব্দ! কিসের গোলমাল!

দুম্…দুম্! দুড়ুম্! মুহুর্মুহু বন্দুকের গর্জন!

কেউ পালাবার পথ পেলে না, একে একে সেপাইদের বন্দুকের গুলিতে শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা ধরাশায়ী হচ্ছে।

অত্যাচারী! মূল্য শোধের দিন এসেছে!

শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও সাজ সাজ রব পড়ে গেল। উভয় পক্ষে শুরু হলো যুদ্ধ!

সেপাইদের দলপতি মুস্তাফা বেগ!

দু'একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার কোন মতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলে।

ক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সেপাইদের সংখ্যা দলে দলে বৃদ্ধি হচ্ছে।

পুলিসের কর্মচারীরাও আজ সেপাইদের দলে এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। রাত্রি আরো গভীর হলো, কিন্তু হত্যালীলার বিরাম নেই।

ইংরাজদের অত্যাচারে পদচ্যুত সুলতানরা যুদ্ধরত পরিশ্রান্ত সেপাইদের যোগাচ্ছে ক্ষুধার আহার্য এবং দিচ্ছে উৎসাহ: সাবাস্ বীর। এই তো চাই। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়। অত্যাচারী নিপাত যাক্।…

মহীশূরাধিপতি সিংহ টিপুর তৃতীয় পুত্র স্বয়ং ঘটনাস্থলে এসেছে: ধ্বংস করো এই বিদেশী অত্যাচারীদের। আবার প্রতিষ্ঠা করো তোমাদের দাবী।… সৈনিকের উল্লসিত চিৎকার নৈশগগনে ছড়িয়ে পড়ে।

মত্ত মোগল রক্তপাগল 'দীন' 'দীন' গরজনে! আবার কি সেদিন সত্যিই ফিরে এল! চারিদিকে রক্তস্রোত! আহতের আর্তনাদ! বারুদের ধোঁয়া, বন্দুকের গর্জন! সুলতানের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী কোথায় ছিল কে জানে! সহসা একসময় দেখা গেল ঘর্মাক্ত কলেবরে রক্তরঞ্জিত হাতে বহুদিন পরে আবার দুর্গশিখরে উড়িয়ে দিচ্ছে মহীশূরের ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত বিজয়-বৈজয়ন্তী!

পতাকা উত্তোলন! দুর্গশিখরে আবার উড়েছে ওদেরই পতাকা!……

দুর্গ তখন সুলতানদের অধীনে।

দুর্গের বাইরে শ্বেতাঙ্গ অফিসার মেজর কোটস্ প্রভাত না হ'তেই এ দুঃসংবাদ আর্কটের সেনানিবাসে পেঁছে দিতে কালবিলম্ব করেনি। অভিযানে অগ্রসর হলো এবারে সুসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ ও তাদের তাঁবে আমাদের একদল মূর্খ স্বদেশদ্রোহী দেশীয় সেপাই। অগ্রভাগে চলেছে কর্নেল গিলেস্পি।

দুর্গপ্রাচীরের সন্নিকটে ইংরাজ সৈন্য এসে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু দুর্গদ্বার বন্ধ।

দুর্গের মধ্যে তখনও যে সব ইউরোপীয় ছিল, তারা এবারে প্রাচীরের উপর হ'তে দাঁড়ি ঝুলিয়ে দিল।

গিলেস্পী দুঃসাহসী, সেই দড়ি বেয়েই দুর্গপ্রাচীরের ওপরে উঠে দাঁড়াল, ইংরাজের জয়ধ্বনি শোনা গেল।

এদিকে ইংরাজের কামানশ্রেণী এসে গেছে ততক্ষণে দুর্গের বাইরে।

যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে ; আবার শুরু হলো সংগ্রাম।

হতভাগ্য টিপুর পুত্রদ্বয়ের ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন ধূলিসাৎ হলো।

বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের গলায় মাল্য দুলিয়ে দিলেন।

অনল নির্বাপিত হলো বটে, কিন্তু যে মাটির বুকে ফাটল ধরেছিল তা আর জোড়া লাগল না।

সেই ফাটলের তলে তলে ফল্গুধারার মতই অনলস্রোত বহে চলল সংগোপনে।

এই খণ্ড খণ্ড বিপ্লবের দিনে ইংরাজ আদেশজারী করলেঃ বাজারে আর টম্‌টম্‌ বাজানো চলবে না।

নন্দিদুর্গও থম্‌থম্‌ করছে। আবার হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকদের গোপনে গোপনে পরামর্শ।

১৮ই অক্টোবর শুরু হবে বিজয় অভিযান!

সেপাইরা যে যার পরিবারবর্গকে দুর্গ হতে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে।

সব ঠিক, গভীর নিশীথে হবে যজ্ঞাহুতি, কেমন করে না-জানি কথাটা শ্বেতাঙ্গদের কর্ণগোচর হয়ে গেল। সংবাদ সেনাপতির গোচরীভূত করলে একজন ইংরাজ অফিসার ও একজন বৃদ্ধ ভারতীয় অফিসার।

ভারতীয় সেপাইদের পরিকল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই শ্বেতাঙ্গ অফিসার ও সৈনিকদের জন্য, আর ভারতীয় সৈনিকদের জন্য কেবল পরিশ্রম ও কষ্ট।

সামান্য বেতনের বিনিময়ে ভারতীয় সেপাইরা এ কষ্ট ও পরিশ্রম করে শ্বেতাঙ্গদের তাঁবে থাকতে আর রাজী নয়।

পিণ্ডিতে ২২ গণিত সৈনিকদল স্পষ্টই বললেঃ অত অল্প বেতন নিতে তারা আর রাজী নয়। বেতন বাড়াতে হবে।

উজীরাবাদ ও ঝেলামেও সৈনিকদের মধ্যে ঐ স্বর।

উজীরাবাদে প্রকাশ্য কুচ্‌কাওয়াজের ময়দানে সেনাপতি হিয়ার্স কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে শান্তির বারিসিঞ্চন করলে।

কিন্তু চারজন সৈনিক কিছুতেই মাথা নোয়াল না। বিচারে তাদের প্রতি কঠোরতম দণ্ড দেওয়া হলো।

আগুনের শিখা ক্রমেই স্ফুলিঙ্গ হতে লেলিহান হয়ে উঠছে।

একদিন যে ভারতীয় সৈনিকরা ছুটিতে স্বদেশে গেলে দেশবাসীরা সম্মান দেখিয়েছে, আজ তাদের লোকে ঘৃণা করছে। এই তো কোম্পানির সেপাইগিরির পুরস্কার! তবে আর কেন?

চার

নিশ্চয়ই, তবে আর কেন ?

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তো নয়, পুঞ্জীভূত বেদনার রক্তাক্ত অভ্যুত্থান।

২৯শে মার্চ। রবিবার।

বারাকপুরের সৈনিকনিবাস।

দিনমণি অস্তগমনোন্মুখ। এমন সময় চারিদিকে কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব।

ওহে শুনেছো ? দুটি সৈনিকের মধ্যে ফিস্‌ ফিস্‌ করে আলোচনা চলে : সর্বনাশের আর বেশী দেরি নেই, গোরা সৈন্যে ভর্তি হয়ে অনেকগুলো যুদ্ধ-জাহাজ কলকাতার বন্দরে এসে পেঁাচেছে। তারা সব এখানে এসে আমাদের স্থান অধিকার করবে।

: কে বললে এ কথা ?

: সকলেই জানে, আর তুমি জান না ? আমরা সময় থাকতে যদি সাবধান না হই, তাহলে আমাদের দুর্দশার আর অবধি থাকবে না।

তাহলে ?

এই সুযোগ। আজ রবিবার, শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা আজ সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে···

মুখে মুখে এ সংবাদ সৈনিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কে দেখাবে পথ ? কে দেবে মুক্তির সন্ধান ?

এগিয়ে এল এক তরুণ সেপাই। মঙ্গল পাঁড়ে।

উন্নত পেশল দীর্ঘ চেহারা।

ভাইসব, আর সময় নেই ! যদি নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ফিরিঙ্গীর হাতে দলিত করতে না চাও তবে এগিয়ে এস। ধর কৃপাণ !

পাঁড়ের সর্বাঙ্গে যুদ্ধের বেশ। এক হাতে পিস্তল গুলিভরা, অন্য হাতে তীক্ষ্ণ তরবারী।

১৮৫৭-এর প্রথম মুক্তিসংগ্রামের মরণজয়ী সৈনিক।

এসো সব, একত্রে মিলিত হও।

ভেরীবাদক সামনেই ছিল, তার দিকে তাকিয়ে মঙ্গল পাঁড়ে বলে : তুর্যধ্বনি করো। ডাক দাও জনে জনে !···

ভেরীবাদক কান দিলে না সে কথায়, একশত বৎসরের দাসত্বের বিষে জর্জরিত ক্লীব।

এসো ইংরাজ ! ক্ষমতা থাকে সামনে এগিয়ে এসো, থাকে যদি রণে সাধ ! অস্থির পদে মঙ্গল পাঁড়ে সৈনিক নিবাসের সামনে ঘুরে বেড়ায়।

বাকী সব সৈনিকেরা স্তম্ভিত।···চোখের সামনে যেন উম্ঘাটিত হচ্ছে একটা আলোর শিখা।

অদূরে দেখা গেল একজন ইংরাজ অফিসার।

মঙ্গল পাঁড়ের পিস্তল গর্জে উঠল : গুড়ুম !...গুড়ুম !

গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

অল্প দূরে সমস্ত সেপাইরা নির্বাক স্থাণুর মতই দাঁড়িয়ে।

এ শুধু অভাবনীয়ই নয়, অচিন্ত্যনীয়। এতকাল যাদের জন্য তারা রক্তপাত করে এসেছে, অবহেলে দিয়ে এসেছে জীবন, তাদেরই বিরুদ্ধে উন্মুক্ত হলো তীক্ষ্ন খরসান।

কাপুরুষ ! ভীরু মেষশাবক। দাঁড়িয়ে দেখছো কি ? এখনও দাঁড়িয়ে আছো নির্বাক অচল কাঠের পুতুলের মত ? লজ্জা কি নেই তোমাদের, ভুলে গেছো কি রানী ঝিন্দনের নির্বাসন ? পাঞ্জাবের দাসত্ব ? শ্রীমন্ত নানা সাহেবের প্রতি অবিচার ? ভেলোরের রক্তপাত ? রাণী লক্ষ্নীবাঈয়ের অশ্রুমোচন ? অযোধ্যার অপমান ?

শুধু দাঁড়িয়েই তারা ছিল না নির্বাকদর্শী, তাদের মধ্যে একজন হাবিলদার ছুটে গেল এ্যাড্‌জুটেন্ট সাহেব লেঃ বগের কাছে সংবাদ দিতে : সর্বনাশ হয়েছে স্যার। শীঘ্র চলুন, মঙ্গল পাঁড়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

মুহূর্তে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে লেঃ বর্গ সৈনিক নিবাসে এসে উপস্থিত হলো।

কোথায় ? কোথায় সেই বিদ্রোহী সেপাই পাঁড়ে ?

দুড়ুম !...আবার গর্জে ওঠে পাঁড়ের হস্তধৃত পিস্তল।

লক্ষ্য লেঃ বগের শির।

লক্ষভ্রষ্ট হয়ে গুলি বিদ্ধ হলো অশ্বের গায়ে। মৃত্যুযন্ত্রণায় অশ্ব গড়িয়ে পড়ে রক্তাক্ত দেহে, লেঃ বর্গও ভূলুণ্ঠিত।

এবারে লেঃ বর্গ ভূ-শয্যা হতে উঠে উন্মুক্ত তীক্ষ্ন তরবারী হাতে এগিয়ে আসে তার সঙ্গে যোগ দেয় আরো দুজন শ্বেতাঙ্গ।

মঙ্গল পাঁড়ের কোষমুক্ত তীক্ষ্ন অসিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে : এসো থাকে যদি রণসাধ ! রক্তের ঋণ শুধতে হবে !

অসিতে অসিতে যুদ্ধ ! অসি বাজে ঝন্‌ ঝন্‌ !...

অপূর্ব পরিস্থিতি—চারিখানি মুক্ত কৃপাণ রক্তলালসায় ঝিলিক হানছে ; অদূরে চারিপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নির্বাক চারিশত সেপাই।

প্রতাপের রক্ত ! শিবাজীর রক্ত ! ভোলেনি ভারত—ভোলেনি সেকথা। ওঠো জাগো বীর। আবার ক্ষত্রতেজে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠো।

ঋণ শোধের দিন আজ।

চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে মহারাত্রির কালো ছায়া। আসে রাত্রি মহাবিপ্লবের। তারই অগ্নি-ইশারা দিকে দিকে। অগ্ন্যুৎসবের করো আয়োজন।

ভারতের মাটিতে শ্বেতাঙ্গের লাল রক্ত। বিজয়লক্ষ্মী বুঝি পাঁড়ের গলায়ই দুলিয়ে দেন বিজয়মাল্য।

লেঃ বগের শিরের ওপরে পাঁড়ের তীক্ষ্ন অসি নেমে আসে, আর রক্ষা

নেই !···

মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ ! তোমরা কি মরবে না কোন দিন ! কি বিষ ছড়িয়ে গেলে এ দেশের মাটিতে !···এগিয়ে এল ঠিক সেই মুহূর্তেই মীরজাফরের বংশধর, মুসলমান সেপাই সেখ পল্টু। ছুটে এসে দু'হাতে প্রাণ-পণে পাঁড়েকে পশ্চাৎ হতে পল্টু জড়িয়ে ধরে।

ব্যর্থ হলো পাঁড়ের নিশানা।

রণক্লান্ত বীর বন্দী হলো তারই দেশবাসীর দেশদ্রোহিতায় ইংরাজের হাতে।

শেষ চেষ্টা করে বীর প্রাণপণে পল্টুর বাহুবন্ধন হ'তে নিজেকে মুক্ত করতে। পল্টুকেও অস্ত্রাঘাত করতে ত্রুটি করে না।

কিন্তু মীরজাফর ইয়ার লতিফের রক্ত ! তার তেজ তো সহজ নয় !

এদিকে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে সেনাপতি হিয়ার্সে ততক্ষণ দ্রুত ছুটে এসেছে সৈনিক নিবাসে। মঙ্গল পাঁড়ে ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে বলে : ধিক্ ! ভীরু নরাধম, কাপুরুষ ! পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে, বুঝবে একদিন এ দাসত্বের কি পরিণাম !

সহসা আবার পাঁড়ের হাতের পিস্তল গর্জে ওঠে, এবারে লক্ষ্য তার নিজেরই শির।

অভিমানী সৈনিক !···এবারে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছে।

ধোঁয়া···বারুদ···অগ্নি-ইশারা। আহত রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল।

আহত রক্তাপ্লুত বন্দীবীরকে শৃংখলিত করে আনা হলো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য।

এদিকে চলল পাঁড়ের চিকিৎসা, অন্যদিকে বিচার-বিভ্রাট।

শ্বেতঙ্গদের সেই বিচার প্রহসন !

৬ই এপ্রিল। সেপাই মঙ্গল পাঁড়ের বিচার। প্রহসন শেষ হলো।

দণ্ডাদেশ : ফাঁসী !

আসামী তখনও অসুস্থ, রোগকাতর-হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে। ক্ষতস্থান পচে ফুলে উঠেছে। বাঁচবার আশা খুবই কম।

নির্বিকার সৈনিক দণ্ডাদেশ শুনলে, তবু সতীর্থগণের সম্পর্কে একটি কথাও বললে না। আর বেশী দেরি করা উচিত নয়, কে জানে কখন কি হয় !

৮ই এপ্রিল ভোরবেলা সেই অসুস্থ মুমূর্ষু সৈনিককে বারাকপুরের সমুদয় সেপাইদের সামনেই প্রকাশ্যে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে দণ্ডাদেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হলো।

১৮৫৭ এর প্রথম শহীদ স্বাধীনতার পাষাণ-বেদীমূলে দিল ১৮৫৭ এর মহাবিপ্লবের প্রথম রক্তাঞ্জলি !

আর ৩৪ গণিত সিপাহীদের জমাদার ! মঙ্গল পাঁড়ে যখন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক-পুরুষদের আক্রমণ করে জর্জরিত করে তুলেছে, সে-সময়ও জমাদার কোনরূপ সাহায্য না করে নিশ্চেষ্ট থাকার অপরাধে শ্বেতাঙ্গ বিচারপতিরা তাকে মৃত্যুদণ্ডা-দেশ দিল।

২১শে জর্মাদারের ফাঁসী হলো।

সূর্য উঠছে। দিগন্তে তারই রক্ত-ইশারা।

ঐ যে দেখি আকাশ পথে,
সূর্য আসে অগ্নি-রথে।

সূর্যের অগ্নিরথচক্রের ঘর্ষণে ঘর্ষণে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভারতের দিক: হতে দিগন্তে ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে।

সৈনিক নিবাসে নিবাসে অসন্তোষের ইঙ্গিত।

কোথায় বাংলাদেশ, আর কোথায় হাজার মাইল দূরবর্তী সুদূরবিস্তৃত সমুন্নত পর্বতমালার সন্নিহিত ভুখণ্ডে আম্বালা নগর।

এই সেই আম্বালা, যার পূর্বপ্রান্তে ভারতবিখ্যাত সুবিস্তৃত কুরুক্ষেত্র। একদা যেখানে সুদূর অতীতে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সৌভাগ্য রবি অস্তাচলে গিয়েছিল, মহারাষ্ট্রীয়রা যেখানে আপনাদের জম্মভূমির রত্নসিংহাসন-লাভের আশা বিসর্জন দিয়েছিল, সেইখানেই শ্বেতাঙ্গ গভর্ণমেন্টের সৈন্যদের প্রধান আড্ডা ; অসন্তোষের কালো মেঘ সেখানেও ফেললে কালো ছায়া।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকপুরুষ মার্টিনো সেপাইদের অভিনব বন্দুকের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিচ্ছিল।

মার্টিনোর প্রাণ আশঙ্কায় দুলে ওঠে। সে কালবিলম্ব না করে প্রধান সেনাপতিকে সমুদয় ব্যাপার জানাল।

প্রধান সেনাপতি এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিল ; কিন্তু বোঝা গেল, কথায় আজ আর সেপাইরা ভুলবে না। শান্ত পাথরের বুকেও ঘর্ষণে ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুরণ দেখা দিয়েছে। এ আগুন অত সহজে নিভবে না।

রাত্রির পর রাত্রি ইউরোপীয় সৈনিক নিবাস, মালগুদাম, চিকিৎসালয় একে একে অগ্নির করালগ্রাসে ভস্মীভূত হয়ে যায়, কিন্তু কে জ্বালায় আগুন কোন সন্ধানই তার মিলে না!

সময় বহে যায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসের পর মাস। কিন্তু একদা বারাকপুরে যে অগ্নিপ্রশস্তি শুরু হয়েছিল, তা আর যেন কিছুতেই নিভতে চায় না।

বারাকপুর হ'তে রাণীগঞ্জ, রাণীগঞ্জ হ'তে বহরমপুর, সেখান হতে আম্বালা, তারপর মীরাট। মীরাট! ১৮৫৭-এর মহাবিপ্লবের লীলাভূমি মীরাট!

১৮৫৭-এর বিরাট অগ্ন্যুৎসবের প্রথম স্ফুরণ ঐ মীরাটের মাটিতেই।

মীরাটের পোড়া মাটিতেই দীর্ঘ একশত বৎসরের পর প্রথম ব্যাপক রক্ত দিয়ে ঋণশোধ দিতে হয়েছিল এ দেশে ফিরিঙ্গীদের।

মীরাট! স্মৃতিপথে ভেসে উঠছে অনলশিখার রাঙা আলোয় রক্তাভ মীরাট। জনতা পূর্ণ, সৈনিক নিবাস, বাজারের লোকারণ্য, সর্বত্রই এক যোগীপুরুষকে দেখা যাচ্ছে।

হস্তিপৃষ্ঠে চেপে যোগী মীরাটের সর্বত্র বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে চলে।

নগরের শান্তিরক্ষকের দল সন্দিহান হয়ে ওঠে : কে? কে এই যোগী? কি এর উদ্দেশ্য?

সরকার হ'তে আদেশজারী হলো : যেমন করে হোক, বন্দী করো ঐ যোগীকে।

কিন্তু কোথায় সেই যোগী!

সরকারের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে হাওয়ায় যেন গেছে সে মিলিয়ে যাদুমন্ত্রে।

যোগীর সর্বাঙ্গে তখন সৈনিকের বেশ। অসংখ্য সৈনিকের মাঝে সেও একজন। সাধ্য কি তাকে তখন খুঁজে বের করে কেউ!

বিখ্যাত তৃতীয় অশ্বারোহী দল তখন মীরাটে।

২৪শে এপ্রিল প্রকাশ্য ময়দানে সেপাইদের কুচকাওয়াজ হবে এবং সেই কুচকাওয়াজের সময়ই সকলকে নতুন টোটা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে, আদেশ-জারী হয়েছে।

এদিকে ২৩শে এপ্রিল রাত্রি দশটায়।

সেনাপতি তার নিজের কক্ষে বসে। সম্মুখে বেলোয়ারী পাত্রে রঙিন সুরা।

ঘরের বাইরে পদশব্দ শোনা গেল।

: কে?

বৃদ্ধ হাবিলদার হীরা সিং কক্ষে এসে প্রবেশ করে।

: কি সংবাদ হীরা সিং? এত রাত্রে?

: সমস্ত সেপাই নতুন টোটার উপব সন্দিহান হয়ে উঠেছে এবং আপনার আদেশ শোনা অবধি সৈন্যদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

: হুঁ। তারপর?

: আমার মনে হয়—

: কি তোমার মনে হয়?

: আপাতত কাল প্রত্যূষে কুচকাওয়াজের সময় টোটা ব্যবহারের আদেশ স্থগিত রাখলেই বোধহয় ভাল হতো।

: বেশ, আমি এ্যাডজুটেন্টকে লিখে পাঠাচ্ছি। দেখি তিনি কি বলেন!

এ্যাডজুটেন্ট সব কথা শুনে বললেন : ক্ষেপেছো? Order is order! একবার যে আদেশজারী হয়েছে, এখন সে আদেশ প্রত্যাহার করলে সবাই বলবে, ইংরাজরা ভীরু—কাপুরুষ! না, না! আদেশ বলবৎ থাকবে।

এ্যাডজুটেন্টের বলদৃপ্ত আদেশ ব্যর্থ হয়ে গেল পরদিন প্রত্যূষে কুচকাওয়াজের সময় ৯০ জন সেপাইএর মধ্যে হীরা সিং প্রভৃতি পাঁচজন সৈনিক ছাড়া বাকী ৮৫ জন হুকুম সত্বেও টোটা স্পর্শ পর্যন্ত করলো না।

সামরিক আদেশকে তারা অবহেলে লঙ্ঘন করলো। সেদিনকার কুচকাওয়াজের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেল।

তৃতীয় অশ্বারোহী দলের উত্তেজনা অন্যান্য দলের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো।

শুধু কি সেপাইদের মধ্যেই উত্তেজনা! জনসাধারণ হিন্দু-মুসলমানরাও ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের অগ্নি-ইঙ্গিত—ঝিলিক দিয়ে যায় বার বার।

কেবল যে বসা-নির্মিত টোটা তাই নয়; আরো শোনা যাচ্ছে, কোম্পানীর ও মহারানীর আদেশে বাজারের ময়দা ও লবণে নাকি অস্থিচূর্ণ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মোন্মাদ ভারতবাসী! কোম্পানীর আমলে মানসম্ভ্রম প্রতিপত্তি অর্থ সব তো গেছেই, এবারে ধর্মও বুঝি আর থাকে না।

উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে আবার আর এক নূতন ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে।

চাপাটির মধ্যে তারা নাকি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহর হতে শহরে, নগর হতে নগরে চালিয়েছে সৈনিক ও জনসাধারণের মধ্যে পত্রবিনিময় করে বিপ্লবপ্রস্তুতি।

মহারাষ্ট্র-চক্রের অধিনায়ক, পরাক্রমশালী বাজীরাওয়ের উত্তরাধিকারী, নির্যাতিত হৃতসর্বস্ব শ্রীভট্ট শ্রীমন্ত নানা সাহেব তখন স্বীয় রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুরে একান্ত শোচনীয় ভাবে দিনাতিপাত করছেন।

অযোধ্যাধিপতি ওয়াজেদ আলী রাজ্য-সম্মান হতে বিচ্যুত হয়ে কলকাতায় বাস করছেন। ইংরাজের অকথ্য অত্যাচারে নানাসাহেবের বুকের ক্ষতস্থান দিয়ে নিরন্তর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

ভারতের নগরে নগরে এপ্রিল মাসে ভ্রাম্যমাণের বেশে শ্রীমন্ত নানাসাহেব বিপ্লবের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তখন: ভারতবাসী! মুক্তির দিন আগত ঐ! সঙ্ঘবদ্ধ হও! জাগ্রত হও।

নানাসাহেব ঘুরছেন, বিঠুর থেকে কাল্পি, কাল্পি হতে কানপুর, সেখান হতে দিল্লী, দিল্লী থেকে লক্ষ্নৌ! নানাসাহেবের দূতেরাও দেশে দেশে তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

মে মাস এসে গেল।

প্রখর গ্রীষ্ম। মার্তণ্ডদেব যেন অগ্নি ছড়াচ্ছেন।

২৪শে এপ্রিলের কাওয়াজের ময়দানে সামরিক আদেশ লঙ্ঘনকারী তৃতীয় অশ্বারোহী দলের যে ৮৫ জন সৈনিক টোটা স্পর্শ করেনি, ৬ই মে তাদের বিচার শুরু হয়ে ৯ই মে বিচার শেষ হলো।

বিচারে প্রত্যেকের দশ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো।

৯ই মের প্রভাত।

আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে সোনালী বিদ্যুতের অগ্নি-ইসারা। প্রবল বায়ুর হাহাকার।

ঝড়—ঝড় আসবে, তারই অত্যাসন্ন রূঢ় ইঙ্গিত।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে ইংরাজের বিচারে দোষী সেপাইরা ময়দানে এসে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে।

মেঘলা আকাশের কালোছায়া সৈনিকদের মুখেও পড়েছে।

অদূরে সজ্জিত অগ্নিবর্ষী কামানশ্রেণী। কামানের সামনে গোরা সৈনিকরা আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, যদি কোন বিদ্রোহী দণ্ডাদেশের সময় গোলযোগ

করে, তবে মুহূর্তে কামান দাগিয়ে সব উড়িয়ে দেওয়া হবে।

সামরিক সাজে সজ্জিত সেনাপতি হিউইট ময়দানে এসে প্রবেশ করল।

গুরুগম্ভীর স্বরে সেনাপতির দণ্ডাদেশ-লিপি পাঠের পর, দণ্ডানুযায়ী একে একে সমস্ত বিদ্রোহী সেপাইয়ের সামরিক পরিচ্ছদ খুলে নেওয়া হলো এবং ধীরে প্রত্যেককে শৃংখলিত করা হলো।

কুইক মার্চ!

বন্দীরা সারিবদ্ধ ভাবে কারাগারের দিকে এগিয়ে চলে।

হাতপায়ের শৃংখল ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজে।

মীরাটে যখন চলছে এই নাটকের অনুষ্ঠান, সুদূর বাংলায় বারাকপুরেও চলেছে আর এক বিচার-প্রহসন।

মঙ্গল পাঁড়ের অসুস্থ রুগ্ণ দেহ ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে বিচার শুরু হলো বাকী সব সেপাইদের—যারা ঐদিন রাত্রে মঙ্গল পাঁড়েকে গুলি ছুঁড়তে দেখেও ইংরাজ-পুঙ্গবদের সাহায্য না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের!

২রা মে বাকী সেপাইরা নিরস্ত্র হয়ে সৈন্যশ্রেণী থেকে বিতাড়িত হলো।

বিতাড়িত সৈন্যদল অযোধ্যায় এসে হাজির হয়।

বুকের মধ্যে জ্বলছে তাদের অপমানের তুষানল ধিকি ধিকি।

দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ।

প্রতিহিংসা চাই। এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ চাই।

অযোধ্যার একদল সৈনিকও টোটা স্পর্শ করতে অসম্মত। আবার সেই নিরস্ত্রীকরণের প্রহসন।

চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

জগৎ স্বপ্নময়।

কাওয়াজের ময়দানে সমস্ত সৈনিক সেনাপতির আদেশে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। অদূরে আগের মতই শ্রেণীবদ্ধ অগ্নি-উদ্গারী কামান ও প্রস্তুত গোরা সৈন্য।

বুঝতে আর কিছুই কারো বাকী থাকে না, কেন এই গভীর চন্দ্রালোকিত রাত্রে সেপাইদের ঘুম ভাঙিয়ে সবাইকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে।

হঠাৎ একটা কামানে আগুন জ্বলে উঠল।

সর্বনাশ! দেখতে দেখতে ভীত ত্রস্ত সেপাইরা প্রাণভয়ে অনেকেই ময়দান হতে ছুটে পালায়।

সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সৈন্য পলাতকদের অনুসরণ করে।

বাকী সৈন্যরা সেনাপতির আদেশে অস্ত্রত্যাগ করে ভূমিতে রাখল।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

রজতশুভ্র কিরণজালে ধরিত্রী স্বপ্নময়ী।

পলাতকদের অনেকেই ক্রমে ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হলো।

ইংরাজের নিরস্ত্রীকরণ মহোৎসব শেষ না হতে-হতেই রুদ্র ভৈরবের প্রলয়-ডমরু বেজে ওঠে গুরু গুরু তালে।

ইংরাজের গৃহে গৃহে নিশ্চিন্ত বিশ্রম্ভালাপ। বেলোয়ারী কাচের স্বপ্নালু আওয়াজ ; আর কারাগৃহের বাইরে যেসব সেপাই রয়ে গেল তাদের প্রাণে জ্বলছে তখন আগুন।

এবং সে আগুন বেশিক্ষণ চাপা রইলো কি ?…

চিন্তা একটার পর একটা এসে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করে ফেলে : তাদের চোখের সামনে প্রভাতে যে নাটক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, কে বলতে পারে তাদের ভাগ্যেও কাল সেই নাটকের পুনরনুষ্ঠান হবে কিনা !

গোপনে গোপনে বসল পরামর্শ-সভা।

কারো চোখেই নিদ্রা নেই।

রাত্রি-অবসান। প্রভাত হয়েছে। সূর্য-সারথির অগ্নিরথের চূড়া দেখা যায় ঐ পূর্ব গগনে রক্তরাঙা।

ক্রমে বেলা বাড়ে, মে মাসের প্রখর সূর্য কিরণে পৃথিবী ঝলসে যায়।

কোন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর ঘরেই দেশীয় ভৃত্যরা কাজে আসেনি আজ। ব্যাপার কি ?

যা হোক, বেলা আরো গড়িয়ে যায়।

সহসা ইংরাজদের এতক্ষণে যেন চমক্ ভাঙে। চারিদিকে কেমন একটা বিশ্রী থম্‌থমে ভাব।

কি একটা ভয়ঙ্কর যে ঘটবে তারই সুস্পষ্ট আভাস।

ধীরে ধীরে দিনমণি অস্তাচলে গেলেন।

বেলা ৫টা হবে।

দণ্ডিত তৃতীয় অশ্বারোহী দলের বাকী সৈন্যরা সবাই অশ্বপৃষ্ঠে চেপে অশ্বপৃষ্ঠে চাবুক হানে।

শিক্ষিত অশ্ব ছুটে চলে ঝড়ের বেগে। মীরাটের পথের ধূলি ওড়ে।

অশ্বারোহী সৈন্যরা কারাগারের লৌহকপাটের সামনে এসে বেগবান্ অশ্বের বল্গা টেনে ধরে। আদেশ উচ্চারিত হয় কঠিন কণ্ঠে : খোল দ্বার ! ইংরাজের কারাগার চূর্ণবিচূর্ণ করে। মুক্ত করো বন্দীদের। অত্যাচারের অবসান হোক্।

ব্রিটিশের পাথরে গড়ে তোলা কারাগারের লৌহকপাট ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে গেল।

ভেঙেছ দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।

এতটুকু দুশ্চিন্তা, এতটুকু ভীতি বা এতটুকু নেই আশঙ্কা।

বন্দীরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, এ কি স্বপ্ন না সত্যি !

অশ্বারোহীদের সঙ্গেই ছিল একজন কর্মকার। দলপতির আদেশে কর্মকার ছেণী ও হাতুড়ির আঘাতে দেখতে দেখতে বন্দীদের হাতের ও পায়ের লৌহশৃঙ্খলগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

কিছুক্ষণ পরে অশ্বারোহী দল ফিরে গেছে, বন্দীরাও বিজয়-উল্লাসে করেছে তাদের অনুসরণ।

শূন্য কারাকক্ষ।

শুধু ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত লৌহশৃংখলের ভাঙা টুকরোগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে দীর্ঘ একশত বৎসরের নির্মম অত্যাচারের।

গোধূলির ম্লান আলোয় মীরাট রহস্যঘন হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা আসে ঐ।

কর্নেল ফিনিস অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে ছুটে এলেন সৈনিকনিবাসে। এখনও হয়তো সময় আছে, উপদেশ ও মিষ্টি কথায় বোকা ভারতীয় সেপাইদের হয়তো শান্ত করা গেলেও যেতে পারে চিরকালের মতই।

মুহূর্তে তার সে স্বপ্ন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। বিদ্রোহী সেনানায়কের হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠলো : গুড়ুম!… …

সেই গুলির আঘাতে অশ্ব লুটিয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে চারিদিক হতে অনলশিখা ছুটে এল। শতেক বন্দুক এক সঙ্গে তীব্র গর্জন করে ওঠে : গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুড়ুম্!…

শ্বেতাঙ্গ সেনাপতির দেহ গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রক্ত! লাল রক্ত! সিরাজের রক্ত! মিরকাশেমের রক্ত! মহারাজ নন্দকুমারের রক্ত! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই!

দলে দলে সৈন্যরা এসে সব মিলিত হয় একত্রে।

আগুন! আগুন জ্বলেছে মীরাটে।

১৮৫৭এর মহাযজ্ঞের আকাশচুম্বী লেলিহান অগ্নিশিখা।

অনুকূল বায়ুপ্রবাহে দিকে দিকে ছড়িয়ে যায় সেই সর্বধ্বংসী অগ্নিশিক্ষা—অগ্নিসংস্কার!

হাওয়ার বেগে বিদ্রোহের সংবাদ মীরাটের সর্বত্র মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রধান সেনাপতি শ্বেতাঙ্গ কর্নেল স্মাইথ কোথায় লুকিয়েছে প্রাণভয়ে কে জানে! ক্রমে রাত্রি গভীর হয়।

যেদিকে তাকাই শুধু আগুন আর আগুন।

উন্মত্ত সৈনিকের বিজয়-উল্লাস। রাজপথে লোক নাহি ধরে।

ক্যাপ্টেন ক্রেগী ছুটে এলো। নিজের দলের অধীনস্থ সৈনিকদের আদেশ দিল : শীঘ্র অস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে চল।

অনেকেই সে আদেশ শিরোধার্য করে নেয়।

: শীঘ্র চল। মুক্ত কয়েদীদের আবার বন্দী করতে হবে।

অদূরে শোনা যায় শতকণ্ঠে বিজয়-উল্লাস।

অশ্বক্ষুরের ঘর্ষণে মীরাটের পথের ধূলি উড়ছে।

: চলো! চলো! দিল্লী চলো!

বেগবান-অশ্বারূঢ় হয়ে বন্দীরা তখন দিল্লীর পথে ছুটে চলেছে।

দিল্লী! ভারতের রাজধানী দিল্লী!…

সভয়ে ক্রেগী পথ হ'তে সরে দাঁড়ায়।

এখন কি কর্তব্য ?

ফিরে চল আবার সৈনিকনিবাসে।

ক্রেগী ফিরে চলে।

বাজার, জনপথ সর্বত্র সৈনিকরা বিজয়-উল্লাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চারিদিকে চলেছে ফিরিঙ্গীর ধ্বংসযজ্ঞ।

পুরুষ বা রমণী বা শিশু কেউ বাদ নেই। বন্দুকের গুলিতে কেউ দেয় প্রাণ—তীক্ষ্ণ অসিমুখে কারও দেহ খণ্ডে খণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে।

রক্তে মীরাটের ধূলি রাঙা হয়ে যায়। অবাধে হত্যা, অবাধে লুণ্ঠন, অবাধে অগ্নিসংযোগ। চারিদিকে আহত ও মুমূর্ষুর আর্তনাদ।

আগুন ও ধূমে আকাশ ও বাতাস আচ্ছন্ন।

সেপাইদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে নগরবাসী।

মীরাট জ্বলতে থাকুক।

পাঁচ

আমরা এগিয়ে চলি দিল্লীর পথে।

চল দিল্লী। দিল্লী চলে হাম। দিল্লী অনেক দূর। সত্যিই কি দিল্লী তখনও অনেক দূর!

দিল্লী! হিন্দু-রাজচক্রবর্তী বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের প্রিয় নিকেতন। মুঘোল সম্রাট আকবরের প্রমোদভূমি। আজ সেই দিল্লী ব্রিটিশ শক্তির নিষ্পেষণে অন্ধকারে অশ্রুমোচন করছে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হতেই দিল্লীর মুঘল অধিপতি সম্পত্তিচ্যুত, ক্ষমতাচ্যুত, ব্রিটিশশক্তির পদানত।

কিন্তু তখনো দেশবাসী ভোলেনি—আকবরের সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, শাহজাহানের অপূর্ব শাসনপরিচালনা, আলমগীর বাদশার প্রভুত্ব!

পূর্বপুরুষের সেই অনমনীয়তা আজ ওদের রক্তে দিয়েছে ডাক।

তৈমুরের উত্তরাধিকারী, তৈমুরের বংশজ বৃদ্ধ আব্দুল মুজাফর সিরাজুদ্দিন মহম্মদ বাহাদুর শাহ নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাট। ইংরাজের বৃত্তিভোগী, শত লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত, দুঃখে দৈন্যে হতশ্রী।

হায় রে! যাদের অঙ্গুলিহেলনে একদা আসমুদ্র হিমালয় ভারতভূমি নত হয়ে চালিত হয়েছে, যাদের দরবারে সেদিনও ইংরাজ বণিককে নিঃশব্দে, নগ্নপদে নত হয়ে সেলাম দিতে দিতে প্রবেশ করে, দূর হ'তে নজরানা দিয়ে তবে বক্তব্য পেশ করতে হয়েছে, সেই ভূলোকবিশ্রুত ময়ূরসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, যাদের অতুল বৈভব ও ঐশ্বর্যের এই বিচিত্র সাতরঙা বেলোয়ারি ঝাড়ের ও সুবর্ণপাত্রে ফেনিল দ্রাক্ষাসুরার বুদ্বুদে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, যারা অবহেলে মুঠো মুঠো সোনা দীনদুঃখী-দরিদ্রদের মধ্যে জনে জনে বিলিয়েছে, আজ কিনা তাদেরই

বংশধরকে ইংরাজের দেওয়া মাত্র দশ লক্ষ টাকা ভিক্ষার দয়ায় ক্ষুধার অন্ন সংস্থান করতে হচ্ছে!

কোম্পানীর রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর গৌরবরবি অস্তাচলমুখী হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে।

বেশী দিনের কথা তো নয়। তাই বুঝি ১৮৫৭এর রক্তিম আকাশপটে অতীত গৌরবের লুপ্ত ছবিখানি মুক্তিকামী বীর শহীদের চোখের সম্মুখে বার বার সকরুণ রেখায় ফুটে উঠেছিল।

আবার যদি উল্টে যাই শ্বেতাঙ্গদের এদেশে আধিপত্য-বিস্তারের সেই কলঙ্কিত রক্তাক্ত অতীত ইতিহাসের পাতাগুলো: মারাঠাদের পরাজয় ও ফরাসীদের ক্ষমতানাশের নববলে বলীয়ান ইংরাজ। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আর কোন ভয়ই নেই। ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গকে একে একে ঘোর ষড়যন্ত্র করে মুকুটহীন, হৃতসর্বস্ব ও শ্রীহীন ভুলুণ্ঠিত করা হয়েছে। এবারে তাদের শ্যেনদৃষ্টি গিয়ে পড়ে দিল্লীর মুঘল সম্রাটের ওপরে।

এই বিজয়-উৎসবের দিন আবার দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের আধিপত্য কেন থাকে? কেন তার নামে আজ টাকা প্রস্তুত হবে? কেন তার নামে দিতে হবে 'খেলাত'? কেন বের হবে তার নামে 'ফর্মান'? কেন দিতে হবে তার সম্মানার্থে 'নজরানা'? প্রাচীনের এইসব নিদর্শন, অহেতুক আনুগত্য-স্বীকার, এ যে অসহ্য! শ্বেতদ্বীপের মানুষ আমরা। আমরাই যখন এদের প্রভু—। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট বললে: করবো না আর দিল্লীর সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার।

দিল্লীর মসনদে তখন আসীন বৃদ্ধ আকবর শাহ।

তবে হাঁ, এসব আনুগত্য-স্বীকার আমরা করবো না বটে, তবে তার বিনিময়ে আপনাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেব ঘুষ।

সেদিন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লর্ড লেক ও ওয়েলেসলী যখন জরাজীর্ণ অন্ধ বৃদ্ধ দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দের হাত হ'তে মুক্ত করে নিজেদের বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেললে, প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই দিল্লীর শেষ স্বাধীন সম্রাটের গৌরবরবি অস্তমিত হয়েছিল। দিল্লীও ইংরাজের রাজ্য-লালসার যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দিয়েছিল সেইদিনই।

চতুর ইংরাজ, লোকের সামনে বৃদ্ধ শাহ আলমকে কোন অসম্মান সেদিন প্রদর্শন করলো না বটে, তবে শাহ আলমের বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ড ও সম্পত্তি গ্রাস করে মহারাষ্ট্রীয়গণের নির্ধারিত সম্পত্তি ও বৃত্তিই বহাল রাখল। বৃত্তি মাত্র দশ লক্ষ মুদ্রা।

অন্ধ সম্রাট শাহ আলম ছিলেন কবি। বুকের রক্ত দিয়ে যে কবিতা সেদিন তিনি রচনা করে গেছেন, চিরদিন লোকে তা স্মরণ করবে।

সম্রাটকে বৃত্তিভোগী করেও ইংরাজের আশ মেটে নি, তাই তাঁকে দিল্লী থেকে সুদূর মুঙ্গেরে অপসারিত করবার প্রচেষ্টা ইংরাজ বণিক শুরু করলে।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অন্ধ সম্রাট মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন।

শাহ্ আলমের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র আকবর শাহ।

১৮২৭, মে—সম্রাটের আনুগত্য-স্বীকারে অসম্মতি জানাল কোম্পানী। মাত্র পাঁচ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে সম্রাটকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হলো।

১৮২২এ প্রধান সেনাপতি সম্রাটকে 'নজরানা' দেওয়া বন্ধ করলে।

একে একে আরো নিয়ম-কানুন হলো : সম্রাট দিল্লীর বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না।

দিল্লীর রাজকুমারদের জন্য সম্মানসূচক তোপধ্বনিও হবে না। রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে রাজকুমাররা দিল্লী হ'তে কোন জায়গায় যেতে পারবে না।

১৮৩৬এর আগে ১৮৩৫এই দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'র শেষ প্রভাব চুর্ণ করা হলো—দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রার পরিবর্তে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কোম্পানীর মুদ্রার প্রচলনে।

যাঁদের পূর্বপুরুষেরা একদিন শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ভারতের মাটিতে বিদেশী অতিথি বলে আশ্রয় দিয়েছেন, যাঁদের পূর্বপুরুষদের সৌজন্যেই বণিক কোম্পানী সাত সমুদ্র তের নদীর পার হ'তে এসেও অজ্ঞাতাকুশলীল বাংলায় আপনাদের ব্যবসা চালাবার সুবিধা পেয়েছে, এবং যাঁরা পিতা বণিক কোম্পানীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন, আজ তিনিই এখন বণিক কোম্পানীর বিচারে ক্ষমতাশূন্য, প্রভুত্বশূন্য ও রাজলক্ষ্মীশূন্য! সামান্য দয়ার বৃত্তিভোগী।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে আকবর শাহের মৃত্যুর পর যখন পুত্র বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসলেন, রাজলক্ষ্মী তখন বিদায় নিয়েছেন দিল্লীর প্রাসাদ হতে।

ইংরাজদত্ত সামান্য বৃত্তিতে ভরণপোষণ চলে না, এবং তার জন্য সম্রাটের ইংরাজের কাছে সাশ্রু আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে!

তাঁর আবেদন নিয়ে তাঁরই দেওয়া 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত রাজা রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে গিয়েও কোন লাভ হলো না।

তারপরে আবার শুরু হলো শ্রীহীন ভুলুণ্ঠিত মুঘোল সিংহাসন নিয়ে টানাটানি।

বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট আবার অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী পূর্ণ যুবতী জিন্নত মহলের পাণিপীড়ন করলেন। শুধু যে অপূর্ব রূপবতীই ছিলেন জিন্নত তা নয়, প্রখর বুদ্ধিশালিনী ও তেজস্বিনী ছিলেন সেই রাজমহিষী।

বৃদ্ধ সম্রাট যুবতী নারীর ক্রীড়নক।

জিন্নত চান তাঁর প্রিয়তম পুত্র জোয়ান্ বখত পূর্বপুরুষদের সিংহাসনের অধিকারী হয়।

১৮৪৯এ সিংহাসনের প্রকৃত পক্ষে উত্তরাধিকারী রাজকুমার দারা বখ্তের মৃত্যু যখন হলো, সম্রাটের বয়স তখন সত্তর বৎসর—জরাজীর্ণ মৃত্যুপথযাত্রী।

আবার সেই মহামান্য গবর্নর বাহাদুর—লর্ড ডালহৌসী!

মনে পড়ছে কি সেই লর্ড ডালহৌসীকে?

সেতারা, ঝাঁসী, কেরৌলী, অযোধ্যা ও মহারাষ্ট্রের বুকে যে জঘন্য নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তারই প্রধান নায়ক। অত্যাচার ও অন্যায়ানুষ্ঠানের মেঘনাদ লর্ড ডালহৌসী। দারা বখ্‌তের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ডালহৌসীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধিত দৃষ্টি লেলিহ হয়ে ওঠে : এই সুযোগ! আগে একবার যখন তিনি দিল্লীশ্বরের সমস্ত রাজকীয় সম্মান বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর সাধে বাদ সেধেছিল বিলাতের ডিরেক্‌টার-সভার সভ্যরা। কিন্তু এতদিনে বুঝি সত্যিই সে সুবর্ণ-সুযোগ এল।

এবারেও ডিরেক্‌টার-সভার সভ্যরা সমস্ত বিবরণ জানতে চাইল।

লর্ড ডালহৌসীও ইতস্তত করছে, কারণ দারা বখ্‌তের মৃত্যু হলেও রাজকুমার ফকরউদ্দীন আছে জীবিত।

এবং ফকরউদ্দীন ইংরাজ-পদলেহী কুকুর বলে ইংরাজের প্রিয়পাত্রও।

একে যদি দিল্লীর মসনদে বসানো যায় তবে লর্ড ডালহৌসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। মূর্খ প্রসাদতুষ্ট হীনবীর্য যুবককে মুঠোর মধ্যে রেখে অনায়াসেই শেষ প্রভুশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করা যাবে। তা ছাড়া দিল্লীর প্রভুশক্তিকে উৎখাত করে যদি তৈমুরের বংশধরদের দিল্লীর রাজপ্রাসাদ হতে বিতাড়িত করা যায়, তা হলে দিল্লীর প্রাসাদকে উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করা যাবে।

এবারে বিলাতের ডিরেক্‌টারদের মধ্যে অনেকেই ডালহৌসীর প্রস্তাব সমর্থন করলে।

১৮৫০এ তারা ডালহৌসীর নিকট তাদের ক্ষমতালিপি প্রেরণ করে।

কিন্তু লর্ড ডালহৌসী কেন জানি না ডিরেক্‌টারদের আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও পূর্বসংকল্পানুযায়ী কাজ করতে ইতস্তত করতে লাগল।

এই গোলযোগের সময়ই বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ সুন্দরী স্ত্রী জিন্নতের অনুরোধে ফকরউদ্দীনকে অপসারিত করে জিন্নতের গর্ভজাত একাদশবর্ষীয় বালক জোয়ান বখত্‌কেই সিংহাসনে বসাতে সংকল্প করেন। ইংরাজ প্রতিনিধিকে লর্ড ডালহৌসী সেকথা জানায়ও।

ডালহৌসী কিন্তু কোন চূড়ান্ত আদেশই দিলে না।

কেবল সুযোগের প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করতে লাগলো।

কারণ তখনও তার ইচ্ছা ফকরউদ্দীনকেই সিংহাসনে বসিয়ে দিল্লীর প্রভুশক্তির মূলে শেষ কুঠারাঘাত করতে হবে।

যা'হোক শেষ পর্যন্ত অনেক আলোচনার পর স্থির হয়, দিল্লীর বর্তমান ভূপতির মৃত্যু পর্যন্ত উপস্থিত বিষয়ে কিছু করা হবে না। সম্রাটের মৃত্যু হলে ফকরউদ্দীনকেই সিংহাসনে বসানো হবে। তবে যেহেতু ফকরউদ্দীনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, সেই সুযোগে কোম্পানীর অভীষ্টসিদ্ধিলাভের উপায় খুঁজে নিতে হবে। সিংহাসন সে পাবে বটে, তবে বর্তমান রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে

কুতবে গিয়ে বাসের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ'তে হবে, আবশ্যক হলে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু অতিরিক্ত বৃত্তিরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিলাতের কর্তৃপক্ষের এই অপূর্ব মীমাংসায় মহামান্য গবর্নর জেনারেল বাহাদুর লর্ড ডালহৌসী নিশ্চিন্ত হলো।

অবিলম্বে দিল্লীর এজেন্ট স্যার টমাসকে গোপনে দিল্লীর প্রাসাদে ফকর-উদ্দীনের কাছে ডালহৌসী এই প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করলে।

ইংরাজের উচ্ছিষ্টলোভী মেরুদণ্ডহীন ফকরউদ্দীন ইংরাজের এই জঘন্য প্রস্তাবেও সম্মত হ'তে এতটুকু দ্বিধাবোধ তো করলোই না, অঙ্গীকারপত্রেও স্বাক্ষর করে দিয়ে এল।

অভিশপ্ত মুঘল সিংহাসন!

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পথেই ফকরউদ্দীনের হৃদয় উদ্বেলিত হতে থাকে অজানিত এক আশংকায়।

শেষ পর্যন্ত সিংহাসনের লোভে তাকে তার পিতৃপুরুষের লীলা-নিকেতন সহস্র সুখৈশ্বর্যের স্মৃতিবিজড়িত আবাল্যের বাসভূমি থেকে নির্বাসিত হতে হবে!

হায়! একি অঙ্গীকার সে করে এল?

অনুতপ্ত হলেও ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত আজ আর তার সেই ক্ষমতা কোথায়! দীর্ঘকাল ব্রিটিশের এই হীন চক্রান্ত সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীর নিকট গোপন রইলো না। যুগপৎ ক্ষোভে, অপমানে ও অন্তরের গূঢ় বেদনার হোমানলে অশেষবুদ্ধিশালিনী জিন্নত মহল দিল্লীর অবশ্যম্ভাবী পতনের বিভীষিকা দেখতে লাগলেন।

তিনি বুঝেছিলেন, দিল্লীর শেষ আশার আলোটুকুও যে ঐ মুহূর্তে নির্বাপিত হয়ে যাবে, এ তারই সর্বনাশা ইঙ্গিত!

পাশার দান উল্টে গেল : ১৮৫৬এর জুলাই মাস।

সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া ধরিত্রীর বুকে নেমে এসেছে।

দিল্লীর প্রাসাদ।

ক্ষুধার্ত রাজকুমার ফকরউদ্দীন নাস্তা করবেন, ভৃত্য কিছু রুটি ও তরকারী নিয়ে এল সুদৃশ্য পাত্রে।

কিছুটা আহার করবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজকুমার বমি করতে শুরু করলেন।

শীঘ্রই অনবরত বমি করে করে হয়ে পড়লেন অত্যন্ত দুর্বল।

রাজকুমার অসুস্থ! হাকিম আসানুল্লা এলো।

বেলা ৬টার সময় সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ফকরউদ্দীন অন্তিম নিঃশ্বাস নিলেন।

দিল্লীর প্রাসাদে ক্রন্দনের রোল উঠল।

হায় অভিশপ্ত মুঘল সিংহাসন!

জিন্নত মহল এবারে আবার নিজের অভীষ্ট সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন।

লর্ড ডালহৌসী তখন ভারত হতে বিদায় নিয়েছে, তার বদলে নতুন গবর্ণর জেনারেল এসেছে লর্ড ক্যানিং।

এদিকে দিল্লীর সিংহাসনের আর একজন দাবীদার দেখা দিল, বাহাদুর শাহের আর এক পুত্র মির্জা কোরেস।

লর্ড ক্যানিংও কম যায় না। তার কাছে যখন দিল্লীর রাজবংশের ব্যাপার উপস্থিত করা হলো, সে তার পূর্ববর্তী ডালহৌসীর মতেরই অনুমোদন করলে।

শীঘ্রই দিল্লীর ব্রিটিশ এজেন্ট মেট্‌কাফ্‌কে গবর্ণর জেনারেল ক্যানিং এক বিরাট উপদেশলিপি দিয়ে পাঠাল। অনেক কথাই তাতে ছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছেঃ গবর্ণর জেনারেল জোয়ান বখ্‌তকে রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে রাজী নয়। ফকরউদ্দীনের সঙ্গে যে ভাবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল ব্রিটিশ শক্তির, মির্জা মহম্মদ কোরেস যদি সেসব মেনে নিতে রাজী থাকে, তবে ব্রিটিশ প্রভু মির্জার উত্তরাধিকারের দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত আছে। তবে হ্যাঁ, উত্তরাধিকারী সে হবে বটে, তবে তার উপাধি আর 'রাজা' থাকবে না— তার উপাধি হবে 'শাহ্‌জাদা'। এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আগে হতে এ সম্পর্কে কোন অঙ্গীকারপত্র দিতে রাজী নয়। আরো কত কি!···

কুক্কুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন!
খদ্যোত হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার!

লর্ড ক্যানিংয়ের দোষ কি! যে আসে লংকায় সে-ই হয়ে যায় রাক্ষস! এই তো প্রবাদ! জিন্নত মহলের বুকের মধ্যে আবার আগুন জ্বলে দ্বিগুণতর হয়ে।

অপমানের বিষে জর্জরিত হয়ে তেজস্বিনী নারী সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহের মত তখনও তিনি নির্বিষ হয়ে পড়েন নি।

যৌবনের খর রক্তপ্রবাহ তখনও তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত।

জোয়ান বখ্‌ত আর বালক নেই আজ। যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তেজস্বিনী মাতার রক্ত তাঁরও শরীরে প্রবাহিত। জ্ঞানে, শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল। অবিমিশ্র ঘৃণা ও বিদ্বেষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁর চক্ষুশূল হয়ে উঠল।

যে প্রাচীন রাজবংশ একদা সুদূর অতীতে আফগানিস্থানের বন্ধুর পার্বত্য প্রদেশ হ'তে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত স্বীয় অসিমুখে আধিপত্য বিস্তার করেছে, একদা যে প্রভুশক্তির পাদমূলে ভারতের অসংখ্য জনগণ ভয়ে ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছে, আজ সেই দীর্ঘদিনের রাজকীয় উপাধি লোপের ষড়যন্ত্রের সংবাদ জনসাধারণের কাছে আর গোপন রইল না।

জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল বিক্ষোভের আগুন।

১৮৫৭এর মহাযজ্ঞের প্রস্তুতির এও একটি স্ফুলিঙ্গ।

ক্রমে দিল্লীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই স্ফুলিঙ্গ বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সেখানেও জনরব। ইংরাজের একশত বৎসরের রাজত্ব শেষ হয়েছে।

বাজারে, সৈনিকনিবাসে, লোকালয়ে, মহাজনের দোকানে দোকানে কানাকানি ফিস্‌-ফিস্‌। ইংরাজ রাজত্বের শেষ হলো ভারতের! আর বেশীদিন নেই!

আবার ইসলাম-ধর্মাবলম্বীগণ পুনরায় নিজেদের ক্ষমতা ফিরে পাবে।

অনেক দূরে চলে এসেছি।

১০ই মের সেই মহাবিপ্লবের রাত্রে প্রজ্বলিত মীরাট শহরের পথে ব্রেগীর পাশে দাঁড়িয়ে দেখে এসেছিলাম, তৃতীয় অশ্বারোহী দল বায়ুবেগে দিল্লী-অভিমুখে ছুটে চলেছে।

বহু বেগবান অশ্বের লৌহক্ষুরের উৎক্ষিপ্ত ধূলারাশিতে মীরাটের রাস্তা অন্ধকার হয়ে গেল।

চন্দ্রালোকিত নিশীথিনী; পৃথিবী স্বপ্নময়ী।...

ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে দিল্লীর পথে বেগমান অশ্ব, পশ্চাতে পড়ে রইলো প্রজ্বলিত ধূম্রাচ্ছন্ন আর্ত কোলাহলে মুখরিত মীরাট শহর। জ্বলছে মীরাট জ্বলুক, আমরা এগিয়ে চলি। সারাটা রাত্রি ধরে অশ্বারোহীর দল ছুটে চলে। পশ্চাতে পড়ে রইলো কত গ্রাম, কত লোকালয়, কত প্রান্তর। ঘর্মাক্ত অশ্ব—মুখে ফেনা গড়িয়ে পড়ে।

ধূলায় ধূসরিত অশ্বোরোহীর দল। তবু চলার বিরাম নেই। শ্রান্তি নেই, নেই কোন ক্লান্তি।...

রাতের অন্ধকার ফিকে তরল হয়ে আসে। আকাশের প্রান্তে শুকতারা নেভেনি এখনো।

পূর্বাকাশে সূর্যসারথির রক্তাক্ত ইসারা।

ঐ—ঐ দেখা যায় দিল্লী!

নবীন সূর্য্যালোকে দীর্ঘ একশত বৎসর পরে দিল্লী মহানগরী যেন ওদের চোখে নতুন করে জেগে ওঠে।

দিল্লী! তাদের চিরপ্রিয় সম্রাটের রাজধানী দিল্লী!

সূর্যকরোজ্জ্বলা নীল যমুনার তটে মুঘল সম্রাটের রাজধানী দিল্লী, আজ যেন ওদের কাছে বহন করে নিয়ে এল নতুন বাণী!

আনন্দে উত্তেজনায় অশ্বারোহীর দল মিলিতকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে: দিল্লী! দিল্লী!...দিল্লীর যে অংশ যমুনার দিকে, সেখানে একটি নৌসেতু। ঐ সেতুর একদিকে সেলিমগড়, অন্যদিকে মীরাট যাওয়ার পথ। লোহিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত দিল্লীর এগারটি প্রধান প্রবেশদ্বার। যেদিকে যমুনা প্রবাহিত সেই-দিকে তিনটি, আর অন্য দিকে আটটি প্রবেশদ্বার।

সম্রাটের বাসভবন নগরের প্রান্তভাগে যমুনার কূলে।

বেলা আটটার সময় মীরাট হ'তে আগত অশ্বারোহীর দল যমুনার নৌসেতু পার হলো।

টোলঘাটের শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষকে উন্মুক্ত অসির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে, টোল-ঘরে আগুন লাগিয়ে, এসে দাঁড়াল লোহিত-প্রাচীরের সম্মুখে।

"দিল্লী প্রাসাদকূটে
হোথা বার-বার বাদশাহজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে
নিবিড় নিশীথ টুটে
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে ॥"

বাঁধভাঙা বন্যার মত ভেসে আসে উন্মত্ত কোলাহল।

"মত্ত মঘল রক্ত-পাগল
'দীন্ দীন্' গরজনে!"

বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ সচকিতে উঠে বসেন: কিসের এ কোলাহল?

ভীত সন্ত্রস্ত সম্রাট বাতায়ন-পথে চেয়ে দেখেন: প্রাসাদের লৌহ-ফটকের সামনে অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। হাতে তাদের উন্মুক্ত তীক্ষ্ন অসি নবীন সূর্যের নবীন আলোয় ঝিলমিল করে। সম্রাট বাহাদুর শা'র জয়! শত কণ্ঠের মিলিত চিৎকার।

কা'রা চিৎকার করে বলছে: ব্রিটিশ রাজ্যের অবসান হয়েছে! মীরাটে সমস্ত শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করেছি আমরা, এবারে অনুমতি দিন্ সম্রাট, আমরা নগরে প্রবেশ করে সমস্ত ফিরিঙ্গীকে হত্যা করে আপনাকে বাদশাহের পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি।

বিচলিত সম্রাট তাড়াতাড়ি প্রাসাদ-সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডগলাস্‌কে ডেকে পাঠালেন। প্রাণভয়ে ভীত ক্যাপ্টেন ডগলাস্ কাঁপতে কাঁপতে সম্রাট-সকাশে এসে হাজির হলো। 'আদেশ দিন আমি এখুনি একবার নীচে যাই, উত্তেজিত সৈনিকদের ফিরে যেতে বলি!' 'সর্বনাশ! ও কাজও করবেন না। আপনাকে সামনে পেলে ওরা কুকুরের মত গুলি করে মারবে।' এদিকে অশ্বারোহী দলের পিছু পিছু অনেক পদাতিক সৈন্য মীরাট হতে দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল, তারাও এসে দিল্লীতে পেঁাছে দিল্লীর অন্যান্য প্রবেশদ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করবার জন্য চেষ্টা করছে। দূর হতে তাদের কোলাহল শোনা যায় সমুদ্র-কল্লোলের মত। দিল্লীর অন্যতম প্রবেশ-পথ কলিকাতা-দরোয়াজা গোরা ও অন্যান্য দেশীয় সৈন্যরা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে ধাবিত হয়েছে রাজঘাট-দরোয়াজের দিকে।

সেখানকার মুসলমান দ্বাররক্ষীরা দ্বার খুলে দিল।

উন্মত্ত মুক্তিপিপাসু সৈনিকের দল প্রবেশ করল নগরে।

অবাধে শুরু হলো দিল্লীর পথে পথে গৃহে গৃহে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি-সংযোগ।

১০ই মে মীরাটে যে আগুন জ্বলেছিল, দেখতে দেখতে মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধানে ১১ই মে দিল্লীতেও ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড লেলিহান শিখায় সেই দাবাগ্নি।

মীরাট হতে আগত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদলের পাশে এসে দাঁড়াল দিল্লীর সৈন্যবাহিনী এবং তাদের পাশে এসে ভিড় করলে দিল্লীর বহু মুসলমান অধিবাসী একে একে।

দিল্লী নগরের পথে সৈনিকদের দীন্ দীন্ রব। দোকানপাট সব বন্ধ।

হেথা হোথা জ্বলছে আগুন তীব্র জ্বালাময়ী। শ্বেতাঙ্গ-আবাসে-আবাসে রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দীর্ঘ একশত বৎসরের পুঞ্জীভূত শ্বেতাঙ্গদের নির্মম অত্যাচারে হেস্টিংস্-ডালহৌসীর রোপিত বিষবৃক্ষের ডালে ডালে পাতায় পাতায় ফুটে উঠ্ছে রক্তপুষ্প!

বেলা প্রায় যায়-যায়।······

দিনমণি আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে হেলে পড়েছে।

দিল্লীর ইংরাজ সৈন্যদের সন্নিবেশ-গৃহ : মেইনগার্ড!

বিদ্রোহের বার্তা এখনো এখানে এসে পেঁছয়নি। প্রাণভয়ে ভীত দু'চার জন ইংরাজ কোনমতে আক্রমণকারীদের তীক্ষ্ণ অসির আঘাত হতে বেঁচে এখানে পালিয়ে এসেছে।

মেইনগার্ডে যেসব ভারতীয় সৈনিক আছে, সেনাপতি তাদের যেন কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠ্তে পারছে না, যদিও এখন পর্যন্ত তারা শান্ত ধীর।

সহসা অদূরাগত সমুদ্রকল্লোলের মত ভেসে এল দূর নগর হতে উন্মত্ত শত কণ্ঠে কোলাহলের একটা রেশ।

অজানিত আশংকায় সেনাপতির বুকখানা দূরু দূরু করে বুঝি কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যার আঁধারে ক্রমে চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

ও কি! ও কিসের আলো? দূরে আকাশ রক্তরাঙা হয়ে উঠলো কেন?

আগুন! আগুনের শিখা!······

সেনাপতি স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো, সহসা এমন সময় কর্ণবিদারী প্রচণ্ড এক শব্দে যেন মেদিনী কেঁপে উঠ্লো থরো থরো।

সেই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কালো ধূম্ররাশি পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং সেই ধূম্রস্তর ভেদ করে শত শত লোল জিহ্বার মত দেখা দিল প্রজ্বলিত দাবাগ্নিশিখা।

দু'জন গোলা-দগ্ধ গোরা ছুটে এল। অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ হয়েছে। মুহূর্তে জ্বলে সব ছাই হয়ে যাবে।

১১ই মে। সেদিন কি ভুলবার!

১৮৫৭এর মুক্তিসংগ্রামে দিল্লীর সে দিনটি লাল আখরে লেখা হয়ে আছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি দিল্লীর পথে পথে। সর্বাঙ্গে ছিল হয়ত সৈনিকের বেশ। হাতে তীক্ষ্ণ উন্মুক্ত অসি।

অত্যাচারের অবসান ঘটাবো। এদেশের মাটি হতে ইংরাজের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলবো—নিয়েছি প্রতিজ্ঞা!

ইংরাজ সৈন্যরাও সেদিন নিশ্চেষ্ট থাকে নি। বীরের মত তারাও এগিয়ে এসেছে আমাদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে।

একে একে তারা আমাদের অসিমুখে প্রাণ দিচ্ছে।

সে দৃশ্য তারাও ভোলেনি, আমরাও ভুলিনি।

ভবিষ্যতে শিল্পীর তুলির টানে টানে সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ছবি যখন

আঁকা হবে, দেশ-দেশান্তরে সেই ছবি আমরা প্রেরণ করবো।

জগৎবাসী মুগ্ধ হয়ে দেখবে ভারতবাসী ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়, দেশের জন্য তারাও প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করতে জানে। এ দেশের মহাকবির বাণী মিথ্যা নয়।

"লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে,
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।"

কোথায় কবি! কোথায় তোমার সেই কম্বুনিনাদ!

আবার শোনাও সেই গান:

"ভক্তদেহের রক্ত-লহরী
মুক্ত হইল কি রে?
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো..."

দিকে দিকে ভেসে যাক সে মহাসঙ্গীত।

শুনুক জগৎবাসী, শুনুক সে মহাসঙ্গীত।

"মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়-ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝঞ্জন!"

বীর সৈনিকদের সেদিন কোন শক্তিই বাধা দিতে পারেনি।

বন্যার জলে কুটোর মতই সব ভেসে গেছে।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার, কামান, বারুদ, গোলাগুলি অগুন্তি। লেফ্‌টেনাণ্ট জর্জ উইলোবি তার অধ্যক্ষ। তার অধীনে আটজন শ্বেতাঙ্গ, বাকী সব ভারতীয় সৈনিক ও কর্মচারী।

অস্ত্রাগারের দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে।

কামানশ্রেণী সুসজ্জিত করে জ্বলন্ত মশাল হাতে কামানের সম্মুখে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরা চরম আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

এমন সময় অস্ত্রাগারের বহির্দেশে সৈনিকদের কোলাহল শোনা যায়: সম্রাটের নামে শপথ করে বলছি, অস্ত্রাগারের দ্বার মুক্ত কর! অস্ত্রাগার এখনো ভালোয় ভালোয় সমর্পণ করো।

কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট উইলোবি নীরব।

মনে হয় শুধু এখন কেবল একটি কথা: এখন আত্মরক্ষার উপায় কি!

আমাদের বীর সৈনিকের দল কিন্তু এই সময় নিশ্চেষ্ট থাকে নি। অন্ধকারে

আড়ালে আড়ালে কোন এক সময় প্রাচীরের সামনে এসে উপস্থিত হ'য়, ছোট ছোট অনেকগুলো 'মই' প্রাচীরের গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে এরই মধ্যে এক ফাঁকে। মুক্তির ডাক তাদেরও কানে এসে পেঁছেছে। দেখতে দেখতে সৈনিকেরা এই মই বেয়ে প্রাচীর লঙ্ঘন করে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল প্রাচীরের এদিকে এসে অস্ত্রাগারের সীমানার মধ্যে! অস্ত্রাগার অধিকার করতে হবে—যেমন করেই হোক। সঠিক সংকল্প।

এ দেশের ফিরিঙ্গীর অস্ত্রাগার (?) আর বুঝি রক্ষা করা যায় না!

চালাও কামান: গর্জে ওঠে ফিরিঙ্গীদের অগ্নিবর্ষী কামান: বুম্!··· বুম্!···বুম্!···

প্রত্যুত্তর দেয় ভারতীয়দের বন্দুক—দুম্···দুম্···দুড়ুম!···

দৃঢ়মুষ্টিতে হাজার হাজার তীক্ষ্ণ খরসান মৃত্যু-ক্ষুধায় লক্‌লাকিয়ে উঠ্‌ল: ফিরিঙ্গীর রক্ত চাই!

চাই দাসত্বের চির অবসান।

সপ্ত সিন্ধু গর্জে উঠে দীন্ দীন্ রবে।

ভারতীয়দের সেদিনকার সে মৃত্যুপণের সামনে একে একে ফিরিঙ্গীরা দিতে লাগল এতদিনের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ঋণশোধ—রক্তাক্ত ভুলুণ্ঠিত দেহে শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে।

Cannon to right of them
Cannon to left of them
Cannon in front of them
Vollied and thundered!

সেই প্রচণ্ড আক্রমনের মুখে আর স্থির থাকতে না পেরে অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ লেফটেনাণ্ট উইলোবি অস্ত্রাগারের সঞ্চিত বারুদস্তুপে অগ্নিসংযোগের ইঙ্গিত দিয়েই তড়িৎপদে গুপ্ত পথে অস্ত্রাগার হতে পালিয়ে গেল।

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ। ধোঁয়া···বারুদ!···আর্তনাদ! আগুন!

কোথায় পালাবে উইলোবি!

মীরাটের পথের ধুলিতেই তার দেহকে খণ্ডে খণ্ডে অসিমুখে ছড়িয়ে দিল তারাই—যাদের নায্য অধিকারকে সে জানিয়েছিল অস্বীকার।

পালাতে দিইনি আমরা, একটি ফিরিঙ্গীকেও সেদিন আমরা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে পালাতে দিইনি।

সেই ১১ই মে'র রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

পৃথিবীতে এতদিনকার অত্যাচারের চলেছে অগ্নিশুদ্ধি।

মহোৎসবের সে শুভক্ষণে তুমি, আমি, সবাই আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি অগ্নিদগ্ধ, রক্তাক্ত দিল্লী নগরীর পথে পথে। এক মন, এক প্রাণ, এক সংকল্প। নিতে হবে প্রাণ; যায় যদি যাক, অবহেলে দিতে হবে প্রাণ!

ভারতের সেদিন সেই প্রথম সত্যিকারের সঙ্ঘবদ্ধ জনজাগরণ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঋত্বিক ও প্রধান হোতা শ্রীমন্ত নানাসাহেব ভারতের এক প্রান্ত

হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতে, তাতে ঠিক হয়েছিল ৩১শে মে হবে সেই সংগ্রামের সর্বত্র একসঙ্গে একই মুহূর্তে শুরু।

কিন্তু আকস্মিকভাবে মীরাটে তৃতীয় অশ্বারোহী দলের ৮৫ জন সামরিক আইন ভঙ্গকারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে বারুদ-স্তূপে করলে অগ্নিসংযোগ। সেদিন মীরাটের বাজারের সাধারণ স্ত্রীলোকেরাও মীরাটে অবস্থিত সৈনিকদের উপহাসে জর্জরিত করে তুললে: কাপুরুষ! লজ্জা করে না তোমাদের, এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদেশীর অত্যাচার সহ্য করছো!

৩১শের জন্য মীরাট অপেক্ষা করতে পারলে না আর।

রক্তাক্ত অসিমুখে মীরাট অত্যাচারের প্রত্যুত্তর দিল।

মুক্তির মশাল জ্বলে উঠলো এবং দেখতে দেখতে সেই মশাল হাতে মুক্তির বারতা নিয়ে ছুটে চলল সবে দিল্লীর পথে।

তা যদি না হতো! যদি সমগ্র হিন্দুস্থান একই সময়ে সর্বত্র শুরু করতো তাদের সেদিনকার মুক্তি-সংগ্রাম, তাহলে ১৮৫৭ সালকে ১৯৪৭ সালের জন্য হয়ত অপেক্ষা করতে হতো না।

শৃঙ্খলের সেদিনই হতো অবসান!

ব্যর্থতার কথা আজ আর নয়।

১৮৫৭এর মহামুহূর্তটি কেন আমাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল, সে কলঙ্ক-কাহিনীকে সবার চোখের সামনে টেনে এনে আর অশ্রুমোচন করবো না।

১৮৫৭এর পরেও যে প্রায় আরো একশত বৎসর ধরে অশ্রুমোচন করেছি। বহুজনের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছি। কিন্তু তবু বলবো—আজ আর কিছুই গোপন রাখবো না। অকপটে সব স্বীকার করবো। কিন্তু তার আগে—

১৮৭৩ তো আজিও শেষ হয়নি।

কত প্রাণদান! কত রক্তপাত! ভারতের ইতিহাসে সে যে রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে আজও।

ফিরে যাই চল দিল্লীর পথে। ১৮৫৭এর ১১ই মে'র চন্দ্রালোকিত রাত্রে। রাত্রির চোখেও বুঝি ঘুম নেই।

মুক্তিযজ্ঞের অগ্নিশিখার দিকে হাজারো চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে নিমেষ-হারা। সারাটা রাত্রি ধরে চলল হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ।

অবশেষে রাত্রি-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রান্ত সৈনিকেরা 'দেওয়ানী-আমে' এল সবাই বিশ্রামের জন্য।

১৬ই মে।

দিল্লীতে আর একটি ফিরিঙ্গীও অবশিষ্ট নেই। বহুদিন পরে সেদিন আবার দেখেছিলাম লালমুখো-ফিরিঙ্গীশূন্য দিল্লী মহানগরী।

এবারে বসল সেনানায়কদের ঘরোয়া বৈঠক: অতঃপর কোন্ পথে?

৩১শের আগেই যখন সংগ্রাম শুরু হলো, তখন আর বিলম্বে কি প্রয়োজন ?

সৈনিকদের প্রতিনিধিদল বৃদ্ধ সম্রাটের সামনে এসে আভূমি নত হয়ে সেলাম জানিয়ে বললে : সম্রাট ! হে স্বাধীন ভারতের সম্রাট ! আবার আপনি নিজ হাতে শাসনদণ্ড তুলে নিন্ !

সম্রাট দেখলেন, এর পরও আর চুপ করে থাকা চলে না ।

সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন : তাই হবে ।

হৃতসর্বস্ব বাহাদুর শাহ আবার মসনদে ।

দিল্লী স্বাধীন ! ভারতে সে এক মহাশুভক্ষণ !

দীর্ঘ বৎসরের গ্লানি ও বেদনা-মুক্ত স্বাধীন দিল্লী নগরী ।

১৮৫৭এর দীর্ঘ পথ, এখনো অনেক বাকী !

চল দিল্লীকে পশ্চাতে রেখে আমরা এগিয়ে চলি !

সর্বনাশের বীজ ! সেই সর্বনাশা বীজের সন্ধানে ! সর্বনাশা বীজ বৈকি ।

সত্যিই তারা সেদিন বুঝতে পারেনি তাদের অত্যাচারের মধ্যে কত বড় সর্বনাশের বীজ সেদিন এ দেশের মাটিতে ফিরিঙ্গীরা রোপন করেছিল । এবং বুঝতে পারেনি বলেই ১৮৫৭এর রক্ত-হোলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল ।

দিল্লীর রক্ত-পিচ্ছিল পথে আজ দেখলাম ছিন্ন লুণ্ঠিত ও পদদলিত ব্রিটিশের বিজয়বৈজয়ন্তী ।

ঘরে ঘরে উড়ছে আমাদের স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা । কি সে পতাকা ! কেমন দেখতে ছিল !

চিরদিনের চিরকালের মৃত্যুহীন ১৮৫৭এর দিল্লীর মহানগরীকে পশ্চাতে ফেলে আমরা আরো এগিয়ে চলি ।

এখনও অনেক পথ বাকী, রক্তাক্ত পথ ধরে চলতে হবে আরো অনেক অনেক দূর ।

এখনও যে দেখা পাইনি সেই বীরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ সৈনিক শ্রীমন্ত নানাসাহেবের, সর্বকালজয়ী সেনাপতি তাঁতিয়া টোপির ।

এখনও পেঁছাতে পারিনি রাণী লক্ষীবাঈয়ের রাজধানী ঝাঁসীতে !

মুক্ত স্বাধীন দিল্লীর বারতা পেঁছে গেছে ভারতের সর্বত্র ।

কলকাতায় নতুন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের নিকটও সে সংবাদ পেঁছাতে বিলম্ব হয়নি ।

এতদূরেও দিল্লীর বিজয়-উৎসবের সেই তূর্যনিনাদ বাতাসে বাতাসে ভাসিয়ে আনে ।

আর ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বাস নেই ।

বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের কাছে ক্যানিংয়ের নির্দেশ পেঁছাতে দেরি হলো না : বাংলার মধ্যে বারাকপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আগ্রা, এই সাড়ে সাতশত মাইলের মধ্যে কেবল দানাপুরেই যা সামান্য একদল গোরা সৈন্য আছে । বারাণসীতে বা এলাহাবাদে পর্যন্ত গোরা সৈন্য নেই, অতএব যত শীঘ্র সম্ভব অনেক গোরা সৈন্য আমদানী করতে হবে ও দিল্লীকে পুনরুদ্ধার করতে হবে ।

কলকাতাতেও গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বহুসংখ্যক খৃষ্টধর্মাবলম্বী নর-নারী, বালক-বালিকা এতকাল যারা নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিল তারা সবাই আজ কেন সশঙ্কিত !

ফিরিঙ্গী, পর্তুগীজ সকলেই অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত। কখন কি হয় !

চারিদিকে অমঙ্গলের ভয়াবহ সূচনা।

অনেকে প্রাণভয়ে নিরাপদ স্থানে পালাচ্ছে, কেউ বা দুর্গের মধ্যে গিয়েও আশ্রয় নিচ্ছে।

বন্দুক-পিস্তলের যোগাড় চলেছে এদেশীয় ফিরিঙ্গীদের ঘরে ঘরে।

ভয়ের কথা তো বটেই ! যারা এতদিন অকাতরে নিজেদের প্রাণবিসর্জন দিয়ে ফিরিঙ্গীর ভাঁবে মাথা নীচু করেছিল, আজ তারাই কিনা তাদের বিরুদ্ধে ধরেছে মারণ অস্ত্র ! ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের এতদিনকার অত্যাচারের পরিতর্পণে হয়েছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ !

কিন্তু কলকাতায় কোন গোলযোগই দেখা দেয়নি।

তবে সৈন্যসংগ্রহ চলতে লাগল। প্রধান সেনাপতিও তৎপর।

শীঘ্রই দেখা গেল কলকাতায় প্রচুর গোরা সৈন্যের আমদানি।

এমন সময় কর্ণেল নীল মাদ্রাজের গোরা সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হয়ে কলকাতার দিকে যাত্রা করে। ক্রমে চারিদিকে অসন্তোষের চিহ্ন আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

৩০শে মে গবর্ণর জেনারেলের আইনসভা ঘোষণা করলে একটি নতুন আইন : যেখানেই কোনরকম হাঙ্গামা হবে, সেখানেই সাধারণের জীবন-মরণের ভার ফিরিঙ্গীর শাসন-বিভাগের যে কোন শ্রেণীর যে কোন বয়েসের বা যে কোন ক্ষমতার কর্মচারীর হাতে সমর্পিত হবে। এই আইন অমান্যে, বা যে কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বা যুদ্ধ ঘোষণা করবে, অথবা ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন অথবা কারাদণ্ড দেওয়া হবে। যদিও শেষোক্ত দুটি অনুপ্রাস মাত্র।

ভারতের প্রধান সেনাপতি তখন আনসন্।

সেনাপতি সিমলার শৈলবিহারী। ভারতের এত গ্রীষ্ম সহ্য হবে কি করে !

মীরাটে ফিরিঙ্গী ধ্বংস ও দিল্লীর স্বাধীনতা সংবাদ সিমলা শৈলে পৌঁছাতে দেরি হয়নি। ভারতীয়রা জেহাদ ঘোষণা করেছে ; এমন আর কি কঠিন ব্যাপার। শিমলা শৈল-শিখরে বসেই আনসন্ যুদ্ধচালনা করতে আরম্ভ করলে।

১৪ই মে দিল্লীতে যখন আমাদের স্বাধীনতা-উৎসব চলেছে, সেনাপতি বাহাদুর আম্বালার দিকে যাত্রা করলে।

আনসনের জীবন-প্রদীপ নিভে এসেছিল, ভারতীয় অসির তীক্ষ্নতা পরীক্ষা করে দেখবার আগেই ওলাউঠা রোগে বেচারী শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যার হেনরি বার্ণাড্য়ের হাতে এসে সেনাপতিত্ব পড়ল।

বার্ণাড সসৈন্যে আম্বালা হতে দিল্লীর দিকে এগিয়ে চলে।

মীরাট ও দিল্লীতে যে ফিরিঙ্গী হত্যা-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারই ভয়ংকর প্রতিহিংসা নেওয়া শুরু হলো এবারে।

অগ্রগামী গোরা সৈনিকেরা পথের দু'ধারে যত গ্রাম নগর লোকালয় দেখতে পেলে, সর্বত্র অবাধে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহের ভিতর দিয়ে মেতে উঠল নারকীয় উল্লাসে।

সামরিক আইনের বলে গ্রামে গ্রামে তারা শুরু করলে সামরিক বিচার প্রহসন (কোর্ট মার্শাল)। দলে দলে নির্দোষ নাগরিকদের ধরে এনে সামরিক বিচারের তস্তুতে বেঁধে কাউকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ফাঁসির দড়িতে, কাউকে সঙ্গীন দিয়ে নৃশংসভাবে খুঁচিয়ে প্রাণান্ত করা হলো, কারো মাথার কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হলো।

রাস্তার দুধারে যেদিকে তাকাই বড় বড় গাছের ডালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অসহায় নাগরিকদের মৃতদেহ ঝুলছে দড়ির ফাঁসে।

দলে দলে সব ধরে আনা হতো, তারপর চিৎকার করে বলা হতো : এরা বিদ্রোহী, অতএব এদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। এরা শ্বেতাঙ্গদের রক্তপাতে সাহায্য করেছে। দোষী কি নির্দোষ তার খোঁজে কোন প্রয়োজন নেই তো!

ফিরিঙ্গীর রক্তপাত করেছে, এর পরও আবার কোন সত্যিকারের অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে নাকি?

কিন্তু নির্দোষ অসহায় নাগরিক।…

তা কি হবে! এরা না করে থাকে, এদেরই স্বজাতি ও দেশের লোকেরাই তো করেছে!

মেনে নিচ্ছি এ কথা : ১০ই ও ১১ই মে তোমরা না হয় মীরাট ও দিল্লীর সংগ্রামে আগে হ'তে প্রস্তুত হতে পার নি, তাই আমাদের অসিমুখে তোমরা সবাই তোমাদের চিরাচরিত গৌরবময় পশ্চাদপসরণ করেছিলে। কিন্তু ৩০শে মে 'হিন্দন' নদীর তীরে কি হয়েছিল?

তোমাদের এত সমরসম্ভার, কামান গোলাগুলি বন্দুক সবই ব্যর্থ হয়ে যায়নি কি, সেদিন আমাদের গোলার মুখে প্রথম দিকে?

দিল্লীর পথে অগ্রগামী শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাহিনীর পযুদস্ত ছিন্নভিন্ন।

হঠাৎ এমন সময় ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে কিসের গোলযোগ! একদল তখনও প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে, বাকী দল দিল্লীর দিকে পিছু হটে গেল।

১১ গণিত বাহিনীর এক বীর সৈনিক শ্বেতাঙ্গের অবিশ্রাম অনলবর্ষী কামানের মুখেও ধীর অচল অটল।

সর্বাঙ্গে রুধিরের ধারা, দেহ অবসন্ন। তবু ঘাঁটি ছাড়বে না।

শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ যুদ্ধ করেও পরিশ্রান্ত সৈনিক যখন দেখলে, গোলাখানা আর রক্ষা বুঝি হয় না, তখন সেই গোলাখানাতেই গোলা ছুঁড়লো সে নিজ হাতে।

গোলা সব ধ্বংস হয়ে যাক। তবু ফিরিঙ্গীর করায়ত্ত যেন না হয়। কঠিন পণ।

প্রচণ্ড শব্দে গোলাখানা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অনলশিখায় ব্যাপ্ত হয়ে গেল চারিদিক। সত্যাশ্রয়ী ইংরাজ ঐতিহাসিক, আবার তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, সেই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন এ্যানডুমের নাম তোমরা লিখে গেছো, কিন্তু ১১ গণিত বাহিনীর সেই বীর সৈনিকের নামটা তোমরা কি ভুলে গেছিলে, না লিখতে ভয় পেয়েছিলে ?

ভেবেছো বুঝি সেই বীরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠকে আমরাও ভুলে থাকবো ? খুঁজে বের করবো আবার আমরা সেই বীর শহীদের নাম।

সে নদী এখনও শুকিয়ে যায়নি, আজও কান পেতে শুনলে নদীর কলতানে শোনা যাবে সেই নাম ?

নামই যদি সাহস করে লিখতে পারবে না, তবে কেন গেছিলে ইতিহাস রচনা করতে !

দলে দলে আবার ফিরিঙ্গীদের সৈন্যবাহিনী দিল্লীর প্রান্তে এসে জড়ো হচ্ছে। আমাদের স্বাধীন দিল্লী ছিনিয়ে নেবে।

সৈন্য এসেছে আম্বালা হ'তে, মীরাট হ'তে, বুলন্দ সহর হ'তে, বিপুল সৈন্যবাহিনী।

দিল্লী হ'তে ছয় মাইল দূরে ঃ বুদলিকাসরাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী সৈনিকেরা সবাই প্রায় তখন সেখানে।

বুদলিকাসরাই ঃ চারিদিকে সেই প্রাচীন যুগের অট্টালিকা, প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান।

এগিয়ে আসছে সেনাপতি বার্ণাডের সৈন্যবাহিনী এদিকেই।

আসে আসুক ! আমরাও প্রস্তুত !

১১ই মের পর আবার ৮ই জুন।

সহসা যেন আচম্বিতে ঝড়ো হাওয়া ছুটে এলো। ভারতীয় শহীদদের কামান গর্জে উঠল ঃ দুম্ ! দুম্ ! সাবধান আর অগ্রসর হয়েছো কি মৃত্যু !···

থমকে দাঁড়াল বার্ণাড ও তার অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী।

মুহুর্মুহু গোলা-বর্ষণ হচ্ছে।

ভারতীয়দের হাতে যতক্ষণ কামান আছে তারা ডরায় না কাউকে।

বার্ণাড চিন্তিত !

আদেশ হলো সমগ্র সৈন্যবাহিনী প্রধানতঃ চার দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করবে। একদল সৈন্য নিয়ে একজন সেনানায়ক বাম দিক দিয়ে আক্রমণ করলে। অন্য আর একজন, আর একদল নিয়ে ডান দিক দিয়ে। বার্ণাড সম্মুখে চারদিক হতে গোরাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেললে ভারতীয় সৈনিকদের। শুরু হলো আবার সংগ্রাম।

ফিরিঙ্গীরাও সেদিন স্তব্ধ হয়ে গেছিল ভারতীয় সৈন্যদের মৃত্যুসংগ্রাম দেখে। চারিপাশ হ'তে ফিরিঙ্গীর কামান ও বন্দুক অজস্রধারে গোলাবৃষ্টি

করছে।

চারিদিকে বিষোদগারণ, ধোঁয়া, আগুন! অমিতবিক্রমে লড়ছে বীর সৈনিকরা।

কোথায় ফিরিঙ্গীর বিপুল সৈন্যবাহিনী, প্রচুর রণসম্ভার, আর কোথায় মৃত্যুপণে সংকল্পিত মুষ্টিমেয় ভারতীয় সৈন্য ও তাদের সামান্য রণসম্ভার।

বুদলিকাসরাইয়ের যুদ্ধেই শেষ পর্যন্ত দিল্লীর জয়-পরাজয় মীমাংসিত হয়ে গেল।

৮ই জুনের অস্তাচলমুখী দিনমণি; কিন্তু সেদিন ফিরিঙ্গীর গলায় জয়ের মাল্য দুলিয়েছিল কারা?

কতটুকু সাহায্য করেছিল গোরা সৈনিকেরা? আমরা মীরজাফর উমিচাঁদের বংশধরেরা না থাকলে ফিরিঙ্গীর জয়ের আশা কোথায় কোন্ অতলে তলিয়ে যেতো!

দাঁড়াও। শুনে যাও! কে কে ছিল সেই দলে।

সেনানায়ক রীডের অধীনে গুর্খা সৈনিকেরা। তারাই প্রথমে আমাদের বূ্যহ ভেদ করে। মীরাটের এদেশীয় সৈনিকেরা, আর জান ফিরোজ খাঁ, আফগান সেনাপতির অধীনে একদল ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য। মনে রেখো এ নামগুলো!···

এবারে বিজয়ী বার্ণাড দিল্লীর কাওয়াজের প্রশস্ত ময়দানে সৈন্যসমাবেশ করলে।

দিল্লীর প্রাচীরের বাইরে ইংরাজদের তাঁবে ভারতীয় সৈন্য ও তাদের নিজস্ব গোরা সৈন্য। ভিতরে মরণপণে তখনও দাঁড়িয়ে অসি হাতে শত শত মুক্তি-সংগ্রামের বীর!

ছয়

বারাণসী।

হিন্দুর সেই চিরপবিত্র তীর্থভূমি।

নিম্নে প্রবাহিতা অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুণ্যসলীলা গঙ্গা।

বারাণসীতেও সৈন্যদের মধ্যে হয়েছে প্রাণসঞ্চার।

জুন মাসের গোড়ার দিক। আজিমগড় থেকে সংবাদ এসেছে, সেখানকার ভারতীয় সৈন্যেরা ফিরিঙ্গীদের শাসন আর মানতে চায় না। অত্যাচারের মীমাংসা চায় অসিমুখে। সংবাদ পাওয়া গেছে, কতিপয় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকের তত্ত্বাবধানে গোরক্ষপুর হতে ৫,০০,০০০ টাকা বারাণসীতে আসছে।

বারাণসীতেও রণদামামা বেজে উঠল।

সমস্ত টাকাই সেপাইরা লুঠ করে নিল এবং সেই লুণ্ঠিত অর্থ নিয়ে সকলে বিজয়গৌরবে আজিমগড়ে ফিরে এসে দেখে, আজিমগড়ে একজন শ্বেতাঙ্গও নেই। সব পলাতক।

সেনাপতি নীল সসৈন্যে বারাণসীতে এসে পেঁছেছে।

আজিমগড়ের চাঞ্চল্যকর সংবাদ বারাণসীতে এসে পেঁছালে আর রক্ষা নেই, অতএব সময় থাকতে বারাণসীর সমস্ত ভারতীয় সৈনিককে নিরস্ত্র করতে হবে, নীলের কঠোর সংকল্প।

ঠিক হলো পরদিন বেলা পাঁচটার সময় নিরস্ত্রীকরণ পর্ব সমাধা হবে।

সমস্ত সৈন্য এসে সার বেঁধে দণ্ডায়মান কাওয়াজের ক্ষেত্রে।

আদেশ প্রচারিত হলো।

গম্ভীর সৈন্যেরা, কেউ একটি টু-শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করলে না। নীরবে সবাই অস্ত্র ত্যাগ করলে।

অদূরে আগের মতই কামানশ্রেণী। প্রস্তুত গোরা সৈন্যের দল।

সেনাপতির আদেশে গোরা সৈন্যেরা এদের অস্ত্রগুলো মাটি হতে তুলে নিতে যেমন অগ্রসর হয়েছে, সহসা যেন বারুদস্তুপে হলো অগ্নিসংযোগ।

মুহূর্তে কোথা হ'তে যে কি হয়ে গেল!

বিদ্যুৎগতিতে ভারতীয় সৈন্যেরা মাটি হতে যে যার অস্ত্র তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্তৃপক্ষের উপর।

দুম্...দুম্...দুড়ুম। গর্জে উঠল শত শত আগ্নেয় অস্ত্র।

ফিরিঙ্গীরাও শুরু করলে সজ্জিত কামান হতে গোলাবর্ষণ।

সংকটময় মুহূর্ত। ভারতীয় সেপাইরা সংঘবদ্ধ না হয়ে সুপরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রাম না চালিয়ে বিশৃংখল যথেচ্ছভাবে অস্ত্রপরিচালনা যখন করছে, সেই সময় একজন শ্বেতাঙ্গ সেনানায়ক চকিতে এসে সমস্ত কামান অধিকার করে নিল।

বিপর্যস্ত ভারতীয় সৈনিকেরা অল্প সময়ের মধ্যেই কামানের মুখে ছত্রাকার হয়ে গেল।

বারাণসীর ইংরাজ সেনাপতি এই অভূতপূর্ব ব্যাপারে নিরতিশয় অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং সে তার কার্যভার আগত কর্ণেল নীলের হাতে তুলে দিল।

দাম্ভিক অপরিণামদর্শী কর্ণেল নীল, হাতে ক্ষমতা পেয়ে ভয়ংকর প্রতিহিংসা সাধনে বদ্ধপরিকর হলো।

সামান্য ভারতীয় সৈনিক। তাদের এতদূর স্পর্ধা।...

তার প্রচণ্ড প্রতিহিংসানলে পলাতক ও পরগৃহে আশ্রিত প্রত্যেকটি সেপাই নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলো। কুটীরে কুটীরে আগুন জ্বলে উঠল।

শুধু মাত্র ভারতীয় সৈন্যদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেই ফিরিঙ্গীদের প্রতিহিংসানল নির্বাপিত হয়নি সেদিন; ৯ই জুন প্রচারিত সামরিক আইনের বলে এবারে শুরু হলো নিরীহ অসহায় নাগরিকদের প্রতি বেপরোয়া বৈরী-নির্যাতন!

পল্লীতে পল্লীতে গোরা সৈনিকরা উপস্থিত হয়ে কুটীরে কুটীরে জ্বালালে আগুন। বৃদ্ধ যুবা শিশু নির্বিচারে যাকে হাতের কাছে পেলে, ঘর হতে টেনে এনে ঝুলিয়ে দিতে লাগল ফাঁসির দড়িতে। নির্মম বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করে দিল কতজনার দেহ। সঙ্গীনের খোঁচায় কত অসহায় মৃত্যুর কোলে

চলে পড়ল। ঘরে জ্বলছে আগুন, সম্মুখে প্রকাশ্য বারাণসীর পথে পথে তৈরী হয়েছিল সেদিন অসংখ্য ফাঁসির মঞ্চ। প্রত্যহ কত যে প্রাণ সেই সব ফাঁসির মঞ্চে ফিরিঙ্গীর প্রতিহিংসানলে নিঃশেষ হয়ে গেল কে তার খোঁজ রেখেছিল।

শ্বেতদ্বীপের নারী! সে দৃশ্যে তোমরাও দিয়েছো করতালি আনন্দে উল্লাসে। সেদিন আম্রবৃক্ষের ডালে ডালে ঝুলছে ফাঁসির দড়িঃ তবু নীলের হৃদয় শান্ত হলো না। পুণ্য বারাণসীধাম রক্তে লাল হয়ে গেল।

আর আজমীর ও বারাণসীতে সেদিন অসিমুখে ভীত তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রী পুত্র পরিজনের প্রাণ বাঁচাতে ঐ সেপাই ও এদেশবাসীরাই সকল প্রকার সাহায্য অকাতরে তোমাদের দিয়েছিল। এই কি তার প্রতিদান?

পুরো জুন মাস ধরে চলল সংহার-লীলা—ফিরিঙ্গীদের ভারতীয় হত্যা উৎসব।

পল্লীতে নেই কোন জনমানব। ঘরে ঘরে জ্বলছে আগুন।

সর্বত্র ঝুলছে গাছের ডালে ডালে নিরীহ নাগরিকের প্রাণহীন শব।

অগ্নিদগ্ধ বারাণসীকে পশ্চাতে রেখে আমরা এগিয়ে যাইঃ কোথায়? জোনপুর!

বারাণসী হতে ৩০ মাইল দূরবর্তী জোনপুরে, আজিমগড় ও বারাণসীর সেপাইদের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে যতেক ফিরিঙ্গী জোনপুর কাছারী-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে।

বেলা কত হবে কে জানে! জোনপুরের কাছারী-বাড়ীর বারান্দায় সেনা-নায়ক দাঁড়িয়ে; সহসা একটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি-বিদ্ধ সেনানায়কের রক্তাক্ত দেহ ভূলুণ্ঠিত হলো।

বাকী সব ফিরিঙ্গী তখুনি প্রাণভয়ে গৃহাভ্যন্তরে আত্মগোপন করলে।

দেখতে দেখতে জোনপুরেও হলো মুক্তি-সংগ্রাম শুরু।

ধনাগার লুণ্ঠিত।

মুক্ত তরবারী ও বন্দুক হাতে জোনপুরের ভারতীয় সেপাইরা এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ সাধনায় কৃতসংকল্প।

কাছারী-বাড়ীতে প্রাণভয়ে লুক্কায়িত ফিরিঙ্গীরা কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ অশ্বে, শকটারোহণে পলাতক।

মীরাট, দিল্লী, আজিমগড়, বারাণসী ও জোনপুর।

১০ই মে, ১১ই মে, মীরাট ও দিল্লী, ৩রা জুন আজিমগড়, ৪ঠা জুন বারাণসী এবং ৫ই জুন জোনপুর।

বার বার অন্তর হ'তে প্রণতি জানিয়ে যাই সংঘবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ রক্তাক্ত দিনগুলিকে।

গঙ্গা যমুনার মিলনঃ প্রয়াগ, এলাহাবাদ!

বারাণসী হতে মাত্র ৭০ মাইল দূরে।

আকবর শাহের দুর্গই আজ ফিরিঙ্গীর কবলিত। যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ।

দুর্গের ছয় মাইল দূরে সৈনিক-নিবাস।

১০ই মের রাত্রি : মীরাটে যখন চলেছে অসি ও কামানের মুখে শত বর্ষের ঋণ শোধ—এলাহাবাদ নিরুদ্বিগ্ন। ফিরিঙ্গীরা নিশ্চিন্ত আরামে বেলোয়ারী পাত্রে সুরার মজলিশে আনন্দের নেশায় মগ্ন।

পরদিন ১১ই মের রাত্রিও এমনি করে হলো অবসান।

১২ই মে প্রত্যুষে ঈশান কোণে দেখা দিল অগ্নি মেঘের আভাস।

মীরাট হতে বার্তা এনেছে, কে বা কারা : ফিরিঙ্গী রাজত্বের অবসান। মুহূর্তে গৃহে গৃহে, বাজারে, পল্লীতে পল্লীতে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো সে কাহিনী।

শ্বেতাঙ্গরা সশঙ্কিত।

১৩ই ও ১৪ই মেঘ আরও জমাট হয়ে আসে।

দিন যায়। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের অগ্নিইসারা।

১৮ই মে এলো দিল্লীর সংবাদ।

মুঘল সম্রাট বসেছেন আবার সগৌরবে দিল্লীর মসনদে।

স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে সুদূর হতে ভাসিয়ে আনে অস্পষ্ট মহা-সঙ্গীতের গুঞ্জনের মত।

মনের মধ্যে যেন কিসের একটা প্রেরণা সবাই অনুভব করে।

মে মাসের দীর্ঘ তপ্ত দিনগুলি একে একে শেষ হয়ে আসে।

ঝরাপাতার বিদায় উৎসব !

জুন মাস এলো।

এতদিন টেলিগ্রাফের তারে সংবাদের আদান-প্রদান চলছিল। ৪ঠা জুন দেখা গেল টেলিগ্রাফের তার আর কোন সংবাদই বহন করে আনছে না। সন্ধ্যার দিকে অশ্বারোহী বার্তাবহ এসে সংবাদ দিল : বারাণসীতে সেপাইরা সব শ্বেতাঙ্গ সেনাপতিদের বিরুদ্ধে অসিধারণ করেছে। সর্বনাশের আর দেরি নেই ; বারাণসীতে ইংরেজরা পর্যুদস্ত ! সৈনিকরা এখন এলাহাবাদের দিকে আসছে। বারাণসী হতে গঙ্গার অপর তট দিয়ে এলাহাবাদ যাওয়ার রাস্তা।

নগরের উপকণ্ঠে দারাগঞ্জের সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে যে নৌসেতু এলাহাবাদে প্রবেশের সেটাই প্রশস্ত পথ।

৬ গণিত সেপাইদের ওপরে হুকুম হলো দু'টি কামান নিয়ে সেই সেতু প্রহরা দিতে হবে।

৬ই জুনের সন্ধ্যা।

গোপনে গোপনে স্থির হয়েছে, আজই এলাহাবাদে যাবতীয় ফিরিঙ্গীদের আক্রমণ করে নিঃশেষ করতে হবে। বারাণসী হতে আরো সৈন্য আসছে।

সবাই একত্র হলে আর ভয় কি !

চারিদিকে একটা শান্ত নির্লিপ্ততা !

কিন্তু কিসের সে শান্ত নির্লিপ্তত ? অত্যাসন্ন ঝড়ের পূর্বে যেমন চারিদিকে

একটা প্রশান্তি দেখা দেয়, এও হয়ত তাই।

রাত্রি নয়টা। সহসা নিস্তব্ধ রজনীর বক্ষ বিদারণ করে আশঙ্কাসূচক ভেরীধ্বনিতে আকাশ-বাতাস সচকিত হয়ে ওঠে।

নৌ-সেতুর মুখে শ্বেতাঙ্গ কামান অধ্যক্ষের প্রাণহীন দেহ তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হলো সর্বপ্রথম।

চারিদিক হতে আসছে মুহুর্মুহু বন্দুকের শব্দ—দুম্…দুম্…দুড়ুম।

সমুদ্রগর্জনের মত কোলাহল দুর্গ ও সৈনিক-নিবাস হতে ভেসে আছে।

সময় হয়েছে নিকট, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

চন্দ্র-কিরণ-স্নাতা ধরণী। চারিদিক দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট।

মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকেরা অসি ও বন্দুক হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দলে দলে শত্রুনিধনে। কৌমুদী-ধৌত রজনী রক্তস্নাতা হলেন।

সেনাপতি দ্রুত দুর্গে প্রবেশ করে, সেখানকার সৈনিকদের নিরস্ত্র করতে উদ্যত তখন।

ভাইকে নিয়োজিত করা হলো তারই ভাইদের নিরস্ত্র করতে।

প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটল ঃ সংগ্রাম হয়েছে শুরু, এ তারই বার্তা!

যে কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে অগ্নিবর্ষী গোলার মুখে তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়।

ফিরিঙ্গীরা সবাই প্রাণভয়ে এসে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

দুর্গের একদল বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী পাঞ্জাবী সৈনিক বেঁকে দাঁড়াল ঃ হিন্দুস্থানী সৈনিক ভাইদের সঙ্গে তারা কিছুতেই যোগ দেবে না।

আর একদল শিখ-সৈন্য নিরস্ত্রীকরণ উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে সমাধা হয়, তার জন্য সঙ্গীন উঁচিয়ে এসে দাঁড়াল।

তাদের চোখের সামনেই তাদের স্বজাতি দেশভাইরা যে যার অস্ত্র ভূমিতে নামিয়ে রাখে ফিরিঙ্গী সেনাপতির আদেশে।

নিরস্ত্রীকৃত হতমান সৈনিকের দল নতশিরে দুর্গ হ'তে বহিষ্কৃত হয়ে চলে গেল একে একে আমাদেরই কতিপয় বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহী তাঁবেদার সৈনিকের চোখের সামনে দিয়ে।

ভাই হয়ে আমরা সেদিন নিষ্প্রাণ পুতুলের মতই ভাইয়ের অপমান দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে; এতটুকু বিচলিত হই নি।

আত্মসম্মানে এতটুকু আঘাতও লাগে নি।

একদল যখন প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ততর্পণ দিচ্ছে, আর একদল তখন বিদেশী শাসকের কৃপাভিক্ষা-লোলুপ!

তবু মুক্তির ডাক তখন ছড়িয়ে গেছে এলাহাবাদের সর্বত্র, এমন কি সুদূরবর্তী পল্লীতে-পল্লীতেও।

জনগণের মধ্যেও সাড়া জেগেছে—মুক্তি চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু। কিন্তু তবু! তবু সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। কিছুই হলো না কার্যকরী।

এতবড় জাগরণের মূলে যে ছিল না আমাদের এতটুকু একতা! ছিল না

এতটুকু শৃঙ্খলা। ছিল না আমাদের এক মন এক প্রাণ!

কেউ কারো মতে চলবে না! সকলেই আমরা স্ব-স্বপ্রধান!

সারাটা রাত্রি ধরে চলল ধ্বংসযজ্ঞ!

৬ই জুনের রাত্রি প্রভাত হলো!

কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত! মুক্ত কয়েদীর দল!

লুণ্ঠন! হত্যা!...

৭ই জুন ধনাগার লুণ্ঠন!

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে এক বৃদ্ধ মৌলবী এগিয়ে এলেন: ভাই সব! তোমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হও! একত্র হও! আবার আমাদের দিন এসেছে। দিল্লীতে মুঘলের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত! মুঘলসম্রাট আবার সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হয়ে মসনদে বসেছেন। সবাই একত্রে দুর্গ আক্রমণ কর! ফিরিঙ্গীদের হাত হ'তে আমাদের সর্বাগ্রে দুর্গ ছিনিয়ে নিতে হবে।

এগিয়ে এল সবাই বীর বিক্রমে।

কিন্তু মুহুর্মুহু কামানের মুখে দাঁড়াতে পারলে না।

চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হলো।

ফিরিঙ্গীরা শিখ-সৈন্যদের বিক্রমে অসি ও বন্দুকের সাহায্যে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখলে।

লজ্জা ও দুঃখে মুখ নিচু হয়ে যায়।

বারাণসীতে মুক্তি-সংগ্রামে শিখ-সৈন্যরা দিল প্রাণ আর এলাহাবাদে তাদেরই আর একদল নিল আমাদের প্রাণ।

১১ই জুনের প্রভাতে সসৈন্যে দস্যুরাজ সেনাপতি নীল এলাহাবাদের রঙ্গভূমে এসে প্রবেশ করল।

দুর্গে সংবাদ প্রেরণ করতে হবে: পত্রবাহক চাই।

ভয় কি। আমরাই তো আছি, কিছু অর্থ দাও। অর্থের বিনিময়ে আমরা সব করতে পারি।

ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই আমরা অস্ত্রধারণ করবো, ভাইয়ের ঘরে ভাই আমরা আগুন জ্বালাবো।

সেনাপতি নীলকে গঙ্গা পার করে দিতে হবে, আমরাই নিয়ে এলাম নৌকা।

আমরাই তাকে গঙ্গার এপারে নির্বিঘ্নে নিয়ে এলাম।

আমরাই উৎকোচের বিনিময়ে দুর্গে সংবাদ পেঁছে দিলাম গোপনে।

বীরদর্পে সেনাপতি নীল মার্চ করে সসৈন্যে এগিয়ে চলল।

দুর্গ অধিকার করতে হবে।

এলাহাবাদ দুর্গ।

নগরে যেমন বিশৃঙ্খলা; দুর্গমধ্যেও তাই চলেছে।

নীল প্রথমেই দুর্গে প্রবেশ করে সেখানে আনলে শৃঙ্খলা।

যে স্বদেশদ্রোহি শিখ-সৈন্যের দল ফিরিঙ্গীদের সাহায্য করেছে, আজ কিন্তু সেনাপতি নীল তাদের বিশ্বাস করতে পারলে না, তাদের প্রতি আদেশ জারী

হলো, দুর্গের বাইরে গিয়ে থাকতে হবে, এবং তাদের সে আদেশ মানতে বাধ্য করা হলো।

অবাধে এখন তারা নিজেদের আত্মসম্ভ্রম, সৈনিকের নিষ্ঠা ভুলে গিয়ে লুণ্ঠন উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠল।

এবার সুরু হলো সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে থেকে মুক্তি-সৈনিকদের সঙ্গে সংগ্রাম। সহসা এমন সময় গুজব ঃ ফিরিঙ্গীরা দুর্গমধ্যে বহু কামান সজ্জিত করেছে, কামানের গোলায় সমস্ত এলাহাবাদ শহর উড়িয়ে দেওয়া হবে।

মূর্খ দেশবাসী সেই গুজব সত্য কি মিথ্যা না যাচাই করেই প্রাণভয়ে যে যার মত পলায়ন শুরু করলে।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই নগর মনুষ্যহীন।

১৮ই জুন প্রাতে জনহীন নগরে বীরদর্পে নীল সসৈন্যে পরিদর্শনে অগ্রসর।

এলাহাবাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেও পূর্ণচ্ছেদ।

এবারে শুরু হল প্রতিহিংসা। ফিরিঙ্গীর প্রতিহিংসা। দানবীয় প্রতিহিংসা।

পুণ্যধাম বারাণসীকে রক্তাপ্লুত করে, হাজার হাজার নিরীহ নর-নারী যুবক-যুবতী শিশু-বৃদ্ধকে নিষ্ঠুরভাবে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েও নীলের পাশবিক প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় নি।

সুরু হলো ফিরিঙ্গীর পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা।

বিনা বিচারে বিনা দোষে নাগরিকদের জোর করে ধরে এনে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া শুরু হলো।

গৃহে গৃহে আগুন জ্বলে উঠ্‌লো।

প্রকৃত অপরাধী হোক বা নিরপরাধ হোক, ফিরিঙ্গীর বিচারে যাদের প্রতি এতটুকু সন্দেহ তাকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে।

দণ্ডিত ব্যক্তির গলায় দড়ি বেঁধে তাকে গাছের নিচে গাড়ীর উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলেই, হতভাগ্যের দেহ ফাঁসবদ্ধ হয়ে ঝুলতে থাকে গাছের ডালের সঙ্গে দড়ির ফাঁসে।

ইংরাজ! তোমাদের বিচারে তারা বিপ্লবী! পরদেশী তোমাদের শত বর্ষের জঘন্য লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল মুক্ত কৃপাণ হাতে এই তো তাদের অপরাধ!

শত বর্ষের অত্যাচারের মর্মপীড়ায় তারা তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে তোমাদের নির্বিচারে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে, তোমাদের রক্তে পথ ও গৃহ প্লাবিত করেছে।

কিন্তু সুসভ্য ব্রিটিশ! প্রশ্ন করি তোমাদের। দেশের জনগণের মধ্যে যখন আবির্ভাবের জাগরণ আসে, নব অভ্যুদয়ের আসে চেতনা, সেই চেতনা ও জাগরণ যে চিরদিনই এমনি নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর, তা তো তোমাদের অজানা ছিল না।

সেই বাইবেল থেকে শুরু করে তোমাদের দেশের জাতীয় অভ্যুথানের প্রতিটি ইতিহাসের পাতাগুলো একবার উল্টে যাও দেখি!

তোমাদেরই দেশের ঐতিহাসিকেরা না একদিন প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে

আয়র্লণ্ডের প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায় যে ঘোর অত্যাচার করেছিল. তার বর্ণনা দিতে গিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের দেশেও যখন এসেছে অভ্যুত্থান, তখন কি অবাধে নির্বিচারে নিরপরাধ শিশু ও নারীরা পর্যন্ত উত্তেজিত লোকদের হাতে নিষ্ঠুর আঘাতে প্রাণ দেয় নি! এবং তাই যদি হয়ে থাকে, তবে ১৮৫৭এর সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে কেন আমাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল? কেন আমাদের যাবতীয় ধনসম্ভার লুঠ করা হয়েছিল? কেন আমাদের ঘরে ঘরে দেওয়া হয়েছিল আগুন?

সত্যাশ্রয়ী ইংরাজ, সুসভ্য ইংরাজ—জবাব দাও! জবাব চাই! থাক সে কথা! কেননা কি তোমরা জবাব দেবে তা আজ আর জানতে আমাদের বাকী নেই!

সাত

"যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা
যমের দুয়ারে দিয়ে কাঁটা
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।"

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার পুণ্য-দিবসে বোন দিচ্ছে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা। মৃত্যুকে এড়াবার জন্য নয়. মৃত্যুকে জয় করবার জন্যে। ভাই আমার মৃত্যুঞ্জয়ী! কপালে তোমার এঁকে দিলাম রক্ত-তিলক।

মায়ের পেটের ভাই-বোন নয়, তবে ভাই-বোনের মতই পাশাপাশি তারা মানুষ। হাসি-খেলায় গানে-গল্পে দীর্ঘদিন কেটেছে তাদের এক সাথে। জান মেয়েটির নাম?

ফুটফুটে গায়ের রং, ঝাকড়া ঝাকড়া একমাথা চুল, চঞ্চলা হরিণ-শিশুর মত। কে ঐ মেয়েটি?

আর ওরই পাশে বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা কিশোর বালকটি কে?

শোন! ভারতবাসী কান পেতে শোন!

চেয়ে দেখো ঐ দূর আকাশের প্রান্তে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র! আজিও জ্বলছে তেমনি অম্লান, তেমনি জ্যোতির্ময়, তেমনি ভাস্বর। প্রায় পৌনে একশত বৎসর পরে আজ আমরা সবাই তোমাদের প্রণাম জানাতে এসেছি। এসো কে আছে কোথায়, দেশবাসী দেশপ্রেমিক! এগিয়ে এসে প্রণাম জানাও!

রূপকথা নয়। কল্পনা কাহিনীও নয়।

চল ফিরে যাই ১৮২৪ সালে!

মহারাষ্ট্রের ম্যাথিরান পর্বতের সানুদেশে, চারিদিকে সবুজ ঘাসের সুকোমল আস্তরণ। ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম 'ভেনু'।

সেই গ্রামে মাধবরাও নারায়ণ ভট্ট নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘর। সাংসারিক দৈন্য, দুবেলা ভাল করে দুমুঠো আহারও জোটে না। মাধবরাওয়ের স্ত্রী শ্রীমতী গঙ্গাবাঈ। এত দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, তবু স্বামী-স্ত্রীর মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। কোন অভাবই তাদের বিচলিত করতে পারে না।

দুঃখ-সিন্ধু মন্থন করে দরিদ্র মাধবের ঘর আলো করে জন্মাল এক চাঁদের মত ছেলে। প্রায় সমসময়ে শেষ বাজীরাও সিংহাসন ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে দান-ধ্যান পুজো-আর্চায় ঋষির জীবন অতিবাহিত করছেন।

বহু মহারাষ্ট্রীয় পরিবার বাজীরাওয়ের দানের খ্যাতি শুনে বাজীরাওয়ের আশ্রয়ে এসে বাস করতে লাগল।

সেই দলে ১৮২৭ খৃঃ দরিদ্র মাধবরাও সপরিবারে এসে ভিড়ে গেলেন। চন্দ্রকলার মত মাধবরাও ও গঙ্গাবাঈয়ের স্নেহের দুলাল ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে।

অদ্ভুত শিশুটি, মুহূর্তে সবার চিত্ত জয় করে নেয়।

কি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি অতটুকু শিশুর!

শিশু হলো বালক; দুরন্ত বালক।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে ঐ চাঁদের মত বালককে বুঝি মানায় না।

আর মানাবেই বা কেন! অলক্ষ্যে যে তখন জননী ভারত-ভূমি রচনা করছেন নিভৃতে এক সোনার মুকুট তার প্রিয় সন্তানের জন্য।

নিজহাতে জননী জন্মভূমি যে তার মাথায় পরিয়ে দেবেন সেই সোনার মুকুট।

বাজীরাও বালককে দেখে যেন কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সমস্ত অন্তরে একটা দুর্দমনীয় প্রেরণা অনুভব করেন, দু'বাহু ছুটে যেতে চায় দুরন্ত সোনার চাঁদের মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে বুকে টেনে নিতে।

কে রে তুই বালক, এমনি করে আমায় আকর্ষণ করিস?

শেষ পর্যন্ত বেশী দিন আর বাজীরাও স্থির থাকতে পারলেন না। ৭ই জুন ১৮২৭ সাগ্রহে বালককে কোলের ওপরে বসিয়ে ঘোষণা করলেনঃ নিঃসন্তান আমি, আজ হতে এই বালককে নিজ পুত্র বলে বুকে তুলে নিলাম। এই হবে ভবিষ্যতে পেশোয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী!

হায় বাজীরাও! তুমি তখনও জানতে পার নি তোমার তুচ্ছ পেশোয়ার স্বর্ণমুকুটের চাইতেও ঢের মূল্যবান রত্নমুকুট ঐ দুই বৎসরের শিশুর জন্য তৈরী হচ্ছে। কত ক্ষুদ্র তোমার পেশোয়ার সিংহাসন! কেমন করে বসাবে তুমি ঐ ক্ষুদ্র সিংহাসনে তাকে, যার সিংহাসন পাতা হবে একদিন অগণিত নরনারীর নিভৃত বক্ষের মাঝে!

কে ঐ বালক?

শ্রীমন্ত নানাসাহেব!

একটু অপেক্ষা করো। মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফেরাও।

মুহূর্ত বই কি! ১৮২৪ আর ১৮৩৫ মাত্র এগারটি বৎসরের ব্যবধান।

১৮৩৫এর ১৯শে নভেম্বর পুণ্যময় বারাণসীধামে মোরোপন্ত তাম্বের ঘরে হুলুধ্বনি কে দিয়েছিল, স্বর্গের দেবকন্যারা কি?

মেয়ে তো নয়, যেন একটি চাঁপার কলি! কি রূপ! চোখ যেন আর ফিরানো যায় না।

কি নাম রাখা যায় মেয়েটির! মনু। মনুবাঈ! মনু। মনুয়া! মনুয়াই বটে, কি আধো আধো মিষ্টি বোল!

কিন্তু, আহা, মেয়েটির যখন মাত্র ৩ কি ৪ বছর, মেয়েটির মা ভাগীরথীবাঈ শেষ নিঃশ্বাস নিলেন।

দুর্ভাগ্য বুঝি কখনও একা আসে না। যার অনুগ্রহে মোরোপন্তের কোন অভাব ছিল না, সেই চিমাজী আপ্পার আকস্মিক মৃত্যুতে মোরোপন্ত যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন।

কি করা যায়, মেয়েটিকে বুকে করে মোরোপন্ত কাশী ত্যাগ করে বিঠুরে এসে বাজীরাওয়ের আশ্রয় নিলেন।

পিতা একদণ্ড মেয়েকে চোখের আড়াল করেন না।

আহা, মা-হারা মেয়ে!

ঘরে এমন একটি স্ত্রীলোক নেই, যে মেয়েটির দেখা-শোনা করতে পারে।

সদাসর্বদা যার আশে-পাশে মনুয়াকে ঘুরতে হয় তিনি পুরুষ, তাঁর পিতা।

নিয়তির কি অদ্ভুত নির্দেশ।

মেয়ে হয়ে জন্মালেও সাধারণ মেয়েলী ভাব মেয়েটির মধ্যে এতটুকু নেই।

মেয়ে হয়েও মনুয়া আমাদের পুরুষের মত কাপড় পরে, তার খেলার সাথীরাও মেয়ে নয়, বালক।

যাকে একদিন দুর্জয় বিক্রমে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার মৃত্যুপণে মুক্ত কৃপাণ হাতে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, প্রকৃতি তাকে আপন হাতেই তাই বুঝি গড়ে নিচ্ছেন।

বিঠুরে এসে বালিকা মনু খেলার সাথী পেলে শ্রীমন্ত নানাসাহেবকে।

দু'জনার মধ্যে বয়সের পার্থক্য এগার বৎসর।

তবু যেন দু'জনার মধ্যে ভাবের অন্ত নেই।

শ্রীমন্ত নানা এখন তরুণ যুবা।

মনু আমাদের কিশোরী।

নানা ঘোড়ায় চেপে চলেছেন, মনুও ঘোড়ায় চেপে চলে তাঁর পাশে পাশে।

দু'টি অশ্ব কদমে কদমে পা ফেলে ফেলে চলে ; কেশর দোলে।

কখনো উন্মুক্ত ময়দানে দু'জনে অসি-ক্রীড়ায় মত্ত।

ভাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যক্ষণে মনু শ্রীমন্ত নানার কপালে এঁকে দেয় রক্ত-চন্দনের রাঙা টিপ্।

চঞ্চলা বালিকা কারো শাসন মানে না।

একদিন এক জ্যোতিষী এলেন। মনুর জন্মপত্রিকা দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন: এ মেয়ে সামান্য নয়। রাজার ঘরণী হবে। ঝাঁসীর অধিপতি গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নীবিয়োগ হয়েছে। দূত পাঠাও তার কাছে।

ভবিষ্যবাণী নিষ্ফল হলো না।

১৮৪২এ বৈশাখের এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে সানাই বেজে উঠল।

মহাসমারোহে অষ্টমী মনুকে ঝাঁসীর মহারাজের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ

করে গৌরীদান করলেন মোরোপন্ত তাম্বে।

পুরোহিত মনুর শাড়ীর আঁচল গঙ্গাধরের উত্তরীয়র সঙ্গে বাঁধছেন। অষ্টম বর্ষীয়া বালিক বললেঃ খুব ভাল করে গিঁট দিও। যেন খুলে না যায়।

নববধুকে নিয়ে গঙ্গাধর ঝাঁসীতে ফিরে এলেন।

মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে মনুর নব নামকরণ হলো, লক্ষ্মীবাঈ।

গরীবের মেয়ে আমাদের মনুবাঈ, রাজার ঘরণী লক্ষ্মীবাঈ আজ।

১৮৫৭এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি অনুজ্জ্বল প্রদীপ-শিখা, শ্রীমন্ত নানা সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাঈ!

এই সঙ্গে আরো একজনকে মনে পড়ছে।

আজিমুল্লা খাঁ।

দরিদ্রের ঘরে জন্ম নিয়েও স্বীয় অধ্যবসায় ও শ্রমে আজিমুল্লা ক্রমে শ্রীমন্ত নানাসাহেবের প্রধান পার্শ্বচর হয়ে উঠেছিলো একদিন।

দারিদ্র্যের জন্য আজিমুল্লাকে বালক বয়সে একদিন কোন এক ফিরিঙ্গীর ঘরে দাসত্বও করতে হয়েছিল।

ভৃত্য হলে কি হবে, অন্তরে তার সর্বদা জ্বলছে মুক্তির আগুন ধিকি-ধিকি! যেমন করেই হোক বড় হতে হবে, শির তুলে দাঁড়াতে হবে দশের একজন হয়ে— বালকের দৃঢ় পণ।

একজন শ্বেতাঙ্গের ঘরে বালক আজিমুল্লা সামান্য বাবুর্চির কাজ করে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে সময়টুকু পায়, কঠোর পরিশ্রম করে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা রপ্ত করে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাবুর্চি আজিমুল্লা ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা রপ্ত করে নিল। দু'টি ভাষাই এখন সে অনর্গল বলতে পারে।

মনে আরো আশা! বাবুর্চির কাজে ইস্তফা দিয়ে আজিমুল্লা কানপুরে চলে গেল স্কুলে অধ্যয়ন করবার ইচ্ছায়।

ক্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করে আজিমুল্লা ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা গ্রহণ করলে।

এই অসীম অধ্যবসায়ী যুবকটির কথা শ্রীমন্ত নানাসাহেবের কর্ণগোচর হ'তে খুব বেশী দেরি হয় না।

ব্রহ্মাবর্তের দরবারে উভয়ের পরিচয় ঘটল।

১৮৫৪ খৃঃ আজিমুল্লা শ্রীমন্ত নানাসাহেবের প্রধান অনুচর রূপে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়!

বিলাতের সুধীজন সমাজের মধ্যে ভারতীয় যুবকটি শীঘ্রই নিজগুণে আসন করে নেয়। অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মেও আজিমুল্লা অপূর্ব দৈহিক সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যে ছিল অতুলনীয়।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গাত্র, উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ গঠন, অতি সহজেই যে কেউ আজিমুল্লার প্রতি আকৃষ্ট হতো প্রথম দৃষ্টিপাতেই।

সাগরপারের বিড়ালাক্ষীরা সর্বদা ঐ সুশ্রী যুবকের আশে-পাশে মধুলোভী ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে ফিরত।

আজিমুল্লা ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ও বহু ধনবতী ইউরোপীয় মহিলা তার সঙ্গে বহুদিন পত্রবিনিময় করেছে। হায় রে ভালবাসা! এমনিই বুঝি অন্ধ চিরদিন!

ভারতীয় যুবকটিকে যেন তারা ভুলেও ভুলতে পারেনি।

আজিমুল্লাকে শ্রীমন্ত নানাসাহেব ইংলণ্ডে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁর প্রতি ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যে ঘোর অবিচার করেছে, তাঁর পিতৃদত্ত সিংহাসন ও রাজকীয় সম্মান হ'তে অন্যায়ভাবে জোর করে বিতাড়িত করেছে, তারই প্রতিকারার্থ ওকালতি করবার জন্য।

কিন্তু কোন ফলই হলো না। আজিমুল্লার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশকেই বহাল রাখল।

আজিমুল্লা স্পষ্টই বুঝতে পারলে, কাতর অশ্রুপাতে ও ভিক্ষায় ও-বস্তু মিলবার নয়। জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে।

যে সুবর্ণ-মুকুট তাদের অধিকারচ্যুত হয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হলে চাই তীক্ষ্ণ ধারালো অসি।

ঠিক ঐ সময় বিলাতে আর একজন ভাগ্য-বিড়ম্বিত ব্রাহ্মণ নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন: সাঁতারার রঙ্গ বাপুজি।

কিন্তু যাক ওসব কথা। কি বলছিলাম? শ্রীমন্ত নানাসাহেব। আজ এতদিন অন্তরের বাণী মুক্তির বেদনায় মূক হয়ে ছিল, সেদিন আমরা বলতে পারি নি, শ্রদ্ধা জানাতে পারি নি। কিন্তু আজ আর ভয় নেই, মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করে ঘোষণা করতে এসেছি সকলে আমরা ১৮৫৭র মুক্তি-সংগ্রামের বীর শহীদদের অতুলনীয় শৌর্য ও বীর্যের গাথা। তাদের রক্তদানের কাহিনী।

সহসা সেদিন ১৮৫৭র রক্ত-সংগ্রামের মধ্যে রক্তশতদলের মত যিনি বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং অকস্মাৎ আবার একদিন কোথায় অন্ধ যবনিকার অন্তরালে যিনি অবলুপ্ত হয়ে গেলেন: শুধু স্মৃতির পটে চিরজাগরূক হয়ে রইলো অনির্বাণ এক জ্যোতির্ময় অগ্নিশিখা, মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রদূত তাঁকে আজ আবার আমরা খুঁজে বের করতে এসেছি। তার মূর্তি গড়িয়ে দেশে দেশে করবো পূজা! দেবো প্রাণের প্রথম প্রণাম।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী শ্রীমন্ত নানাসাহেবের পালক-পিতা বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষরা একান্ত অন্যায়ভাবে নানা সাহেবের সমস্ত দাবী কলমের একটিমাত্র খোঁচায় নাকচ করে দেওয়ার পর সেই যে সেদিন আমরা সেই হতভাগ্য যুবকের ব্যথায় অশ্রুমোচন করে এসেছিলাম, তারপর দীর্ঘকাল আর তার সন্ধান নিতে পারি নি।

শুধু ১৮৫৭র মুক্তি-সংগ্রামে কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, হৃতসর্বস্ব সেই রাজ্যহারা, গৃহহারা যুবক ভ্রাম্যমাণের বেশে ভারতের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে

বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন এক মহাবিপ্লবের বাণী! ওঠো! ভারতবাসী জাগো! আমাদের দাবীকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তবে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও ঘরে ঘরে।

নিষ্ঠাবান সর্বজনের অপরিচিত দরিদ্র পিতার ঘরে জন্মেও শ্রীমন্ত নানা সাহেবের বুকের মধ্যে যে আশার কুসুম মুকুলিত হয়ে উঠেছিল স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মুক্তির জন্য, তারই স্বর্গীয় সৌরভে ১৮৫৭র পৃষ্ঠাগুলো আজিও বুঝি সুরভিত!

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

শ্বেতাঙ্গের দুয়ারে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েও যখন তাঁকে লগুড়াহত হয়ে ফিরে আসতে হলো অপমানের দুঃসহ জ্বালা বুকে করে, সে লজ্জার গ্লানিকে যুবক শ্রীমন্ত নানা কোনদিনও কি ভুলতে পেরেছিলেন!

পিতৃ-অধিকার হতে বিচ্যুত হয়ে গঙ্গাতীরবর্তী ব্রহ্মাবর্তে শ্রীমন্ত নানা বসবাস শুরু করেন এক প্রাসাদোপম সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে।

ইংরাজের কলঙ্ক-মসী যদি শ্রীমন্ত নানাকে কলঙ্কিত করতে পারত, যদি তাদের সব চেষ্টা সফল হতো, তবু আজ আমরা বলতাম অকুণ্ঠচিত্তে সেই দেশ-প্রেমিকের অমিত বিক্রমকাহিনী! বলতাম আমাদের দেশের কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েঃ

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।

শেষ পর্যন্ত ইংরাজের চক্রান্তে শ্রীমন্ত নানাসাহেবের ব্রহ্মাবর্তের উত্তরাধিকারিত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়।

এবং সেদিনকার ইংরাজদের অত্যাচারের প্রত্যুত্তরই এলো পরবর্তীকালে ১৮৫৭-য় কানপুর হ'তে।

রক্তস্রোতে কানপুরের পথের ধূলি রাঙা হয়ে গেল। খণ্ডিত বিখণ্ডিত অসংখ্য মৃতদেহ।

প্রজ্বলিত হুতাশন দিয়েছিল সেই অত্যাচারের জবাব।

সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি নরপিশাচ নীলের প্রতিহিংসানলে প্রজ্বলিত রক্তাক্ত এলাহাবাদের পথ হ'তে বিদায় নিয়ে এসেছিলাম।

হঠাৎ স্মৃতিপথে লক্ষ্মী ও শ্রীমন্ত নানার কথা উদিত হওয়ায় একান্ত বিচলিত হয়ে বুঝি ক্ষণিকের জন্য পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম।

আবার ফিরে যাই চল সেই মুক্তিসংগ্রামের রক্ত-রেখাঙ্কিত পথরেখা ধরে। পশ্চাতে পড়ে রইলো মীরাট, দিল্লী, বারাণসী, জৌনপুর, এলাহাবাদ।

এগিয়ে যাই এবার কানপুরের দিকে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জলধারা-পথে যেন প্রবাহিত হয়ে গেছে সেই মহাবিপ্লবের প্রাণরস ভারতের দিক হতে দিগন্তে।

বারাকপুর, বহরমপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর।

মা গঙ্গে! শিশুকালে রামায়নে পড়েছিলাম, তোমার আবির্ভাবের কাহিনী, একদা কোন স্মরণাতীত ভগীরথ তোমায় স্বর্গ হতে শঙ্খ বাজিয়ে এই ধরাধামে বহিয়ে এনেছিল বুঝি আমাদেরই স্বাধীনতা সংগ্রামের সাক্ষ্য দিতে!

১৮৫৭ সালের বুকে কবে মিলিয়ে গেল; কিন্তু তুমি আছো আজও তেমনি।

তুমি দেখেছিলে আমাদের সেই পলাশীর প্রান্তরে পাপের প্রায়শ্চিত্তের রক্ত-তর্পণ!

তাই এই সঙ্গে তোমাকেও জানাই প্রণাম।

কানপুর!

উত্তরে অযোধ্যা, দক্ষিণে এলাহাবাদ।

ঐ সময়ে কানপুরে প্রায় তিন হাজার ভারতীয় সৈনিক ফিরিঙ্গীর তাঁবে ছিল, এবং ৬০ জন গোরা গোলন্দাজ সৈনিক এবং কতিপয় শ্বেতাঙ্গ অফিসার ছিল।

এছাড়াও পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহীদলে ছিল ৬৭ জন ইংরাজ অধিনায়ক।

সৈনিকদলের অধ্যক্ষ তখন সেনাপতি স্যার হিউ হুইলার।

মীরাট দিল্লীর অভ্যুত্থানের সংবাদ কানপুরেও এসে পেঁাচেছে। মুক্তির ডাক এসে পেঁাচেছে, আর কি কেউ চুপ করে থাকতে পারে!

প্রাণে লেগেছে তাদেরও দোলা।

সৈন্যাধ্যক্ষ হুইলার সশংকিত! কখন কি হয়!

ক্ষণে ক্ষণে আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণ। আর দেরি করা উচিত নয়, চিন্তিত সেনাপতি হুইলার অনেক চিন্তার পর অস্ত্রাগারের দক্ষিণ পূর্বদিকে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের জন্য চতুর্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত যে দু'টি চিকিৎসালয় ছিল, সেই জায়গা আত্মরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করলেন।

অনতিবিলম্বে স্থানটিকে চারিপাশ হতে নতুন প্রাচীর তুলে আরো সুরক্ষিত করা হলো, পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যাদিও সেখানে সংগৃহীত হলো।

গঙ্গাতটে অবস্থিত সুরক্ষিত গোলাবারুদপূর্ণ অস্ত্রঘরকে নিরাপদ না ভেবে আত্মরক্ষার জন্য প্রধান সেনাপতি যে স্থানটি বেছে নিল, অলক্ষ্যে নির্মম প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে সেখানেই নিজহাতে ফিরিঙ্গীরা রচনা করে নিল নিজেদের কবরখানা।

মর্দিত-পুচ্ছ শাদুলের মত শ্রীহীন শ্রীভ্রষ্ট শ্রীমন্ত নানাসাহেব তখন সুযোগের অপেক্ষায় অধীর চিত্তে কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুরে বসে আছেন।···

মন্ত্রণাদাতা তাঁর আজিমুল্লা ও বীরশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক তাঁতিয়া টোপি।

চতুর নানার ব্যবহারে ফিরিঙ্গীরা মুহূর্তের জন্যও বুঝতে পারে নি সেদিন কতখানি তীব্র জ্বালা অহর্নিশি বুকের মধ্যে চেপে রেখে, বাইরে তিনি মিষ্ট-কথায় ফিরিঙ্গীদের তুষ্ট করছেন।

ইংরাজ কর্তৃপক্ষ নানা সাহেবের হাতেই ধনাগার রক্ষার ভার দেয়।

তিনশত সৈন্য ও দুইটি কামান নিয়ে নানাসাহেব কানপুরে এসে উপস্থিত হলেন।

সঙ্গে এলেন বীর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি।

সেনাপতির আত্মরক্ষার আয়োজন চলেছে পূর্ণোদ্যমে!

প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বে কামান সব সুসজ্জিত হচ্ছে।

প্রাচীরের বাইরে সৈনিক-নিবাসে চলেছে শতবর্ষ পরে বিরাট অভ্যুত্থানের আয়োজন।

ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ১৮৫৭র যে অভ্যুদয় হয়েছিল, তার পরিকল্পনা হয়েছিল শ্রীমন্ত নানাসাহেবের ব্রহ্মাবর্তের নিভৃত প্রাসাদে।

তাঁর পাশে সেদিন যারা দৃঢ়পণে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে নানার আত্মীয় ও ভ্রাতা বাবা সাহেব, বালা সাহেব এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেবের কথা হয়ত অনেকেই জানে না।

তা ছাড়া ছিল আজিমুল্লা খাঁ ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই ও মহারাষ্ট্র-সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি।

বার বার সেই মহারাষ্ট্র-সেনাপতি বীর চূড়ামণি তাঁতিয়ার মুখখানি স্মৃতি-পথে জেগে উঠছে আজ।

যাঁদের স্মৃতির অরুণরাগে আজিও ১৮৫৭ সাল রাঙা হয়ে আছে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত-রঙিন পাতাগুলো যাঁদের গৌরবে অমর হয়ে রইল, তাঁদেরই একজন তাঁতিয়া টোপি।

শ্রীমন্ত নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, লক্ষ্মীবাঈ, আজিমুল্লা, কুমার সিং, জিন্নতমহল এঁরাই ছিলেন সেদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক উদ্যোক্তা। বুকের রক্ত দিয়ে এঁরা স্বাধীনতার দরবারে বিকিয়ে গেলেন।

১৮৫৭এর এপ্রিল মাসে শ্রীমন্ত নানাসাহেবই আজিমুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান শহর ও নগরগুলিতে পর্যটন করে আসন্ন মুক্তি-সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন এবং সেই সংগ্রামের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনও স্থির করেছিলেন; কিন্তু সেই নির্দিষ্ট দিনের আগেই যখন মীরাট ও দিল্লী অভ্যুত্থানের পথে এগিয়ে গেল, সেই সময় হতেই ব্রহ্মাবর্তে উদ্যোগ আয়োজন চলতে থাকে এবং স্থির হয় জুনের প্রথম সপ্তাহেই সংগ্রাম শুরু করা হবে কানপুরে।

গোপন পরামর্শের আদানপ্রদান চলত সুবাদার টিকা সিংয়ের গৃহে ও সিপাহীদের নায়ক সামসুদ্দীন খানের গৃহে।

সেপাইদের মুখপত্র ছিল সুবাদার টিকা সিং।

সেই এসে নানাসাহেবকে সংবাদ দেয়: যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমান সেপাই, সবাই প্রস্তুত। সবাই চায় এই হীন দাসত্ব হ'তে মুক্তি—চায় অত্যাচারের অবসান। সবাই এখন শ্রীমন্ত নানার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

১লা জুন সন্ধ্যার ম্লান অস্পষ্ট আলোয় গঙ্গার মধ্যে একখানা ভাসমান

নৌকা-বক্ষে শ্রীমন্ত নানাসাহেব, তাঁর ভাই বালা রাও, আজিমুল্লা ও সুবাদার টিকা সিংয়ের গোপন পরামর্শ হয়ে গেল, কি উপায়ে কখন কেমন করে যুদ্ধ শুরু হবে। আলোচনার পর সকলেই ভাগীরথীর পুণ্যবারি স্পর্শ করে দৃঢ়কঠিন কণ্ঠে শপথ উচ্চারণ করলেঃ দেশের জন্য আমরা প্রাণ দেবো। স্বাধীনতা লাভই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মাথার উপরে নিশীথের নক্ষত্র-খচিত আকাশ।

চারিদিকে অসীম স্তব্ধতা।

বায়ুবিক্ষোভিত গঙ্গাবক্ষে বীচিমালার কুলু কুলু শব্দ।

অদূরে আলোকিত কানপুর শহর।

শ্রীমন্ত নানার আদেশ শোনা গেলঃ প্রতিজ্ঞা কর, আমরা দেশের জন্য প্রাণ দেবো।

প্রত্যুত্তর শোনা গেল দৃঢ়কণ্ঠেঃ আমরা দেশের জন্য প্রাণ দেবো।

মৃদুমন্দ তরঙ্গাঘাতে গঙ্গাবক্ষে নৌকাখানি দুলছে।

এই মরণপ্রতিজ্ঞা আর কেউ শুনলে না, শুনলে কেবল গঙ্গার প্রবহমাণ গৈরিক জলধারা।

ঐ দলে ছিল সামসুদ্দীন। একথা সে গোপন রাখতে পারলো না। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে সে তার প্রিয় নর্তকী আজিজানের গৃহে এসে প্রবেশ করল।

সামসুদ্দীনের মুখের দিকে তাকিয়ে আজিজান প্রশ্ন করেঃ ব্যাপার কি! চোখের দৃষ্টিতে যে আনন্দ একেবারে উপ্‌চে পড়ছে!

ঃ চুপ্‌! আস্তে কথা বল! চারিদিকে শত্রুর চর, ঘরের দেওয়ালেরও কান আছে।

আজিজানের কাজলটানা দু'টি চোখের দৃষ্টি আগ্রহে চক্‌-চক্‌ করে ওঠেঃ কি!

ঃ আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের পরিকল্পনা আজ স্থির হয়ে গেল। শত বৎসরের অত্যাচারের প্রতিশোধ! শহরের রাস্তা ফিরিঙ্গীর রক্তে লাল হয়ে ভেসে যাবে।

ঃ পারবে নিতে প্রতিশোধ?

ঃ নিশ্চয়ই।

১লা জুনের সন্ধ্যায় নেতাদের গোপন পরামর্শ যখন চলেছে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকার ওপরে, স্যার হিউজ হুইলার লর্ড ক্যানিংকে পত্র লিখছেনঃ কানপুরে ভয়ের কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। নানা সাহেবের হাতে অস্ত্রাগার ও ধনাগারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। কানপুরে আর অশান্তির কোন আশঙ্কা নেই বলেই লক্ষ্ণৌতে সৈন্যসাহায্য প্রেরণ করছি।

৩রা জুন এলাহাবাদ হ'তে যেসব গোরা সৈন্য কানপুরের আসন্ন বিপদে সাহায্যার্থে এসেছিল তারা লক্ষ্ণৌর দিকে প্রেরিত হলো।

কারও মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই।

চারিদিকে যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে।

রাত্রি প্রভাত হলো। ৪ঠা জুন।

আকাশ নির্মেঘ। নীলকান্তমণির মত সূর্যকিরণে যেন ঝলমল করছে।

বৈশাখের শেষ ঃ মাঝে মাঝে রৌদ্রতপ্ত হাওয়া হু হু শব্দে ছুটে যায়।

ক্রমে দিনমণি অস্তাচলমুখী হলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

ঘরে ঘরে জ্বললো প্রদীপ!

রাত্রি। নিঃসীম রাত্রি। সৈনিক, ঘুমালে তো চলবে না! সময় এগিয়ে আসছে!

কান পেতে শোন! শুনতে পাচ্ছ কি?

চোখে আমাদের কারোরই ঘুম নেই। বুকের মধ্যে অনুভব করছি সেই রুদ্র ভৈরবের পায়ের সাড়া।

সেই প্রলয়ংকর নটরাজের আবির্ভাব।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥

গভীর রজনীর নিস্তব্ধতাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে শোনা গেল পর পর তিনটি গুলির শব্দ—দুড়ুম! দুড়ুম! দুড়ুম!

দূর আকাশের ভালে দেখা গেল রক্তিম লেলিহ আগুনের শিখা।

সংগ্রাম হলো শুরু। তারই সংকেতধ্বনি।

মুহূর্তে দলপতি সুবাদার টিকা সিং তার প্রিয় অশ্বের পৃষ্ঠে লাফ দিয়ে উঠে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক সৈনিক অশ্বারূঢ় হয়।

ছুটে চলে বেগবান অশ্বে চেপে মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকরা ঃ এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ-ব্রত উদ্‌যাপন এবারে শুরু হোক!

নির্মম। কঠোর সৈনিক! ভুলো না তুমি দেশের পায়ে উৎসর্গীত! তোমার প্রাণ, তোমার দেহ সব দেশের!

আকাশ বাতাশ ধ্বনিত হয়ে ওঠে দীন্ দীন্ গর্জনে।

স্বদেশ হামারা! হামারা হিন্দুস্থান!

ভাইয়ো, দেশকে লিয়ে কোরবাণী!

দলে দলে অশ্বারোহী সৈনিকদের পাশে এসে দাঁড়ায় অশ্বারোহী সৈনিকদের দল।

কর্ণেল ইওয়ার্ট এর মিনতি শোনা যায় ঃ মেরে বেটা। মেরে বাচ্চা; ই কেয়া কর রহে তোমলোক্! তোমাদের এতদিনের আনুগত্য নষ্ট করে কেন নিজেরা নিজেদের মুখে কলংক-কালি লেপন করছো! লোকে শুনলে বলবে কি!···ছিঃ ছিঃ, শান্ত হও।

কঠিন অট্টহাসে দিগন্ত প্রকম্পিত হয়ে ওঠে বুঝি।

মিষ্টি ভুয়ো হিতোপদেশ শুনবার মত আজ এই মুহূর্তে সময়ের প্রাচুর্য কই!

নাই ! নাই ! নাই যে সময় !

তীরবেগে ছুটে চলে সব নবাবগঞ্জের দিকে ।

শ্রীমন্ত নানাসাহেবের তাঁবু যে নবাবগঞ্জে ।

নবাবগঞ্জের ধনাগারে নানার অধীনস্থ সৈন্যের দল যে তাদেরই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে ।

ধনাগারের বাইরে আগত সৈনিকদের বিজয়-উল্লাস শোনা গেল ।

ঃ ভাই সব এসেছো ! আমরাও প্রস্তুত ! এসো দুয়ার খোলাই আছে !

সুবিপুল ধনাগার ও অস্ত্রাগার মুহূর্তে মুক্তি-সৈনিকদের করায়ত্ত হয় ।

৪ঠা জুনের রাত্রি প্রভাত হলো কানপুরে ।

৫ই জুনের নবোদিত রক্তিম সূর্য কানপুরবাসীর কাছে এনেছে এক নবীন বার্তা !

আরো তিনশত সৈনিক এসে নানাসাহেবের দলে যোগ দিয়েছে প্রভাতে ।

সংগ্রামের নেতারা সব মিলিত হয়েছে নবাবগঞ্জে ।

শ্রীমন্ত নানাসাহেব, দুই ভাই বালা সাহেব ও বাবা সাহেব, ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, আজিমুল্লা ।

সবাই হয়েছে প্রস্তুত সমস্ত রাত্রি ধরে ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসের অভিযান চালাতে, যত শীঘ্র সম্ভব কানপুর নিজেদের করায়ত্ত করতে ।

রণোন্মাদ মুক্তি-সৈনিকের দল চীৎকার করে ওঠে ঃ কোথায় আমাদের রাজা, আমাদের দলপতি শ্রীমন্ত নানাসাহেব ! তাকে আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে চাই ।

এর পরও আর কি স্থির থাকতে পারে কেউ !

নানাসাহেব সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন ।

হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঃ সুস্বাগতম্ ! জয়োঽস্তু !

সকলেই একযোগে নানাকে রাজা বলে স্বীকার করে নেয় । জানায় তাদের অন্তরের অসীম শ্রদ্ধা ও প্রণাম ।

এবারে সমরের আয়োজন । নানাসাহেবের আদেশ প্রচারিত হলো ঃ সুবাদার টিকা সিং ! আপনাকে অশ্বারোহী সৈনিকদের নেতৃত্ব দেওয়া হলো । আজ হতে আপনি আর ইংরাজের তাঁবে সুবাদার নন । ভারতীয় বাহিনীর একজন সম্মানিত সেনাপতি (জেনারেল) । জমাদার দলগঞ্জন সিং, আপনি হলেন শত গণিত বাহিনীর দলপতি । সুবাদার গঙ্গাদীন আপনি হলেন ৫৬ গণিত বাহিনীর নেতা ।

এ সংবাদ শ্বেতাঙ্গমহলে পেঁছুতে দেরি হলো না ।

ভয়ে ও আশংকায় সর্বাঙ্গ তাদের কণ্টকিত হয়ে ওঠে ।

সবাই এসে প্রাণভয়ে তাদের নবনির্মিত সুগঠিত প্রাচীর-বেষ্টিত আশ্রয়ে একত্র হয়ে সৈনিকদের প্রতিরোধের জন্য কামান ও অস্ত্রশস্ত্র সাজাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ।

নানাসাহেবের হুকুমে ওদিকে সৈনিকের দল শ্বেতাঙ্গদের ঐ সুরক্ষিত আশ্রয়

দুটিই অধিকার করবার জন্য বীরদর্পে এগিয়ে আসছে ঝড়ের গতিতে।

৬ই জুন প্রাতে দুর্গাধিপতি স্যার হুইলার নানাসাহেবের প্রেরিত একখানি সাবধান লিপি পেলেন : আমরা অবিলম্বে আক্রমণ সুরু করবো। তাই পূর্বাহ্ণেই তোমায় জানিয়ে দিলাম, যাতে প্রস্তুত হয়ে নিতে পারো।

সর্বনাশ! এ যে যুদ্ধে আহ্বান!

সাজ সাজ রব পড়ে গেল মুহূর্তে ইংরাজ-শিবিরে।

প্রস্তুত হও, পদদলিত পেশবা নানার সৈন্যবাহিনী কানপুর অধিকার করতে আসছে।

আট

সংবাদ এসেছে, শ্রীমন্ত নানাসাহেবের সৈন্যবাহিনী ছুটে আসছে তীরবেগে কানপুর অধিকার করতে।

প্রথমেই ধনাগার ও অস্ত্রাগার সেপাইরা অধিকার করে নেয়।

সৈনিকদের হাতে প্রভূত অর্থ এসেছে এবং বহু কামান, গোলাগুলি বারুদ এসেছে।

৬ই জুন। সহসা মধ্যাহ্নের আকাশ বহুশত লোকের বিজয়-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়। একসাথে বহু কামান গর্জে ওঠে। সেই সঙ্গে প্রাচীর-বেষ্টিত আশ্রয়স্থল হ'তে শ্বেতাঙ্গদের কামানও গর্জে উঠল।

শুরু হয়ে গেল দুই পক্ষে সংগ্রাম।

চারিদিককার প্রাচীর ধূলিমুষ্ঠির মত কামানের গোলায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে রেণু রেণু হ'য়ে। শ্রীমন্ত নানার চারিপাশে এসে দলে দলে সবাই ভিড় করে দাঁড়ায়—প্রাণদানের প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

নানার প্রচণ্ড কামান ও গোলাগুলির মুখে কানপুরের পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

প্রধান সেনাপতি টিকা সিং বিজয়-গৌরবে মুক্তিসংগ্রামের পথে এগিয়ে চলে। কানপুরের সেদিনকার সেই মুক্তি সংগ্রামে শুধু পুরুষরাই অস্ত্রধারণ করেছিল তা নয়, কানপুরের জেনানারাও বোরখা ও অন্তঃপুরের পর্দা ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে এল : মুক্তির লাগি দিতে হবে প্রাণ!

নর্তকী 'আজিজান'! কোথায় তার কাঁচুলী, রঙ্গীন রেশমী ওড়না, কোথায় সিঁথি স্বর্ণকেয়ূর, কোথায় চরণের নূপুর, রক্তিম ওষ্ঠের প্রাণমাতানো হাসি, বাঁকা চোখের বিলোল চাউনি! সেও আজ অভিনব বেশে মৃত্যু সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে, হাতে সুতীক্ষ্ন অসি, বিদ্যুতের মত যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে চমক্ হেনে যায়।

বীরগণ! বীরের মত প্রাণ দাও, দেশকে তোমাদের স্বাধীন মুক্ত কর।

এদিকে চলেছে মুক্তির লাগি সংগ্রাম ; অন্যদিকে সেই বিপ্লবের মুহূর্তেও শৃঙ্খলা ও আইন এনে শান্তি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট সংগ্রামের নায়ক শ্রীমন্ত নানা সাহেব।

নগরবাসীদের একত্র ডেকে সম্মতিক্রমে হোলাস সিংকে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

সেনাবাহিনীর সকল প্রকার চাহিদা মিটাবে—মোল্লা।

বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো। বিচারপতি নির্বাচিত হয়েছেন—জওয়ালা প্রসাদ, আজিমুল্লা খান ও আরো দু'একজন। প্রধান কর্মসচিব—বাবা সাহেব।

অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকল্পে নানা কুলিশ-কঠোর। লৌহকঠিন হাতে হয় মীমাংসা।

১২ই জুন ইংরাজের দুর্গ আক্রমণ করা হলো।

উভয় পক্ষের কামান গর্জন ও গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে চললো মুক্তি-সংগ্রাম।

১৮ই জুন সেই স্মরণীয় দিনটি: ফিরিঙ্গীদের সমস্ত কামান গর্জন ও গোলাগুলিকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এল বীর সৈনিকের দল। প্রাচীর উল্লংঘন করে অধিকার করলে বিপক্ষের কামান।

বহুকাল পরে আবার শ্বেতাঙ্গ-অধিকৃত দুর্গে উড্ডীন হলো সেদিন আমাদের বিজয়পতাকা। কিন্তু সেই মুহূর্তে কারা দেশদ্রোহীর দল এদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এল!

বিশৃংখলা, চারিদিকে গোলযোগ, হটে আসতে বাধ্য হলো মুক্তি-সৈনিকের দল।

একটু থাম! শোন, কান পেতে শোন!

আজ ২৩শে জুনের রাঙা প্রভাত। মনে পড়ে কি পলাশীর প্রান্তরে সেই ২৩শের অভিশপ্ত সূর্যোদয়! বাংলার মাটিতে তথা ভারতে শ্বেতাঙ্গ শক্তির প্রথম অভ্যুদয়ের সর্বনাশা ইঙ্গিত!

ভুলিনি সেই ২৩শে জুনের অপমানের তীব্র জ্বালা। দীর্ঘ একশত বৎসর ধরে সেই বিষের জ্বালায় জর্জরিত আমরা। দীর্ঘ একশত বৎসরের নিরন্তর রক্তক্ষরণের আজ বুঝি অবসান।

নানার সৈনিক-নিবাসে আজ ২৩শে জুনের প্রভাতে কিসের কলরোল? কেন আজ এত চাঞ্চল্য?

সবার মুখেই আজ কঠিন মৃত্যুপণ আগুনের শিখার মত জ্বলছে।

পদাতিক অশ্বারোহী কামানবাহী সবাই সেজেছে আজ শেষ সংগ্রামের তরে।

হয় স্বাধীনতা—নয় মৃত্যু!

শেষ সংগ্রাম ব্যর্থ হলো না।

রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল। ২৩শে জুন, ২৪শে জুন, ২৫শে জুন, অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ: উড়ছে শ্বেতাঙ্গদের দুর্গে আমাদের বিজয়বৈজয়ন্তী।

হে স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক! হে জাতীয় পতাকা! প্রায় একশত বৎসর পরে আবার প্রণাম জানাই।

কানপুরের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। কানপুর আজ আমাদেরই করতলগত।

নানা সাহেবের হুকুম হলো : থাম বীর ! যুদ্ধ থামাও ! আর রক্তপাত নয়, এবারে শান্তি।

নানার নির্দেশে এক শ্বেতাঙ্গ রমণীর হস্তলিখিত ঘোষণাপত্র প্রধান শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি হুইলারের কাছে প্রেরিত হলো : শোন রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাবৃন্দ ! তোমাদের মধ্যে যারা শয়তান ডালহৌসির চক্রান্তে না যোগ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণে প্রস্তুত, তাদের কোন ক্ষতিই করা হবে না। নির্বিবাদে এলাহাবাদে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সেনাপতি হুইলার ঐ চরমপত্র পেয়ে ক্যাঃ মুর ও হুইটিংএর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেন, নানার নিকট আত্মসমর্পণ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

অতএব......।

২৬শে জুন প্রাতে উভয়ে উভয়দলের নিকট চুক্তিবদ্ধ হলো : শ্বেতাঙ্গ দলপতি সমস্ত কামান, গোলাগুলি, বারুদ ও অর্থ যাবতীয় সব কিছু আমাদের হাতে অর্পণ করবে। বিনিময়ে নানাসাহেব অবরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গদের নিরাপদে এলাহাবাদে পৌঁছে দেবেন।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো।

স্থির হলো পরদিন প্রত্যুষে শ্বেতাঙ্গদের স্থানান্তরিত করা হবে।

অস্ত্র-সমর্পণও শেষ হলো নির্বিঘ্নে। নিরস্ত্রীকরণ নয়। ভারতীয় সৈনিকদের নিরস্ত্রীকরণ নয়, শ্বেতাঙ্গদের অস্ত্রসমর্পণ ও আত্মসমর্পণ।

নানার নিকট অস্ত্র সমর্পণের পর বিগ্রেডিয়ার জওয়ালপ্রসাদ সগৌরবে শ্বেতাঙ্গদের দুর্গ এসে অধিকার করলে।

তাঁতিয়া টোপির নির্দেশে চল্লিশটি নৌকাও প্রস্তুত রাখা হলো।

অধিকারচ্যুত শ্বেতাঙ্গদের দল কানপুর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত।

কানপুরে শ্রীমন্ত নানাসাহেবের বিজয়-বার্তা ততক্ষণে চারিদিকে পেঁৗছে গেছে লোকের মুখে মুখে।

চারিদিক হতে তরুণ সৈনিকের দল এসে মিলিত হচ্ছে নানার পতাকাতলে : মহারাজ ! মোরা সবে হবো তব সাথী !

আজিমগড় হতে এসেছে সপ্তদশ পদাতিক সৈন্যদল। চৌবেপুর হতে লক্ষ্ণৌর কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। এসেছে বারাণসী হতে, এলাহাবাদ হতে।

আরো এসেছে সম্ভ্রান্ত ভুস্বামী নবাবের দুই দল সৈন্য।

সবাই দিচ্ছে সহানভুতি। কেউ পাঠাচ্ছে অর্থ, কেউ লোকবল। এবং এদের পিছু পিছু কত এল অত্যাচারে জর্জরিত বিভিন্ন নগরবাসী স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে। শান্তিতে তারা বাস করতে চায় শ্রীমন্ত নানার আশ্রয়ে কানপুরে।

২৭শে জুনের প্রভাত।

লজ্জায় অধোবদন ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর প্রায় ৪৫০ জন সমবেত।

সতীচৌরা ঘাট।......

প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী সূর্যকরোজ্জ্বলা, বীচিভঙ্গে ক্রীড়াময়ী।

সারি সারি ঘাটে সব নৌকা প্রস্তুত।

দলে দলে ইংরাজ পুরুষ রমণী শিশু শ্লথ মন্থর গতিতে ঘাটের কাছে এসে উপস্থিত হলো।

পশ্চাতে দূর হতে দেখা যায় অধিকৃত শ্বেতাঙ্গ দুর্গ।

মৃত্যুর মত কঠিন স্তব্ধতা চারিদিকে।

সতীচৌরা ঘাটের সন্নিকটস্থ হরদেবের মন্দিরের পাষাণচত্বরে দণ্ডায়মান—আজিমুল্লা খান, বালা সাহেব, প্রধান সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি।

আর গঙ্গার ঘাটের চতুপার্শ্বে ভিড় করেছে প্রায় সমগ্র কানপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা! কেন?

কেন এসেছো সবাই আজ ভাগীরথী তীরে? কি দেখতে এসেছো? কি দেখতে চাও?

সুসজ্জিত অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য আদেশের প্রতীক্ষায় স্থির ধীর অচঞ্চল দণ্ডায়মান চতুর্দিকে।

একে একে শ্বেতাঙ্গরা নৌকারোহণ করলে, এবারে বুঝি নৌকা ছাড়বে!

সহসা সেনাপতি তাঁতিয়া টোপির হস্ত উত্তোলিত হয়ে বামে ও দক্ষিণে আন্দোলিত হলো: ইঙ্গিত, কিসের ইঙ্গিত!

মুহূর্তে ২৭শে জুনের ধীর গম্ভীর সূর্যকরোজ্জল প্রভাতের বক্ষ বিদীর্ণ করে সহস্র কামান ও বন্দুক একসাথে মৃত্যু-গর্জন করে ওঠে!

ধ্বংস করো। ফিরিঙ্গী ধ্বংস করো।

ধোঁয়া…বারুদ…অগ্নি…প্রচণ্ড বিস্ফোরণ…আর্ত কোলাহল!

১৭৫৭এর পলাশীর প্রান্তরের ২৩শে জুনের রক্ত তর্পণ। ২৭শে জুন ১৮৫৭-এর কানপুরে ভাগীরথী তীরে।

ন্যায় কি অন্যায় সে বিচার আজ নয়।

২৭শে জুন প্রাতে শ্বেতাঙ্গরা অস্ত্রহীন, অসহায় ছিল বটে। কিন্তু জাফরগঞ্জ প্রাসাদের অন্ধকার কারাকক্ষে তরুণ কিশোর নবাব সিরাজ, তার হাতে কি অস্ত্র ছিল শুনি, যখন ইংরাজদের প্ররোচনায় তীক্ষ্ণ খরসান হাতে মহম্মদী বেগকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল? কে সে-কথা শোনেনি? কোন্ ইংরাজ সেদিন মহারাজ নন্দকুমারের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিল শুনি? কারা ন্যায়বিচার করে সেদিন ৫ই আগষ্ট মহারাজকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল শুনি?

মা গঙ্গে পতিত-পাবনী তুমি সাক্ষী! তুমি সাক্ষী। পলাশীর প্রান্তরে তুমি সাক্ষী ছিলে গঙ্গার ঘাটে কুলির বাজারে। আজ তাই তোমায় সাক্ষী মানলাম ২৭শে জুনের প্রভাতে কানপুরে।

২৮শে জুন।

স্বাধীন কানপুরে নানাসাহেবের দরবার-গৃহ। সম্মুখে প্রশস্ত ময়দানে দেশীয় সৈনিকদের কুচকাওয়াজ। ভেরীর ধ্বনি।

শ্রীমন্ত নানাসাহেব দরবার-গৃহে এসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে

ধ্বনিত হলো: সুস্বাগতম্ !—ভাই সব ! আজিকার এ গৌরব শুধু একা আমারই নয়, তোমরাও সকলেই তার অংশীদার, তোমাদের সকলেরই গৌরব আনন্দ !

ইতিহাস-বিশ্রুত পেশোবার রত্ন-মাণিক্য-খচিত সিংহাসন আজ স্থাপন করা হয়েছে দরবার-গৃহে ; বিজয়-তিলক ললাটে এঁকে পেশোবা আজ সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছি।

বিস্তৃত দরবার-গৃহে অগণিত মনুষ্য সমাগমে তিল ধারণেরও বুঝি আর স্থান নেই। আনন্দাশ্রুতে আঁখির দৃষ্টি ধুয়ে নিলাম বার বার।

অন্তরের অন্তস্তল হতে প্রণতি জানালাম ১৮৫৭এর মুক্তিসংগ্রামের প্রধান হোতা ও ঋত্বিক অবিনশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ী মহারাষ্ট্র কুলরবি পেশোবা শ্রীমন্ত নানা সাহেবকে !

২৬শে জুন আর ১৭ই জুলাই।

কিন্তু তারও আগে চল এগিয়ে যাই অযোধ্যার পথে, ইতিহাস-বিশ্রুত লক্ষ্ণৌ শহরে ও আমাদের মনুয়ার ঝাঁসির রক্তস্নাতা সমরাঙ্গনে।

উড়ুক কানপুরে ততদিন স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা।

অযোধ্যা ! ডালহৌসীর চক্রান্তে ফিরিঙ্গীদের কবলিত হৃতভ্রষ্ট অযোধ্যা !

আজ অযোধ্যার নবাব শ্রীভ্রষ্ট। নেই তার কোন সৈন্য-বাহিনী, জনবল বা অর্থবল। পরমুখাপেক্ষী ভীত সন্ত্রস্ত।

জমিদার ও রাজাদের সমস্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি ভূলুণ্ঠিত।

স্যার হেনরী লরেন্স অযোধ্যার বর্তমান প্রধান কর্মসচিব।

এদিকে মিষ্ট স্তোক্‌বাক্যে হেনরী লরেন্স আপ্রাণ চেষ্টা করছে অযোধ্যাবাসীর অন্তরের জ্বালাকে নিবৃত্ত করতে, অন্যদিকে অযোধ্যাবাসী পরাধীনতার বিষ-জ্বালায় তিল তিল করে মুক্তির জন্য হচ্ছে প্রস্তুত।

শ্রীমন্ত নানাসাহেবের মুক্তির ডাক ব্যর্থ হয়নি। শৃঙ্খল ভাঙতে হবে, আবার স্বাধীন হতে হবে।

হিন্দু নেতা মানসিং, মুসলীম নেতা মৌলভী আহম্মদ শাহ্ প্রভৃতি গোপনে গোপনে ছড়ায় মুক্তির বাণী জনে জনে: জাগো, অযোধ্যাবাসী জাগো ! প্রতিজ্ঞা কর, হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু ! বল দেশের জন্য প্রাণ দোব !

এদিকে সংবাদ এসেছে, মীরাট জেগেছে ! দিল্লী স্বাধীন, মসনদে বসেছেন আবার আপন গৌরবে সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্।

ভারত আবার স্বাধীন হতে চলেছে, আর বেশী দেরি নেই ! দিন আগত ঐ !

দূরদর্শী হেনরী লরেন্স লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবন ও রেসিডেন্সী বিপদকালে আশ্রয়স্থল হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে।

৩০শে মে সন্ধ্যায় সহসা ভেসে এলো রাইফেলের রুদ্ধ গর্জন !—স্বাধীনতার

জয়ধ্বনি : দুমু! দুড়ুম!

অযোধ্যাও জ্বালালো ১৮৫৭এর আগুন!

৩১শে মে হতে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চললো অযোধ্যায় মরণপণ মুক্তিসংগ্রাম। মাত্র দশ দিনে শ্বেতাঙ্গ-প্রতিপত্তি ধূলায় পর্যবসিত হলো।

১০ই জুন চলেছে বিজয়ী সৈনিকের দল লক্ষ্মৌর পথে। এবারে লক্ষ্মৌর সংগ্রাম। লক্ষ্মৌর চারিদিকে এসে দলে দলে ভারতীয় সৈনিকেরা ভিড় করেছে। ২৮শে জুন লক্ষ্মৌতে সংবাদ এসেছে—কানপুর স্বাধীন; ইংরাজ অধিকারচ্যুত লৌহ-ব্রিজের নিকটে ইংরাজ-সৈন্যরা এসে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের কামান গর্জে উঠল। প্রত্যুত্তর দিল ভারতীয়দের গোলাগুলি ও কামান।

চারিশত ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে প্রায় দেড়শত ইংরাজ-সৈন্য মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়ে। বাকী সব প্রাণভয়ে করলে পলায়ন।

হেনরী লরেন্স এসে আত্মগোপন করলে রেসিডেন্সিতে।

ভারতীয় সৈনিকেরা পলাতক শ্বেতাঙ্গদের পশ্চাদ্ধাবন করে ছুটে আসে।

মচ্ছিভবন ও রেসিডেন্সী অবরুদ্ধ।

অযোধ্যার সংগ্রাম শেষ। ইংরাজ পরাজিত।

এবারে চল ঝাঁসীতে।

১৮৫৭এর স্বাধীনতার সংগ্রামে অক্ষয়-কীর্তি ঝাঁসী।

ক্যাঃ ডনলপ ঝাঁসী ব্রিটিশ বাহিনীর অধিনায়ক আর ক্যাঃ স্কীন কমিশনার।

কানপুরের সমরাঙ্গনে যখন চলেছে শ্রীমন্ত নানাসাহেবের অধিনায়কত্বে মুক্তিসংগ্রাম, তখন তাঁর বাল্যের সহচরী ঝাঁসীর কুললক্ষ্মী মনুয়া লক্ষ্মীবাঈ—তিনিও নিশ্চল হয়ে বসে ছিলেন না। শ্বেতাঙ্গের হীন জঘন্য চক্রান্তে পদদলিত রাণীর অন্তরের দীর্ঘকাল সঞ্চিত রোষবহ্নি যা তাকে জর্জরিত করছিল, সহসা তা প্রলয় শিখায় লেলিহান হয়ে উঠল।

৪ঠা জুন উন্মুক্ত অসি হাতে শৃঙ্খলমোচনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে রাণী এগিয়ে এলেন।

সংবাদটা চাপা ছিল না, বিপ্লবের প্রস্তুতির বিষয়ে রাণীর সহকারী লক্ষ্মণ রাওয়ের কয়েকখানা পত্র কমিশনার স্কীনের হস্তগত হয়েছিল।

শ্বেতাঙ্গের দল যখন আসন্ন বিপদে মুক্তির উপায় খুঁজছে, সহসা এমন সময় অতর্কিতে কামান গর্জে উঠল রাণীর দুর্গ হতে।

প্রাণভয়ে ভীত শ্বেতাঙ্গের দল সত্বর দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

৫ই জুন ঝাঁসীর সর্বত্র সমরাগ্নি জ্বলে উঠল প্রচণ্ড লেলিহান শিখায়, ঝাঁসীতে শ্বেতাঙ্গদের তাঁবে এদেশীয় সৈনিক যারা ছিল তারাও আজ বিদ্রোহী। শ্বেতাঙ্গ নিধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ঝাঁসীর মুক্তি চাই, চাই দাসত্বের অবসান।

ভেঙ্গে ফেল শ্বেতাঙ্গের এদেশে তৈরী কারাগার, মুক্ত কর কয়েদীদের।

অগ্নিসংযোগ কর ওদের কাছারী-ঘরে।

দেখতে দেখতে সেপাইরা শ্বেতাঙ্গদের দুর্গ অবরোধ করে। অনেক অত্যাচার

করেছো, এবারে কোথায় পালাবে শুনি ?

সত্যি পালাবার আর কোন উপায়ই নেই।

শেষ পর্যন্ত সেপাইদের হাতেই ফিরিঙ্গীদের আত্মসমর্পণ করতে হলো।

অস্ত্র পরিত্যাগ করে সকলে নতি স্বীকার কর।

আবার অস্ত্র-সমর্পণ উৎসব।

একে একে ভারতীয় সৈনিকের দল অবনত মস্তকে অস্ত্র সমর্পণ করেছে।

অস্ত্র সমর্পণের পরে প্রত্যেককে বন্দী করা হলো। বন্দীর দল নতমস্তকে দুর্গদ্বার দিয়ে সারিবন্দীভাবে রাজপথে এসে দাঁড়ায়।

রাজপথের একধারে সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী। বন্দীদের এনে সেখানে দাঁড় করানো হয়েছে।

এবারে অত্যাচারের প্রতিশোধ।

ঝাঁসীর রাণীর প্রতি যে অত্যাচার করেছো, তাঁর ন্যায্য দাবীকে অস্বীকার করেছো, আজ দিতে হবে তারই জবাব।

প্রস্তুত হও।

সুরু হলো হত্যাযজ্ঞ।

একটি শ্বেতাঙ্গকেও জীবিত রাখা হবে না। ঝাঁসীর কলঙ্ক মোচন হবে ফিরিঙ্গীর রক্ত তর্পণে। প্রতিশোধ। গঙ্গাধর রাওর বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রতি যে অন্যায় অবিচার এদেশে তোমাদের ফিরিঙ্গী প্রতিনিধি ডালহৌসি করেছে তারই প্রত্যুত্তর, জবাব !

লক্ষ্মীর হাতের বাঁকা তলোয়ার ঝিলিক হেনে ওঠে।

ঝাঁসীর পথে পথে সর্বত্র ফিরিঙ্গীদের মৃতদেহ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত।

ঝাঁসীতে সত্যিই ফিরিঙ্গী-শক্তির অবসান হয়েছে।

প্রায় পোণে একশত বৎসর পরেও বিস্মরণের যবনিকা ভেদ করে শুনতে পাচ্ছি বিজয়ী সৈনিকদের কঠিন কণ্ঠস্বর : মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহকা অম্মেল রাণী লক্ষ্মীবাঈকা !

আবার বহুদিন পরে ঝাঁসীর রাজ-তক্তে আসীনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

সম্মুখে কঠোর কর্তব্য।

রমণীয় কমনীয়তা ও কোমলতা মুছে ফেলে অপূর্ব পাঠানী বেশে রাণী এসে তাঁর প্রিয় প্রজা ও অনুচরদের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখছি, কি অপূর্ব ! অত্যাশ্চর্য !

পরিধানে পায়জামা, অঙ্গে বেগুনী রংয়ের রেশমী অঙ্গরক্ষা ; মাথায় টুপী, তার উপরে পাঠানী পাগড়ী, কটিদেশে জরির দোপাটা এবং তদসংলগ্ন লম্বমান রত্ন-খচিত খাপে তীক্ষ্ন ধারালো বাঁকা তলোয়ার। হাতে হীরার বলয়, গলে মুক্তার হার, অনামিকায় হীরকাঙ্গুরীয়।

অনেকের সঙ্গে সেদিনও বীরাঙ্গনা তোমায় জানিয়েছিলাম প্রণাম। আজও জানাই প্রণাম। কঠিন হাতে রাণী ঝাঁসীর সকল দায়িত্ব-ভার তুলে নিলেন আপন হাতে।

ঝাঁসীর সর্দাররা বুন্দেলখণ্ডের সর্দাররা বোরছার রাণী লড়য্যীবাঈ সবাই এসেছে আজ রাণীর পাশে ঃ ঝাঁসীর স্বাধীনতা রক্ষা' করতেই হবে। প্রাণ যায় যাক।

রাণীর আদেশে আবার নতুন করে গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্য ঝাঁসীতে কারখানা খোলা হলো।

ঝাঁসীর দুর্গকে সুরক্ষিত করবার জন্য এতদিন ফিরিঙ্গীদের ভয়ে যে তিনটি বড় কামান দুর্গের মাটির তলে সংগুপ্ত ছিল, সেগুলো তুলে এনে দুর্গমধ্যে স্থাপন করা হলো। বুন্দেলা ও ঝাঁসীর সর্দাররা সশস্ত্র অনুচরদের নিয়ে দুর্গ-প্রহরায় নিযুক্ত।

রাণীর অসামান্য দয়া-দাক্ষিণ্যে, সৈন্য-শৃঙ্খলা, বিচারকার্য, শান্তিস্থাপনে সকলেই আজ প্রীত। কারো মনে কোন খেদ নই।

ঝাঁসীকে পশ্চাতে রেখে এগিয়ে যাই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার পথে!

ভারতের ইতিহাসে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার গৌরবগাথা কোনদিন কেউ ভুলবে না। পাটনার নিকটবর্তী দানাপুরে অনেক সেপাই অবস্থান করে, তারা যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলায় পাটনার মুসলমানরা, তবে সর্বনাশ! ইংরাজ প্রতিনিধিদের একথা সেদিন অগোচরে ছিল না।

অতএব সময় থাকতে এদের নিরস্ত্র করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু গভর্ণর জেনারেল সম্মত হতে পারলে না।

সহসা এমন সময় পাটনায় দিল্লীর সংবাদ ভেসে এলো। দিল্লী স্বাধীন॥ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ আবার মসনদে বসেছেন।

সেপাইয়া যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসে। ঘরে ঘরে প্রস্তুত হওয়ার সাড়া পড়ে যায়।

দানাপুর হতেও সংবাদ এলো, সেখানকার ভারতীয় সেপাইরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এবং শীঘ্রই পাটনার দিকে এগিয়ে আসবে।

পাটনার ফিরিঙ্গীর দল প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে!

সবাই এসে ঢুকল কমিশনারের বাসগৃহে। অশ্বারোহী সশস্ত্র সেপাই প্রহরায় নিযুক্ত হয়।

কিন্তু তক্ষুনি কোন বিশেষ গোলযোগ ঘটল না। তবে চারিদিকেই অসন্তোষের কালো ধোঁয়া। কেমন যেন একটা বিশ্রী থম্‌থমে ভাব।

আসন্ন বিদ্রোহের আতংকে কমিশনার টেলর পাটনার মুসলমান অধিবাসীদের সামান্য সন্দেহের জন্যও ভয়াবহ শাস্তি দিতে শুরু করলে, এমন কি যাকেতাকে ধরে বিনা বিচারে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে নি।

পাটনা শহরে অনেকের মধ্যে বিশেষভাবে যে তিনজন মৌলভী জনে জনে বিপ্লবের বাণী বিলিয়েছিল, তাদের মধ্যে শাহ মহম্মদ হুসেন, আহম্মদ উল্লা, ওয়াজ উলহক এদের নাম কেউ ভুলবে না কোনদিন।

ধূর্ত শয়তান টেলর কৌশলে পরামর্শের জন্য মৌলভী তিনজনকে আহবান করে অবশেষে কারারুদ্ধ করলে।

বায়ুবেগে ঐ দুঃসংবাদ পাটনার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

এবং শুধু তাই নয়, কমিশনার পাটনার অধিবাসীদের নিরস্ত্র করার মনস্থ করলে, কিন্তু চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হলো না।

৩রা জুলাই সন্ধ্যায় প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল।

চকিতে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ফিরিঙ্গীরা শিখসেনোর সাহায্যে নির্বাপিত করলে।

ঐ গোলযোগের অপরাধে বহু লোকের সঙ্গে পাটনার বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী পীর আলীও ধৃত হলেন।

পাটনা ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে বিপ্লবের যে যোগসূত্র রচিত হয়, সে পীর আলীর গোপন প্রস্তুতির মধ্যে দিয়েই।

ফিরিঙ্গীর বিচার-সভায় শহীদ পীর আলী সমস্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননাকে তুচ্ছ করে অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বিচারপতি বললেঃ পীর আলী, এখনও সময় আছে, তোমাকে মুক্তি দেবো, যদি তুমি দলের সকলের নাম বলে দাও।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে পীর আলী বললেঃ এমন কতকগুলো কাজ আছে, যার জন্য জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয়; আবার এমনও কতকগুলো কাজ আছে যার জন্য অবহেলে জীবন বিসর্জন দিতে হয়। তোমরা আমায় ফাঁসি দিতে পার, আমার মত অপর লোকও প্রতিদিন তোমাদের ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে পারে; কিন্তু আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু হতে জন্ম নেবে আমারই মত সহস্র সহস্র বীর, যারা অকাতরে দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তোমাদের উদ্দেশ্য কখনও সফল হবে না।

বিচার-ফল ঘোষিত হয়—মৃত্যুদণ্ড!

পীর আলীকে তখন কমিশনার প্রশ্ন করেঃ পীর আলী, শেষ সময়ে তোমার কোন প্রশ্ন বা বক্তব্য আছে?

ঃ আছে।

ঃ বল।

ঃ আমার মৃত্যুর পর আমার আবাস-বাটী কি করা হবে?

ঃ ভূমিসাৎ করা হবে। জবাব এলো।

ঃ আমার সম্পত্তি? দ্বিতীয় প্রশ্ন।

ঃ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ঃ আমার সন্তানরা?

ঃ তারা এখন কোথায়? বিচারপতি প্রশ্ন করে।

ঃ অযোধ্যায়।

মৃত্যু-পথযাত্রীর ঝাপসা করুণ দৃষ্টিপথে কি শেষ মুহূর্তে তার প্রিয় সন্তানদের মুখচ্ছবি ভেসে উঠছিল!

পীর আলীর দেহ এর পর ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

আবার ফিরিঙ্গীরা সংকল্প করে ভারতীয় সেপাইদের নিরস্ত্র করতে, সেনাপতি এবারেও মত দিল না; তবে সিপাইরা যাতে বন্দুকের ক্যাপ না

ব্যবহার করতে পারে, এজন্য সমুদয় ক্যাপ গোরা সৈনিকদের অধিকারে নিয়ে আসা হলো অস্ত্রাগার হতে ভারতীয় সেপাইদের চোখের সামনে। এই অপমানে ভারতীয় সেপাইরা চঞ্চল ও অধীর হয়ে ওঠে। কি এর প্রতিকার! আবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল মেঘলা আকাশে রক্তের লালিমায়।

২৫শে জুলাই পদদলিত সৈনিকেরা মেঘমন্দ্র স্বরে গর্জন করে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ করলো হাতের বন্দুক ও রাইফেল।

বিদ্রোহীর দল শোণ নদীর তটে এসে উপস্থিত হলো। এবং বিনা বাধায় নদী অতিক্রম করে আরার দিকে সবাই অগ্রসর হলো।

সেদিন যে দেশপ্রেমিক সকল বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে বীরবিক্রমে বিদ্রোহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সমগ্র বিহার প্রদেশে তার ক্ষমতা যেমন ছিল অসাধারণ তেমনি প্রতাপ ছিল অখণ্ড।

তিনি কে? একজন ভূম্যধিকারী, ক্ষমতাশীল বৃদ্ধ এক রাজপুত।

কি নাম তাঁর?

কুমারসিংহ। ১৮৫৭এর স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কত দিন চলে গেল, বিহারবাসী আজও তাঁর নামে শ্রদ্ধার প্রণতি জানায়।

ভারতের সর্বত্র যখন চলেছিল ১৮৫৭এর সংগ্রাম-প্রস্তুতি গোপনে গোপনে, বিহার তখন দূরে সরে থাকে নি।

বিহারে অনেক ধনী জমিদার ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও মৌলভীরা সেই গোপন প্রচেষ্টাকে উজ্জীবিত করার জন্য এগিয়ে এসেছেন।

গোপন সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র ছিল পাটনাতে।

কেন্দ্র পাটনা হতে মুক্তির সে ডাক বিহারের আশেপাশে সর্বত্র পেঁছে যেতে দেরি হয় নি।

ফিরিঙ্গীর রাজত্বের অবসান হোক।

আরায় আগত বীর সৈনিকদের সাদর আহ্বান জানালেন কুমারসিংহ।

বৃদ্ধ রাজপুত জগদীশপুরের প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে সমাগত বীরদের শোনালেন অভয় বাণী: এসো বীর, আমি হবো তোমাদের সাথী!

বার্ধক্যে নুয়ে পড়া দেহে যেন সহসা 'দুকূল প্লাবিয়া' এলো যৌবনের জোয়ার।

আশি বছরের বৃদ্ধ রাজপুত্ সিংহের মত কেশর দোলায়।

ডালহৌসীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় কুমারসিংহও কুক্ষিগত হয়েছিলেন।

কিন্তু সে অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেন নি তিনি কোন দিন।

তুষানলের মত জ্বলছিল বুকখানা দিবারাত্র।

আজ এসেছে সেই অপমানের অত্যাচারের অন্যায়ের জবাব দেবার দিন।

আগত সেপাইরাও প্রত্যুত্তর দিল: তুমিই আমাদের দলপতি! তুমিই আমাদের সেনাপতি! তুমিই আমাদের রাজা, তোমার আদেশে দেশের তরে অকাতরে আমরা প্রাণ দেবো! এই প্রতিজ্ঞা নিলাম।

কুমারসিংহের যে কেবল অসাধারণ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাই ছিল তা নয়, দেশের

লোকেরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। বিপদে-আপদে দেশের লোক সর্বাগ্রে তাঁরই কাছে ছুটে এসেছে। কখনো কুমারসিংহকে পথ দিয়ে যেতে দেখলে, পথের দু'পাশে জনতা সসম্ভ্রমে তাঁকে জানাত অন্তরের শ্রদ্ধা।

আর দেরী নয়, কুমারসিংহ তাঁর প্রধান পার্শ্বচর রণদলন সিং ও হরেকৃষ্ণ সিংকে নিয়ে গোপন পরামর্শ শুরু করলেন, গভীর রাত্রে নিভৃত কক্ষে।

পরামর্শমত হরেকৃষ্ণ দানাপুরে গিয়ে সেপাইদের জানিয়ে এল : বীরগণ, প্রস্তুত হও দেশের জন্য প্রাণ দিতে।

সেপাইরা যখন শুনলে বীরেন্দ্রকেশরী কুমারসিংহ এই বৃদ্ধ বয়সেও দেশের জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছেন, কেউ আর স্থির থাকতে পারলে না। সবাই দানাপুর হ'তে অগ্রসর হলো আরার দিকে।

কুমারসিংহও আরায় এসে সকলের অগ্রভাগে শির উঁচু করে দাঁড়ালেন।

ছোট ভাই অমরসিংহ জ্যেষ্ঠের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এবারে শুরু হলো আরায় যে আবাস-গৃহে ফিরিঙ্গীরা আশ্রয় নিয়েছে তার অবরোধ।

কার্যসূচী আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল।

২৬শে জুলাই ধনাগার লুণ্ঠন করে কারাগার ভেঙে সব কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হলো।

দুর্গে অবরুদ্ধ ফিরিঙ্গীর দল : মুহুর্মুহু চারিদিক হতে গুলিবৃষ্টি চলেছে।

সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্যও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

সহসা এমন সময় অদূরবর্তী আম্রকানন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় রক্তিমাভ হয়ে ওঠে।

কিসের আগুন!

একদল গোরা সৈন্য আসছিল আরার পথে, এ তাদেরই ধ্বংস চিত্র।

গোরাদের দলপতি সেপাইদের গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হলো।

আম্রকাননে চারিদিক হতে গুলি ছুটে আসছে অন্ধকারে।

একের পর এক গোরা সৈন্য প্রাণ দেয় সেই গুলির অব্যর্থ আঘাতে।

নিকষকালো অন্ধকারে পৃথিবী যেন মুছে গেছে। প্রাণভয়ে গোরা সৈনিকের দল আম্রকাননের মধ্যে ছুটাছুটি করে। পথ খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত আর উপায়ান্তর না দেখে অবশিষ্ট গোরা সৈন্যরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য খালের ধারে এসে উপস্থিত হলো।

পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে বিদ্রোহীর দল। একটি ফিরিঙ্গীকেও তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে দেবে না।

রক্তে রাঙা হয়ে গেল খালের জল।

অমারাত্রি শেষ হয়ে আসে, অবরুদ্ধ দুর্গবাসীরা উৎকণ্ঠায় অধীর।

আরায় এখন আর ফিরিঙ্গীর এতটুকু আধিপত্যও নেই।

কুমারসিংহই এখন আরার ভাগ্যবিধাতা।

বিজয়ী বীর হাতে তুলে নেন শাসনদণ্ড।

স্বাধীন আরা।

এদিকে ১লা আগস্ট, ইংরাজ সেনাপতি আয়ার বিদ্রোহ দমনে সসৈন্যে গুজরাজগঞ্জ পল্লীতে আম্রকাননে এসে সৈন্যস্থাপনা করেছে।

২রা আগস্ট যখন তারা আরো অগ্রসর হতে যাবে, কুমারসিংহের কামান গর্জে ওঠে প্রচণ্ড রবে।

সেই সঙ্গে শুরু হলো গুলিবৃষ্টি অবিশ্রান্ত চারিদিক হতে।

কুমারসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়।

পিছু হটে সসৈন্যে কুমারসিংহ নদী পার হয়ে বিবিগঞ্জ পল্লীতে এসে দাঁড়ালেন শত্রুর প্রতীক্ষায়।

নদী পারাপারের সেতু আগেই কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্বেতাঙ্গ আয়ারের সৈন্যদল নদী পার না হতে পেরে রেলওয়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে যে রাস্তাটা আরার দিকে গেছে সেই পথ ধরেছে তখন।

সে পথেও গর্জে ওঠে কুমারসিংহের কামান আবার।

অবিশ্রাম গুলিবর্ষণে আয়ারের সৈন্যদল বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত।

এবারে ফিরিঙ্গীদের পিছু হটবার পালা। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়, কারণ কুমারসিংহের সৈন্যদলে কি কারণে বিশৃংখলা দেখা দেয় যেন এবং সেই বিশৃংখলার সুযোগে গোরা সৈন্যরা আবার এগিয়ে আসে।

কুমারসিংহ উপায়ান্তর না দেখে জগদীশপুরে ফিরে এলেন শেষ চেষ্টায় জন্য। কিন্তু এদেশীয় সৈনিকদের সাহায্যে গোরা সৈনিকরা শেষ পর্যন্ত জগদীশপুরে কুমারসিংহের শেষ প্রচেষ্টাকেও ধূলিসাৎ করে দিল।

বৃদ্ধ রাজপুত অদমিত। গেছে রাজ্য যাক, এখনো দেহে আছে প্রাণ।

কুমারসিংহ শাসিরামের দিকে এগিয়ে গেলেন, পশ্চাতে পড়ে রইলো তাঁর এত সাধের জগদীশপুর, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন!

শাসিরামের নিকটবর্তী এক পাহাড়ে কুমারসিংহ সৈন্য সমাবেশ করলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়।

সৈন্যরা দেখলে বৃদ্ধ রাজপুত বীরের দু'চোখে অশ্রু।

ঃ এ কি! আপনার চোখে জল!—সৈন্যবা অধীর হয়ে ওঠে।

ঃ কি করে বোঝাব তোমাদের, কেন আমার চোখে আসে জল! আমার সমস্ত আশাই বুঝি শেষ হয়ে যায়, পরাধীনা দেশমাতৃকার শৃংখল বুঝি আর মোচন হয় না! এ দুঃখের বুঝি আর এ জীবনে অবসান হলো না! কিন্তু তবু—তবু আমি শেষ চেষ্টা করবো, কিছু না পারি অন্ততঃ দেশের জন্য প্রাণ দিতেও তো পারবো। শুনেছো বোধ হয়, ফিরিঙ্গীরা আমার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে পঁচিশ হাজার মুদ্রা! এবারে আমরা আজিমগড়ের দিকে আক্রমণ চালাবো, প্রস্তুত হও সকলে। আজিমগড় অধিকার করে ক্রমে এলাহাবাদ, সেখান হতে বারাণসী ও তারপরে অগ্রসর হবো আমরা জগদীশপুরের দিকে।

১৮ই মার্চ সসৈন্যে কুমারসিংহ আজিমগড় হতে ২৫ মাইল দূরবর্তী আত্রাওয়ালিতে এসে ছাউনি ফেললেন।

মিলন্যান সসৈন্যে এগিয়ে এলো কুমারসিংহের গতিরোধ করতে। কিন্তু কুমারসিংহের কামানের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

চারিদিক হতে গোরা সৈনিক ও তাদের তাঁবে বহুশত দেশদ্রোহী ভারতীয় সেপাই আজিমগড়ে এসে উপস্থিত হচ্ছে দলে দলে।

দু'পক্ষে আবার শুরু হলো সংগ্রাম।

শ্বেতাঙ্গের বহুশত কামানের মুখে অবশেষে আর উপায়ান্তর না দেখে কুমারসিংহ পিছু হটে গেলেন।

আজিমগড়ের পথে তমসা নদীর তীরে আবার সংগ্রাম ১৫ই এপ্রিল।

এ যুদ্ধে গোরার দল পরাজিত হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

কুমারসিংহ ফিরিঙ্গীর সৈন্যদলকে বিতাড়িত করে নঘাই পল্লীতে সৈন্য সমাবেশ করলেন।

১৭ই এপ্রিল এখানে হলো দু'পক্ষে সংগ্রাম।

কুমারসিংহের সৈন্যদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল সরে গেল অন্যদিকে, বাকীদল সম্মুখযুদ্ধে ফিরিঙ্গীদের অগ্রগমনে বাধা দিতে লাগল।

প্রথম দলকে নিয়ে কুমারসিংহ সেকেন্দরপুরে এসে ছাউনি ফেললেন।

ফিরিঙ্গীরাও এগিয়ে এসেছে।

গঙ্গার তীরে আবার সংগ্রাম হলো শুরু।

এই যুদ্ধে কামানের গোলায় বীর কেশরী আহত হলেন।

আহত রক্তাপ্লুত কুমারসিংহকে তাঁর প্রিয় অনুচরেরা খাটিয়ার ওপরে বহন করে নিয়ে এলো জগদীশপুরে—তাঁর ভগ্ন লুণ্ঠিত দগ্ধ প্রাসাদে।

জগদীশপুরে এসেও আহত ও রুগ্ন বীর শেষ যুদ্ধ করে বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। কুমারসিংহের মৃত্যুর পর অমরসিংহ জ্যেষ্ঠের অসমাপ্ত কর্মভার স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিলেন।

দীর্ঘ কাহিনী আর টানবো না।

দীর্ঘ সাতমাসকাল অমরসিং শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত পর্যুদস্ত হয়।

বিহারের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ছেদ পড়ে।

১৮৫৭এর বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জেবলেছিল মহাযজ্ঞের অগ্নি।

সে কাহিনীর শেষ নেই, তার বর্ণনার প্রচেষ্টা শুধু অসম্ভবই নয়, দুঃসাধ্য।

শুধু এইটুকু আজ জানা রইলো, দীর্ঘ একশত বৎসরের পুঞ্জীভূত গ্লানি, অবমাননা, অত্যাচার সহসা যেন কোন যাদুমন্ত্রে ১৮৫৭-এ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল শুধু দুদিনের জন্য। কিন্তু স্থায়ী হলো না, এত প্রাণদান, এত রক্তপাত যেন দামিনী ঝলকে জাতির শ্রেষ্ঠ সুখের পরশটুকু দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল স্মৃতির বিস্মরণ-লোকে।

এবং ১৮৫৭এর সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলি মৃত মুহ্যমান জাতির বুকে জাগিয়ে

গেল এক অভিনব চেতনার সাড়া—যা পরবর্তী পৌনে একশত বৎসর ধরে খণ্ড খণ্ড বিপ্লবের অভিব্যক্তিতে বার বার ঝলকিত হয়ে ভারতের মাটিকে করেছে রক্তাক্ত, আকাশকে করেছে রক্তিম।

কারণ স্থূল দৃষ্টিতে যে মহতী প্রচেষ্টাকে আমরা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে অশ্রুমোচন করেছি, সে যে ব্যর্থ হয় নি, আমাদের রক্তদানই পরবর্তীকালে তার স্বীকৃতি। বুকের রক্ত দিয়ে ভারতের মাটিকে বার বার সিক্ত করতে পেরেছি বলেই হয়ত, সেই যুগসঞ্চিত রক্তসিন্ধু মন্থন করে ভারতের ভাগ্যাকাশে ফুটে উঠলো একটি শ্বেতশতদল : ক্ষমা ও অহিংসার বাণী প্রাণে জাগালো নব চেতনা।

সর্বহারা অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসী শুনালেন আমাদের সেই অমৃতের পুত্রের কাহিনী। শোনালেন নব আশার বাণী! প্রাণে জাগালেন চেতনা! বললেন : শত্রুকে জয় করতে হবে, তবে অসি দিয়ে নয়—ভালবাসা দিয়ে—প্রেম দিয়ে। শুধু কি ভারত! সমগ্র পৃথিবী সেই সর্বত্যাগী দধীচির অমৃত বাণী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নত হয়ে এলো প্রণাম জানাতে। কে আছো কোথায়! এস প্রণাম জানাও!

সিদ্ধার্থের মত আজ তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে যা কোনদিন সম্ভব হয় নি, আজ ভারতে তাই হয়েছে সম্ভব।

বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ নয়, প্রেম।

তুমি অস্ত্র হানবে, আমি বুক পেতে দেবো। দেখি কত অস্ত্র রেখেছো তোমার তূণে।

তাই বলছিলাম, আজকার ভারতের এই নব অভ্যুদয়ের শুভলগ্নে নূতন জাতির নূতন ইতিহাস রচনা করতে হবে। আজ হতে হবে আমাদের নিষ্করুণ, কঠিন। তাই হয়ত বার বার স্মৃতির বিস্মরণ-লোকে যুগসঞ্চিত আমাদের যত ভুল, দোষ, ত্রুটি, যত পাপ, যত অন্যায়, যে কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত নেই—সব কিছুই স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে—আর যেন আমরা ভুল না করি, আর যেন অন্যায়কে ক্ষমা না করি, দুর্বলের শঙ্কায় আর যেন না সংকুচিত হই। না হই বিহ্বল! কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যেন সত্যি আজ গাইতে পারি—

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপন-মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়॥
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়॥

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

বিদ্রোহী ভারত

দ্বিতীয় পর্ব

যে যুগ চলে গেল,
সে যুগের কাহিনীকে তুলে দিলাম
যে যুগ আগত ঐ—
সেই যুগের হাতে।
যে রাত্রি পোহায়ে গেল,
সেই ফেলে আসা রাত্রির স্মৃতি
এনে দিলাম তুলে,
আজিকার এ নব প্রভাতে ॥

চৌদ্দই আগস্টের আর খুব বেশী দেরি নেই। প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের দাসত্বের লৌহ-শৃংখল মোচন হবে ১৪ই আগস্ট। নয়া দিল্লীতে রাজকীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, মুহূর্ষু ভারতের মৃত জাতি স্বপ্ন দেখছে। অত্যাসন্ন সেই মহোৎসবের আনন্দে দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে যেন জেগেছে রোমাঞ্চ। কবরের মাটিতে জীবনের অংকুরোদ্গম !···ঘোষিত হয়েছে : প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্বের ভার নেবেন পণ্ডিতজী। হিন্দুস্থানের পণ্ডিতজী ! এখনো কিন্তু লীগ গভর্ণমেন্ট বাংলা দেশের বুকে লৌহমুষ্টিতে শাসনের রজ্জুটা টেনে রেখেছে। শেষ শোষণের অদ্ভুত জিঘাংসা। দানবীয় বৃত্তির শেষ স্বাক্ষর।···

সত্যই তা'হলে বাংলা দেশ দ্বিধাবিভক্ত হবে। আর পৃথকভাবে সরকারী দায়িত্ব হাতে আসবে চৌদ্দই আগস্টের পর।

সৃষ্টিধর (মাষ্টারদা) দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে রাসবিহারী এ্যাভিনু দিয়ে হেঁটে চলেছেন। গায়ে খদ্দরের হাফ্‌সার্ট, মাথায় গেরুয়া রংয়ের একটা গান্ধী ক্যাপ, পরিধানে খদ্দরের মোটা ধুতি। পায়ে পেশোয়ারী চপ্পল। চপ্পলের তলায় বোধহয় লোহার পেরেক বসানো, পাথরে বাঁধানো কঠিন ফুটপাতের 'পরে শব্দ তোলে ঠং ঠং··· !

এখনো অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সাঁপুর তো আর এখানে নয়, সেই টালিগঞ্জের ব্রিজ ছাড়িয়ে আরো অনেকটা গেলে তারপর ডাইনে বেঁকে চলতে হবে। সেও কম পথ নয়। দিদি রোগশয্যায়।

সকালবেলা অভিজিৎ মেসে এসে সংবাদ দিয়ে গিয়েছে। অভি, অভিজিৎ। অভিজিৎ মাষ্টারদার ঠিকানাটা জানত না। বীরেশ্বরের কাছেই নাকি মাষ্টারদার ঠিকানা জানতে পেরেছে।

অভিজিৎ বলে গিয়েছে : ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছেন, আর বেশী দিন নেই।

তবু রক্ষে নীলাঞ্জনের ফাঁসীর সংবাদ দিদি এখনো জানেন না। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তাই এখনো দিদি নাকি আক্ষেপ করেন, মধ্যে মধ্যে, 'নীলেটার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হল না।'

অভিজিৎকে প্রায়ই প্রশ্ন করেন : হ্যাঁরে, দেশ স্বাধীন হতে চলল শুনছি। সবাইকে ছেড়ে দিল, তা নীলুকে কি এখনো তারা ছাড়বে না ?···এ তবে কেমনতর দেশ স্বাধীন হবে রে ? আমার নামে একটা দরখাস্ত লিখে দে পণ্ডিতজীর কাছে !···সে হয়ত জানেও না এখানে তার দিদি মৃত্যুশয্যায়, তারই পথ চেয়ে চেয়ে দিন গুনছে ! যে অভিমানী ছেলে ! জানি তো তাকে।

অভি একটা দরখাস্ত লিখে আনে : এই নাও দিদি দরখাস্ত !

যে যুগ চলে গেল,
সে যুগের কাহিনীকে তুলে দিলাম
যে যুগ আগত ঐ—
সেই যুগের হাতে।
যে রাত্রি পোহায়ে গেল,
সেই ফেলে আসা রাত্রির স্মৃতি
এনে দিলাম তুলে,
আজিকার এ নব প্রভাতে॥

চৌদ্দই আগস্টের আর খুব বেশী দেরি নেই। প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের দাসত্বের লৌহ-শৃঙ্খল মোচন হবে ১৪ই আগস্ট। নয়া দিল্লীতে রাজকীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, মুহুর্মুহু ভারতের মৃত জাতি স্বপ্ন দেখছে। অত্যাসন্ন সেই মহোৎসবের আনন্দে দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে যেন জেগেছে রোমাঞ্চ। কবরের মাটিতে জীবনের অংকুরোদ্গম !…ঘোষিত হয়েছে ঃ প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্বের ভার নেবেন পণ্ডিতজী। হিন্দুস্থানের পণ্ডিতজী ! এখনো কিন্তু লীগ গভর্ণমেন্ট বাংলা দেশের বুকে লৌহমুষ্টিতে শাসনের রজ্জুটা টেনে রেখেছে। শেষ শোষণের অদ্ভুত জিঘাংসা। দানবীয় বৃত্তির শেষ স্বাক্ষর।…

সত্যই তা'হলে বাংলা দেশ দ্বিধাবিভক্ত হবে। আর পৃথকভাবে সরকারী দায়িত্ব হাতে আসবে চৌদ্দই আগস্টের পর।

সৃষ্টিধর (মাষ্টারদা) দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে রাসবিহারী এ্যাভিনু দিয়ে হেঁটে চলেছেন। গায়ে খদ্দরের হাফ্‌সার্ট, মাথায় গেরুয়া রংয়ের একটা গান্ধী ক্যাপ, পরিধানে খদ্দরের মোটা ধুতি। পায়ে পেশোয়ারী চপ্পল। চপ্পলের তলায় বোধহয় লোহার পেরেক বসানো, পাথরে বাঁধানো কঠিন ফুটপাতের 'পরে শব্দ তোলে ঠং ঠং… !

এখনো অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সা'পুর তো আর এখানে নয়, সেই টালিগঞ্জের ব্রিজ ছাড়িয়ে আরো অনেকটা গেলে তারপর ডাইনে বেঁকে চলতে হবে। সেও কম পথ নয়। দিদি রোগশয্যায়।

সকালবেলা অভিজিৎ মেসে এসে সংবাদ দিয়ে গিয়েছে। অভি, অভিজিৎ। অভিজিৎ মাষ্টারদার ঠিকানাটা জানত না। বীরেশ্বরের কাছেই নাকি মাষ্টারদার ঠিকানা জানতে পেরেছে।

অভিজিৎ বলে গিয়েছে ঃ ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছেন, আর বেশী দিন নেই।

তবু রক্ষে নীলাঞ্জনের ফাঁসীর সংবাদ দিদি এখনো জানেন না। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তাই এখনো দিদি নাকি আক্ষেপ করেন, মধ্যে মধ্যে, 'নীলেটার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হল না।'

অভিজিৎকে প্রায়ই প্রশ্ন করেন ঃ হ্যাঁরে, দেশ স্বাধীন হতে চলল শুনছি। সবাইকে ছেড়ে দিল, তা নীলুকে কি এখনো তারা ছাড়বে না ?…এ তবে কেমনতর দেশ স্বাধীন হবে রে ? আমার নামে একটা দরখাস্ত লিখে দে পণ্ডিতজীর কাছে !…সে হয়ত জানেও না এখানে তার দিদি মৃত্যুশয্যায়, তারই পথ চেয়ে চেয়ে দিন গুনছে ! যে অভিমানী ছেলে ! জানি তো তাকে।

অভি একটা দরখাস্ত লিখে আনে ঃ এই নাও লিখিত দরখাস্ত।

দে ভাই। কলমটা আন্, সই করে দিই। কোথায় সই করবো বল তো? চোখেও ছাই আজকাল কি আর তেমন দেখতে পাই।

কম্পিত হাতখানি তুলে কোনমতে এঁকেবেঁকে দিদি সইটা করে দেন: আজই কিন্তু পাঠিয়ে দিস্ ভাই। ভুলে যাস্‌নে যেন আবার! তোদের আবার যা ভোলা মন। উড়োজাহাজেরই টিকিট একটা এঁটে দিস্, তাড়াতাড়ি যাবে।

একদিন না যেতেই দিদির তাগাদা শুরু হয়: অভি! অভি! কোথায় গেলি ভাই!

অভিজিৎ ঘরে এসে প্রবেশ করে: আমায় ডাকছিলে দিদি?

হ্যাঁরে দরখাস্তটা পাঠিয়েছিলি তো?: দিদি অভির মুখের দিকে তাকান।

হ্যাঁ গো। সে তো কালই পাঠিয়ে দিলাম। অভির গলাটি কি কেঁপে ওঠে!

তবে সে আসে না কেন?

চিঠি পণ্ডিতজী পড়বেন, তবে তো!···সে তুমি ভেবো না দিদি, ঠিকানা ঠিকই আছে, সে আমি দেখেশুনে দিয়েছি।

কি জানি ভাই! আমার যে আর সময় নেই রে!···

অভি উদ্‌গত অশ্রু কোনমতে চাপতে চাপতে ঘর হ'তে পালিয়ে যায়।

কি জবাব দেবে!···কি জবাব দেবে ও!···

অভির মাকে ডেকে দিদি বলেন: বৌদি! নীলু আসছে! চালকুমড়োর বড়ি খেতে সে বড্ড ভালবাসতো!···করে রেখে দিও। আমি তো বিছানায় শুয়ে। কলকাতা শহরে চালকুমড়ো আর পাবে কোথায় বল। বাজার হতেই আনিয়ে নিও।

নিশ্চয়ই করে দেবো দিদি! আপনি ভাববেন না। অভির মা জবাব দেন।

একদিন দু'দিন করে সাতটা দিন কেটে গেল। দিদির ধৈর্য বুঝি আর থাকে না। ঘুরেফিরে সবাইকে কেবল একই প্রশ্ন: হ্যাঁরে চিঠিটা কি তবে গেল না? আর একটা না হয় দরখাস্ত লিখে দে। এবারে মহাত্মাজীকে একটা দে! আমার যে আর সময় নেই!

চোখে তো ঘুম নেই।

শয্যার 'পরে শুয়ে শুয়ে কেবলই যেন ঘরছাড়া সেই দুরন্ত নীলাঞ্জনেরই পায়ের শব্দ শোনেন।

ঐ বুঝি সে এল!

একটু শব্দ হলেই: দেখ তো নীলু এল কি না? বৌদি, রাত্রে একটু সজাগ থেকো ভাই! যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি!···আর যদি ঘুমিয়েই পড়ি তা'হলে সে এলেই কিন্তু আমায় জাগিয়ে দিও! কত দিন দেখি না নীলুকে? মায়ের পেটের ভাইতো নয়, শত্রু! শত্রু! এমন শত্রু যেন কারও ঘরে না থাকে! ছোটবেলায় মা মারা গেলেন। বাবা আবার বিয়ে করলেন। ঐ নীলু, দেড় বছর বয়স হবে তার। আমাকেই তো ও মা ব'লে জানে!

দিদি আপন মনেই বকে যান। অতীত স্মৃতির রোমন্থন। ঝাপ্‌সা ছানিপড়া চোখে অশ্রু ঘনিয়ে আসে। বাইরে সত্যিই পায়ের শব্দ পাওয়া গেল:

অভি! অভি আছিস?

কে? কার গলা?···

সৃষ্টিধর এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

অভিজিৎ বাইরের ঘরেই ছিল : কে?

আমি সৃষ্টিধর। দিদি কোন্ ঘরে ভাই!

মাষ্টারদা! অভি ইতিপূর্বে প্রথম সেদিন মেসে সংবাদ দিতে গিয়ে মাষ্টার-দা'কে দেখলে। মাষ্টারদা! যার কথা কত শুনেছে ও! কত গল্প! কত কাহিনী! বিপ্লব যুগের সেই অসীম সাহসী মাষ্টারদা···যার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ, যাকে ধরবার জন্য এত বড় ব্রিটিশ শক্তিও হিম্‌সিম্ খেয়ে গেছে। সেই মাষ্টারদা! অভি এগিয়ে এসে মাষ্টারদার পায়ের কাছে মাথা নোয়াতে যেতেই মাষ্টারদা অভির দু'টো হাত ধরে ফেললেন : থাক্ ভাই, থাক্, রোজ রোজ প্রণাম কেন? নীলাঞ্জনের ভাইপো তুমি!···দিদি কেমন আছেন!···

অভি মাথা নাড়ে।

চল দিদির ঘরে যাই!

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে মাষ্টারদা ডাকেন : দিদি কোথায় গো? দিদি!

কে?

আমি সৃষ্টিধর, দিদি।

কে? সৃষ্টিধর!···

মাষ্টারদা এগিয়ে এসে দিদির পাশেই বসেন।

নীলুকে সঙ্গে আনলে না কেন সৃষ্টি! সে তো তোমাকে ছাড়া কখনো থাকতো না! দু'জনে একসঙ্গে সেই চলে গেলে!···নীলু আমার কেমন আছে সৃষ্টিধর?

একটু দ্বিধা নেই মাষ্টারদার, বলে : নীলু! সে তো ভালই আছে দিদি! তার জন্য কোন চিন্তা করো না!

কিন্তু সবাই যখন ছাড়া পেলে, সে তবে আসছে না কেন মাষ্টার?···দেশের কাজে নামলে কি স্নেহ মমতা সব একেবারেই বিসর্জন দিতে হয় তোমাদের?···বুড়ী দিদির কথা কি একবারটিও মনেও পড়ে না তার?

গভীর স্নেহে মাষ্টারদা দিদির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

শীর্ণ দেহাবয়ব যেন শয্যার সঙ্গে একেবারে লীন হয়ে গিয়েছে। রগের দু'পাশের চুল অধিকাংশই পেকে সাদা হয়ে গেছে।

মুখের 'পরে সুস্পষ্ট বলিরেখায় বয়সের ছাপ!

এককালে দিদির গায়ের বর্ণ কাঁচা হলুদের মত ছিল। এখন মনে হয় যেন রোদে পোড়া তামাটে। অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী যেন আগুনের তাপে ঝলসে গিয়েছেন। সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, কিছুই আজ তার অবশিষ্ট নেই!

নীলাঞ্জন মাষ্টারদার চাইতে প্রায় বছর আটেকের ছোটই হবে।

কিশোর-সংঘের একজন সাধারণ সভ্য হয়ে এলো একদিন নীলাঞ্জন। তারও

ঠিক তার দিদির মতই এমনি স্বর্ণকান্তি ছিল। কি নাসা, কি চক্ষু, কি কৃষ্ণ ভ্রূ!…প্রশস্ত ললাট। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণের জরুল চিহ্ন! সেই নীলাঞ্জনেরই দিদি হিরন্ময়ী!…ভাইয়ের জন্য তিনি এ জীবনে স্বামীর ঘরই করতে পারলেন না।

দুরন্ত ভাই! কারও শাসন মানবে না! অশান্ত চঞ্চল!…

সৎমায়ের কাছে ভাইকে রেখে হিরন্ময়ী শ্বশুরবাড়ীতে গেলেন।

এক মাসও গেল না। ভাই নদী সাঁতরে পালিয়ে চলে এল দিদির কাছে।

রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা হবে।

ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি! নিঃসাড় গ্রাম!…মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের ডাক শুধু শোনা যায় এখানে ওখানে।

দিদি! দিদি গো!

ঘুমের মধ্যেই দিদি চমকে ওঠেন: কে?

পাশেই স্বামী শেখরনাথ শুয়ে ছিলেন। প্রশ্ন করেন: কি হলো?

ঘুমের মধ্যে নীলুর গলা শুনলাম যেন।

পাগল!…এই রাতদুপুরে, কোথায় সে নদীর ওপাড়ে অন্য গাঁয়ে।

আবার শোনা যায় কণ্ঠস্বর: দিদি গো! দিদি!

ঐ! ঐ তো আমার নীলুর গলা। যাই!

তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে হিরন্ময়ী দরজা খুলে অন্ধকারে আঙ্গিনার 'পরে এসে দাঁড়ান: কে?

আকাশে মেঘ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন নিশুতি রাত্রি যেন থম্ থম্ করে।

দিদি, আমি নীলু।…নীলাঞ্জন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে দিদির গায়ে। দু'হাতে দিদিকে আঁকড়ে ধরে: দিদি!

হ্যাঁরে দস্যি! এত রাত্রে তুই কোথা হ'তে এলি বল তো?

পালিয়ে এলাম দিদি! তোমার জন্য মন-কেমন করছিল।

বেশ করেছিস্! চল্ ঘরে চল!—তোকে নিয়ে আমি কি করি বল তো নীলু!

দিদি হিরণ্ময়ীর ওখানেই থেকে গেল নীলু। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা দু'দিনেই হাঁপিয়ে ওঠে দস্যিছেলের কাণ্ডকারখানায়।

সংঘাত বেধে ওঠে স্নেহ ও আত্মীয়তার মর্যাদায়।

পরের ছা, এত গরজ তাদের কিসের? এত ঝামেলাই বা কেন পোহাবে ওরা? নীলাঞ্জনকে নিয়ে নালিশের অন্ত নেই।

শেখরনাথ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তীব্র কণ্ঠে বলেন: হয় ভাই নিয়ে তুমি থাক এ বাড়ীতে, আমি যাই; না হয় নীলুকে পাঠিয়ে দাও। নিত্য এ ঝামেলা আর সত্যি আমার সহ্য হয় না হিরণ!…

ও যদি ভাই না হয়ে তোমারই ছেলে হতো কি করতে? অবিচলিত ভাবে হিরণ্ময়ী প্রশ্ন করেন।

কেটে দু'টুক্রো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতাম! বলে রাগতভাবে শেখরনাথ ঘরে হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

নির্বাক হিরণ্ময়ী স্বামীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুকখানা তোলপাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হ'য়ে আসে।

নীলু কিন্তু কোন কথাই যেন বুঝবে না!

এত দুষ্ট হলে কি হবে, পড়াশুনায় কিন্তু ঠিক আছে। ক্লাসে তার মত অংক কষতে কেউ পারে না, কবিতা মুখস্থ পারবে না কেউ ওর মত বলতে, মুখে মুখে ইংরাজী ট্রানস্লেশনে ওকে হারায় কে! কিন্তু দুষ্টুর যেন শিরোমণি·

যত বদ্‌বুদ্ধি কি ওরই মাথায় ঘুরবে সর্বদা!

হিরণ্ময়ী কিছুই বলতে পারেন না। মা-হারা ভাইটির মুখের দিকে তাকালেই শাসনের সমস্ত সংযম যেন স্নেহের প্রাবল্যে খেই হারিয়ে ফেলে।

এদিকে নীলাঞ্জনকে কেন্দ্র করে বাড়ির মধ্যে অসন্তোষের ঝড় যেন ক্রমেই ঘোরালো হয়ে ওঠে দিনকে দিন!

শেষ পর্যন্ত হিরণ্ময়ী ভাইয়ের হাত ধরে একদিন শ্বশুরবাড়ীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নৌকায় এসে উঠে বসেন। আর তিনি ফিরে যান নি শ্বশুরের ভিটেয়।

মাস দু'য়েক পরে হঠাৎ একদিন শেখরনাথ এলেন, বললেন: ফিরে চল হিরণ!···তোমাকে আমি নিতে এসেছি।

দিদি মাথা নাড়লেন: যে বাড়ীতে আমার ভাইয়ের স্থান নেই, সেখানে আমারও স্থান নেই।

তাহলে তুমি যাবে না!

যাব না তো বলি নি। বলেছি যেখানে নীলুর স্থান নেই সেখানে আমার স্থানের কি সঙ্কুলান হবে?

এরপর কিন্তু আমার দোষ আর দিতে পারবে না হিরণ!···

ভয় নেই! যে মুহূর্তে মেয়েমানুষ হয়েও শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে এসেছি, সমস্ত সংশয়ের একেবারে শেষ করেই এসেছি সেই মুহূর্তেই। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় যাকে ধরে রাখতে পারলাম না, তার জন্য আর যাই হোক্ আমি হা-হুতাশ করবো না! তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমার চাইতেও তোমার ভাই-ই তোমার বড় হলো তা'হলে হিরণ?

মায়ের পেটের ভাই আর স্বামী এক বস্তু নয়। কিন্তু সে তর্ক থাক্। তুমি হয়ত বুঝবে না! সত্যিই যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে আর পাঁচটা বছর অপেক্ষা করো, নীলু একটু বড় হলেই আবার আমি ফিরে যাবো!

থাক্! আর না ফিরলেও চলবে!

রাগত শেখরনাথ স্থানত্যাগ করলেন।

এক মাসও গেল না, হিরণ্ময়ী লোকমুখে শুনলেন, স্বামী শেখরনাথ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করবেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে হিরণ্ময়ী নীলাঞ্জনকে সজোরে বুকের 'পরে চেপে ধরলেন।

ভাই দিদির মুখের দিকে তাকায়। ভাইয়ের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করেন: হ্যাঁরে নীলু, তোর দিদিকে তুই কোনদিন ছেড়ে যাবিনে

তো, আজ থেকে তোর দিদির সকল দায়িত্ব কিন্তু তোকেই বহন করতে হবে।

খুব পারবো, সে তুমি দেখে নিও। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না!

সেই নীলাঞ্জনই তাকে ছেড়ে চলে গেল একদিন।

মাষ্টারদার তো কিছুই অজানা নেই। নিজের হাতে গড়া শিষ্য নীলাঞ্জন সেন।

আমায় সত্যি কথা বল তো মাষ্টার, নীলু আমার বেঁচে আছে তো?···

ও-কথা কেন বলছো দিদি!

কি জানি মাষ্টার! কথাগুলো আর শেষ হয় না! দিদির দু চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নেমে আসে।

কেঁদো না দিদি, কেঁদো না! নীলাঞ্জন তোমার মরে নি! সে মৃত্যুঞ্জয়!

*　　　*　　　*

সত্যিই তো! কেন এ অশ্রুমোচন!

ক্ষণিকের হলেও সে তো মিথ্যা নয়। তার তো শেষ নেই! সে যে অব্যয়, অক্ষয়, সে যে অনাদি, সে যে অনন্ত! স্মৃতির মণিকোঠায় আজও যে সে বেঁচে আছে। এবং থাকবেও বেঁচে চিরদিন।

তবে কেন এ অশ্রুমোচন!···কেন এ বিলাপ! কেন এ ক্ষণিক দুর্বলতা!

কিন্তু তবু! তবু মন মানে কই! তাই বুঝি দু'চোখের কোলে অশ্রু ভরে আসে। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

*　　　*　　　*

যায় যাক্! লজ্জায় অপমানে সর্বাঙ্গ কালি হয়ে যাক্! তবু বলব! পর-দেশীরা আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে। একমাত্র সোনার ভারতবর্ষেই যে তাদের Divide and Rule নীতি সফল হয়েছে, সগৌরবে একথা ঘোষণা করবে চিরদিন। সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস।

ভাই হয়ে আমরা ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি। পরদেশী প্রভুর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াতে গিয়ে, ভাইয়ের বুকে আমরা ভাই ছুরি হেনেছি, ঘরভেদী বিভীষণ হয়ে আমাদেরই মৃত্যুবাণ তুলে দিতে ইতস্তত করিনি পরদেশীর হাতে। বিভীষণের কলঙ্কের মতই এ কলঙ্ক যে যাবার নয়!

বহু দূর দেশ হতে এসে যারা জোরজবরদস্তি ও ছলনা করে আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরই বুটের তলায় চিপে ধরে শান্তির-বাণী আওড়াতে বাধ্য করলে, আর যাই করি না কেন আমাদের সে দৈন্যকে আজ্ যেন লজ্জার খাতিরে না এড়িয়ে যাই! স্বীকৃতি দিতেই হবে। এবং সেই লজ্জাস্কর স্বীকৃতির বেদনা-মাখা অশ্রুজলে ঝাপসা চোখে আবার ফিরে তাকাই—১৮৫৭র সেই পরাজয়ের কাহিনী তো! বিপ্লবের সেই অগ্নি—যে যজ্ঞাগ্নি শুধু জ্বলতে দেখে এসেছিলাম!

*　　　*　　　*

সেই দিল্লী, বারাণসী, জৌনপুর, কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসী···যেখানে দেখে এলাম বহু কালের দাসত্বের অবসানে উড়তে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা; সেখানেই আবার ফিরে যেতে হবে। বলতে হবে অকুতোভয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে, কেমন করে একে একে আবার আমাদের সে সব জায়গা হতে ফিরে আসতে

হলো, পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি ও লজ্জায় মাথা নীচু করে, দাসত্বের লৌহ-শিকলকে নিজেদের পায়ে-পায়েই আরো শক্ত কঠিন করে বেঁধে। ১৮৫৭র সেই মহাপ্রলয়ের দিনে ভারতের দিকে দিকে যখন চলেছে শিকল ভাঙ্গার বহ্নি-উৎসব, ভারতের বহু স্বাধীন রাজ্যের রাজন্যবর্গ একান্ত নিরপেক্ষ হয়েই সেদিন দূরে দাঁড়িয়ে রইলো ইচ্ছা করে নির্বিকার ভাবে। তাদের প্রাণে কি সত্যি সেদিন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে নি? মূর্খের দল! শুধু মূর্খ নয়, দেশ-দ্রোহীর দল! তারা যদি সেদিনকার সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে কাঠের পুতুলের মত দূরে দাঁড়িয়ে না থাকত, মুক্তিকামী বীর সৈনিকদের পাশে এসে দাঁড়াতো তাদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে, তা'হলে হয়ত নিশ্চয়ই ১৮৫৭র রক্তদান ব্যর্থ হতো না। হতো না…হতো না সে দিনগুলো কলঙ্কিত!

সাহায্য তো তারা সংগ্রামীদের কোন প্রকারেই করেনি, বরং পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে বিদেশী শক্তির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সেদিনকার ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ ও পযু্দস্ত করতে।

কিন্তু কে সে মুখোসধারীর দল? কারা?

আজ বিচারের দিনে তাদের যেন আমরা না ভুলে যাই! কাচ্, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বুন্দেলা, রাজপুতানা এবং তাদের স্বগোত্র আরো অনেকেই মীরজাফর, ইয়ারলতিফ্ ও পাতিয়ালার বংশধরেরা।

মুষ্টিমেয় বীর শহীদের বুকের রক্তে যখন দেশের মাটি সিক্ত হয়ে গেল, কই জনসাধারণ তো এগিয়ে এলো না সে রক্তোৎসবে সেদিনের সেই মহামুহূর্তে!

তারপর যারা সেদিন দেশের ডাকে এগিয়ে এলো, তাদেরও মধ্যে নেই কোন একতা, নেই একনিষ্ঠতা, নেই অন্ধ দেশপ্রেম, নেই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

দলের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব।

দলপতিকে মেনে নেওয়ার মত সকলের চিত্তে নেই নিঃসংশয়তা বা উদারতা।

* * *

১১ই মের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আবার দিল্লীতে ফিরে এসেছি।

আগেই বলেছি ৭ই আগষ্ট শ্বেতাঙ্গ সেনানায়ক দিল্লির সন্নিকটে উপনীত হয়।

তারও আগে সসৈন্যে উইলসন সেখানে এসে পেঁীছে গিয়েছে।

স্বাধীন দিল্লীকে আজ চারিপাশ হতে শ্বেতাঙ্গের দল আমাদেরই বিশ্বাস-ঘাতক দেশদ্রোহী ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্যে অবরোধ করেছে।

কিন্তু কই! অবরুদ্ধ দিল্লী তো আজিও ধরা দেয় না। নতি স্বীকার করে না।

হতাশার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে স্বেতাঙ্গদের মনে।

নব আশার বাণী শোনায় শ্বেতাঙ্গ অফিসার বেয়ার্ড স্মিথ্: হতাশ হলে চলবে না। দিল্লীর অবরোধ আমরা তুলে নিতে পারি না, আজ যদি আমরা দিল্লীর অবরোধ তুলে দিই, পিছু হটে যাই, সমগ্র পাঞ্জাব আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে যাবে সমগ্র ভারত। যাবে সমস্ত আশা।

ভারতে আমাদের রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ব্রিগেডিয়ার উইলসন জবাব দেয় : ঠিক বলেছো, দিল্লী পুনরাধিকার না করা পর্যন্ত আমরা এক পাও পিছু হটে যাবো না।

শোন ভারতবাসী, শ্বেতাঙ্গদের কথা শোন। এ দৃঢ়তার কেন অভাব হয়েছিল সেদিন তোমাদের ? কেন তোমরাও সেদিন তাদের পাশে থেকে ঐ সংকল্পের বাণী শুনেও অধীনতা শৃঙ্খল ছুঁড়ে ফেলে দেশকে চিরস্বাধীন করতে এগিয়ে যাওনি ? কেন তোমরাও সমান কণ্ঠে করতে পারনি প্রতিজ্ঞা ?

দিল্লী অবরোধ তারা সেদিন করেছিল বটে, তবে তাদেরও দুর্দশার অন্ত ছিল না।

সংবাদ আদানপ্রদানের কোন ব্যবস্থাই নেই। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে সব ধ্বংস করেছে সংগ্রামীর দল।

প্রায় এক মাস পরে সংবাদ আসে নিকলসনের নেতৃত্বে আরো একদল সৈন্য আসছে দিল্লীর দিকে সাহায্যার্থে।

এদিকে দিল্লীতে বিদ্রোহী দলে উপযুক্ত নেতার অভাব, সুষ্ঠুভাবে সৈন্য চালনা করবে এমন কেউ নেই।

স্বয়ং সম্রাট বাহাদুর শাহেরও যুদ্ধ বা সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কে নেই কোন সত্যিকারের অভিজ্ঞতা, কারণ মুঘল শক্তি যখন ক্ষয়ের মুখে, হৃতসর্বস্ব, শ্রীভ্রষ্ট, তখনই যে তাঁর জন্ম।

ইংরাজের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের মধ্যেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো লাঞ্ছনা ও অবমাননা সয়ে কেটেছে।

ব্রিটিশ শক্তির নিকট পদানত পিতার সন্তান তিনি।

ময়ূর সিংহাসনের গৌরব গরিমা আজ তাঁর কাছে অতীতের স্বপ্নস্মৃতি মাত্র।

পঞ্চাশ হাজার বীর সাহসী যোদ্ধা দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে, তবু জয়ের আশা ক্ষীণ হয়ে আসে দিনকে দিন, কেবল একজন সত্যিকারের দলপতির অভাবে।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের চেষ্টার অন্ত নেই।

শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে সম্রাট সাহায্যলিপি প্রেরণ করলেন জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, আলোয়ারের রাজন্যবর্গের নিকট : সকাতর মিনতি : দেশের এত বড় দুর্দিনে আপনারা এগিয়ে আসুন। দেশকে বিদেশীর পদদলিত হতে দেবেন না। আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করুন। ফিরিঙ্গীদের আমাদের জন্মভূমি হতে বিতারিত করুন। স্বাধীন করুন আমাদের স্বপ্নের, গৌরবের হিন্দুস্থানকে। সকলে একত্র হোন। দেশ হতে ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে দিন। আমার রাজ্য মান সম্ভ্রম কিছু চাই না, সিংহাসন আমি হাসিমুখে ত্যাগ করবো, আপনারা যোগ্য ব্যক্তিকেই সিংহাসনে বসিয়ে দেশ শাসন করুন।

কিন্তু সম্রাটের কাতর অনুনয় ব্যর্থ হলো।

এদিকে দুপক্ষে যুদ্ধ চলেছে ঘোর রবে।

দিল্লীর গৌরব-রবি যখন অস্তোন্মুখী দিন দিন, সামান্য মাহিনার জন্য সেপাইদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ।

হয় মাহিনা বাড়াও, নচেৎ নগরের ধনীদের গৃহ লুট করবো আমরা।

হায় অপদার্থের দল ! দেশের এত বড় দুর্দিনে আজ সম্মানের চাইতে অর্থই হলো তোমাদের কাছে বেশী ! দেশের চাইতে বেশী হলো একমুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা !

তোমরা পরাধীন থাকবে না ত থাকবে কে ?

সম্রাটের আদেশে নায়ক বখৎখান সেপাইদের প্রশ্ন করে : তোমাদের অভিপ্রায় কি ? যুদ্ধ করবে, না আত্মসমর্পণ করবে ?

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় : যুদ্ধ ! আমরা যুদ্ধ করবো !

বখৎখানের পরামর্শমত স্থির হলো, নজাফগড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রু-পক্ষের যে সৈন্যদল আসছে তাদেরও ধ্বংস করতে হবে, যেন দিল্লীতে তাদের দল না এসে পেঁছুতে পারে। শত্রুশিবিরে এ সংবাদ পেঁছুতে দেরি হল না। নিকলসন অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দ্রুত সেপাইদের সংকল্পে বাধাদানের জন্য নজাফ-গড়ের দিকে এগিয়ে যায়।

ভারতীয় সৈন্যদল কিন্তু বখৎখানের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে সামনের এক পল্লীগ্রামে গিয়ে ছাউনি ফেললে।

ইংরাজ সৈন্য এসে অতর্কিতে ভারতীয় সেপাইদের আক্রমণ করলে।

সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিল বীরের মত যত ভারতীয় সেপাই, তারা আক্রমণের জন্য এতটুকু প্রস্তুত ছিল না।

'বুন্দেল-কি সড়াই'য়ের যুদ্ধের পর এত বড় পরাজয় ভারতীয় বাহিনীর আর হয়নি। দ্বিতীয়বার, নীতির অপপ্রয়োগ, যথেচ্ছাচারিতা, আদেশ লঙ্ঘন ও নৈতিক আদর্শের অভাবে ও একতার জন্যই তাদের ঘটলো শোচনীয় পরাজয়। এমনই হয়। আদর্শের মৃত্যু যেখানে ঘটেছে, পরাজয়কে সেখানে ঠেকিয়ে রাখা কি যায় ? যায় না।

দীর্ঘকাল ধরে দিল্লী অবরোধের পর ২৫শে আগস্ট ঐ যুদ্ধ জয় শ্বেতাঙ্গ দলে আনন্দের ও আশার বাণী বহন করে আনল।

এদিকে ইতিমধ্যে পাঞ্জাব হ'তে নিরাপদে নতুন সৈন্যদলও এসে গেল।

শত্রুপক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনী : তিন হাজার পাঁচশত গোরা সৈন্য ও অফিসার, পাঁচ হাজার গুর্খা, শিখ ও পাঞ্জাবী সৈন্য। দুই হাজার পাঁচশত কাশ্মীরি সৈন্য এছাড়াও এদের দলে ছিল বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী ঝিন্দের রাজা। ইংরাজ-উচ্ছিষ্ট-লোভী কুক্কুরের দল।

সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে শত্রুপক্ষে সমরায়োজনই চলল।

ধীরে ধীরে ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দেশদ্রোহী ভারতীয় সৈনিকের দল দিল্লীর গৌরব-রবি ধূলিসাৎ করতে এগিয়ে আসছে, দিল্লীর প্রাচীরের বাইরে, প্রাচীরের মধ্যে তখন আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে চলেছে নানা বিশৃংখলা, বিদ্রোহ ও দলপতির আজ্ঞা ও নির্দেশ লঙ্ঘন।

১৪ই সেপ্টেম্বর বিশাল ইংরাজ সৈন্য চার ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালাল।

দ্বিপ্রহরের দিকে বহু ফিরিঙ্গীর রক্তপাত ও প্রাণদানের পর দিল্লীর প্রাচীর ভেঙ্গে গেল, স্বাধীন দিল্লীতে আবার শ্বেতাঙ্গরা প্রবেশ করল।

১১ই মে'র স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে তারই ভয়াবহ সূচনা ফিরে এল।

নিকলসন রক্তাক্ত, আহত।

২৪শে সেপ্টেম্বর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন দিল্লীর সমগ্র আশাই প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে।

দিল্লীর তিনের-চার অংশ শ্বেতাঙ্গ অধিকারে গিয়েছে।

দিল্লীর বুকে শুরু হলো এবারে প্রতিহিংসার রক্তোৎসব।

গোরা সৈনিকেরা বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী যাকে সামনে পেলে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিল্লীর পথের ধুলায় ছড়িয়ে দিল দানবীয় জিঘাংসায়।

গৃহে গৃহে জ্বালাল ভয়াবহ অগ্নি।

শিখ সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে মেতে ওঠে সেই হত্যাযজ্ঞে। অগ্ন্যুৎসবে।

দিল্লীর প্রাসাদও অবরুদ্ধ : কিন্তু বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ ?

গভীর রাত্রে বখৎখান এসে সম্রাটের কক্ষে করাঘাত হানল।

কে ?

সম্রাট, আমি বখৎখান।

আমাদের সব আশাই কি তা'হলে নির্মূল হলো, এই সংবাদই কি দিতে এলে বখৎখান !...বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন।

সম্রাট্ !...রাজধানী শত্রুদের হাতে গিয়েছে বটে, তবে এখনও আমরা শেষ চেষ্টা করতে পারি, আপনি নিরুৎসাহ হবেন না। আমি কাল এসে আপনাকে নিশ্চয় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বলব।

বখৎখানের প্রস্থানের একটু পরেই বাহাদুর শাহের আর একজন আত্মীয়, মীর্জা এলাহি বক্স এসে বাহাদুর শাহ্‌কে নিজগৃহে নিয়ে গেল। সেখান হতে মীর্জার পরামর্শে পরের দিন রাত্রে সম্রাট্ বেগম জিন্নৎমহল ও তদীয় পুত্র হুমায়ুনের সমাধিভবনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন গোপনে। এই সংবাদ গোপনে ঘর-সন্ধানী বিভীষণ রাজীব আলি ইংরাজ শিবিরে পেঁাছে দেয় এবং রাজীব আলি ও মীর্জার সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি হডসন দিল্লীর শেষ স্বাধীন সম্রাটকে বন্দী করলে।

আর বন্দী হলো ঐ সঙ্গে শাহ্‌জাদারাও !

পথিমধ্যেই শাহ্‌জাদা ও অন্যান্য রাজবংশীয়দের গুলি করে মারা হলো। হুমায়ুনের বংশধরদের রুধিরে দিল্লীর পথের ধুলো রাঙা হয়ে গেল।

১৮৫৮ অব্দের ২৭শে জানুয়ারী ইংরাজ সৈনিক কর্মচারীদের আদালতে বিচারের প্রহসন শুরু হলো বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের। চল্লিশ দিন বিচারের পর আদেশ হলো : নির্বাসন দণ্ড।

রেঙ্গুনের তিনশত মাইল দূরে পেগুতে বৃদ্ধ সম্রাট্ নির্বাসিত হলেন।

* * *

দিল্লীতে অশ্রুমোচনের শেষ না হতেই ফিরে তাকাই লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার দিকে। এখানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, সেই নীতিভঙ্গ, সেই ভেদাভেদ, সেই যথেচ্ছাচারিতা ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে, এবং

তারই সাহায্যে সেখানেও শত্রুপক্ষই হলো জয়ী।

অযোধ্যা!

সেদিন যখন চক্রান্ত করে শ্বেতাঙ্গরা বিনা বাধায় একটি বহু বিস্তৃত ও বহু সম্পত্তিপূর্ণ প্রদেশের অধিপতিকে তাদের ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রান্তভাগে নির্বাসিত করেছিল, তখন অযোধ্যাবাসী নির্বাক স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিল, প্রতিবাদে কেউ একটি অঙ্গুলিও হেলন করে নি। নবাবের পদচ্যুতিতে তারা কেবল নিরুপায় দুঃখানলেই অশ্রু-তর্পণ দিলে, কিন্তু ঐ অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি অসিও খাপ হ'তে মুক্ত হলো না।

ক্লীবত্বের ফল পেতে দেরি হয় নি।

যে নবাবের আমলে, তাদের নবাব অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী হওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রা সহজ ও সরলই ছিল, আজ সেই নবাবহীন ইংরাজের আমলে দুঃখ-দৈন্য যেন শতবাহু বিস্তার করে এগিয়ে এল।

অযোধ্যায় সম্ভ্রান্তবংশীয়রা যারা আত্মীয়তাসূত্রে নবাবের সঙ্গে ছিল সংযুক্ত, নবাবের অভাবে আজ তাদেরই দৈন্য ও অভাব যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠল।

সেদিন পদচ্যুত নবাবের আত্মীয়-স্বজনরা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়রাই কেবল দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন তাই নয়, জনসাধারণও দারিদ্র্য ও করভারে অবসন্ন হয়ে উঠেছিল।

এরা ছাড়াও ভূসম্পত্তি ও অর্থবলে বলীয়ান চিরপ্রসিদ্ধ রাজপুত জাতি, একদা যারা তাদের ক্ষমতায়, তেজস্বিতায় ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল, এরাও শ্বেতাঙ্গদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল।

তালুকদার সম্প্রদায়কেও উৎখাত করতে শ্বেতাঙ্গরা কসুর করে নি।

সে সময় সম্ভ্রান্ত তালুকদারদের সশস্ত্র অনুচর ও জঙ্গল পরিবেষ্টিত মৃন্ময় দুর্গ ছিল। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ঐ সব দুর্গ হতে কামান অপহরণ, জঙ্গল পরিষ্কৃত, সশস্ত্র অনুচরদের নিরস্ত্রীকৃত ও দলভ্রষ্ট করে দেওয়া হয়। এ অপমানের জ্বালা সেই সব নিরস্ত্রীকৃত যোদ্ধারা ভুলতে পারে নি।

এই ভাবেই ১৮৫৭-র বিপ্লবে ঐ সকল অধিকারচ্যুত অত্যাচার জর্জরিত-সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়, স্বত্বভ্রষ্ট ভূস্বামীর দল, তাদের নিরস্ত্রীকৃত বিতাড়িত লাঞ্ছিত সমরকুশলী অনুচরবৃন্দ, ও অযোধ্যা অধিকারের পর নবাবের সৈন্যদল হতে যে সব সৈন্যদের শ্বেতাঙ্গরা বিতাড়িত করেছিল, সকলে আজ এগিয়ে এল প্রতিহিংসা ব্রত উদ্‌যাপনে!

মে মাসের প্রথমেই সাত সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিক সৈন্যদল নতুন টোটা ব্যবহারে অসম্মতি জানায়। অধিনায়কদের সকল চেষ্টা হয় ব্যর্থ। টোটা তারা কিছুতেই ব্যবহার করবে না, যায় প্রাণ যাক্‌!

আটচল্লিশ সংখ্যক পদাতিক দলের কাছে সাহায্য প্রার্থনার সংবাদ গিয়েছে পত্র মারফৎ। কিন্তু সেপাইদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

দেশদ্রোহী এক তরুণ সেপাইয়ের হাতে সে চিঠি ভাগ্যক্রমে পড়ে যায়।

আটচল্লিশ সংখ্যক পদাতিক দলের বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী পরউচ্ছিষ্ট-

লোভী সুবাদার সেবক তেওয়ারী, হাবিলদার হীরালাল দোবে এবং রামনাথ দোবে, তারাই গোপনে সেই পত্রখানা শ্বেতাঙ্গ অধিনায়কদের হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হলো না।

শ্বেতাঙ্গ স্যার হেনরি লরেন্সের কানে এ সংবাদ পৌঁছতেই সে বলে : আর দেরি নয়, বলপূর্বক ভারতীয় সেপাইদের এখুনি নিরস্ত্রীকৃত করতে হবে।

১০ই মে'র চন্দ্রালোকিত রাত্রি, মীরাটে যখন স্বাধীনতার পুণ্যসংগ্রাম হয়েছে শুরু, এখানে প্রশস্ত কাওয়াজের ময়দানে শুরু হলো নিরস্ত্রীকরণ উৎসব—ফিরিঙ্গীদের বিজয় উল্লাসে। নিরস্ত্রীকরণ উৎসবের পর এক পক্ষকালও গেল না, জ্বলে উঠলো আগুন অযোধ্যায়।

* * *

আর লক্ষ্মৌ রেসিডেন্সি!

গোমতীর তটে যে পাহাড়টি অবনত হয়ে আছে, তারই উপরে রেসিডেন্সি, সুদৃশ্য ত্রিতল বাটী। ১৮০০ সনে সাদত আলি রেসিডেন্টের বাসের জন্য রেসিডেন্সী নির্মান করেছিলেন। রেসিডেন্সীর মধ্যস্থিত ভূগর্ভে অনেকগুলো গুপ্ত কক্ষ আছে। রেসিডেন্সীর সীমানার মধ্যেই ফিরিঙ্গীর ধনাগার।

বৈদ্যুতিক তরঙ্গের তারে ভাসিয়ে আনছে লক্ষ্মৌতে চারিদিকের দুঃসংবাদ। বিপ্লবের বার্তা। প্রলয়-প্রভঞ্জনের গুরু গুরু ডাক।

ভারতীয় সেপাইরা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে সে সংবাদে। দিল্লী, মীরাটের সাফল্য প্রাণে জাগাচ্ছে তাদের নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন!

সৈন্যাধ্যক্ষ হেনরী লরেন্স।

৩০শে মে'র রাত্রি। অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ের আশু সম্ভাবনায় প্রকৃতি থমথম্ করছে।

রেসিডেন্সী-গৃহে হেনরী লরেন্স ডিনার খেতে বসেছে তার সহচরদের নিয়ে টেবিলে। দ্বারে করাঘাত শোনা গেল : আসতে পারি?

—এসো! কি সংবাদ!

—আজ রাত্রেই বিদ্রোহীরা সংগ্রাম শুরু করবে। শুনলাম সংকেতধ্বনি—নয়বার তোপধ্বনি নাকি ওরা করবে।

আগন্তুকের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারকে ফালি-ফালি করে তোপধ্বনি শোনা গেল।

কিন্তু কই? কোন গোলমালই তো শোনা যাচ্ছে না!

হেনরী লরেন্স হেসে ফেলে : কই হে? কোথায় বিপ্লব?···সব যে চুপ্‌চাপ!

কিন্তু হেনরী লরেন্সের কথা শেষ হলো না। অকস্মাৎ মুহুর্মুহু বন্দুকের শব্দ চারিদিক প্রকম্পিত ক'রে তুলল : দুম্···দুম্! দুড়ুম্!···দুম্!···

ছুটে সকলে ঘরের বাইরে আসে। রজতস্নাতা ধরণী। অপূর্ব মোহিনী।

সৈনিক নিবাস হতেই বন্দুকের শব্দ আসছে, তাতে আর কোন ভুলই নেই।···বিদ্রোহীর দল এইদিকেই আসছে এগিয়ে।

সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সদলবলে হেনরী সৈনিক নিবাসের

দিকে ধাবিত হয়। এদিকে সেপাইরা রেসিডেন্সীর দিকে এসে গেল বুঝি।

জ্বলে উঠলো আগুন! শুরু হলো ফিরিঙ্গী নিধন যজ্ঞ।...

বিদ্রোহীদের অব্যর্থ গুলির আঘাতে ফিরিঙ্গী ব্রিগেডিয়ারের রক্তাপ্লুত দেহ মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু একদিনেই সব বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ফিরিঙ্গীর কামানের মুখে; একতা ও নিষ্ঠার অভাবে।

এদিকে অযোধ্যার চারিদিক হ'তে প্রাণভয়ে পলায়িত ফিরিঙ্গীরা লক্ষ্ণৌতে এসে ভিড় করছে। অযোধ্যা ফিরিঙ্গী শূন্য, ভারতীয়দের সম্পূর্ণ করতলগত।

হেনরী লরেন্স এখন লক্ষ্ণৌ রক্ষাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবার নতুন করে সৈন্য সমাবেশ শুরু হয়। ঐ সৈন্যদলের মধ্যেই ছিল বিশ্বাসঘাতক ভারতীয় শিখসৈন্যরা, তা ছাড়াও ৮০০ জন অন্যান্য ভারতীয় সৈন্য।

১২ই জুন আবার বিপদের কালো মেঘ এলো ঘনিয়ে আকাশে।

প্রথম সংঘর্ষ হলো ফিরিঙ্গীদের সাথে ভারতীয় বিপ্লব-বাহিনীর—ইসলামপুর পল্লীতে। বিপ্লব-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ফিরিঙ্গী-বাহিনী ছত্রাকারে বিশৃংখল হয়ে গেল। গৌরবময় পশ্চাদপসরণ করতে তারা বাধ্য হলো।

বিনু-হাটের যুদ্ধে বিজয়ী বিপ্লব-বাহিনী এবারে এগিয়ে এলো বিজয়োল্লাসে গোমতীর তটাভিমুখে। সামনেই কামান দ্বারা সুসজ্জিত প্রস্তরময় সেতু—গোমতী পারাপারের একমাত্র পথ।

ফিরিঙ্গী-বাহিনী মরণপনে কামান চালাতে শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে ভারতীয়-বাহিনী নৌকা সংগ্রহ করে নদী পার হতে শুরু করল।

আজ তারা কোন বাধাই মানবে না।

নীলাকাশ মধ্যাহ্নের প্রখর মার্তণ্ড তাপে যেন আগুন ছড়ায়।

ফিরিঙ্গীদের আশ্রয়স্থল ফৈজাবাদ, সীতাপুর, সুলতানপুর সবই ভারতীয়-বাহিনী করেছে অস্ত্রমুখে অবরোধ।

চারিভিতে মুহুমুর্হু কামান গর্জন! আহতের আর্তনাদ, অগ্নি ও ধূম শিখায় পৃথিবী জ্বলছে অত্যাচারের ঔদ্ধত্যে!

দুর্নিবার আক্রমণের মুখে মচ্ছিভবন, রেসিডেন্সী সব বিদ্রোহীদের করতলে ছেড়ে দিতে ফিরিঙ্গীরা বাধ্য হলো।

দিনমণি অস্ত গেলেন। এলো রাত্রির কালো ছায়া। কিন্তু গোলাগুলির বিরাম নেই।

১লা জুলাই লক্ষ্ণৌতে ব্রিটিশ শক্তি ও গৌরব, বিপ্লব-বাহিনীর কামানের মুখে ভূলুণ্ঠিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে গোপনে মচ্ছিভবন হতে প্রাণভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ফিরিঙ্গীরা দলে দলে রেসিডেন্সিতে এসে আশ্রয় নিল।

২রা জুলাই হেনরী লরেন্স বিপ্লব-বাহিনীর কামানের গোলায় শেষ নিঃশ্বাস নেয়; হেনরীর মৃত্যুসংবাদ ভারতীয়দের মধ্যে নতুন আশা বহন করে আনে। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ শুরু করে।

গোলাবৃষ্টির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। সেদিনকার মুক্তিসংগ্রামের সে

এক গৌরবময় অধ্যায়। দিনের পর দিন যায়, রাত্রির পর রাত্রি আসে, কিন্তু বিপ্লবীদের অবরোধ তিলমাত্র শিথিল হয় না। অবরুদ্ধ ফিরিঙ্গীদের দুর্দশার একশেষ। মনের শান্তি নেই, ক্ষুধায় আহার নেই, নেই তৃষ্ণায় পরিমিত জল। সবার উপরে দেখা দেয় ওলাউঠা, বসন্ত, যত প্রকারের দুরারোগ্য সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধি।

সকল কিছুর উপরে অবিশ্রান্ত গোলা-বৃষ্টি!

জুলাই গেল। আগস্ট মাস এলো, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তনই নেই। দেশদ্রোহী সেপাই অঙ্গদ, হীন চরের বৃত্তি নিয়ে বিপ্লবীদের সকল সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে ফিরিঙ্গীদের কাছে গোপনে গোপনে।

দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের বহু ভারতীয় কর্মচারী নিজেদের দেশের ভাইদের ভুলে ইংরাজের তুষ্টি সাধনে যতপ্রকার সাহায্য সম্ভব দিয়ে নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে।

অঙ্গদই একদিন সংবাদ এনে দেয়ঃ আর ভয় নেই, সেনানায়ক হ্যাভলক্ সসৈন্যে কানপুর হ'তে আসছে ফিরিঙ্গীদের উদ্ধার করতে।

২৫শে সেপ্টেম্বর সত্যসত্যই উদ্ধারকারী ইংরাজ সৈন্যদের আসবার সাড়া পাওয়া গেল দ্বারে।

ওদিকে ২০শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে আবার স্বাধীনতার সমাধি হলো। ফিরিঙ্গীদের বিজয়-পতাকা সম্রাটের প্রাসাদে হল উড্ডীন নতুন করে।

দিল্লী অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো ইংরাজ ও দেশদ্রোহী পর-উচ্ছিষ্টলোভী বিদেশীর তাঁবেদার দেশীয় সৈনিকদের হত্যা ও লুণ্ঠন নারকীয় উৎসব।

২৬শে সেপ্টেম্বরঃ লক্ষ্নৌ!

বিপ্লব-বাহিনী মরণপণে যুঝে চলেছে, আসতে দেবে না আগত ফিরিঙ্গী-বাহিনীকে। কিন্তু লক্ষ্নৌর স্বাধীনতার স্বপ্নও ধূলিসাৎ হ'তে চলেছে। দিল্লী ও মীরাটের বিষাক্ত ধোঁয়ার পুনরাবৃত্তিতে লক্ষ্নৌর মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলেছে মাত্র। বিপ্লব-বাহিনীকে কিছুতেই যেন ফিরিঙ্গীরা শেষ করতে পারে না।

অক্টোবর মাসও এইভাবেই যায়। নভেম্বর মাস এসে পড়ে।

১৩ই নভেম্বর আলামবাগ এবং দেলখোশা বাগানের মধ্যবর্তী মৃন্ময় দুর্গের পতন হলো।

১৬ই নভেম্বর আবার ইংরাজ সৈন্যবাহিনী রেসিডেন্সী আক্রমণ করে।

কিন্তু সেখান থেকেও আবার পিছু হটে আসতে হয়।

এমনি করেই বিপ্লব-বাহিনীর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের যুদ্ধ চলে দীর্ঘদিন ধরে। রক্তে লক্ষ্নৌর রাস্তার ধুলো লাল হয়ে যায়, কামানের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে যায়।

লক্ষ্নৌর এই জীবন-মরণ সংগ্রামে যে ভারতসন্তান মৃত্যুপণে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তার কথাই আজ বার বার মনে পড়েঃ ফৈজাবাদের আহম্মদ শাহ্ মৌলবী। শ্বেতাঙ্গরা বহু পূর্বেই আহম্মদ শাহের অন্তরে অগ্নির সন্ধান

পেয়েছিল এবং তাই তাকে গ্রেপ্তার করে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিল ফাঁসীর দড়িতে, ১৮৫৭র মহাবিপ্লবের মাত্র কিছুকাল পূর্বে।

দেশপ্রেমিকের উপরে দেশদ্রোহীর অপরাধ কাঁধে চাপিয়ে ফৈজাবাদের কারাগৃহে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা হলো।

যে মুহূর্তে ভারতের মাটিতে বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো, বিপ্লবীরা কারাগারের পাষাণপ্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেশপ্রেমিককে দিলে মুক্তি। কারামুক্ত অক্লান্ত দেশকর্মী আহম্মদ শাহ্ দিবারাত্র সমভাবে আবার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র বিলিয়ে বেড়াতে লাগলেন লক্ষ্মৌর জনে জনে।

১৫ই জানুয়ারী ১৮৫৮ঃ বিপ্লবীরা সংবাদ পেলে ফিরিঙ্গী-বাহিনী লক্ষ্মৌর দিকে এগিয়ে আসছে কানপুর হ'তে।

আলমবাগে ফিরিঙ্গী-বাহিনীকে তারা এসে আরো শক্তিশালী করে তুলবে।

এদিকে এত বড় সংবাদেও বিপ্লবীদের মধ্যে কোন সাড়াই কিন্তু জাগল না। রণসজ্জা বা উদ্যমের কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না।

আহম্মদ শাহ্ কিন্তু এত বড় দুঃসংবাদে চুপ করে থাকতে পারলেন না, তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন কানপুরের পথে অগ্রগামী ফিরিঙ্গী-বাহিনীর অগ্রগতিকে রোধ করতে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে।

আউটরামের কাছে এ সংবাদ গোপন রইল না। ভারতীয় গুপ্তচর এসে গোপনে ফিরিঙ্গীদের এ সংবাদ আগেই দিয়ে দিল।

আউটরাম সঙ্গে সঙ্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেঃ তোমরা শীঘ্র এগিয়ে যাও। সংবাদ পেয়েছি আহম্মদ শাহ্ সদলবলে কানপুরের পথে আমাদের বাধা দিতে এগিয়ে আসছে। শীঘ্র গিয়ে তার গতিরোধ করো।

অস্ত্রমুখে দুই দলে সাক্ষাৎ হলো পথের মধ্যখানে।

অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রের প্রতিরোধ, রক্ত দিয়ে রক্তের ঋণশোধ! মস্তকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহম্মদ শাহ্, দেশমাতৃকার বীর সন্তান, স্বদেশদ্রোহিতার ভাই হয়ে ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার, গুপ্তচর বৃত্তির মূল্য পরিশোধ করে গেলেন।

দলপতির রক্তাপ্লুত আহত দেহ সেই মুহূর্তেই ডুলির মধ্যে শায়িত করে বিপ্লবীরা লক্ষ্মৌতে প্রেরণ করল।

বিপ্লবীদের মধ্যে যখন এই দুঃসংবাদ পৌঁছল, দলপতির শূন্য স্থান পূর্ণ করলে এবারে এক নির্ভীক ব্রাহ্মণ—বিদেহী হনুমান। আহম্মদ শাহ্র অসমাপ্ত কর্মভার স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণ অসিহাতে রণক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন বীর বিক্রমে।

সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘোর সংগ্রামের পর ব্রাহ্মণ ফিরিঙ্গীদের হাতে আহত হয়ে বন্দী হলেন।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে এই ঘটনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল আবার চতুর্দিকে।

আবার সেই অর্থের মোহ তাদের মনকে আচ্ছন্ন করল।

দেশের স্বাধীনতা গেল ভেসে, শুরু হলো স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৈন্যদের মধ্যে।

দিন যায়। চারিদিকে ঘোর অনিয়ম বিশৃঙ্খলা। একজন মাত্র দলপতির

অভাব। মাত্র একজন দলপতি যিনি ঐ বিশৃংখল বাহিনীকে চালনা করতে পারেন।

আবার এদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী আহত আহম্মদ শাহ্ সামান্য একটু সুস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালেন সৈন্যদের পুরোভাগে। তখনও তাঁর দেহের ক্ষতগুলি ভাল করে শুকিয়ে যায় নি। কিন্তু তাঁর সকলপ্রকার প্রচেষ্টাই এবারেও ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল। ভীরু অপদার্থ দেশদ্রোহীর দল তখনও অর্থের মোহে নিশ্চল।

সেই ১৮৫৭র ভারতীয়দের মুক্তি-সংগ্রামের সময় হ'তে আজ পর্যন্ত যে ভারতীয় বাহিনীর পিঠ্ চাপড়ে ইংরাজ বাহাদুর বাহবা দিয়ে এসেছে, আসলে সে ভারতীয় বাহিনীকে গড়া হয়েছিল গুর্খা ও শিখ যোদ্ধাদের (?) নিয়েই।

১৮৫৭র মহাবিপ্লবের ঘন দুর্যোগে গুর্খা ও শিখ সৈন্যবাহিনী যদি শ্বেতাঙ্গদের পাশে না এসে দাঁড়াত, এবং পরবর্তী কালেও যদি তারা তাদের সদা আজ্ঞাবহ হয়ে না থাকত, তাহলে ফিরিঙ্গীদের ভারতে দীর্ঘ প্রায় পৌনে দুই শত বৎসরের কায়েমী রাজ্যবিস্তারের সোনার স্বপ্ন হয়ত কবে সেই সম্ভাবনার মুখেই ধূলিসাৎ হয়ে যেত।

দিল্লীর পরাজয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে যেমন শিখ-বাহিনীকেই মনে পড়ে, তেমনি লক্ষ্ণৌর পরাজয়ের দুর্দিনেও মনে পড়ে দেশদ্রোহী জঙ্গ বাহাদুরের নেপালী সৈন্যদের কথাই সর্বাগ্রে।

আজ তাই অযোধ্যাবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেল, যখন তারা শুনলে ইংরাজ বাহিনীকে সাহায্য করতে জঙ্গ বাহাদুরের অন্য আর এক বাহিনীও অযোধ্যার দিকে এগিয়ে আসছে। আজ আর শোক করে কোন লাভ নেই। কারণ তখন জঙ্গ বাহাদুরের মত দেশদ্রোহীকে গুলি করে মারবার মত কোন ব্রজেশ্বরী-নন্দন কানাইলালের হয়ত জন্ম নেওয়ার সময় হয়নি। ভারতবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি তখনও সম্পূর্ণ! তামস তপস্যা হয়নি শেষ।

শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বেগমও সৈন্যবাহিনী নিয়ে লক্ষ্ণৌর রক্ষায় এগিয়ে এলেন। কিন্তু হতচ্ছন্ন লক্ষ্ণৌর 'পরে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া যেন ঘনিয়ে এসেছে।

কানপুর হতে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ কলিন্সের পরিচালিত সৈন্যবাহিনী আউটরামের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে।

ইংরাজ সৈন্যবাহিনী লক্ষ্ণৌ অধিকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দলে দলে চতুষ্পার্শ্ব হতে ইংরাজ সৈন্য এসে লক্ষ্ণৌর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

বিদ্রোহীদের দলও পুষ্ট হয়ে উঠ্ছে; কত লোক আসছে জন্মভূমির রক্ষা-কল্পে, গ্রাম হতেও ছুটে আসছে অশিক্ষিত মূর্খ গ্রামবাসীরা—তারাও যুদ্ধ করবে।

মূর্খ, দরিদ্র, অশিক্ষিত চাষী, তারাও আজ এসেছে :—

আগে কেবা প্রাণ
করিবেক দান
তারই লাগি কাড়াকাড়ি।

দেশ হতে দেশান্তরে, শহর হতে শহরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যে রক্ত-কোকনদের প্রতীক বিলানো হয়েছিল, যে চাপাটি বিতরণ হয়েছিল : উঠ, জাগ ভারতবাসী, মায়ের শৃঙ্খল মোচন করো, আজ যেন সেই রক্ত-কোকনদের পাপড়িগুলি দিক হতে দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত, চৈত্র-শেষের ঝরা পাতার মত, দুরন্ত গ্রীষ্মের বাতাসে। সেই চাপাটি-উৎসব আজ দিকে দিকে।

অগণিত সন্তান এসেছে আজ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে।

শহরের রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে-গলিতে, গৃহে গৃহে বন্দুক কামান বসেছে।

দিলখুশ-বাগ হতে কৈশোর-বাগ পর্যন্ত আত্মরক্ষার প্রস্তুতি।

কেবলমাত্র শহরের উত্তরাংশে কোন ব্যবস্থা নেই, কেবলমাত্র বিদ্রোহী সৈনিকরা সেখানে বুক ফুলিয়ে এখনও দণ্ডায়মান।

ধূর্ত কৌশলী ইংরাজ সেনানায়ক কলিন্স্ শহরের উত্তরাংশের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠ্‌ল।

আক্রমণ শুরু হলো ঐ পথেই।

ইতিপূর্বে হ্যাভ্‌লক্, আউটরাম, কলিন্স কেউই ঐ অংশ দিয়ে লক্ষ্ণৌ আক্রমণের পরিকল্পনা করেনি।

শহরের ঐ অংশেই গোমতী নদী প্রবাহিতা। বিদ্রোহীরাও ভেবেছিল, ঐ পথটিতে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থারই প্রয়োজন নেই।

আউটরামও ঐ পথটিই এবারে বেছে নিল।

৬ই মার্চ শুরু হলো আক্রমণ উত্তর-পথে।

৬ই মার্চ হ'তে শুরু করে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত দিবা-রাত্র সমভাবে চলেছে সংগ্রাম, বীর সৈনিকদের দৃঢ় পণ : জননী জন্মভুমিকে আবার স্বাধীন করবোই।

রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। লক্ষ্ণৌর শেষ আশার আলোটুকু—তাও বুঝি নির্বাপিত হয়ে আসছে।

লক্ষ্ণৌর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মধ্যে নবাব ও বেগমকে মুক্তিকামী সৈনিকেরা কোনমতে স্থানান্তরিত করে।

কিন্তু শহীদ আহম্মদ শাহ্ কই?

তখনও তাঁর প্রাণে আশা। নতুন উদ্যমে আবার আক্রমণ চালিয়েছেন তিনি সামান্য মুষ্টিমেয় বীর-সৈনিকদের নিয়েই।

শহর ফিরিঙ্গীদের পূর্ণ অধিকারে এসেছে।

২১শের সংগ্রামই লক্ষ্ণৌর শেষ সংগ্রাম।

শহরের কুটীরে কুটীরে শুরু হয়েছে বিজয়ী ফিরিঙ্গীদের লুণ্ঠনোৎসব, হত্যা, রক্তপাত ও অগ্নিযজ্ঞ।

রক্তে শহরের পথ-ঘাট পিচ্ছিল। অগ্নি ও ধূম্রে আকাশ আচ্ছন্ন। আহতের আর্তনাদ চারিদিকে।

রক্ত-লোলুপ ফিরিঙ্গীদের দানবীয় অট্টহাস্য।

দোষী-নির্দোষীর নেই কোন ভেদাভেদ। বিচার ত নয়—যথেচ্ছাচারিতা। কুৎসিত প্রতিহিংসা।

একটি বৃদ্ধ এগিয়ে এল : তোমরা না সুসভ্য ইংরাজ ! নির্দোষ শিশুদের এমনি করে হত্যা করছো কেন ? গুড়ুম্ ! প্রত্যুত্তর এলো সৈনিকদের মুষ্টিবদ্ধ পিস্তল হতে অগ্নিঝলকে। রক্তাক্ত-দেহ, গত-প্রাণ বৃদ্ধ লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয়। ক্ষুধার্ত হায়নার মত হয়েছে ফিরিঙ্গীর দল। সুসভ্য জগতে এসেছে বন্য-বর্বরতা। সেই আদিম হিংস্র জিঘাংসা। সেই রক্তভৃষ্ণা !

বন্দী সেপাইদের কুকুরের মত গুলি করে মারা হচ্ছে।

* * *

দিল্লীর পতন হয়েছে। অশ্রুমোচন করছে দিল্লী।

লক্ষ্ণৌতেও শুরু হলো অশ্রুমোচন।

কিন্তু সংগ্রামের ত শেষ হলো না।

যে মশাল জ্বললো তার আগুন ত নিভবার নয়। নিভবে কেন ? এ ত বিদ্রোহ নয় ! এ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ মৃত্যু নয়—এ যে প্রাণদান !

এ অস্ত্রধারণ ত সামান্য অভিযোগের 'পরে ভিত্তি করে নয়।

ধর্মনাশ ! সে ত ভুয়ো কথা।

রাজনৈতিক দাসত্ব ! দীর্ঘদিনের দাসত্বের মর্মদাহ তিল তিল করে যে জাতিকে এতকাল দগ্ধেছে !

এবং সেই অগ্নিদাহ মন্থন করে জেগেছে মুক্তির রক্ত-কোকনদ। মুক্তির জ্যোতির্ময় শিখা।

স্বদেশ আমার ! জননী আমার ! মাগো আমার জন্মভূমি !

দিল্লী গিয়েছে। গিয়েছে লক্ষ্ণৌ। কিন্তু অযোধ্যায় তখনও চলেছে সংগ্রাম।

সেপাই হতে শুরু করে, জমিদার রাজা তালুকদার, মৌলভি-মুন্সি, সাধারণ গ্রামবাসী সবাই এসেছে এ সংগ্রামে। এ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম। মুক্তির জন্য মরণপণ।

* * *

লক্ষ্ণৌকে পশ্চাতে ফেলে ফিরে তাকাই অযোধ্যার দিকে।

অনল-শিখায় রক্তাভ হয়ে উঠেছে অযোধ্যার আকাশ।

সীতাপুর : প্রথম অনল-শিখা দেখা দিল।

সেপাইদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে অত্যাচারে জর্জরিত ভুস্বামীরাও।

ওরা জুন : সীতারামপুরে বিদ্রোহানল জ্বলে উঠ্‌লো। লুণ্ঠিত হলো ধনাগার।

কয়েকজন দেশদ্রোহী সেপাই গোপনে লক্ষ্ণৌতে সংবাদ প্রেরণ করে।

তড়িৎবেগে ফিরিঙ্গীদের রক্ষাকল্পে ছুটে এলো একদল শিখসৈন্য লক্ষ্ণৌ হ'তে।

সীতারামপুর হ'তে বিদ্রোহানল ব্যাপ্ত হয়েছে মুলাওনে। সেখান হ'তে মোহমদীতে।

প্রজ্বলিত হুতাশনের মত বিপ্লবের অগ্নিশিখা একে একে অযোধ্যার চতুষ্পার্শ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়।

কি সাধ্য ফিরিঙ্গীদের ঐ জ্বালাময়ী পাবক-শিখার গতি রোধ করে!

মুক্তির ডাক পেঁাছে গেছে জনে জনে। তরঙ্গ রোধিবে কে? মহাবারিধির বক্ষ হতে এসেছে তরঙ্গাঘাত। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে সেই তরঙ্গ।

তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ফৈজাবাদ।

একদা সম্পদ-প্রভাবশালী অযোধ্যার তালুকদারগণ, যারা ফিরিঙ্গীদের রাজত্বে পর্যুদস্ত হচ্ছিল ও হয়েছিল, আজ তারা এত বড় সুযোগ হেলায় হারাতে চাইলে না।

তাহাদের হৃদয়গত প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নি, এতকাল যা প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল, সহসা যেন লেলিহান হয়ে ওঠে।

সাহাগঞ্জের রাজা মানসিংহ।

ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে হৃতসর্বস্ব হয়ে ইতস্তত পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন।

এই দুর্যোগে তাঁকে বন্দী করা হলো।

ফৈজাবাদে তখন বিপ্লবের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সর্বত্র লুঠ, হত্যা চলেছে অবাধে।

সুলতানপুরে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ল ৯ই জুন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতানপুরও ফিরিঙ্গী শূন্য হলো।

শেষ আশা ছিল রাজা হনুমন্ত সিংহ।

ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে জর্জরিত হৃতসর্বস্ব হনুমন্ত সিংহ—তিনিও রেহাই পাননি।

যে ফিরিঙ্গীর দল একদা তাঁর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেনি, আজ তারাই যখন রাজার দরজায় এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল, রাজার দুই চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করল: সাহেব! আপনাদের দেশের লোক এই দেশে এসে আমাদের রাজাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যেসব সম্পত্তি চিরকাল হ'তে ভোগদখল করে এসেছি, আপনারা সেসব জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছেন অন্যায় জুলুম করে। তথাপি আমি আপনাদের কোনদিন বিরুদ্ধাচরণ করিনি। এখন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। এই দেশের লোক আজ আপনাদের বিরোধী হয়ে উঠেছে। একদিন অন্যায় জুলুম করে যাকে আপনারা সম্পত্তি-চ্যুত, নিঃসহায় করেছেন, আজ তারই কাছে এসেছেন সাহায্যের প্রার্থনায়, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে! কিন্তু এখন আর তা হয় না। আমি আমার সশস্ত্র অনুচরদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাবো এবং আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এদেশ হ'তে আপনাদের চিরদিনের মত বিতাড়িত করবো।

অযোধ্যা ও অযোধ্যার আশেপাশে কিভাবে বিপ্লবের অগ্নিশিখা বিস্তারলাভ করেছিল, সেকথা স্বীকার করতে ফিরিঙ্গী ঐতিহাসিকদেরও অনেক সময় সত্যকেই মেনে নিতে হয়েছিল: এই সব ঘটনায় ইংরাজের জীবন এবং ইংরাজের সম্পত্তির যেভাবে অনিষ্ট হয়েছে, সেইরূপ আমাদের জাতীয় গৌরবেরও হানি হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হয়েছে। প্রত্যেক

স্থানেই আমাদের স্বজাতিগণ শৃগাল শকুনি প্রভৃতির ভক্ষ্য না হলেও, আপনাদের প্রাণনাশের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পলায়ন করেছে দিকে দিকে।

সিপাহী যুদ্ধের ঐতিহাসিক স্বয়ং কে সাহেবের বিবৃতি।

*   *   *

১৬ই আগস্ট ইংলণ্ড হতে নব নিযুক্ত সেনাপতি এলেন স্যার কলিন ক্যাম্পবেল।

২০শে অক্টোবর ক্যাম্পবেল কলিকাতা হ'তে যাত্রা করে ১লা নভেম্বর এলাহাবাদে এসে পেঁছিলেন।

কানপুরের পথে ক্যাঃ পীল সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে চলেছে।

ফতেপুর হতে ১৪ মাইল দূরে কাজোয়া পল্লী। ১৬৫৯ খৃঃ আলমগীর বাদশা আওরংজীব তাঁর ভ্রাতা শা'সুজার সঙ্গে এইখানেই যুদ্ধে বিজয়ী হন।

আওরংজীবের ভারত সাম্রাজ্য লাভের মীমাংসা সেদিন এইখানেই স্থিরীকৃত হয়েছিল।

দানাপুর হ'তে বহুসংখ্যক সিপাহী কাজোয়ায় এসে সমবেত হলো।

১লা নভেম্বর দুই পক্ষ মুখোমুখি হয় এবং যুদ্ধে জয়ী হল ইংরাজরাই।

এদিকে ৩রা নভেম্বর ক্যাম্পবেল কানপুরে উপনীত হয়।

ক্যাম্পবেল যখন তার সৈন্যসমভিব্যাহারে অযোধ্যায় এসে প্রবেশ করলে, সেখানে তখনও চলেছে প্রচণ্ড সংগ্রাম।

পথে কেবল কান-কাটা কুকুর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

*   *   *

১৩ই নভেম্বর প্রধান সেনাপতি আলমবাগ ও দেল-খোশা বাগান অধিকার করে।

১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে, ২০শে, ২১শে, ২২শে, ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে—দ্রুত পাতাগুলো উল্টিয়ে যাই।

২৬শে নভেম্বর। কানপুর।

সংবাদ এসেছে প্রধান সেনাপতি ক্যাম্পবেল সসৈন্যে কানপুরের নৌ-সেতু উত্তীর্ণ হয়েছে।

নৌ সেতুর প্রান্তভাগে একটি মৃন্ময় দুর্গে সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহাম্ তখনও প্রতিরোধ করে চলেছে মুক্তিকামী সৈনিকদের।

কিন্তু মৃন্ময় দুর্গে প্রবেশের আগে ১৮৫৭-র মুক্তিসংগ্রামের পরিকল্পনাকারী শ্রীমন্ত নানা, তাঁতিয়া তোপী ও আজিমুল্লাহ খান্—সেই তাঁদেরই অন্যতম রক্ত-বিপ্লবের শহীদ মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ বীরশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক তাঁতিয়া তোপীকে স্মরণ ক'রে প্রণাম জানিয়ে নিই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। উন্নত পেশল দেহ, সুগঠিত মস্তক, বিস্তৃত কপাল, খড়্গের মত উন্নত নাসা, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী।

১৮৫৭-র রক্তবিপ্লবের স্মৃতি চিরদিন জাতির মনে রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে,

বিশেষ করে সেই বিপ্লবের হোতা শ্রীমন্ত নানা সাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাই, আজিমুল্লাহ্ খান, কুমার সিং, মঙ্গল পাড়ে, সেনানায়ক মহারাষ্ট্র প্রৌঢ়-ব্রাহ্মণ তোপী।

ত্যাতা তোপে, তাঁতিয়া তোপী।

সেই ১৬ই জুলাই কানপুরে সেপাইদের পরাজয়ের পর শ্রীমন্ত নানা সাহেবকে কানপুর ত্যাগ করে ব্রহ্মাবর্তের দিকে অগ্রসর হ'তে আমরা দেখে এসেছিলাম।

প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে সেরাত্রে গোপন সভা বসল শ্রীমন্ত নানার।

১৭ই জুলাই শ্রীমন্ত নানা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালা সাহেব, ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, প্রধান সহকারী ও সেনাধ্যক্ষ তাঁতিয়া তোপী ও কুলনারী সমভিব্যাহারে ভাগীরথীর দিকে অগ্রসর হলেন।

ভাগীরথী-তটে নৌকা প্রস্তুত।

শ্রীমন্ত নানা লক্ষ্ণৌর অন্তর্গত ফতেপুরে চৌধুরী ভূপাল সিংয়ের আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

চৌধুরী ভূপাল সিং বিপ্লবীদের নিজগৃহে সাদর আহ্বান জানালেন।

হ্যাভ্‌লক তখন তার সমগ্র সৈন্যদের নিয়ে কানপুর পরিবেষ্টন করে লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হবার মতলব আঁটছে।

দরবারে স্থির হলো, কানপুরের সমরে পরাজিত ছত্রভঙ্গ সৈন্যবাহিনীকে আবার নতুন করে গড়ে কানপুরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে।

সেনাধ্যক্ষ হবেন স্বয়ং তাঁতিয়া তোপী।

উঠ! সৈনিকগণ আবার সাজ, স্বাধীনতার সংগ্রমের জন্য প্রস্তুত হও!

ওদিক ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ হ্যাভ্‌লক প্রস্তুত হচ্ছে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে অগ্রসর হতে। অকস্মাৎ তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনী ঝড়ের মত সম্মুখে এসে বিপর্যস্ত করে তোলে ফিরিঙ্গীদের অগ্রগতিকে।

ত্রস্তে তারা কানপুরের দিকে হটে আসে।

ফিরিঙ্গী সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তাঁতিয়া আবার ফতেপুরে এসে নানা সাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বিশ্বাসঘাতক সিন্ধিয়ার আশ্বাসবাক্যে গোয়ালিয়রের সৈন্যবাহিনী তখনও ছিল নিশ্চুপ।

অন্তরে তাদের ঝড় বইছে, স্বাধীনতার সংগ্রামে যে তারাও তাদের বুকের রক্ত তর্পণ দিতে চায়।

গোপনে তাঁতিয়া গোয়ালিয়রের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গিয়ে মিশে গেলেন।

মর্মস্পর্শী ভাষায় জানালেন আহ্বান: এসো বীর, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করো।

সুসজ্জিত গোয়ালিয়র-বাহিনী নিয়ে তাঁতিয়া অগ্রসর হন কানপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনার দক্ষিণভাগে কাল্পী অভিমুখে।

সমর-কৌশলী সুদক্ষ সুচতুর মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক বুঝতে পেরেছিলেন, কানপুর অধিকার করতে হলে, সর্বপ্রথমে অধিকার করতে হবে কাল্পীর দুর্গ

এবং সেখান হ'তেই চালাতে হবে আক্রমণ।

এদিকে গুপ্তচরের মুখে তাঁতিয়া স্যার কলিন ক্যাম্পবেলের কানপুর আসবার সংবাদও পেয়েছিলেন।

দ্রুত ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এসে তাঁতিয়া কাল্পী অধিকার করে সেখানে সৈন্যস্থাপনা করলেন।

১০ই নভেম্বর যমুনা পার হয়ে ভগিনীপুর অধিকার করলেন, সেখানেও সৈন্য সমাবেশ করা হলো।

বালা সাহেবও এসে তাঁতিয়ার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিলেন।

মাত্র কিছুকাল আগেও যে দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয় প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ শ্রীমন্থ নানার দরবারে সামান্য একজন বেতনভুক্ত কলমজীবী ছিলেন মাত্র, আজ তিনিই সমরনায়ক। গৌরব আসে বুঝি এমনি করেই।

ফিরিঙ্গী সেনানায়ক ওয়াইন্ডহাম সসৈন্যে নৌ-সেতুর প্রান্তভাগে অবস্থিত মৃন্ময় দুর্গে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রধান সেনাপতি কলিন ক্যাম্পবেলের আশাপথ চেয়ে।

রণকৌশলী সেনানায়ক আর বৃথা কালক্ষেপ না করে, যমুনা অতিক্রম করেই 'দোয়াবে' এলেন, এবং জালনায় তাঁর ধনসম্ভার ও অন্যান্য জিনিসগুলো রেখে ঝড়ের গতিতে কানপুরের আশেপাশে কতকগুলো গ্রাম অধিকার করে নিলেন।

ফিরিঙ্গীদের রসদ-সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

ওয়াইন্ডহামের নেতৃত্বে ফিরিঙ্গী-বাহিনীও চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। ২৫শে নভেম্বর পান্ডু নদীর অভিমুখে অগ্রসর হলো অগ্রগামী তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনী, চারিপাশ হ'তে ঘিরেছে তাদের ওয়াইন্ডহামের সৈন্যরা।

মুহুর্মুহু প্রতিপক্ষের সৈন্যদের 'পরে তাঁতিয়ার সৈন্যরা গোলাগুলি বর্ষণ করছে। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই বিপ্লবীদের তিনটি কামান ফিরিঙ্গীরা অধিকার করে নেয়।

আশায় আনন্দে ওয়াইন্ডহামের সৈন্যবাহিনী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে : আর কি, জয় ত এবার তাদের করায়ত্ত! বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হয়েছে!

আনন্দে ফিরিঙ্গীবাহিনী প্রত্যাবর্তনের কল্পনা করছে। সহসা এমন সময় ঝড়ের মত তীব্রবেগে তাঁতিয়ার বাহিনী ওদের 'পরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আক্রমণের বেগ সামলাতে না পেরে ফিরিঙ্গীবাহিনী একেবারে কানপুর পর্যন্ত হটে এল।

ভারতীয় সেনানায়ক যে কত বড় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সেটা বুঝতে ওয়াইন্ডহামের মুহূর্তও বিলম্ব হয় না।

চক্রব্যূহের মত প্রায় চতুর্দিক হ'তে তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনী ফিরিঙ্গীদের ঘেরাও করে ফেলেছে।

প্রায় অর্ধভাগ কানপুরেই এখন তাঁতিয়ার করতলগত।

এমন সময় সংবাদ এল গুপ্তচরের মুখে, ব্রিটিশ প্রধান সেনানায়ক স্যার কলিন্সের সৈন্যবাহিনী কানপুরাভিমুখে অগ্রসর হয়ে আসছে ঝড়ের বেগে।

এদিকে তাঁতিয়ার নিজের সৈন্যবাহিনী অবিশ্রাম যুদ্ধে ক্লান্ত ও অবসন্ন।

২৯শে নভেম্বর ফিরিঙ্গীদের প্রধান সেনাপতি কানপুরের নৌ-সেতু উত্তীর্ণ হলো।

ওদিকে উৎকণ্ঠিত ওয়াইণ্ডহাম মৃন্ময় দুর্গের মধ্যে বসে কলিন্সের আগমন প্রতীক্ষা করছিল প্রতি মুহূর্তে।

দিনমণি অস্তাচলমুখী। কলিন্সের সৈন্যবাহিনী একে একে নৌ-সেতু অতিক্রম করে কানপুরে পদার্পণ করছে।

সকলেই গিয়ে মৃন্ময় দুর্গে আশ্রয় নেয়।

এখনও প্রায় সমগ্র কানপুর শহর ও ভাগীরথীর তটদেশ তাঁতিয়ার সৈন্য-বাহিনীর করতলগত।

কানপুরের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিক্ষরা পৃষ্ঠাগুলি!

বামে প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী ও নগরের মধ্যবর্তী স্থান—বৃক্ষবহুল উন্নত ভূখণ্ড, অনেকগুলি ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা ও নালাসমূহ। দক্ষিণে গঙ্গার খালের অপরদিকে বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তর।

এই প্রান্তরেই গোয়ালিয়র-বাহিনী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে আছে।

*　　　　*　　　　*

কয়েক দিন রণসজ্জা চলতে থাকে।

তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এসে ইতিমধ্যে মিলিত হয়েছে শ্রীমন্ত নানা সাহেবের সৈন্যবাহিনী ও বুন্দেলখণ্ড এবং মধ্যভারতের সৈন্যবাহিনী।

সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ মহারাষ্ট্রীয় রণকৌশলী বিদ্রোহী সেনানায়ক স্বয়ং তাঁতিয়া তোপী।

৬ই ডিসেম্বর সূর্য আকাশপটে দেখা দিল রক্তরথে।

সূর্য-চিহ্নিত রক্তিম আকাশে প্রতিবিম্বিত করে কামান উঠলো গর্জে।

একদিকে শ্রীমন্ত নানা সাহেব ও তাঁতিয়ার সৈন্য পরিচালনা, অন্যদিকে ব্রিটিশ সেনানায়ক স্যার কলিন্স, ওয়াইণ্ডহাম, ওয়ালপোল ও ক্যাঃ পীল প্রভৃতি।

কিন্তু হায়, তথাপি ১৮৫৭র গৌরব-রবি অস্তাচলমুখী।

দিল্লী, লক্ষ্ণৌর মেঘাবৃত আকাশ হ'তে কালো মেঘ কানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো বুঝি, তা নাহলে তাঁতিয়ার পরাজয় ঘটে কখনো ক্যাঃ পীলের কাছে!

একান্ত বাধ্য হয়েই পশ্চাদপসরণ করে গেল তাঁতিয়া ও তাঁর সৈন্যবাহিনী।

৯ই ডিসেম্বর বিঠুরের পথে হলো এদের সঙ্গে দ্বিতীয় সংঘর্ষ।

এবারও মুক্তি-সংগ্রামীদের পরাজয়।

তাঁতিয়া পুনঃ কাল্পীতে এলেন। আবার মনোযোগ দিলেন নতুন করে সৈন্য সমাবেশে।

সংগ্রামে জয়-পরাজয় আছেই, কিন্তু তার জন্যে বিচলিত তাঁতিয়া নন।

এই সময় নানা এলেন বিঠুরে।

সেখান হ'তে গেলেন অযোধ্যায়।

পরহস্তগত কানপুর হতে বিদায় নিয়ে যাবো এবারে অন্যদিকে।

১৮৫৭র অগ্নিশিখা লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছি সম্মুখের দিকে।

শেষ তর্পণ বুঝি ঝাঁসীতে।

ঝাঁসী হতে সেদিন যখন কামানের গোলার বারুদ ও রক্তস্রোতের মধ্যে বিদায় নিয়ে এসেছিলাম, সেদিন সেখানে ইংরাজের প্রাধান্য আর ছিল না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ তখন ঝাঁসীর গদীতে।

দেখতে দেখতে দীর্ঘ দশ মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যের কোথাও কোন খেদ বা গোলমাল নেই।

এমন সর্বগুণান্বিতা মহীয়সী নারী যেখানে স্বীয় হস্তে শাসন-রজ্জু ধরেছেন, সেখানে আর দুঃখ বা নালিশ কিসের! কিসেরই বা অভিযোগ!

প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় লক্ষ্মী প্রায়ই পুরুষের বেশে, আবার কখনো কখনো নারীর বেশে সজ্জিত হয়ে দরবার ঘরের সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব বসবার ঘরে এসে উপস্থিত হতেন। সেখান হতেই তাঁর আদেশলিপি ঘোষিত হতো।

* * *

১৯শে মার্চ ১৮৫৮, সংবাদ এলো ঝাঁসী হ'তে ১৪ মাইল দূরবর্তী চঞ্চলপুরের দিকে ফিরিঙ্গী সেনানায়ক স্যার হিউ রোজ সসৈন্যে যাত্রা করেছে।

তদানীন্তন ঝাঁসীর নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও তেমন কুশলী ও কর্মপটু ছিলেন না বলেই উপস্থিত কর্মনির্ধারণে গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিল।

রাণীর দরবারে এমন অনেক বয়স্ক কর্মচারী ছিল, যারা ইংরাজ সৈন্যের আগমন-বার্তা শুনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

রাণী-মা, আত্মসমর্পণ করুন! ভীত-ত্রস্ত আবেদন।

আত্মসমর্পণ! ওষ্ঠপ্রান্তে ঘৃণার হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়ঃ মেরি ঝাঁসী নেহি দুঙ্গী।

রাণীর অধীনে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সেনানায়ক নথে খাঁ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

তখন যোদ্ধারাও সজ্জিত হলো রণসাজে।

রাণী আসন্ন যুদ্ধের জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ: মেরী ঝাঁসী নেহি দুঙ্গী।

২১শে মার্চ স্বয়ং হিউ রোজ তার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীতে এসে শিবির স্থাপন করলে নগর ও দুর্গের মধ্যবর্তী কতকগুলি ভগ্নপ্রায় বাংলোর মধ্যে।

দক্ষিণে সমুন্নত পর্বতশ্রেণী বহুদূর বিস্তৃত। বামে পর্বত-শ্রেণী ও ফতিয়ার পথ প্রসারিত।

উত্তরে পর্বতশীর্ষে ঝাঁসীর প্রসিদ্ধ দুর্গ চতুষ্পার্শ্বে সমুন্নত সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত।

দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ব্যতীত অন্য সকল দিকে ঝাঁসী নগরী প্রসারিত।

শুধু যে দুর্গই প্রাচীর-বেষ্ঠিত ছিল তা নয়, নগরীও ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত।

দুর্গ-প্রাচীরের ন্যায় নগর-প্রাচীরেও গুলি নিক্ষেপের রন্ধ্র এবং কামান

সন্নিবেশের স্থল নির্দিষ্ট ছিল।

দূর হতে যাতে দুর্গ-অভ্যন্তর পরিদর্শন করা যায়, হিউ রোজ নগরের বহির্দেশে একটি সুউচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করে।

২২শে মার্চ চতুষ্পার্শ্ব হতে নগর ও দুর্গ অবরোধ করা হয়।

২৩শে মার্চ কামান-নির্ঘোষে যুদ্ধ হলো শুরু উভয় পক্ষে।

* * *

অন্ধকার রাত্রি।

আকাশে অগণিত তারকা।

রাত্রির অন্ধকারকে দূর করেছে নগরের মধ্যে প্রজ্বলিত অসংখ্য মশাল। সুগভীর রণবাদ্য বাজে দুম্ দুম্ দুম্।···

রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ইংরাজ সৈন্য রাত্রির অন্ধকারে একবার আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু সতর্ক রাণীর সৈন্যদের গোলাবর্ষণে আবার পিছু হটে আসে।

পরদিন প্রভাতে রাণীর সুবিখ্যাত কামান 'ঘনগর্জ' হ'তে গোলাবর্ষণ শুরু হলো। পযুর্দস্ত হয়ে পড়ে ফিরিঙ্গী-বাহিনী 'ঘনগর্জে'র' তোপাঘাতে।

২৪শে ফিরিঙ্গীরা চারটি তোপমঞ্চ তৈরী করে আক্রমণ শুরু করে। নগর প্রাচীরের কিয়দংশ ঐ দিন ভেঙে গেল।

নগরবাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

এগিয়ে এল অন্তঃপুরবাসিনী রাণী রণাঙ্গনে অসিহস্তে।

২৫শে দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হয়।

রাণীর গোলন্দাজ গোশ খাঁ বীরবিক্রমে বুরুজ হ'তে গোলাবর্ষণ শুরু করে।

২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০শে মার্চ ঝাঁসীর বীরবৃন্দ একে একে প্রাণ দান করেন রণক্ষেত্রে।

৩১শে মার্চ ঃ সুসংবাদ এসেছে, সেনানায়ক তাঁতিয়া তোপী আসছে সসৈন্যে ঝাঁসীর দিকে।

হিউ রোজের কপালে চিন্তার রেখা দেখা দেয়।

এদিকে এখনো দুর্গ করতলগত হয়নি।

বেত্রবতীর তীরবর্তী প্রান্তরে তাঁতিয়া শিবির স্থাপনা করেছেন।

আর বিলম্ব নয়, দুর্গ অবরোধ চালাবার জন্য যথোপযুক্ত সৈন্য রেখে হিউ রোজ বাকী সৈন্য নিয়ে তখনি বেত্রবতীর দিকে অগ্রসর হয়।

তাঁতিয়ার নিকট এ সংবাদ পোঁছাতে বিলম্ব হলো না।

তাঁতিয়ার শিবিরের পুরোভাগে ঘন জঙ্গল, প্রখর মার্তণ্ডতাপে শুষ্ক।

'জঙ্গলে অগ্নিসংযোগ কর', তাঁতিয়া নির্দেশ দিলেন।

মুহূর্তে অগ্নিসংযোগে দাবানলের মতই অরণ্যের শুষ্ক গুল্মলতা দাউ দাউ করে লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠে পথরোধ করল হিউ রোজের।

নিবিড় ধূম্ররাশিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত।

এই অবকাশে তাঁতিয়া পশ্চাদপসরণ করলেন। জানি না বীর সেনানায়কের হঠাৎ এ বিভ্রম কেন হলো।

দুঃসময়ে বুঝি মতিভ্রমই ঘটে অতি বড় বুদ্ধিমানেরও!

তাঁতিয়ার আগমন সংবাদে দুর্গাভ্যন্তরে যে আনন্দের বার্তা বহে এনেছিল, এই দুঃসংবাদে তা নিমেষে লুপ্ত হলো!

কিন্তু তবু তারা নিরুৎসাহ হয়নি সেদিন।

আবার নতুন আশায় নতুন উদ্দীপনায় সৈন্যদের মধ্যে 'সাজ' 'সাজ' রব পড়ে গেল।

১লা এপ্রিল তাদের যুদ্ধে যে অপূর্ব বিক্রম দেখা গেল, তা সত্যিই অতুলনীয়।

৩রা এপ্রিল ঃ

নগরে প্রবেশের প্রধান পথ ঃ বোরছা নরোয়াজা ইংরাজ সৈন্যের হস্তগত হয়েছে, উন্মত্ত জলস্রোতের মত ফিরিঙ্গীরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। উন্মত্ত সৈন্যেরা ঘরে ঘরে আগুন লাগাচ্ছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাকে সম্মুখে পায়—অসির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দানবীয় হিংসায়।

রাণীর প্রাসাদ-দুয়ার।

উন্মত্ত ফিরিঙ্গী সৈন্য আর তাদের তাঁবেদার পর-উচ্ছিষ্ট-লোভী ভারতীয় সৈন্য।

ভাঙ্! ভাঙ্ রে দুয়ার!

মৃত্যুপণে পথ রোধ করেছে রাণীর সৈন্যবাহিনী।

চারিদিকে জ্বলছে আগুন।

প্রচণ্ড হুতাশন।

আর বুঝি প্রাসাদ রক্ষা করা যায় না।

দুর্গের অভ্যন্তরে রাণী লক্ষ্মীবাঈ চঞ্চল পদবিক্ষেপে পায়চারি করছেন।

কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর পাশে ঃ রাণী-মা!

বিচলিত হবেন না, শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করবো।

কিন্তু আপনার বিশ্বস্ত ৫০ জন অশ্বারোহীও আজ মৃত। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। উন্মত্ত ফিরিঙ্গীরা এতক্ষণে বোধ হয় দুর্গদ্বার অতিক্রম করলো।

শুনুন আর্য! আমি দুর্গ ছেড়ে পালাব মনস্থ করেছি। এই নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানি আমি কোনমতেই মাথা পেতে নিতে পারবো না। এখান হতে পালিয়ে আমি নানা ভাইয়ের ওখানে যাবো।

কিন্তু কি করে পালাবেন রাণী-মা? চারিপাশে শত্রুসৈন্য পথ আগলে রয়েছে।

অসিমুখে পথ পরিষ্কার করে নিতে লক্ষ্মী জানে!

পিতা মোরোপন্ত তাম্বে এলেন ঃ কি করবে মা স্থির করলে?

প্রস্তুত হন পিতা, দুর্গ ত্যাগই স্থির করেছি। সঙ্গে আপনি, দামোদর ও

কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর যাবে।

* * *

৪ঠা এপ্রিল।

অন্ধকার রাত্রি।

আকাশে শুধু অগণিত তারকা।

দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে জ্বলছে আগুন লোলিহান শিখায়, রাতের কালো আকাশ লালে লাল হয়ে গিয়েছে।

দুর্গত্যাগের আয়োজন প্রায় সমাপ্ত।

এখনও ফিরিঙ্গী সৈন্য দুর্গদ্বার অতিক্রম করতে পারেনি।

* * *

ঝাঁসীর রাজলক্ষ্মী।

কোথায় সে নারীসুলভ কমনীয়তা ও লজ্জারুণিমা।

সংবদ্ধ বেণী পৃষ্ঠে লম্বমান।

পরিধানে সালোয়ার, বক্ষে বক্ষাবরণ লৌহবর্ম, কটিদেশে লম্বমান তীক্ষ্ণ তরবারি।

মস্তকে রেশমী পাগড়ী।

পৃষ্ঠে শক্ত করে বাঁধা তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় দত্তক সন্তান বালক দামোদর রাও।

অশ্বে আরোহণ করলেন রাণী লক্ষ্মী।

সুশিক্ষিত অশ্ব সামান্য ইঙ্গিতে নিঃশব্দে লম্ফ দিয়ে দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করে গেল।

পশ্চাতে অনুচরবৃন্দ।

দুর্গ হ'তে লক্ষ্মীর পলায়নবার্তা ফিরিঙ্গীদের মধ্যে পৌঁছাতে দেরি হলো না। হিউ রোজ তরুণ অফিসার লেঃ বোকারকে ডেকে আদেশ দেয়ঃ রাণী পলাতকা। এখুনি তার অনুসরণ করো। জীবিত বা মৃত সেই বিদ্রোহিণী রাণীকে বন্দী করে আনবে।

ছোটে মুহূর্তে ফিরিঙ্গী সৈন্য কতিপয় অশ্বপৃষ্ঠে।

কিন্তু দীর্ঘ একুশ মাইল পথ অনুসরণ করে বোকার দেখলেনঃ ঐ দূরে বেগবান অশ্ব হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে।

উড়ছে পথের ধূলি পশ্চাতে ধূম্রজাল রচনা করে।

কাছাকাছি আসতেই দু'পক্ষে হয় যুদ্ধ শুরু।

মোরোপন্ত জংঘাদেশে আহত হয়ে রুধিরস্রাবে ক্লান্ত হয়ে ধরা পড়লেন, কিন্তু রাণীকে ধরা গেল না, বিদ্যুৎগতিতে অশ্ব ছুটিয়ে রাণী দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

* * *

এদিকে ঝাঁসীর নগর ও দুর্গ ফিরিঙ্গীদের হস্তগত।

ভয়াবহ নৃশংস হত্যা লুঠ ও অগ্নিদাহ চলেছে সর্বত্র বেপরোয়া।

অসহায়ের আর্ত কোলাহলে আকাশ ও বাতাস ভরে গেছে।

নগর ও প্রাসাদ লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হলো।

*　　　*　　　*

পশ্চাতে পড়ে থাক্ অগ্নিদগ্ধ ঝাঁসী। ওদিকে আর ফিরে তাকাবো না। জন্মভূক ঝাঁসী, দিন আসবে, তখন আবার এসে অগ্নিদগ্ধ ঝাঁসীর মাটির বুকে নতুন করে প্রাসাদ গড়ে তুলব। আর ত সময় নেই, বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে রাণী লক্ষ্মীবাঈকে যে পথের মধ্যে আমরা ফেলে এসেছি।

রাণী! আমাদের ঝাঁসীর রাণী! প্রায় একশত বৎসর পার হয়ে যেতে চলেছে, তবু তোমায় কি ভুলতে পেরেছি! আশায় আশায় দিন গুনছি কবে আবার তুমি ফিরে আসবে! অশ্বপৃষ্ঠে, অসিহস্তে এলায়িত কুন্তলা বীরাঙ্গনা!

প্রণাম তোমায় জননী! প্রণাম!

ঘরে ঘরে জননীরা তোমারই মত কন্যা কামনায় তপস্যা করবে, যারা সুখের দিনে স্বামীর ঘর আলো করে থাকবে নিরন্তর কল্যাণ কামনায়। ঘরে ঘরে জ্বালাবে শান্তির স্বর্ণপ্রদীপ, আঁকবে মঙ্গল আল্পনা দুয়ারে দুয়ারে আবার, প্রয়োজনের দিনে তারাই অকুতোভয়ে মুক্ত অসিহস্তে বীরাঙ্গনারূপে আত্মদানে, রক্তদানে নৃমুণ্ডমালিনী শক্তিরই আধার তারা প্রমাণ করবে।

*　　　*　　　*

কাল্পী!

শ্রীমন্ত নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তখন কাল্পীতে অবস্থান করছেন।

ধূলি ধূসরিত ক্লান্ত আশ্বারূঢ়া রাণী এসে ওঁদের শিবিরের সম্মুখে দাঁড়ালেন।

শ্রীমান্ত দ্রুতপদে এগিয়ে এসে সাদরে আহ্বান জানালেন বাল্যসঙ্গিনীকে: এসো লক্ষ্মী!

নতুন করে আবার যুদ্ধের আয়োজন হলো শুরু।

তাঁতিয়ার 'পরে এবারে ন্যস্ত সৈন্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব।

*　　　*　　　*

কুঁচ নগর: কাল্পী হতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরবর্তী।

শ্বেতাঙ্গ হিউ রোজের সেন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো এদের সৈন্য বাহিনীর আবার। তাঁতিয়ার মতিভ্রম ঘট্‌লো, রাণীর কোন পরামর্শই সে নিলেন না। ফলে ফিরিঙ্গীদের হাতে ঘট্‌লো তাঁদের এবারে পরাজয়।

তাঁতিয়া পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ হলো কাল্পীর ছয় মাইল দূরে যমুনাতীরে, এবারেও তাঁতিয়া রাণীর আদেশ অগ্রাহ্য করলো, মাত্র আড়াইশত অশ্বারোহীর পরিচালনাভার রাণীর হাতে, যমুনা রক্ষার ভার রাণীর 'পরে ন্যস্ত, বিদ্যুৎশিখার মত অশ্ব পরিচালনা করে মুক্তবেণী বীরাঙ্গনা উম্মুক্ত অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র বিরাজ করতে লাগলেন।

কিন্তু এবারেও রাও সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতায় রাণীকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগে বাধ্য হতে হলো।

রাণী এলেন গোপালপুরে।

শ্রীমন্ত নানাও তখন গোপালপুরে, রাও সাহেবও পলায়ন করে এসেছিল গোপালপুরেই।

এখন উপায় ?

একমাত্র পথ এখন আমাদের সম্মুখে, রাণী বলেন, গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করে সেখান হতে যুদ্ধ করা, দুর্গ ভিন্ন ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ অসম্ভব।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে লক্ষ্মী ! মহারাজা জয়াজী রাও সিন্ধে ফিরিঙ্গীদের তাঁবেদার, তার মন্ত্রী দিনকর রাও-ও ইংরাজ-পদলেহী. এছাড়া দুরারোহ পর্বতের 'পরে অবস্থিত গোয়ালিয়র দুর্গ।

তার জন্য কোন চিন্তা নেই রাও সাহেব, বুদ্ধির চালে আমরা দুর্গ অধিকার করবো। রাণী আশ্বাস দিলেন।

অতএব গোপালপুর ত্যাগই স্থির হলো।

এ সংবাদ গোয়ালিয়রে পেঁছিতে দেরি হলো না। দিনকর ইংরাজের সঙ্গে গোপনে সংবাদ আদানপ্রদান শুরু করে দিল।

সে বললে, মহারাজ বিচলিত হবেন না। ইংরাজ শিবিরে সংবাদ পাঠিয়েছি।

কিন্তু ইংরাজের সাহায্য এসে পেঁছিবার আগেই যে এরা এসে পড়বে মন্ত্রী !

তারও উপায় চিন্তা করেছি, আপাতত ওদের আক্রমণ না করে কেবল আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

মহারাজ সিন্ধে মন্ত্রীর পরামর্শে সন্তুষ্ট হতে পারে না। দেরি করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে সসৈন্যে মেবারের দুই মাইল পূর্বে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হয়।

বেলা সাতটার সময় গোলাবৃষ্টি শুরু করে সিন্ধে।

কিন্তু বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীর সৈন্য পরিচালনায় মুহূর্তে সিন্ধের সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করতে পথ পায় না।

এদিকে সিন্ধের বহু সৈন্য এ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাও সাহেবের সৈন্যদের সঙ্গে হাত মিলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অনেকে গিয়ে মুক্তি-সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগও দিল।

এদিকে বেগতিক দেখে সিন্ধে প্রাণপণে আগ্রার দিকে অশ্বকে ধাবিত করলে।

রণকৌশলে লক্ষ্মী হলেন বিজয়ী।

স্বপ্ন তাঁর বুঝি এতদিনে সফল হতে চললো।

বিজয়-উল্লাসে রাও সাহেব নগরে প্রবেশ করলেন।

* * *

অপরিণামদর্শী রাও সাহেব এই সংকট-মুহূর্তে ক্ষণিক আশার আনন্দে শিথিলতা প্রকাশ করলেন।

দশহরা পর্ব সমুপস্থিত।

সৈনিকদের শৃঙ্খলা সাধন না করে নির্বুদ্ধি রাও সাহেব উৎসবে মত্ত হয়ে উঠলেন।

এদিকে ঐ সুযোগে স্বয়ং হিউ রোজ মহারাজকে গোয়ালিয়রে আসতে সংবাদ প্রেরণ করে নিজে সসৈন্যে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করলে।

গোয়ালিয়রে এ সংবাদ পেঁছিতে বিলম্ব হলো না, কিন্তু তবু রাও সাহেবের সম্বিৎ হলো না।

রাণীর পুনঃ পুনঃ সতর্ক বাণী সত্ত্বেও তিনি উৎসব নিয়েই মেতে রইলেন।

কেবলমাত্র তাঁতিয়াকে সৈন্য সমাবেশ করতে আদেশ দিলেন।

তাঁতিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরাজ সেনাপতির পথরোধ করতে অগ্রসর হলেন।

কিন্তু ফিরিঙ্গীর বিরাট সৈন্যবাহিনীর কাছে তাঁতিয়া পরাজিত হলেন।

রাণী রাও সাহেবের অব্যবস্থিততায় পূর্বেই নিরতিশয় বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তিনি রাও সাহেবকে ডেকে বললেন: কূলে এসে আপনি তরী ডোবালেন রাও সাহেব! কর্তব্যকর্ম অবহেলা করে আমোদ-প্রমোদে রত থেকে, সব নষ্ট করলেন আপনি! কিন্তু আর দেরি করবেন না। ফিরিঙ্গী সৈন্য সমাগত প্রায়, এখুনি সৈন্যদের সজ্জিত করুন। সম্মুখ-যুদ্ধ ভিন্ন আর গত্যন্তর নেই।

তাঁতিয়াও সম্মত হলেন রাণীর প্রস্তাবে।

আবার বীরাঙ্গনা পুরুষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধস্থলে এসে দাঁড়ালেন সৈন্যের পুরোভাগে।

গোয়ালিয়র দুর্গের পূর্ব ভাগ রক্ষার ভার তারই 'পরে ন্যস্ত হয়েছে।

১৭ই ও ১৮ই জুন রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী ভূখণ্ড ফুলবাগানে রাও সাহেবের সৈন্যদের সঙ্গে ফিরিঙ্গী-বাহিনীর যুদ্ধ হলো; রাণী সারাদিন সৈন্য পরিচালনা করলেন স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে অসিহস্তে রণক্ষেত্রে থেকে অক্লান্তভাবে।

কিন্তু জয়ের আশা সুদূরপরাহত!

অগত্যা রাণী তাঁর কতিপয় সহচর নিয়ে রণস্থল ত্যাগ করাই সমীচীন বোধ করলেন।

রাণীর অশ্বও নিরতিশয় ক্লান্ত। কিন্তু ওদিকে ফিরিঙ্গীর সৈন্যবাহিনী এসে গেল!

অশ্বপৃষ্ঠে রাণী ছুটেছেন, সহসা কানে এলো কার আর্ত চিৎকার: মরলাম, কে আছে কোথায় বাঁচাও!

বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত করুণ আর্তনাদ।

চকিতে রাণী পশ্চাতে অবলোকন করে দেখলেন, তার প্রিয় সহচরী মুন্দরা একজন ইংরাজ অশ্বারোহী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্তা হয়ে প্রাণভয়ে চিৎকার করছে।

বিদ্যুৎবেগে রাণী অশ্ববল্গা টেনে ধরে অশ্বের গতি রোধ করলেন।

ঝলকে উঠলো রাণীর হাতের তীক্ষ্ণ অসি এবং ইংরাজ অশ্বারোহীর মস্তক চ্যুত হলো। মুন্দরাকে রক্ষা করে আবার রাণী অগ্রসর হলেন সম্মুখের দিকে।

সামনেই সংকীর্ণ খাল।

খাল উত্তীর্ণ হবার জন্য অশ্বকে ইঙ্গিত করেন, কিন্তু ক্লান্ত অশ্ব এগোয় না।

ইংরাজ সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করে একেবারে নিকটে এসে পড়েছে।

অসিহস্তে রাণী ফিরে দাঁড়ান। আর উপায় নেই। অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতীর্ণ হলেন রাণী এবং শুরু হলো অসি-যুদ্ধ মুখোমুখি সংগ্রাম।

অপূর্ব সে অসি-যুদ্ধ।

একদিকে সুশিক্ষিত ইংরাজ, অন্যদিকে একজন ভারতীয় কুললনা।

পৃথিবীর ইতিহাসে কত শত যুদ্ধ-কাহিনী লিখিত হয়েছে যুগে যুগে কিন্তু এ যুদ্ধের তুলনা কোথায়?

১৮৫৭র রক্তবিপ্লবের রক্তক্ষরা ইতিবৃত্তের পাতায় রক্ত দিয়েই লেখা রইলো এই অপূর্ব অসিযুদ্ধের কাহিনী, সে তো মুছে যাবার নয়।

আক্রমণকারীর তীক্ষ্ণ অসি সহসা এসে ক্লান্ত অবসন্ন রাণীর বক্ষঃস্থলে আঘাত হানে।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে এল।

মৃত্যু সন্নিকটে তবু আহত ব্যাঘ্রীর মতই রাণী মুহূর্তে তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে ইংরাজ সৈন্যকে দ্বিখণ্ডিত করে নিজে ধরাশায়ী হলেন।

* * *

ছোট একটি পর্ণকুটীর।

অন্তিম শয়নে শায়িতা রক্তাপ্লুতা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী।

কুটীর-স্বামী গঙ্গাধর বাবাজী পার্শ্বে উপবিষ্ট, আর কোথায়ও কেউ নেই।

বড় পিপাসা—একটু জল: ক্ষীণ অন্তিম কণ্ঠ।

গঙ্গাধর পবিত্র গঙ্গোদক এনে দিলেন: এই নাও মা জল।

আঃ! গঙ্গাধর, কই বাবাজী তুমি কোথায়?

এই যে মা আমি।

অশ্রুপ্লুত আঁখির দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসে: মেরী ঝাঁসী!...

একে একে লাগিল নিভিতে
দীপালোকমালা।

* * *

বিপ্লবের মহাগ্নিশিখা সত্যিই কি নির্বাপিত হয়ে এল?

১৮৫৭র রক্ত-প্রচেষ্টা কি এইখানেই এমনিভাবে পরিসমাপ্ত হবে?

এমনি করেই কি সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

কিন্তু কোথায় সেই দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বীর সেনানায়ক তাঁতিয়া?

ঝালোয়ারের রাজধানী ঝালরপত্তন।

তাঁতিয়া তখন সেখানে।

প্রসিদ্ধ জালিমসিংহের বংশধর পৃথ্বীসিংহ ঝালরপত্তনের সিংহাসনে তখন।

পৃথ্বীসিংহ কাপুরুষ, ইংরাজ-পদলেহী। সে তৎপর হয়ে ওঠে তাঁতিয়ার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করতে।

কিন্তু অধিনস্থ সৈন্যরা চায় তাঁতিয়ার পক্ষ সমর্থন করতে।

সব এসে মিলিত হলো তাঁতিয়ার সঙ্গে।

তাঁতিয়া রাণার প্রাসাদ অবরোধ করলেন।

পরদিন রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো : রাণা, কেন পরদেশীর পদলেহন করছেন, আসুন, আমরা একত্র হয়ে পরদেশীকে দূর করে দিই আমাদের জন্মভূমি হতে চিরতরে ; মুক্ত করি আমাদের জননী জন্মভূমিকে।

বেশ, আমি পাঁচ লক্ষ মুদ্রা যুদ্ধ-সাহায্য দিতে পারি।

পাঁচ লক্ষ মুদ্রা কতটুকু, অন্তত পঁচিশ লক্ষ টাকা পেলেও কোনমতে এই সুবিপুল যুদ্ধভার বহন করা যেতে পারে।

অবশেষে রাণা অনেক তর্কাতর্কির পর পনের লক্ষ পর্যন্ত টাকা দিতে রাজী হলেন এবং পাঁচ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিলেন।

কিন্তু রাণা ঐ রাত্রেই গোপনে রাজধানী ত্যাগ করে মৌ'তে প্রস্থান করলেন।

পাঁচ দিন ঝালরপত্তনে কাটিয়ে তাঁতিয়া বর্ষাসমাগম আসন্ন দেখে, রাও সাহেব প্রভৃতির পরামর্শে ইন্দোরাভিমুখে যাত্রা করলেন।

এদিকে কিন্তু ইংরাজ-বাহিনী তাঁতিয়ার পিছু-পিছুই আসছে।

পথে নালকেরা, রাজগড়, নরবর, শিরোজ্ঞ পড়ল। সেখান হতে ললতপুর।

এদিকে হাতের সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত, সৈন্যদের মাহিয়ানা বাকী পড়েছে।

তাদের মধ্যে অসন্তোষের ধোঁয়া দেখা দিচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

সঙ্গের সাথীরা একে একে এই মুক্তিকামী সেনানায়ককে ত্যাগ করে গিয়েছে। আর কোন আশাই নেই। সব আশার শেষ!

হৃত-সর্বস্ব ভগ্ন-মনোরথ মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক সব ত্যাগ করে মনের দুঃখে গিয়ে পারনের নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপন করলেন।

সহসা একদিন সেই অরণ্য-মধ্যে পুরাতন বন্ধু মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

আপনি একা দেখছি, কিন্তু সঙ্গের সৈন্যদের ছেড়ে দিলেন কেন ?

সে দুঃখের কাহিনী আর নাই বা শুনলেন। আজ হয়ত সত্যিই পরিশ্রান্ত আমি। এখন ভালই করি, মন্দই করি, আপনার সঙ্গেই জীবনের শেষ কয়টা দিন থাকবো স্থির করেছি।

কিন্তু হায়, পরিশ্রান্ত হৃতসর্বস্ব মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন, তিনি জানতেন না সে ফিরিঙ্গীদেরই একজন গুপ্তচর মাত্র, বন্ধুবেশী শত্রু!

গোপনে মানসিংহ ইংরাজ সেনানায়ক মীডের নিকট সংবাদ প্রেরণ করলেন : পলাতক তাঁতিয়ার সন্ধান মিলেছে। এই সুযোগে শীঘ্র দেখা করুন আমার সঙ্গে।

৭ই এপ্রিল। গভীর নিশীথে তাঁতিয়া যখন নিঃশঙ্কচিত্তে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, ইংরাজ সেনাপতি মিড্ তাঁতিয়ার বন্ধুরূপী শয়তান মানসিংহের চেষ্টায় বীরেন্দ্রকেশরীকে শৃংখলিত করলে।

১৮৫৭র শেষ আশার আলোটুকুও নির্বাপিত হলো, বিশ্বাসঘাতকতার বিষ-ফুৎকারে।

১৮৫৯, ১৮ই এপ্রিল সাপ্রিতে তাঁতিয়ার ফাঁসী হলো ইংরাজের বিচারে।

ইংরাজের বিচারে তাঁতিয়া দোষী! তাই তাকে ফাঁসী দেওয়া হলো। যে বীরশ্রেষ্ঠ একদা প্রৌঢ় বয়সেও বারংবার রাজপুতানা ও মালব ঘুরে বেড়িয়েছেন,অসীম কৌশলে বারংবার ইংরেজ সৈন্যদের পরাভূত ও পর্যুদস্ত করেছেন. যাঁহার বীরত্ব-গাঁথা আজিও সারা ভারতের জনগণের বুকে আশার ও সাহসের উদ্দীপনা যোগায় তার মৃত্যু তো নেই। সে যে অবিনশ্বর, মৃত্যুহীন।

আর মৃত্যুহীন সেই ১৮৫৭র অগ্নিযজ্ঞের সর্বপ্রধান হোতা শ্রীমন্ত নানা সাহেব। ইংরাজের শত চেষ্টাও যাকে কোনদিন শৃঙ্খলিত করতে পারেনি, ভারতের একপ্রান্তে হ'তে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে যার কোন সন্ধানই মেলেনি, তিনি সহসা একদিন ভারতের ভাগ্যাকাশে উল্কার মত আবির্ভূত হয়ে এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মতই চারিদিক প্রজ্বলিত করে সহসা আবার কোন্ বিস্মৃতির অন্ধকারে যে আত্মগোপন করলেন কেউ তা জানল না।

কিন্তু সত্যিই কি বিস্মৃতি!

সমগ্র স্মৃতি তবে তাঁকে প্রণতি জানায় কেন? কেন তবে উত্তরকালে ১৮৫৭র যে অগ্নিদাহ একদা বাংলার একপ্রান্তে সেনানিবাসে জ্বলে উঠেছিল, শহীদ মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসীর দড়িতে দোদুল্যমান নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি লোমকূপ হ'তে এবং ক্রমে যে অগ্নি মীরাট, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্মৌ, বারানসী, অযোধ্যা, ঝাঁসী, পাটনায় ছড়িয়ে গেল, সে অগ্নি আর কোনদিনও নিভল না। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত কখনো ধিকিধিকি, কখনো আবার প্রজ্বলিত পাবক-শিখার মতই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ভারতের আকাশ বাতাস অরুণাভ করে তুলেছে উত্তরকালে বারংবার।

অক্লান্ত-কর্মী ফিরিঙ্গী প্রতিনিধির দল যখন কোনমতেই শ্রীমন্ত নানাকে খুঁজে পেলে না, তখন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একের পর এক আঠার জন নির্দোষীকে নানা সাহেবের নামে অকুণ্ঠিত চিত্তে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধও করেনি।

ফিরিঙ্গীর সন্দেহ-তালিকা ভুক্ত ফাঁসীর আসামী অষ্টাদশ নানা মৃত্যুর পূর্বে সখেদে বলেছিলেন: মরণে কোন খেদ নেই, তবে ফিরিঙ্গী প্রতিনিধির কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ, এই যেন শেষ নানা সাহেব হন। আর যেন কোন নির্দোষীকে ফাঁসীর দড়িতে না ঝোলানো হয়, এ প্রহসনের যেন এখানেই হয় শেষ।

আজিমউল্লা খাঁকেও ইংরাজের নাগপাশ বাঁধতে পারেনি কোন দিন। চির মুক্ত, চির স্বাধীন! সাধ্য কি কেউ তাদের কেশ স্পর্শ করে!

১০ই মে ১৮৫৭র অগ্নিদাহ নির্বাপিত হলো ১৮৫৯র মে মাসে।

ভারতে ফিরিঙ্গীর পর-রাজ্য গ্রহণের দুর্বার লোভ, পরকীয় স্বত্বের উচ্ছেদ প্রচেষ্টার ও অসংযত ব্যবহার ও নানাবিধ অত্যাচারের মাশুল তাদের কড়ায় গণ্ডায়

না হলেও কিছুটা শোধ করতে হয়েছিল।

লাভ-লোকসানের খতিয়ানে হয়ত সেদিন তারা জিতেছিল, কিন্তু ১৮৫৭র বিপ্লব নেশাগ্রস্ত ঘুমিয়ে পড়া জাতির একশত বৎসরের ঘুম-জড়িমায় প্রবল নাড়া যে দিয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে সেদিন তো কারও দ্বিমত ছিলই না, আজিও হয়ত নেই।

বণিকের ছদ্মবেশে যে জাতি একদিন আমাদের দেশদ্রোহিতা ও দলাদলির অন্ধ-গলিপথে এসে আমাদের সিংহাসন-চ্যুত করে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার করেছিল, দীর্ঘ একশত বৎসর পর তার আবার রূপ বদলাল, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮র ২রা অক্টোবর একান্ত দয়াপরবশ (?) হয়ে এক ঘোষণাপত্র বের করে রাজ্যভার স্বহস্তে নিলেন।

ভারতের ভাগ্যাকাশে নতুন করে আবার মেঘ-সঞ্চারের ইঙ্গিত দেখা দিল পাকাপোক্তভাবে।

দুই

আবার ফিরে তাকাই সেই আঠারো শতকের মধ্যপর্বে, অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতের দিকে।

দিল্লীর মুঘোল বাদশাহী গৌরব মলিন হয়ে এসেছে। সাম্রাজ্যের শক্তি বহুদিন হ'তেই নিঃশেষ হয়ে আসছিল।

সেই পুরাতন বেদনাক্লিষ্ট কাহিনী: ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের মাটিতে যখন প্রভুত্বের শিকড় গেড়ে বসেছে।

সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্তে যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তার প্রায় সবগুলিই নবশক্তির নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন পর্যুদস্ত।

কিন্তু ভারতবাসী এ দাসত্ব সেদিন মেনে নিতে রাজী হয়নি নির্বিচারে। লৌহকঠিন হস্তে নবজাগ্রত রাজশক্তি চেয়েছিল দাসত্বকে কায়েমী করতে।

ফিরিঙ্গীরা যখন এদেশে এসে বাণিজ্য শুরু করে, মুসলমানের হাতেই ছিল রাজ্যশাসনভার, এবং সেই মুসলমান রাজশক্তি ক্রমে দুর্বল ও অশক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই ফিরিঙ্গী বণিক এদেশে রাজ্য স্থাপনের সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিল।

তাই হয়ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল মুসলমানদের মধ্যেই প্রথম: ওহাবী বিদ্রোহ। ঐ বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় যাঁরা সেদিন হয়েছিলেন, তাঁরা তদানীন্তন মুসলিম ভারতের অন্যতম আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর কয়েকজন।

সেদিনকার সে বিদ্রোহের মূলে মুসলিম ভারতের কয়েকজন ধর্ম-সংস্কারকই নেতৃত্বভার নিয়েছিলেন বলেই যেন আমরা না মনে করি যে এর মূলে ছিল কেবল ধর্মের গোঁড়ামিই বা ধর্মান্দোলন।

যদিও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মান্ধ ভারতবাসী চিরদিনই ধর্মের নামে মরীয়া হয়ে উঠেছে, তথাপি ওহাবী আন্দোলনের মূল সত্যকে আজ কেবলমাত্র ধর্মের গোঁড়ামি বলেই অস্বীকার করলে চলবে না।

রাজনৈতিক পরাজয় ও রাজক্ষমতাকে হারাবার বেদনা ও তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থাই হয়ত সেদিন এই বিদ্রোহের মূলকে আঁকড়ে ছিল, এবং ধর্মের লাগাম ধরে বিদ্রোহীরা ঐ দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে চেয়েছিল। কারণ ধর্মান্ধ ভারতবাসীকে ধর্মের চাবুক হেনে যত সহজে বিচলিত করা যেতো, তত আর হয়ত কিছুর দ্বারাই সম্ভব হতো না।

ভারতে ফিরিঙ্গী-শক্তির পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যত খণ্ড খণ্ড বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, ওহাবী আন্দোলন সেই বহু বিপ্লব আন্দোলনেরই একটি অংশ মাত্র।

সে যাই হোক, 'ওহাবী' কথাটা মোটেই এদেশীয় নয়, যদিচ ঐ শব্দটিকে কেন্দ্র করে ভারতে তথা বাংলার মাটিতে একদিন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল। বিশেষ করে তদানীন্তন একদল আচারনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ মুসলমান যাদের বলা হোত 'ফরাজী' বা 'ফেরাজী'—বঙ্গদেশে তারাই ছিল ওহাবী।

সুদূর আরব দেশে প্রথমে শুরু হয় এই ওহাবী আন্দোলন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আবির্ভাব হয়—নাম তাঁর আবদুল ওহাব। তিনিই ঐ আন্দোলনের প্রবর্তক।

তুর্কীর অধীনে অবস্থানকালে আরব জাতির মধ্যে নানা দিক দিয়েই অবনতি দেখা দেয়। সাধারণ মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের সত্য মূল তত্ত্বটি বিস্মৃত হয়ে বাহ্যিক কতকগুলো সামান্য আচার অনুষ্ঠান নিয়েই মত্ত হয়ে ওঠে। ধর্মপরায়ণ আব্দুল ওহাব জাতির ঐ আবর্জনা দূর করে মহম্মদ প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত খাঁটি ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। আরব সমাজের লোকেরা দেখতে দেখতে তাঁর অনুগত হয়ে উঠতে লাগল। এবং ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হ'তে মুসলমানগণ আরবে যেতেন তীর্থ করতে এবং ক্রমে তীর্থযাত্রীদের মধ্য দিয়েই ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল ঐ আন্দোলন।

ভারতে এই আন্দোলনের স্রষ্টা সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি, ১৭৮৬ খৃঃ মহরম মাসে রায়বেরিলীতে তাঁর জন্ম।

কিশোর বয়সেই সৈয়দের মনে সৈনিক হবার স্পৃহা জেগে ওঠে। শুরু করেন তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে। উত্তর ভারতে ইংরাজ রাজত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

কিশোর সৈনিকের যোগাযোগ ঘটলো দুর্ধর্ষ পিণ্ডারীদের সঙ্গে। কিশোর বালক হয়ে ওঠে দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা! ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

ভারতের অন্তর্গত পাঞ্জাবে তখন শিখ রাজ্য তথা হিন্দু প্রভুত্ব গড়ে উঠছে।

যার ফলে সৈয়দের জীবনে দেখা দেয় এক পরিবর্তন—সৈয়দ ধর্ম সংস্কারে অনুরাগী হয়ে উঠলেন। সুসংস্কৃত ও সংশোধিত ইস্‌লাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে সৈয়দ একদিকে যেমন পণ্ডিত ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মুসলীম সমাজে সমর্থন লাভ করলেন, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মুসলমানেরাও তার অনুগত হয়ে উঠতে লাগল। ফলে যখন যেখানে তিনি গমন করতেন, বিখ্যাত মোল্লানারা তাঁর

সঙ্গে থেকে ভৃত্যের মত তাঁকে সেবাযত্ন করতেন। যাতে করে সাধারণ মুসলীম সমাজও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। ঈশ্বর এক এবং মুসলমান মাত্রেই সমান—সৈয়দ প্রচারিত ঐ দু'টি কথা যেন মন্ত্রের মতই মুসলমান জনসাধারণের চিত্ত অনায়াসেই জয় করে নিল। যখন যেখানে তিনি গমন করতে লাগলেন, দলে দলে স্থানীয় লোকেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। সৈয়দ সর্বত্র উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোকদের তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে লাগলেন। পাটনায় তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্য একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেখানে তদীয় নিযুক্ত চারজন খলিফার মধ্যে ইনায়েৎ ও বিলায়েৎ আলির নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। পাটনা হ'তে সৈয়দ কলকাতায় এলেন, এখানেও তাঁর বিস্তর শিষ্য হলো।

১৮২০-২২ খৃঃ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে বেড়ালেন সৈয়দ।

তারপর মক্কায় তীর্থ করতে গিয়ে 'ওহাবী'দের সংস্পর্শে এলেন এবং ওহাবী দলভুক্ত হয়ে গেলেন। এতকাল সৈয়দের মন ছিল ধর্ম সংস্কারেই। ওহাবী মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সর্বপ্রথম মনে হলো ধর্মরাজ্য স্থাপিত না হলে বিশুদ্ধ ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তন স্বপ্নে মাত্র পর্যবসিত হবে। অতএব সর্বপ্রথমে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা চাই। বোম্বাইয়ের পথে সৈয়দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এবং ওহাবী মতবাদের প্রচারোদ্দেশে ১৮২৪ খৃঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে মিশে গিয়ে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে মুসলমান প্রভুত্ব বিস্তারে তৎপর হয়ে ওঠেন।

১৮২৭ হ'তে শিখ-অধ্যুষিত অঞ্চলে ওয়াহাবীদের আক্রমণ হলো শুরু।

বহু খণ্ড খণ্ড যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে ১৮৩১ সনে সৈয়দ একজন শিখের গুলিতে নিহত হলেন। সৈয়দ নিহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রধান শিষ্যেরা চতুর্দিকে সংবাদ প্রচার করতে লাগল যে, সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যু হয়নি। সব কিছু শত্রুর রটনা। তিনি এখনো জীবিত। গুপ্তভাবে বিচরণ করছেন এবং তাঁর অনুগতের দল তার নির্দেশমত কার্য করে যেতে পারলেই আবার একদিন তিনি সশরীরে সকলের সম্মুখে এসে দেখা দেবেন। নিরীহ মুসলমান জনসাধারণ ঐ কথায় বিশ্বাস করে আগের চাইতেও অধিকতর ধনজন দিয়ে সৈয়দ পরিকল্পিত ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর কর্মীসংঘকে নানাভাবে সহায়তা করতে লাগল। নিভৃত পর্বত প্রদেশ সিতানায় ওহাবীদের দুর্গ স্থাপিত হলো। পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে লাগল রসদ সংগৃহীত।

এদিকে সমগ্র উত্তর ভারতে সৈয়দ যখন নিজ মতবাদ প্রচার করে চলেছেন এক ধর্মরাজ্য স্থাপনের আশায়, বাঙলা দেশে সরিয়ত্তুল্লা নামে অন্য একজন মুসলমান অনুরূপ মতবাদ প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন। সরিয়ত ছিলেন ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামের অধিবাসী। তিনিও মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন। এবং তাঁর অন্ধ ইসলাম প্রীতি ক্রমে তাঁকে হিন্দু বিরোধী করে তোলে। ইংরাজ প্রভুত্ব তাঁর কার্যের অন্তরায় বোধ করায় তিনি তার প্রতি-বিধানকল্পে ইংরাজের বিরুদ্ধেই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। সরিয়তের

পরে তাঁর পুত্র দুদুমিয়াও পিতার অনুসৃত পথে অগ্রসর হন।

সৈয়দ আহামদের প্রবর্তিত 'ওহাবী' আন্দোলন যে সহসা ভারতে শিকড় গেড়ে বসেছিল তার মূলে ছিল সরিয়ৎ ও তদীয় পুত্র দুদুমিয়ার কার্যসমূহ ও তৎপরতা।

কিন্তু সত্যিকারের 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' বাংলা দেশেই শুরু হয়েছিল।

কারণ মনে পড়েছে আজ মৌলভী সরিয়ত্ উল্লাহ্‌কে, যাঁর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল সর্বপ্রথম এই বাংলাদেশেই অষ্টাদশ শতকের জনজাগরণ।

দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে ওহাবী-পন্থীরাই সর্বপ্রথম বয়ে আনলে নব আশার বাণী।

ধর্মের নামে হলেও আসলে আর্থিক উন্নয়নের।

দেখতে দেখতে অগ্নিশিখা বাংলার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল: চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর, নদীয়া···

এলো ১৮৩১ সাল: ১৮৫৭রও আগের কথা: সবে অধিষ্ঠিত ইংরাজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

ওহাবী! ওহাবী! প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে!

সহস্র সহস্র অশিক্ষিত নিপীড়িত কৃষক নিয়েছে আজ মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের শপথ! ইংরেজ রাজত্বের অবসান চাই।

অবসান! হাঁ, অবসান চাই! কিন্তু সে অগ্নিগর্ভ কণ্ঠস্বর ভোলেনি ভারত! ভোলেনি তোমাকে আজিও হে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর!

সাধারণ একজন মুসলমান কৃষক।

তুতু মীর বা তিতু মিঞা।

ভারতে গণবিপ্লবের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় শহীদ।

১৭৮২ খৃঃ। ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তার চলেছে তখনও ভারতের দিক হতে দিকে, ক্রমে দাসত্বের ক্লেদাক্ত বেষ্টনীতে নির্জীব শক্তিহীন হয়ে চলেছে ভারতবাসী। এমনি সময়ে ২৪ পরগণার হৃদয়পুর গ্রামে এক শিশু জন্ম নিল।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ধর্মের প্রতি তার গভীর অনুরাগ।

শিক্ষার কোন ভাল ব্যবস্থা নেই, তবু বালকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না মহীশুর শার্দুল টিপুর ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী, শাহ আলমের দুর্দশার কাহিনী। চঞ্চল হয়ে ওঠে হৃদয়। নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে।

কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে তিতু। শান্ত, ধীর অথচ গম্ভীর, ছোটখাটো এক জমিদার-কন্যার পাণিগ্রহণ করায় অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা দেয়, কিন্তু দেশের ডাক যার দু'কান ভরে বেজেছে, আরাম বিলাস তার কোথায়? কুস্তি, লাঠি, অসি শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে তিতু নদীয়ার এক জমিদারের বরকন্দাজ হলেন।

মারপিটের এক মামলায় জড়িয়ে পড়ে একবার কারাবাসও হলো;

কারামুক্তির পর তিতু চলে গেলেন দিল্লী এবং সেখান হ'তে বাদশা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন মক্কায় ১৮২৯ খৃঃ।

সেইখানেই হলো ওহাবী নেতা সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে পরিচয়।

নতুন করে জেগে উঠলেন যেন তিতু যাদুর স্পর্শে রূপকথার কাহিনীর মত।

মক্কা তীর্থ সেরে বাংলার ছেলে তিতু আবার বাংলার মাটিতে ফিরে এলেন। বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন আচার-ব্যবহারের বিশেষ কোন রীতিনীতি ছিল না। কিন্তু সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম-সংস্কারে মেতে উঠলেন এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে।

তীর্থ প্রত্যাগত তিতুর তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধর্মীর (?) ব্যবহার সহ্য হলো না বলেই সত্য ইসলাম ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হলেন তিনি।

সমাজের সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা কিন্তু তিতুর মত মেনে নিতে রাজী নয়।

সমাজের নিম্ন সম্প্রদায়—জোলা, নিকারী, পলুয়া প্রভৃতি কিছু কিছু তার মতকে মেনে নিল।

তিতুর অনুশাসন ছিল (১) টাকা ধার দিয়ে কারুর সুদ নেওয়া চলবে না। (২) বিবাহে বা কোন পর্বোপলক্ষে কোন বাদ্য বাজানো চলবে না। (৩) প্রত্যেককে দাড়ি (নুর) রাখতে হবে। (৪) কাছা দিয়ে কাপড় পরবে না।

প্রতি রাত্রে তিতুর বাসগৃহে গোপন বৈঠক হয় শুরু। তার শিষ্য ও অনুরাগী সম্প্রদায়ের অন্যান্য মুসলমানেরা ভীত হয়ে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে দরবার করলে। কৃষ্ণদেব রায় তিতুর অনুরাগীদের ডেকে সাবধান করে দিলেন এবং বললেন : তোমরা নিজেদের কাজকর্ম সেরে ধর্মকর্ম কর, আমার আপত্তি নেই। যদি তা না করে ধর্মের নামে অন্যের প্রতি অন্যায় জোরজুলুম কর, তাহলে প্রত্যেকের দাড়ি প্রতি ৷৷০ কর ধার্য করবো।

জমিদারের শাসনের ফলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ালো।

তিতু গর্জে উঠলো, বললে : ভাল কথায় বিধর্মীর দল না শোধরায়—তা'হলে বলপ্রয়োগ শুরু করো। যেমন করেই হোক ছলে বলে ওদের স্বমতে আনতেই হবে।

জমিদারের নিকট গিয়ে যারা নালিশ জানিয়েছিল, তাদের মধ্যে খাসপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানও ছিলেন।

তাঁর ঘরবাড়ী সব লুঠ হয়ে গেল সহসা এক রাত্রে।

এ ব্যাপারে তিতুর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, জমিদারকে জব্দ করা। খাসপুর লুণ্ঠন করে তিতুর অনুচরেরা পরদিন প্রাতে ইছামতী পার হয়ে পূঁড়া আক্রমণ করল।

পূঁড়াতে সেদিন কার্তিক পূর্ণিমার পরদিন বারোয়ারী পূজা হচ্ছে।

বারোয়ারী তলায় যাত্রাগান চলেছে : তিতুর দল আসছে সংবাদ পেয়ে বারোয়ারী তলা ছেড়ে যে যেদিকে পারলে সব পালিয়ে গেল।

বেচারী পুরোহিত পূজা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় পালাবার অবকাশ পেলো না।

তিতুর দল বারোয়ারী তলায় এসেই একটি গোহত্যা করলে।

এই জঘন্য ব্যাপারে পুরোহিত কিন্তু স্থির থাকতে পারল না, দেবীর খড়্গ নিয়ে রুখে দাঁড়ালো।

শক্তের ভক্ত নরমের যম। তিতু বেগতিক দেখে চম্পট দিল বারোয়ারী তলা ছেড়ে।

বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তিতুর লুঠতরাজের সংবাদ গেল, বারাসত তখন একটি ভিন্ন জিলা, থানা ছিল 'কদম্বগাছিতে'।

ম্যাজিস্ট্রেট কদম্বগাছি থানা ইনচার্জকে তদন্তে পাঠালেন।

থানা ইনচার্জ দারোগাবাবু জাতিতে ছিলেন চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। তিনি ১৫০ জন বরকন্দাজ ও চৌকিদার নিয়ে তিতুকে ধরতে এলেন।

তিতুর লোকবল তখন প্রায় ৫০০/৬০০। উভয় পক্ষে হলো যুদ্ধ।

দারোগা বাবু ও তাঁর কয়েকজন অনুচর ঐ যুদ্ধে প্রাণ হারাল।

দারোগা হত্যার পর তিতু ঘোষণা করলেন : আমিই এখন ভারতের অধীশ্বর। গোবরডাঙ্গা ও টাকীর জমিদারদের নিকট তিতু কর চেয়ে পাঠালেন। এও বলে পাঠালেন, যদি তারা তিতুর আধিপত্য না স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের মাথা তিতুর দু'পায়ে গজরানা করা হবে।

তিতুর এক পরামর্শদাতা ফকির ছিলেন। ফকির সাহেব বললেন : ঘাবড়াও মাৎ বেটা। ইংরাজের গোলাগুলি কিছুই নয়, সব আমি খেয়ে ফেলবো।

তিতু তখন বাঁশবেড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা তৈরী করলেন আত্মরক্ষার জন্য।

বাঁশবেড়িয়ার এক ঘন নিবিড় আম্রকাননের মধ্যে গড় কেটে বাঁশের কেল্লা তৈরী করে তিতুর দরবার বসল।

সামান্য কৃষকের ছেলে হোল স্বাধীন রাজা।

চারিপাশে কঠিন প্রহরা।

অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে সড়কি, বল্লম, রামদা, টাঙ্গী ইত্যাদি।

গ্রামের লোকেরা ভয় পেয়ে কেউ কেউ টাকীতে, আবার কেউ কেউ বা গোবর-ডাঙ্গায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

গোবরডাঙ্গার জমিদার তখন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ডাকসাইটে জমিদার।

তিতুর ক্রমবর্ধমান শক্তি অর্জনের ব্যাপারে তিনি একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

কলকাতার বিখ্যাত লাটুবাবু ও ছাতুবাবুদের নিকট হতে ২০০ হাবসী অনুচর চেয়ে পাঠালেন।

মোল্লাহাটীর কুটির ম্যানেজার ছিলেন ডেভিস্ সাহেব, তারও অধীনে তখন প্রায় ২০০ শত লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা ছিল।

তারাও কালীপ্রসন্নবাবুর পরামর্শে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

তিতুর নিকট এ সকল সংবাদ গোপন ছিল না।

তিতুকে আগেই আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করবার জন্য ডেভিস লোকজন নিয়ে বজরায় করে এগিয়ে এলেন।

বাঁশচোড়ের কাছাকাছি বজরা থামতেই তিতু ডেভিসের বজরা অতর্কিতে আক্রমণ করে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

ডেভিস্ কোনমতে প্রাণ হাতে করে পালালেন।

এরপর তিতু প্রায় ৫00 অনুচর নিয়ে গোবিন্দপুর আক্রমণ করে।

গোবিন্দপুরের রায় মহাশয়ও আগে হতেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন।

এবারের যুদ্ধে তিতুই কিন্তু হেরে গিয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালাল নদীপথে।

তিতুর অনুচরদের মধ্যে অনেকেই হতাহত হয়। অলৌকিক ভাবে তিতুকে প্রাণে বাঁচতে দেখে তার অনুচরেরা তাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলে মনে করতে লাগল। ঐ সঙ্গে নানা উপকথাও প্রচারিত হলো তিতু সম্পর্কে।

তিতুর দল ক্রমে ভারী হয়ে উঠতে লাগল। অনেকে এসে তিতুর দলে যোগ দিল।

দারোগা হত্যার রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। সামান্য একজন কৃষককে দমন করা এমন কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার এই ভেবে কলকাতা হতে তিতুকে দমন করতে এক নাজীরের অধীনে কয়েকজন চৌকিদার, বরকন্দাজ, জনকয়েক রংরুট ও চারজন গোরা অশ্বারোহী এলো।

আর তিতুর দলে তখন প্রায় ১000 লোক সংঘবদ্ধ হয়েছে।

মুসলমান ধর্মকে নতুন করে বলীয়ান করতে যারা একদা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, আজ তাদের মনে দেখা দিল বুঝি ভিন্ন চিন্তা।

ধর্মই বল আর যাই বল, কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে চাই ফিরিঙ্গী বিতাড়ন এদেশ হ'তে।

যত দিন তারা এখানে রাজ্যশাসনের গদীতে বসে আছে, ততদিন কোন কিছুরই প্রাধান্য বা প্রচার তারা ক্ষমার চোখে দেখবে না।

অতএব!

কলকাতা হতে প্রেরিত ছোটখাটো দলটি তিতুর দেশীয় অস্ত্রের মুখে বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে গেল।

কলকাতায় যখন এ সংবাদ এসে পেঁছিল, কর্তাদের টনক এবারে নড়ে উঠলো।

সামান্য একজন গেঁয়ো চাষা! এতবড় স্পর্ধা তার! সমূলে উৎপাটন করো!

পড়ে গেল সাজ সাজ রব।

১৮৩১ সন।

বিরাট বাহিনী এলো আধুনিক রণসাজে সজ্জিত হয়ে এক বিদ্রোহী কৃষকের দম্ভ চূর্ণ করতে।

১৯শে নভেম্বর।

রাত্রি শেষ হয়ে এল, পূর্বাকাশে উষার রক্তিম রাগ।

লেঃ স্টুয়ার্টের পরিচালনায় একদল সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈনিক ও একদল গোলন্দাজ সৈন্য পূর্ব-প্রেরিত লোকদের সঙ্গে এসে অতর্কিতে তিতুর বাঁশের কেল্লাকে ঘিরে ফেললে।

কিন্তু ওহাবীরা এত সৈন্য সমাবেশ ও বিপুল সমরায়োজন দেখেও যেন কিছু মাত্র ভীত নয়, বরং এর আগের বার যে কয়েকজন বিপক্ষীয় ওদের হাতে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, সেই মৃত দেহগুলো বাঁশের কেল্লার সম্মুখে টাঙ্গিয়ে দিল।

সুসভ্য ইংরাজ অফিসার লেঃ স্টুয়ার্ট সামান্য হাতিয়ার-হীন একদল চাষা-ভুষা গেঁয়ো লোকের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ করতে কেমন যেন দ্বিধাবোধ করতে লাগল ঃ একজন দূতকে পাঠালে তিতুর কেল্লায় ঃ আত্মসমর্পণ করো!

গেঁয়ো তিতু রাজনীতি জানবে কোথা হতে, দূত অবধ্য, তথাপি সে দূতকে হত্যা করে সগর্বে ঘোষণা করলে ঃ যুদ্ধং দেহি!

লেঃ স্টুয়ার্টের দল তিতুর বাঁশের কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে কামান সাজিয়ে রেখেছিল। ফাঁকা তোপধ্বনি করা হলো!

কামান হ'তে যে ফাঁকা আওয়াজও করা যায়, গেঁয়ো চাষাভুষারা তা জানত না। তাই ওরা ভাবলে, কামান দাগানো হলো, কিন্তু গোলা ছুটল না, এ নিশ্চয়ই ফকির সাহেবের কেরামতি। নিশ্চয় ফকির সাহেব কামানের গোলা গিলে খেয়ে ফেলেছেন।

সমস্বরে উল্লাসে সব চিৎকার করে ওঠে ঃ হজরৎ নে গোলা খা ডালা।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে কেল্লার বহির্দেশে এসে চতুষ্পার্শ্বের ইংরাজ সৈন্যের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইংরাজের সুবর্ণ সুযোগ।

লেঃ স্টুয়ার্ট হুকুম দিল ঃ Fire!

ভীম রবে গর্জে ওঠে ইংরাজের কামান। ভূমিসাৎ হলো তিতুর বাঁশের কেল্লা।

নিজেদের হঠকারিতার জনাই তিতু প্রভৃতি কয়েকজন সর্দার ইংরাজের কামানের গোলায় প্রাণ দিল।

বাকী যারা বেঁচে ছিল, প্রায় ৩০০ জন বন্দী হলো ইংরাজের হাতে।

ইংরাজের আদালতে এদের প্রত্যেকেরই প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে তিতু মীরের মৃত্যুর পর বঙ্গের ওহাবী সমাজ প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি আর, তবে লুপ্তও হয়নি।

তিতু মীরের পর সরিয়াতুল্লার নেতৃত্বে ফরিদপুর ও ঢাকায় ১৮৩৭ সন নাগাদ বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়। প্রায় ১২০০০ জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ হয়ে নতুন এক সরা জারী করে নিজ মতাবলম্বী লোকদিগের মুখে দাড়ি, কাছাখোলা, কটি-দেশে চর্মের রজ্জু ভেল করে চতুর্দিকস্থ হিন্দুদের বাড়ীতে চড়াও হয়ে দেব-দেবীর পূজায় অশেষ ব্যাঘাত ঘটায়। সরিয়তের মত তদীয় পুত্র দুদুমিয়াও অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে ঢাকা ফরিদপুর ও বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে। ফরিদপুরে দুদুমিয়া ফরাজীদের গুরু ছিলো। সে ও তার অনুচরেরা স্থানীয় জমিদার ও কুঠিয়ালদের একেবারে অগ্রাহ্য করে চলে। তারা গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে কোন দিন দাঁড়ায় নি বটে তবে গভর্মেন্ট তাদের ভয় করতো।

১৮৪৭ সনে দুদুমিয়ার বাড়ি জমিদার ও কুঠিয়ালেরা মিলে লুঠ করে এবং ১৮৫৭ সনে সেসন আদালত তার প্রতি দণ্ড দেয়। ১৮৫৭ এ যখন ভারতীয়

সেপাইরা মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গভর্মেণ্ট আশংকাক্রমে দুদুমিয়াকে কয়েদ করে কিছুকালের জন্য আলিপুরে জেলে রাখে।

দুদুমিয়ার শিষ্যরাও সর্বত্রই তাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করে তার যশোগান ও মত প্রচার করত, সমাজের দ্বারা শাসিত হয়ে বা ইচ্ছাপূর্বক কাছা ছেড়ে যারা দুদুমিয়ার শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিল তাদেরই 'ফেরাজী' বলা হতো। এক একজন খলিফার অধীনে বহু 'ফেরাজী' থাকত. পা পচে গিয়ে দুদুমিয়া মারা যায়।

ক্রমে বাংলা দেশে 'ফেরাজী'দের কার্যকলাপ এক নবরূপ ধারণ করে এবং বারাসাত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিং ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় তারা ছড়িয়ে পড়ে। সিতানায় 'ওহাবী' কেন্দ্রে মূল উদ্দেশে কার্য চলতে লাগল এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে ধন-জন ও অন্যান্য রসদপত্র সিতানায় প্রেরিত হতে থাকে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হ'তে পূর্ব-প্রান্তিক বাংলা এই দুই হাজার মাইল স্থান জুড়ে ওহাবীদের বিভিন্ন আড্ডা, শাখা বা কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওহাবী সৈন্যদের কুচকাওয়াজের সময় নানা সমর-সঙ্গীত গাওয়া হতো।

ওয়াহাবীরা সামরিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৫৮, ১৮৬৩ ও ১৮৬৮ অব্দে ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে. কিন্তু প্রতিবারই ঘটেছে পরাজয়।

কতকাল চলে গেল, তিতু মীরের কথা স্মৃতির পটে ঝাপসা হয়ে গেছে কি তবু ?—না। সেই যে চলতি গান, যা বহুকাল ধরে চাষাভূষারা বাংলার মাঠে মাঠে গেয়ে বেড়িয়েছে—কেন ?

—জোলানী উঠিয়া বলে, উঠরে জোলা ঝাট্
হাজাম বাড়ী গিয়া শীঘ্র তোর দাড়ী কাট্ ॥
তিতুমীরের গলা ধরি নমরুদ্দি কয়
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙা গোরা. উর্দ্দিপরা ব্যাতের টোপ মাথায়
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি............ইত্যাদি।

১৮৫৭র বিপ্লবাগ্নি নির্ভিয়ে (?) দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ জাতি বুঝতে পারলে, এই স্বর্ণভূমি ভারতকে শোষণ করতে হলে সর্বাগ্রে যে জিনিষের প্রয়োজন—সেটা হচ্ছে ভেদ-নীতির প্রচলন। আর তা না হ'লে এই তেত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি বিরাট এই ভূখণ্ডকে করায়ত্ত রাখা সহজসাধ্য হবে না। কাজ শুরু হলো সৈন্য বিভাগে সর্বপ্রথম।

১৮৫৭র মৃত্যুপণকে ব্যর্থ করে দিতে যে দেশদ্রোহী পর-উচ্ছিষ্ট লোভীরা ইংরাজদের পাশে পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, সেই শিখ ও গুর্খাবাহিনী আজ ইংরাজের পিঠ-চাপড়ানি পেয়ে নিজের হিন্দুস্থানী ভাইদের, হিন্দুস্থানী সেপাইদের শত্রু বলে ধরে নিতে শুরু করল।

এতো তাদেরই জবানী। স্বয়ং লর্ড ডালহৌসীর জবানী : ভয়ের কিছু

নেই। হিন্দুস্থানী সেপাইদের বিরুদ্ধে শিখ ও গুর্খারা বিশ্বস্তভাবে শয়তানের (Devils) মতই লড়বে।

শিখরা সেপাই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের পক্ষ নিয়ে লড়ছে, তার কারণ এ নয় যে তারা আমাদের খুব প্রীতির চক্ষে দেখে, তার কারণ এই যে তারা বাঙালী পল্টনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।

কিন্তু এ ঘৃণা এল কোথা হতে? এর মূল কোথায় ছিল! ডালহৌসী?

তোমাদের রাজনীতিতেই! ধন্য নীতি-বিশারদ ফিরিঙ্গী জাত! রাজত্ব করবার নামে এত বড় শোষণ আর কোন জাত কোন জাতকে করেছে কিনা জানি না। ১৮৫৭র শোধ এমনি ভাবেই তোমরা তুললে, যাতে করে এতগুলো লোককে বেমালুম একেবারে পাকাপোক্ত ভাবে গোলাম বানিয়ে ছেড়ে দিলে। এতবড় বিশাল ভারত ভুমিতে মানুষ বলতে আর একটা লোককেও রাখলে না। ভেদ-নীতির কুঠারাঘাতে এতগুলো মানুষকে একেবারে জর্জরিত ক্ষতবিক্ষত করে ভেড়া বানিয়ে দিল।

'ঐক্য বোধ' ও 'ভ্রাতৃত্ব বোধ' কথা দুটো ভারতের অভিধান হ'তে একেবারে মুছে গেল।

বাঙ্গালী পলটনের চেহারা সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়ে শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান, জাঠ, রাজপুত, গুর্খা দিয়ে সৈন্যদল গড়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে আইনের বলে বাঙ্গালীকে নিরস্ত্র করে রাখবারও ব্যবস্থা হয়ে গেল!

পঙ্গু ঠুঁটো জগন্নাথ করে বাঙালী জাতটাকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলে, তোমাদের রাজ্য বিস্তারের সুবিধার জন্য তোমরা ভেবেছিলে বাঙ্গালী যে একদা কোনদিন অস্ত্র ধরতো, সত্যিকারের সৈনিক ছিল সে কথাটাও তাদের ভুলিয়ে দেবে; কিন্তু তা সম্ভব করতে পারলে কি!

তারই জবাব: আমাদের বাঙালী ছেলে যতীন্দ্রনাথ বাড়ুজ্জ্যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র! যাঁদের ডাকে আজ শুধু বাংলা কেন, ভারতের সর্বত্র সৈনিক সাধনা এনে দিল।

সৈনিক আমরা! একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়!

তোমরা আইনের তালা-চাবী দিয়ে আমাদের সাধনা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে প্রহরী বসালে সঙ্গীন উঁচিয়ে।

তাই রুদ্ধঘরের অন্ধকারে, গোপনে গোপনে শুরু হলো আমাদের সাধনা।

আমরা স্বপ্নে দেখলাম: মা কি ছিলেন, আর কি হয়েছেন।

আর স্বপ্ন দেখলাম: মা কি হবেন।

তোমরা আইন রচনা করো। শৃঙ্খল করো আরো শক্ত, কারাগার করো লৌহকঠিন ক্ষতি নেই তাতে।

আমরা স্বপ্ন দেখি: মা কি হবেন! মা কি হবেন!

আমাদের দেশ-মাতৃকা জননী জন্মভুমির মুক্তি প্রস্তুতি চলুক!

আইন! আইনের পর আইন যত খুশী রচনা করতে চাও করো!

ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন তত টুটবে।

১৮৬১ঃ পাশ হলো ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল্ একট্। ঐ আইনে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ পুনর্গঠিত হলো। বড়লাটের শাসন পরিষদে একজন পঞ্চম নিযুক্ত হলেন।

১৮৭০ঃ আইনের আবার কিঞ্চিৎ সংশোধন—যখন যে প্রদেশে পরিষদের অধিবেশন হবে, তখন সেই প্রদেশের শাসনকর্তারাও এতে অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে যোগদান করবেন। চলুক আইন গড়া, আমরা একটু পিছনে তাকাই।

মরা গাঙ্গে বান এলো ঃ চৈত্র বা হিন্দু মেলা।

ভাঙা বন্দরে প্রাণের সাড়া এল কি? প্রথম মেলা ১২২৮, ৩০শে চৈত্র (ইংরাজী ১৮৬৭), দ্বিতীয় অধিবেশন ১২৮৯ শক, ৩০শে চৈত্র।

কি বলেছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর?—আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত-ভূমির জন্য!

মাগো! সন্তান তোমার জাগছে। ঘুমে বোজা চোখের পাতায় রুদ্ধ বাতায়ন ফাঁকে ফাঁকে আলো এসে পড়ছে তিমির বিদারী অরুণ রশ্মি।

রশ্মি! ভাঙা ভাঙা নবারুণ রশ্মি!

ঐ তো তোমার ছেলেরা বলছে, শোন মা, এই মিলনের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য আরো আছে। যাতে করে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় প্রীতি, ভারতবর্ষের মাটিতে বদ্ধমূল হয়, তাই তো এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

আমাদের কবির কণ্ঠে শুনলাম ঐ সঙ্গে নতুন দিনের নতুন গান ঃ

হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

*　　　*　　　*

কেন ডরো, ভীরু, করো সাহস আশ্রয়, যতো ধর্মস্ততো জয়।
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয়।

একশত বৎসরেরও বেশী, মরা জাতি শুনলো যেন নতুন কথা!

১৮৬০—১৮৮০ ঃ মাঝে মাঝে আসে মরা গাঙ্গে যেন জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস!

আমরা শুনলাম আরো একজন নির্ভীকের কণ্ঠ।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

না, ভারত ঘুমিয়ে নেই! এসেছে তার ঘুম ভাঙার লগ্ন!

১৮৭১ঃ ওহাবী নেতা আমীর খাঁকে ইংরাজ তিন আইনের বলে যাবজ্জীবন

নির্বাসন দণ্ড দিল।

ওহাবীরা বললেঃ না, এ জুলুম চলবে না—আমাদের নেতার প্রকাশ্য আদালতে প্রকাশ্য বিচার হোক। তাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেটন নরমানের এজলাসে আবেদন করা হলো।

বিচার অবিশ্যি যা হলো তা বলাই বাহুল্য।

তখন ভারতে লর্ড মেয়োর শাসনকাল। এলো ১৮৭১এর ২০শে সেপ্টেম্বর।

টাউন হলের সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় আবদুল্লা এসে অতর্কিতে প্রধান বিচারপতি নরমানের বক্ষে ছুরিকাঘাত করলে।

নরমানের সুবিচারের জবাব।

রক্তাক্ত দেহে নরমান মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবং সেই রাত্রেই শেষ নিঃশ্বাস নিল।

Tooth for a tooth ! Eye for an eye !...

ঘুমন্ত ভারতে বহুকাল পরে আবার বুঝি দেখা দিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

হিংস্র ইংরাজ ফাঁসীর দড়িতে লটকে আবদুল্লার প্রাণান্ত ঘটালো। ভাবলে, বোধ হয় আগুন নিভলো।

ভুল ভাঙতে দেরি হলো না প্রভুদের। ১৮৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি আন্দামান ভ্রমণকালে শের আলীর হাতে স্বয়ং লর্ড মেয়ো প্রাণ দিল। দ্বিতীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ !

তাই বলছিলাম, ভারত ঘুমিয়ে থাকেনি। এবং মুখে না প্রকাশ পেলেও, অন্তরে হয়ত সেটা ইংরাজ সরকার অনুভব করছিল হাড়ে হাড়েই।

রাজ্যশাসনের নামে শোষণ ও ব্যভিচার, অন্যায় জোরজুলুম ক্রমে তাই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কর্তারা 'আর্মস্ এ্যাক্ট' (অস্ত্র-আইন) নামে আর একটি নতুন আইন দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি বন্দুক বা তরবারিটি পর্যন্ত রাখা ভারতীয়দের পক্ষে বে-আইনী বলে ঘোষিত হলো ! শ্বেত-অশ্বেত, খ্যাত-অখ্যাত সকল বিদেশীই অস্ত্র-শস্ত্র রাখতে পারবে ও ব্যবহারও করতে পারবে, কেবলমাত্র আমরা এদেশের অধিবাসী হয়েও, হিন্দু বা মুসলমান কেউই, অস্ত্র ব্যবহার তো দূরের কথা অস্ত্র রাখতেও পারবো না, আইনতঃ সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। কোন একটা সুসভ্য শিক্ষিত স্বাধীন জাতি যে রাজ্যশাসনের অজুহাতে এতদিনকার একটা সুসভ্য জাতকে এমনি করে হাত পা-ভেঙে পঙ্গু অপদার্থ করে ফেলতে পারে, ভাবতেও বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

যে ভারতকে কেন্দ্র করে একদা এত বড় ভূখণ্ড এশিয়া শিল্পে, স্থাপত্যে, শিক্ষায়, কৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আজ সেই ভারতের আর গৌরবের বলতে কিছুই এরা বাকী রাখবে না : ইংরাজের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু কবরের মাটিতেও অংকুরোদ্গম হয়, এ-ই প্রকৃতির বিধান। তাই ভারতের কবরের মাটিতে দেখা দিলেন : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

এঁদেরই প্রচেষ্টায় আবার ভারতের জনগনের বুকে এলো নতুন ঐক্যের ধারা। নতুন মন্ত্র হলো উচ্চারিত।

যে আত্মবিশ্বাস প্রায় শূন্যে গিয়ে পেঁছেছিল, তা আবার তারা সম্পূর্ণ হয়ে ফিরে পেলে, এক-ভ্রাতৃত্ব ও একজাতীয়তাসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হলো। এই কল্যান-মুহূর্তে ভারত-সভা নতুন চিন্তা ও কর্মধারা জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করলে।

'ভারত-সভার' মূল উদ্দেশ্য ছিলঃ ভারতের প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫ঃ প্রজাস্বত্ব আইন। জমিতে প্রজার স্বত্ব এবারে সুনির্দিষ্ট হলো।

* * *

দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছেঃ সামান্য কারণে দেশপ্রেমিক নেতা সুরেন্দ্রনাথের দু'মাস দেওয়ানী জেলে কারাবাস হলো। কারাকক্ষের দুয়ার খুলেছে।

পলাশীর প্রান্তরে হতভাগ্য সিরাজের পতনের পর হতে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ক্রমপ্রতিষ্ঠা ও সেই অধীনতার শিকল ভাঙতে গিয়ে ভারতে পরবর্তী প্রায় দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝলকে উঠেছে বার বার, তার রক্তিমাভায়ই ভারত হয়ত নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছিল সেদিন আবার।

এ সেই স্বপ্নঃ মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন. আর কি হইবেন।

তিন

সেই স্বপ্নঃ দ্বি-সপ্ত-কোটিভুজৈধৃ'ত খর-করবালে, অবলা কেন মা এত বলে!

ভারতে বিংশ শতাব্দী আসছে। তারই অত্যাসন্ন ইঙ্গিত ১৮৯৩ঃ বোম্বায়ে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

অদূরাগত উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহাগ্নির একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জুড়ে, বিশেষ করে পুনার চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুসলমান ও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ যেন হু হু করে জ্বলে উঠলো ঐ সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গে।

১৮৯৪ঃ পুনা ও বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রীয় ও চিৎপাবন ব্রাহ্মণ যুবকেরা গণপতি উৎসবকে কেন্দ্র করে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। পথে পথে মিছিল। লাঠি, তরোয়াল ও মশাল নিয়ে সশস্ত্র মিছিল দেখা দিল।

একদা যাদের শৌর্যে ও বীর্যে স্বয়ং আলমগীর বাদশা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলঃ যে মহারাষ্ট্রীয় বীর গৈরিক পতাকা তুলে স্বপ্ন দেখেছিলেনঃ

খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
এক ধর্মরাজ্য পাশে বেঁধে দিব আমি···

তারই ভগ্ন সমাধি-মন্দিরের দ্বারে এসে প্রণাম জানালো হাজারো মারহাঠী যুবকঃ জয়তু শিবাজী!

জীর্ণ সমাধি মন্দির সুসংস্কৃত হলো।

১৮৯৫ঃ শিবাজী উৎসব।

চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত দুটি যুবক দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার সমিতি স্থাপন করলেন।

ওঠ! ভারতবাসী জাগ! শিবাজী ও বাজীপ্রভুর অনুকরণে দুঃসাহসিক কাজে এবারে তোমাদের প্রবৃত্ত হ'তে হবে। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো, বলো ভাই সব আমরা জাতির মুক্তি-সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দেবো।

এদেশের নাম যদি হয় হিন্দুস্থান, তবে এখানে ইংরাজ রাজত্ব করে কোন্ অধিকারে!

১৮৯৭ঃ কেশরীর পাতায় আমরা পড়লাম ঃ বাঘনখ সাহায্যে আফজল খাঁর হত্যা শিবাজীর অবশ্য-করণীয় পুণ্যকীর্তি, নরহত্যা আদৌ নয়। আমাদের তা'র অনুকরণে দেশের শত্রু উৎসাদনে প্রবৃত্ত হতে হবে।

'বাঘনখ'! শিবাজীর সেই চিরস্মরণীয় অমোঘ গুপ্ত শক্তি 'বাঘনখ'!

শার্দুলের মত সেই ধারালো নখরাঘাতে, যারা আমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে, শয়নের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, অঙ্গের বস্ত্রাবরণ খুলে নিয়েছে, সেই ফিরিঙ্গী শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো।

ইংরাজের সুশাসন (? ! তবু মহামারী, দুর্ভিক্ষ!

১৮৯৭ঃ দেখা দিয়েছে প্লেগের মহামারী বোম্বাইয়ে।

কর্ম ও নীতি-বিশারদ ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের শুরু হলো 'প্লেগ রেগুলেশনের' অকথিত পাশবিক অত্যাচার।

দেশের লোক বুঝতে পেরেছে প্লেগ কমিশনার শ্বেতাঙ্গ র‍্যাণ্ড এই অত্যাচারের মূল।

গভর্ণমেণ্টের নিকটেও প্রার্থনা করে কোন ফল নেই।

এ তো আর বুঝতে কারও কষ্ট নেই যে, সামান্য প্লেগ প্রতিরোধের অছিলায় তারা শুরু করেছে এই দুর্বিষহ প্রজাপীড়ন ও জঘন্য অত্যাচার।

প্রতিকারহীন রক্তের অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে!

* * *

২২শে জুনের স্বপ্ন-মদির রাত্রি!

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের দীর্ঘ ৬০ বৎসর পূর্ণ হলো। হীরক জুবিলী উৎসব।

আলোকমালায় সেজেছে তাই পুনা নগরী। হাস্যে, লাস্যে, গল্পে, গীতে যেন অভিসারিকা, সহসা সেই আলোকোজ্জ্বল আনন্দ-ঘন মুহূর্তে নীল শান্ত আকাশ চিরে নেমে এলো যেন বিচারের বজ্রাগ্নি শিখা ইন্দ্রের বজ্রের মতই অব্যর্থ অমোঘ।

দুম্! দুম্! দুড়ুম্!

রক্ত! পুনার মাটি ভিজে গেল। দামোদর চাপেকারের হাতে র‍্যাণ্ড ও লেঃ আরেস্ট বিগত-প্রাণ!

অন্ধকারে যে বজ্র সঞ্চিত হচ্ছিল, এ তারই একটু আভাস মাত্র এবং যে বজ্রর হতে পরবর্তীকালে ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে বাংলাদেশে মুহুর্মুহু অগ্নিজিহ্বা লালায়িত হয়ে উঠেছে।

কারাগারের লৌহকবাট ঝন্ ঝন্ করে খুলে যায়, ফাঁসীর দাঁড় দাগের ওপর দাগ পড়ায় কণ্ঠে কণ্ঠে। ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি উৎক্ষিপ্ত করে ছুটে যায় জাহাজ আন্দামানে নির্বাসন দিতে।

* * *

গুপ্ত সমিতি!

বল দেশের জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত! প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো!

একদিকে গুপ্তকক্ষে গুপ্ত সমিতির গোপন অধিবেশন, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করবে না।

চাপেকার সমিতিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছ্‌নছ্‌ করে দেওয়া হলো।

কিন্তু ২২শে জুনের রাত্রে যে অগ্নিশিখা ঝলকিয়ে উঠেছিল, তা কি নিভল!

পুনার গুপ্ত 'বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের নিকট দীক্ষা হয়ে গেল শ্রীঅরবিন্দের। বরোদার মহারাজার শরীর-রক্ষীর কাজে ইস্তফা দিয়ে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে কলকাতায় এলেন। সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একখানা চিঠি সরলা দেবীকে লিখিত:

সভা সমিতি করে মিষ্ট কথায় আর যাকেই ভোলানো যাক, ফিরিঙ্গী জাতকে ভোলান যাবে না। লগুড় হেনে শায়েস্তা করতে হবে। অতএব প্রস্তুত হও।

সময় হয়েছে নিকট এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

সুদূর দাক্ষিণাত্য হতে উড়ে এলো বিপ্লবের বীজ শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা বাংলার মাটিতে শ্বেতাঙ্গদের অলক্ষ্যে।

১০২ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে সুকিয়া স্ট্রীট থানার নিকটে ব্যারিস্টার পি. মিত্রকে কেন্দ্র করে যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবী সমিতির প্রথম কেন্দ্র স্থাপনা করলেন।

১৯০৩: বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার গোড়ার দিকে এসে যোগ দিলেন ঐ সমিতিতে।

১৯০৪—

১৯০৫: সোনার বাংলার অঙ্গ ছেদ করলে ফিরিঙ্গীরা।

ভয় পেয়েছিল ইংরাজ। বাঙ্গালী জাতি তখন রাজনীতিতে ও শিক্ষায় অগ্রসর, সমগ্র ভারতের নেতৃস্থানীয়। এই জাতিকে পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে, তার নেতৃত্বের ক্ষমতাও যাবে এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসীর প্রগতিমূলক আন্দোলনেও ভাঁটা পড়বে।

কিন্তু, তার ফিরিঙ্গীদের চাইতেও সাংঘাতিক উদ্দেশ্য যেটা ছিল সেটা: ভেদনীতির প্রবর্তন এই দেশের জনগণের মধ্যে।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদ্রেক।

শ্বেতাঙ্গরা যত অস্ত্র হেনেছে অসহায় ভারতবাসীর ওপরে, এটা সবার চরম ! পাশুপাত অস্ত্র !

নবগঠিত পূর্ববঙ্গ আসামের ছোটলাট হলেন স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড্‌ ফুলার। সে তো প্রকাশ্যেই যত্রতত্র বলতে শুরু করলে ঃ আমার হিন্দু মুসলমান দুই স্ত্রী।

হিন্দু দুয়োরাণী—অবহেলিতা ও নিন্দিতা, আর মুসলমান সুয়োরাণী—প্রণয়াস্পদা ও বিশেষ অনুরাগিণী।

হায় রে কি রূপকথারই সৃষ্টি হলো, আজিও তার মীমাংসা হলো না !

১৯০৫এর সেই অঙ্কুরিত বিদ্বেষ-বিষ, ১৯৪৮এর ৩০শে জানুয়ারী আকণ্ঠ পান করে মৃত্যুঞ্জয়ী হলেন যিনি, সেই অহিংসার পূর্ণ প্রতীক মহাত্মাকে আর একবার প্রণাম জানাই এই সঙ্গে।

ভারত সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উঠেছিলো সেদিন, সে বিষের সাক্ষ্য দেবে যুগ যুগ ধরে দিল্লী নগরীর বিড়লা ভবন ও যমুনাপুলিনের রাজঘাট শ্মশান !

ফিরিঙ্গীর কীর্তি ! এ জগতে অতুলনীয়। আর অতুলনীয় তাদের অমোঘ পাশুপাত অস্ত্র প্রবর্তিত ভেদ-নীতি ! সেলাম তোমায় লর্ড কার্জন ! হাজার সেলাম ! কবি আবার বল ! আবার আমরা শুনি বল ঃ জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাংলার সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব ; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, ভিক্ষা নহে।

* * *

না, ভিক্ষা আমরা চাই না। ছিনিয়ে নেবো আমরা আমাদের যা কিছু প্রাপ্য। স্বত্বাধিকারের প্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রতিষ্ঠা ! দাবীর স্বীকৃতি !

বল বল বল সবে
শতবীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

কোথায় সেই শ্রেষ্ঠ আসন ! কোথায় আমাদের সেই মা দিগভুজা নানা প্রহরণ-ধারিণী শত্রু-মর্দিনী মৃগেন্দ্র-পৃষ্ঠ বিহারিণী !

বন্দেমাতরম্‌ !

কাঁদো বাংলা। কাঁদো ! আজ তোমার শোকের দিন। হাঁ বঙ্গজননী, তুমি সেদিন কেঁদেছিল, আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেছি। আমরাও সেদিন মিলনের 'রাখীবন্ধন' পালন করেছিলাম।

সর্বত্র হরতাল। কাজকর্ম. গাড়ী চলাচল সব বন্ধ। সবাই গাইছে প্রাণ খুলে 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীত। আর দেশের কবি সেদিন গাইলেন ঃ

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,

সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান—
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

বাঙালী মরেনি। বাঙালী চিরজীবী। জগৎ-সভায় যাদের আসন পাতা হয়েছে, যে বাঙালী রামমোহন, বিবেকানন্দ, হেম, মধু, বঙ্কিম, রবি, বিপিন, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন,—সে বাঙালীর মৃত্যু কোথায়?

দিকে দিকে তার জয়যাত্রা।

দেশের চারণ কবি তাই আবার গেয়ে উঠ্‌লেন:

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন টুট্‌বে ততই—
মোদের বাধন টুট্‌বে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে ততই—
মোদের আঁখি ফুট্‌বে।

মৃতজাতির বুকে নব চেতনার আলোড়ন: শুরু ভারতে স্বদেশী আন্দোলন।

'বয়কট' আন্দোলন। আন্দোলন সুরু হলো প্রথম বাংলা দেশেরই মাটিতে।

পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ: আমি বিশ্বাস করি এই স্বদেশী আন্দোলনই আমাদের দেশের মুক্তির পথ।

আসন্ন ভারতব্যাপী মুক্তি-যজ্ঞ শুরু হবে, এ তারই প্রস্তুতি!

কংগ্রেসের মধ্যেও দু'টো দল গড়ে উঠ্‌ছে। একদল পুরাতন পন্থী, তাদের নায়ক স্যার ফিরোজ শা মেহ্‌তা; অন্যদল নতুন পন্থী, কাণ্ডারী হলেন বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ বিপিন পাল। একদল চান ধীরেসুস্থে আপোসে মীমাংসা; অন্যদল বললে, আমাদের চাই স্বরাজ্য, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা।

নতুন ও পুরাতন দলের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

লাল-বাল-পাল।

বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল। ত্রয়ী সম্মিলন।

এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে এগিয়ে এলেন শ্রীঅরবিন্দ।

বাইরে প্রকাশ্যে যখন এই আন্দোলন চলেছে, গোপনে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠছে তখন একটি দু'টি করে: গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান—অনুশীলন সমিতি।

শুধু বঙ্গ-ভঙ্গের রদই নয়, ভারতের স্বাধীনতা চাই।

স্বাধীনতা চাই! স্বাধীনতা!

বিলাতী লবণ, চা, চিনির পিকেটিং করে কি হবে? তা দিয়ে কি স্বাধীনতা

হবে ? রাষ্ট্রবিপ্লব হবে ? লাঠি খেলা, বন্দুক, তরোয়াল চালানো শেখ, সমিতি গঠন করো। বুকের রক্ততর্পণে আসবে স্বাধীনতা।

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে উঠছে।

দলে দলে স্কুলের কিশোর ছেলেরা এসে লাঠি খেলা, ড্রিল, কুচ্‌কাওয়াজ শুরু করেছে।

মিলিটারী ট্রেনিং!

প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো, সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি—স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। সর্বদা সমিতির পরিচালকের নির্দেশ মানিয়ে চলিবে।

জঙ্গলাকীর্ণ আম-কাঁঠাল ও নিভৃত আলো-আঁধারী বাঁশবনের মধ্যে লাঠি খেলা, অশি শিক্ষা ও কুচ্‌কাওয়াজ চলেছে।

লাঠিটা আসলে তো লাঠি নয়। তরোয়াল ও বন্দুকের লড়াই শেখার উদ্দেশ্যেই আইন বজায় রেখে লাঠি খেলার প্রবর্তন।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা! মানুষ আমরা নহি তো মেষ।

সন্ধ্যার আব্‌ছায়া অন্ধকারে সেই আম্রকাননের ছায়ায় বাঁশঝাড়ের নির্জনতায় এসে সব মিলিত হয়।

গোপনে গোপনে চলেছে শক্তির আরাধনা। মৃত্যুপণে দীক্ষা!

কলকাতা হ'তে আসছে নবযুগের অগ্নিক্ষরা বাণী নিয়ে, যুগান্তর পত্রিকা। সহসা এমন সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গঃ গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবকে গুলি করে মারা হয়েছে সংবাদ প্রচারিত হলো।

ওদিকে সাগরপারে রুশ-জাপান যুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য সম্রাট জারের পরাজয় ও জাপানের জয়।

মহারাষ্ট্র হ'তেও মাঝে মাঝে উদ্দীপনার অগ্নিকণা ছুটে আসে। আকাশে মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছে। কালো মেঘ, বজ্রবিদ্যুৎ ভরা।

১৯০৭ সাল।

নরম ও গরম দলের বিরোধে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল।

* * *

আর গোপন বিপ্লব সমিতি! সেখানে বিপ্লবের অঙ্কুর দানা বেঁধে উঠছে, একটু একটু করে। কালো মেঘের বুকে লুকানো সেই বজ্র-বিদ্যুৎ!

বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা নির্মাণ।

বোমা তৈরী শিক্ষা দিচ্ছেন: হেমচন্দ্র কানুনগো।

১৯০৬ সাল থেকেই একাধিকবার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ-আসামের অত্যাচারী লেঃ গভর্ণর ফুলারকে হত্যা করবার বিশেষ চেষ্টাও হয়ে গেছে। কিন্তু সফল হয়নি কেউ।

ঐ সঙ্গে নতুন করে ফিরিঙ্গীরাজের দমন-নীতি দেখা দিয়েছে।

'বন্দেমাতরম্', 'নবশক্তি', 'সন্ধ্যা',—প্রভৃতি পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করা

হয়েছে।

জনতা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

নির্ভীক ব্রহ্মবান্ধব, 'সন্ধ্যা'র কর্ণধার, আদালতে অভিযোগের উত্তরে বললেনঃ বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টায় আমি যে ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত নহি। * * * ফিরিঙ্গীরাজ আমাকে জেলে দেয় সাধ্য কি!

খানাতল্লাসীও শুরু হয়েছে।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড।

স্বদেশী মামলার বিচার প্রায়ই তারই এজলাসে হয় এবং সামান্যতম দোষেও সে দেয় গুরুদণ্ড। স্বদেশী আন্দোলনে ছেলেরা লিপ্ত হলে তাদের প্রতি আদেশ হতো নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের।

১৯০৭, ১লা নভেম্বরঃ প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা, সব কিছু বন্ধ করা হলো নতুন আইন জারী করে

নিত্য নতুন দমননীতি ফিরিঙ্গীর হুমকি।

বজ্রগর্ভ মেঘ হ'তে অশনি-সম্পাত হলোঃ ১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল।

চার

কে তুমি উদাসী, বাংলার পথে ঘাটে মাঠে গেয়ে যাও!
উদাসী একতারাতে এ কি গান গাও!
একবার বিদায় দে মা,
ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসী
দেখবে জগৎবাসী॥

ক্ষুদিরাম। তোমায় আজ আবার দীর্ঘকাল পরে স্মরণ করছি।

চোখের উপরে যেন ছায়াছবি ভেসে উঠছে, রিক্ত গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের রিক্ততায় কে ওই দধিচী!

একমাথা রুক্ষ এলোমেলো চুল। দীর্ঘ সরল অগ্নিশিখার মত ঋজু, যেন খাপমুক্ত একখানা ধারালো তলোয়ার।

মাত্র ১৯ বৎসরের তরুণ কিশোর।

মনে পড়ে তোমার দিদিকে কিশোর। সেই যে যিনি মাত্র তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়ে তোমায় কিনে নিয়েছিলেন বিধাতার হাত হ'তে!

আজ আমরা এসেছি, সবাই মিলে তোমাকে আবার কিনে নিতে মহাকালের হাত থেকে।

ক্ষুদ দিয়ে নয় ক্ষুদিরাম! এবারে বুকভরা ভালবাসা ও অশ্রুপুষ্পে।

তুমি হয়ত জান না, তোমার দিদি অপরূপা দেবীকে যখন আমরা প্রশ্ন

করেছিলাম ঃ দিদি, আমাদের ক্ষুদিরাম সম্পর্কে কিছু বলুন।

দিদি কেঁদে ফেললেন ঃ আজ আবার ঊনচল্লিশ বছর পরে ক্ষুদিরামের জন্য কাঁদতে বসেছি। কেঁদে এসেছি চিরদিনই। সামনা-সামনি কাঁদতে পারিনি, লুকিয়ে কাঁদতে হয়েছে! যাকে কিনেছিলাম মাত্র তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে, যাকে বিদায় করেছি গোপনে কাঁদা চোখের জল দিয়ে ঃ কত শাসন, কত গঞ্জনা, কত অবহেলা করেছি বলে মনে মনে বিঁধে রয়েছে—আজ তার শেষ তর্পণ করে অনুতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচবো। এই ভাঙা পাঁজরের ভিতর কত কথাই তো আছে!

কেঁদো না বোন! এ শোকাশ্রু তো তোমায় শোভা পায় না।

অগ্নি কি কোন বন্ধন মানে! সে যে চিরমুক্ত চিরস্বাধীন।

১৮৮৯ সাল! ৩রা ডিসেম্বর, সন্ধ্যা পাঁচটা।

একটি শিশু জন্মালো! মেদিনীপুর জেলার মৌবানি, ত্রৈলোক্যনাথ বসুর ঘরে। রুগ্ন কৃশ একটি শিশু।

ওরে ভাই হয়েছে, ভাই! বোনেদের কি আনন্দ! এর আগে যে দু'টি ভাই মারা গিয়েছে।

উলুধ্বনি দিয়ে তিন বোন ভাইকে জানায় আহ্বান।

আগে দু'টি ভাই মারা গিয়েছে অকালে, বোন অপরূপা তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়ে তাই নবজাত ভাইটিকে কিনে নিলে।

শিশু ক্রমে হামাগুড়ি দেয়, এঘর হতে ওঘরে, কি দুরন্ত কি অশান্ত।

দিদি যাবে শ্বশুড়বাড়ী, কোথা হ'তে শিশুটি ছুটে এসে দিদির হাঁটু দু'টো আঁকড়ে ধরে ; শিশুটি তখন হাঁটতে শিখেছে যে। ফর্সা, লিক্‌লিকে, মাথায় একমাথা ঠাকুরের জন্য রাখা চুল ঃ যেতে দেবো না।

কেন এ মায়া! কেন এ পিছুডাক।

খুব শীঘ্রই মায়ার বাঁধন ছিঁড়বে বলেই কি এই মায়া নিয়ে লুকোচুরি!

দিদির একটি ছেলে হলো ঃ ললিত।

মামা-ভাগ্নে পিঠেপিঠি! দু'জনেই সমান দুষ্টু!

দিদি খুঁজছেন ঃ ললিত! ক্ষুদি! ক্ষুদিরাম।

কোথায় ক্ষুদিরাম। ভাগ্নে তখন ছোট্ট লেপটির তলায় মামাকে লুকিয়ে ফেলেছে।

মা এসে ঘরে প্রবেশ করেন ঃ তোমার মামু কই ললিত?

মুখখানা গম্ভীর করে ললিত জবাব দেয় ঃ জানিনে তো মা!

পরক্ষণেই কিন্তু লেপের তলে মামা ফিক্ করে হেসে ফেলে।

তবে রে দুষ্টু ছেলে! কপট গাম্ভীর্যে মা চোখ রাঙাল!

রক্ত-আমাশয়ে মা মারা গেলেন, তাঁর নাড়ীছেঁড়া ধন ক্ষুদিরামকে মাটির মার কোলে তুলে দিয়ে। এই নাও মা তোমার সন্তান।

বালকের বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর।

মায়ের স্নেহ হতে এত তাড়াতাড়ি বঞ্চিত হয়েছিল বলেই হয়ত পরবর্তী

জীবনে সে মাটির মাকে আপন করে নিতে পেরেছিল।

অদৃশ্য হাতে লক্ষ-কোটি বাঁধনে জননী জন্মভূমি বেঁধেছিলেন ওকে। মা-হারা বালক, দিদি অপরূপা নিয়ে এলেন বুকে করে নিজের শ্বশুরালয়ে ভাইটিকে।

দিদির বুকভরা স্নেহের ছায়ায় বালক বড় হয়ে ওঠে। ঠাকুরের মানত রাখা মাথায় বড় বড় চুল, নাকে সোনার তেঁতুল পাতা, পায়ে মরা হাজা ছেলের চিহ্নপ্রমাণ স্বরূপ সরু লোহার বেড়ী!

বেড়ী দিয়ে কাকে বাঁধতে চেয়েছিলে দিদি?

সে যে বাঁধনকে মেনে নিয়েছিল মুক্তি বলে। সে যে চির বন্ধনহীন।

* * *

যে বাঁধনকে মেনে নিয়েছিল মুক্তি বলে, তাকেই আমি বাঁধতে চেয়েছিলাম মাস্টার!

দিদির কণ্ঠস্বর বুঝি অশ্রু-বাষ্পে বুজে আসে।

নীলু! আমার নীলু! তোমরা আর আমায় স্তোক দিও না মাস্টার! আমি তো শুধু তার দিদিই নই, আমি যে তার মা। আমার বুকের মধ্যেই যে সে মানুষ! তার প্রতিটি দিনের হাসি কান্না দিয়েই যে আজিও বুকখানা আমার ভরে আছে! সে-রাত্রের কথা, সেই শেষ বিদায়ের রাত্রি, আজিও আমি ভুলিনি।

বর্ষাকাল। গ্রাম। সকাল হ'তেই ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা-ঘাটে একহাঁটু কাদা ও জল জমে গিয়েছে।

প্রায় দেড় মাস পরে নীলু আগের দিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এসেছে।

নীলুর নামে যে পুলিসের ওয়ারেন্ট বের হয়েছে, দিদির আর তা অজানা নেই।

যে কয়দিন নীলু ছিল, না, থানার দারোগা, গ্রামের চৌকিদার ইয়াছিন, দিনে রাতে কতবার যে এসে পলাতক নীলাঞ্জনের খোঁজ করে গিয়েছে।

সেদিনটাই শুধু আসেনি।

এমনি-বৃষ্টি বাদলার মধ্যে ঘর হ'তে বের হয় কার সাধ্যি।

রাত্রির অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে আসে, বাইরে প্রকৃতিও যেন আরো অশান্ত হয়ে ওঠে।

ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, যেন আকাশ ভেঙে পড়বে।

সোঁ সোঁ হাওয়া পাল্লা দেয় বৃষ্টির সঙ্গে।

ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, তারই আলোয় নীচু হয়ে কাঠের তক্তাপোসের ওপরে বসে নীলাঞ্জন কি একখানা বই পড়ছে।

দিদি দক্ষিণের পোতায় রান্নাঘরে ব্যস্ত।

দরজায় মৃদু করাঘাত: কে?

নীলাঞ্জন চকিত দৃষ্টি তুলে দরজার পানে তাকায়: কে?

নীলু দরজা খোল, আমি সুষ্টিধর!

কে ? মাস্টারদা ? নীলাঞ্জন উঠে বন্ধ দরজাটা খুলে দেয়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক হাওয়া ও বৃষ্টির ঝাপটা ঘরে এসে ঢোকে, মুহূর্তে ঘরের একটিমাত্র বাতি নিভিয়ে দেয়।

বাতিটা যে নিভে গেল মাস্টারদা !

তা যাক্। নৌকা ঘাটে রেডি। রাত্রি দশটায় নৌকা ছাড়বে। মাঝি প্রথমটায় একটু দোমনা করছিল। বসিরের ছেলেটার কিন্তু ভারী সাহস, সে বললেঃ ডরাও ক্যানে বাপজান, মাস্টাররে ঠিকই মোরা স্টিমার ঘাটকে পেঁছামু !

হাঁ বসিরের ছেলে রমজান, ও চিরকালই অমনি ডানপিটে।

সহসা দিদির কণ্ঠস্বর শোনা যায়ঃ ঘরের মধ্যে কে রে নীলু ! আলোটা নিভ্লো কি করে ?

হাওয়ায় আলোটা নিভে গেল দিদি, মাস্টারদা এসেছেন।

কে মাস্টার, যাওনি তুমি তা হলে ! বেশ !

না দিদি, যাওয়া হয়নি।

তা আলোটা জ্বাল না, মেঝের ওপরে দিয়াশলাইটা আছে দেখ।

আলোটা জ্বালানো হলো।

বাইরে বৃষ্টিটা এখন অনেকটা যেন কম।

ভালই হয়েছে মাস্টার, নীলুর জন্য গরম ভাতে ভাত হয়েছে, ঘরে মুঙ্গলীর দুধে তোলা ঘি আছে, খেয়ে যেও।

খেয়েই যাবো দিদি, অনেকদিন তোমার হাতের রান্না খাই না, তাছাড়া অন্ন আবার কবে দু'মুঠো জুটবে কে জানে !

এবার এসে তো দেখাই করলে না, সেই গত শুক্রবার এসেছিলে, তারপর আজ এই এসেছো। আমি ভেবেছিলাম হুট্ করে যেমন এসেছিলে, তেমনি হুট্ করেই বুঝি চলে গেল।

হাঁ, গত শুক্রবার সৃষ্টিধর নীলাঞ্জনেরই খোঁজ করতে এসেছিল, কিন্তু নীলাঞ্জন তখনও এসে পেঁছায়নি।

তোমরা বোস, ভাত হলেই তোমাদের ডাকব, কয়েকটা ডালের বড়া ভেজে নিইগে ঐ সঙ্গে। দিদি আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

টোনায় গিয়ে শেষরাত্রে স্টিমার ধরবো, মাস্টারদা বলে।

দিদিকে কিন্তু এখনও কিছু বলা হয়নি মাস্টারদা।

না বললেই বা, ক্ষতি কি !

না, তা পারবো না মাস্টারদা। দিদির কাছে আমার কোন কথাই গোপন নেই, তুমি তো জান একদিক দিয়ে যে উনি আমার মায়েরও অধিক।

বেশ, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই বলবো যা বলবার।

* * *

আহারাদির পর মাস্টারদাই বলে কথাটাঃ আমরা আজই রাত্রে চলে যাবো দিদি।

সে কি মাস্টার ! এই ঝড়জলের রাত্রে !

পালাবার এর চাইতে বড় সুযোগ তো আর পাবো না দিদি। কেউই এ ঝড়-জলের রাত্রে সরকারের নিমক শোধ দিতে বের হবে না। তাছাড়া ঘাটে নৌকা প্রস্তুত।

কোথায় যাবে ?

কোন কিছু নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নেই দিদি।

মাস্টার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে : আর তো দেরি করা চলে না নীলাঞ্জন। তুমি নদীর ঘাটে চলে এসো, আমি একবার সন্তোষের বাড়ী হয়ে যাবো। মাস্টারদা ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য পা বাড়ায়।

মাস্টার, শোন। দিদির ডাকে মাস্টারদা ফিরে দাঁড়ায়।

আমি জানি, তুমি নীলুকে আমার কতখানি ভালবাসো এবং এও জানি এপথে কত সংকট, কত বিপদ ! তবু এইটুকুই আমার আশ্বাস, তুমি ওকে দেখবে। তুমি ওর পাশে আছো !

প্রথমটার মাষ্টারদা দিদির কথার কোনই জবাব দিতে পারে না। তারপর মুখ তুলে দিদির দিকে তাকিয়ে বলে : একান্তই যদি নিরুপায় হই তবে আলাদা কথা দিদি ! তবে আমি ওর পাশে যতক্ষণ থাকবো, এইটুকুই শুধু তোমায় বলতে পারি, আমার প্রাণ দিয়েও ওকে বাঁচাবো।

আশ্চর্য ! সেই নীলাঞ্জনের দিদির কাছে শেষ বিদায়।

আর এ জীবনে নীলাঞ্জনের সঙ্গে দিদির দেখা হয়নি।

কতদিন হয়ে গেল, তবু কি সে রাত্রির কথা মাস্টার ভুলতে পেরেছে।

বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে। কর্দম-পিচ্ছিল পথ ধরে কোনমতে মাস্টার অন্ধকারে সন্তোষদের বাড়ীর দিকে চলেছে।

সন্তোষের ওখানে ওর পিস্তলটা ও কার্তুজগুলো আছে, যাবার আগে নিয়ে যেতে হবে।

সন্তোষদের বাড়ীতে ওর অবাধ গতিবিধি।

মাস্টার জানত না, আজ দুই দিন সন্তোষের জ্বর। শয্যাগত সে।

সন্তোষের বিধবা মা ও কিশোরী বোন মৃণাল রোগীর শয্যার পাশেই তখনও জেগে বসে।

মাস্টারের ডাকে মৃণাল উঠে দরজা খুলে দেয়।

কি খবর মাস্টারদা, এত রাত্রে ! সন্তোষই প্রশ্ন করে।

কি, ব্যাপার কি ?

আজ দু'দিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি দাদা। ম্যালেরিয়া জ্বর। সন্ধ্যার দিকে ভাল ছিলাম, আবার কিছুক্ষণ হলো জ্বর এলো।

তাই তো আমার জুতোটা নিতে এসেছিলাম যে ভাই !

যা তো মৃণাল ! আমার পড়বার ঘরের পুরানো আলমারীর মাথায় একটা জুতোর বাক্স আছে, মাস্টারদাকে এনে দে।

মৃণাল উঠে গেল।

বড় তাড়াতাড়ি ভাই, চল মৃণাল, আমাকে দেখিয়ে দাও বাক্সটা তুমি। মাস্টারদাও উঠে দাঁড়ায় এবং মৃণালকে অনুসরণ করে।

ছোট অপরিসর ঘরটা। একপাশে দেয়ালের গায়ে একটা বহুকালের পুরানো আমকাঠের আলমারী।

মাস্টার নিজেই হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নামায়। বাক্স খুলে কাপড়ে মোড়ানো পিস্তলটা কোমরে বেঁধে নেয়।

ওটা কি?

পিস্তল!...

তাহলে লোকে যা বলে, সত্যি?

কি সত্যি মৃণাল? সৃষ্টিধর হাসিমুখে মৃণালের প্রসারিত সরল চোখের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলায়।

সত্যিই তাহলে তুমি সন্ত্রাসবাদী?

সন্ত্রাসবাদী কিনা জানি না মৃণাল, তবে আমি চাই, ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হোক। আমরা আবার দেশকে আমাদের দেশ বলে জানতে পারি।

লোকে বলে পুলিস তোমায় ধরতে পারলে ফাঁসী দেবে।

মাস্টার মৃদু হাসে: তা হয়ত দেবে। এতটুকু সংকোচ নেই কণ্ঠে! পরক্ষণেই দরজার দিকে পা বাড়ায়।

চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আমরা কি দেশের কাজ করতে পারি না?

কেন পারবে না, দেশ তো কারুর একার নয়। তোমার আমার সকলের। দেশের সেবায় অধিকার সকলেরই তো আছে মৃণাল।

কিন্তু দাদা যে বলে দেশের কাজে নামতে হলে আর সব কাজ ভুলতে হয়।

না মৃণাল! সংসারের মধ্যে থেকেও দেশের সেবা করা যায়।

তবে তুমি সংসার ছেড়েছো কেন? ঘরে তুমি থাক না কেন? ঘরের মায়া কি তোমার নেই?

ঘরের মায়া কার নেই মৃণাল! তবে আমার সময় কই! তাছাড়া বিপ্লবী আমি। আমার চোখের সামনে একটি মাত্র আদর্শ: আমার শৃংখলিতা দেশ-জননী।

পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে মাস্টার বলে: মৃণাল, শৈশবে কে কি স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্নের কথা ভুলে যাও। ভালবাসব, দশজনের মত ঘর-সংসার পাতব, তার জন্য আলাদা মনের দরকার। নিজের বলতে আজ যেমন আমার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, তেমনি দেবার মত আজ আর কিছুই আমার নেই। দেশ আমার সর্বস্ব অপহরণ করে রিক্ত নিঃস্ব ভিখারী করে এই বিশ্বে ছেড়ে দিয়েছে। তোমার মা আছেন, স্নেহময় দাদা আছেন, ভবিষ্যৎ তোমার উজ্জ্বল।

মৃণালের দু'চোখের কোল বেয়ে কেবল অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কোনই জবাব দেয় না।

মাস্টার আবার যাবার জন্য পা বাড়ায়।

আবার কবে দেখা হবে!

দেখা তুমি আর আমার পাবে না মৃণাল, তবে!

তবে—

তবে যদি কোনদিন শুনি, তুমি স্বামী পুত্র নিয়ে সুখের সংসার গড়েছো, তখন একদিন যাবো। দেখে আসবো তোমায়। অন্তরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আসবো।

বেশ তাই এসো, মৃণালের অশ্রুনত আঁখি বুজে আসে।

শুধু একটানা বৃষ্টির শব্দ, দুকান ভবে বাজে অবিরাম রিমঝিম্, রিম্ ঝিম্!...

চোখ যখন খুলল মৃণাল, ঘর খালি, শুধু দরজাটা খোলা, বৃষ্টির ছাট্ আসছে, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া।

* * *

উঃ! নদী সেদিন যেন রণ-মুখী! কি ঢেউ! কি বাতাস!

নীলাঞ্জন আগেই পেঁছে গিয়েছে নদীর ঘাটে।

রমজান হাল ধরে বসে আছে মাষ্টারদার প্রতীক্ষায়।

মাষ্টারদা নৌকায় ওঠে, একটা বৈঠা হাতে তুলে নিয়ে বলে, নীলু, তুমিও একটা বৈঠা নাও।

নৌকা চলতে সুরু করে, ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে।

ঘর-ছাড়া দিক-হারা যাত্রী কোথায় চলেছো? কোথায় ভেড়াবে তোমার এ তরী?

দেশ দিয়েছে আমায় ডাক।

* * *

দেশ দিয়েছে আমায় ডাক দিদি। তাই চললাম তোমায় ছেড়ে।

আদর্শের সংঘাত বেঁধেছে। ভগ্নিপতি সরকারের চাকুরে। তোষণ-নীতি ও দেশ-প্রীতির সংঘাত।

এমনি করে যদি তোমার ভাই স্বদেশী করে বেড়ায়, আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে! স্বামী বলেন।

বাপ-মা-হারা ছোট ভাইটি যে তাঁরই আশ্রিত।

কি জবাব দেবেন অপরূপা দেবী স্বামীর কথার।

কিশোর ক্ষুদিরামের কানে কি সে কথা গিয়েছিল!

পড়াশুনায় মন বসে না। তার চাইতে ঢের ভাল লাগে ব্যায়াম ও খেলাধুলা।

* * *

১৯০২ সাল: মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতি।

সমিতির উপদেষ্টা ও প্রধান কর্মী: বিপ্লবী সত্যেন বসু।

গোলকুমার চকে—সত্যেনের বাড়ীর লাগোয়া একটা ভাঙা কালীমাতার

মন্দির, তারই সামনে একটা চালাঘর : গুপ্ত-সমিতির কেন্দ্র।

কিশোর ক্ষুদিরাম সত্যেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিচক্ষণ দূরদর্শীর বুঝতে কষ্ট হয় না, মায়ের পায়ে উৎসর্গিত ঐ কিশোর। সমিতিতে খেলাধুলা হয়, ব্যায়াম হয়, পাঠচক্র আছে, নিয়মিত পড়াশুনাও চলে।

সাঁঝের আঁধার ঘন হয়ে এসেছে।

মন্দিরের খোলা দ্বারপথে দেখা যায় পাষাণ বিগ্রহের সম্মুখে প্রদীপদানে প্রদীপ-শিখাটি কাঁপছে মৃদু মৃদু।

নৃমুণ্ডমালিনী, এলায়িত কুন্তলা, লোল-জিহ্বা, সংহারিণী কালীমূর্তি : শক্তির প্রতীক। অসুর-দলনী জগন্মাতা!

সত্যেন প্রশ্ন করেন : তোরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারিস তো বল?

এ কি প্রশ্ন!

সবাই চুপ। কারও মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই।

সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে চারিদিক থম্‌থম্‌ করছে।

কে দেবে প্রাণ, কোথায় কে আছ এসো বীর! মায়ের জন্য এগিয়ে এসো।

সহসা এগিয়ে এল ক্ষুদিরাম : নিশ্চয়ই আমি দেশের জন্য মরতে পারি।

বেশ, তবে ঐ মায়ের মন্দির ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর : সাদা পাঁঠা বলি দিয়ে, সেই রক্তে মাকে আমার তৃপ্ত করবো।

প্রতিজ্ঞা নিলাম!

পরম স্নেহে সত্যেন কিশোর ক্ষুদিরামকে বক্ষের মাঝে টেনে নেন আলিঙ্গনের বন্ধনে।

১৯০৫ : দুই ভাই জ্ঞানেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রের নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর শহরের কিশোর ও যুবকের দল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বর্তমান দুর্নীতির অবসান হোক। মুক্তি চাই! মুক্তি!...

বিদেশী দ্রব্য বর্জন করো, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নাও।

১৯০৬, ফেব্রুয়ারী : মেদিনীপুরের এক মারহাট্টা কেল্লায় বসেছে এক শিল্প প্রদর্শনী। গেটের মাথায় লেখা : সোনার বাংলা।

কিশোর ক্ষুদিরাম গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে বিলাচ্ছে দেশদ্রোহ-মূলক (?) পুস্তিকা।

পুলিস এসে বাধা দেয়।

বিদ্যুৎবেগে পুলিসের নাকে এসে পড়ে ক্ষুদিরামের লৌহমুষ্টির আঘাত। হৈ-চৈ...গোলমাল।

পুলিস ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক সত্যেন্দ্র সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে এলেন দৌড়ে, পুলিশকে বললেন : আরে এ কেয়া কিয়া তুমনে! ডেপুটি সাব্‌কা লেড়কা হ্যায় জানতে হো? কাহে উনকো পাকড়া।

সর্বনাশ! ডেপুটি সাহেবের লেড়্‌কা। পুলিশ মুক্ত করে দেয় ক্ষুদিরামকে।

পরে পুলিস যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, ক্ষুদিরাম তখন তাদের নাগালের

বাইরে।

অলক্ষ্যে আত্মগোপন করেছে সে।

ছোটখাটো সংঘাতের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় ক্ষুদিরামকে নিয়ে।

সরকারী ডাক লুঠ, হাটের মধ্যে গিয়ে বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি।

শিবমন্দির : মামাভাগ্নে চলেছে মন্দিরের সামনে দিয়ে।

কত পুরুষরমণী দেবতার প্রত্যাদেশের জন্য মন্দিরদুয়ারে হত্যা দিয়েছে।

কৌতূহলী কিশোর প্রশ্ন করে : ললিত, এরা কেন শুয়ে আছে রে ওখানে অমন করে?

হত্যা দিয়েছে মামা ওরা, জান না, দেবতার দয়া হলে রোগ সারবে, মনস্কামনা পূর্ণ হবে!

সত্যি! তাহলে আমাকেও তো হত্যা দিতে হয় ললিত!

সেকি মামা! তুমি কেন হত্যা দেবে, তোমার আমার আবার কি রোগ হলো?

হত্যা দেবো এইজন্য যে, বলবো দেবতা ইংরাজকে এদেশ থেকে দূর করে দাও!

শিবঠাকুর যদি সত্যই প্রত্যাদেশ দিতে পারেন, তাহলে আমাকেও নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন।

মামা বলে কি! ভাগ্নে মামার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মামার দু'চোখের দৃষ্টি তখন দূরে সন্নিবদ্ধ : বন্দিনী মায়ের শিকল ভাঙ্গার স্বপ্ন!...

আর ওদিকে কলিকাতা মহানগরীতে।

১৯০৭ সাল : কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট স্বনামধন্য মিঃ কিংস্‌ফোর্ড। যত স্বদেশী ব্যাপার সংক্রান্ত মামলার বিচার চলেছে কিংস্‌ফোর্ডের আদালতেই।

আর তার বিচারে লঘুপাপে গুরুদণ্ড চলেছে অবাধে দিনের পর দিন।

দেশের লোক সব তটস্থ হয়ে উঠেছে।

এ কি অন্যায় জুলুম! এ কি অত্যাচার!...বিচারের নামে এ কি প্রহসন! রাজ্যরজ্জুটা ওদের হাতে বলে কি যা খুশি তাই ওরা করবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই!

বিপিন পালের বিচারের দিন যেন চরমে ওঠে ব্যাপারটা।

বিচার দেখতে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে ১৫ বৎসরের কিশোর বালক সুশীল সেনও আছে।

শ্বেতাঙ্গ পুলিস ইনস্‌পেক্টার মিঃ হিউ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঐ কিশোরের উপরে বেটন ও ঘুষি চালায়।

পুচ্ছ-মর্দিত শার্দুলের মত কিশোর রুখে দাঁড়ায় প্রতিবাদে : মুষ্ট্যাঘাতে দেয় অত্যাচারের জবাব।

কিংস্‌ফোর্ড ক্ষেপে ওঠে : কালা আদমীর এত সাহস! চালাও বেত ওই

বালকের সর্বাঙ্গে।

বিস্মিত জনতা! বেত্রাঘাতে জর্জরিত বালক সকল অত্যাচার সহ্য করে নীরবে শান্ত হয়ে। তোরা বেত মেরে ভুলাবি আমায় তেমন মায়ের ছেলে নই!

* * *

মুরারীপুকুরের উদ্যানে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি।

গুপ্ত সমিতির অন্ধকার কক্ষ: গোপন সভা বসেছে।

অত্যাচারীর দণ্ড দিতে হবে।

এমন শিক্ষা দিতে হবে ঐ অত্যাচারী ফিরিঙ্গীকে, যাতে ও বুঝতে পারে মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। অন্যায় জুলুমের আছে প্রতিবাদ।

গোপন সভায় স্থির হয়ে গেল: কিংসফোর্ডের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

অত্যাচারের অবসান ঘটাতে হলে কঠোর হস্তেই তা দমন করতে হবে।

বোমা ফেলে ওই অত্যাচারী ফিরিঙ্গীর শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে। কিন্তু কে ফেলবে বোমা!

স্থির হয়ে গেল: দুটি নাম।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী!

ঊনবিংশ শতকে অবশ্যম্ভাবী রক্ত-বিপ্লবের রাত্রি প্রভাতের প্রথম সূচনা: মেঘাবৃত ভারতের উদয়াচলে প্রথম রক্তিমআভায় লেখা হলো দুটি নাম: ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী!

তারপর একটি দুটি করে সুদীর্ঘ ঊনচল্লিশটি বৎসর কালের বুকে লীন হয়ে গিয়েছে। তবু ক্ষণিকের বুদবুদের মত কাল-সমুদ্রের বুকে যে দুটি নাম জেগে উঠে আবার মিলিয়ে গেল, তার শেষ বুঝি কোন কালেই নেই। যুগ যুগ ধরে ভারতের অন্তস্তলে ঐ দুটি নাম অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো ভক্তি-বেদনা-অশ্রুর স্মৃতিতে।

১৯০৮: কিংসফোর্ড মার্চ মাসে মজঃফরপুরে দায়রা জজ হয়ে এল।

* * *

এপ্রিলের গোড়ার দিকে এক শুক্রবার হাওড়া স্টেশনে, বেলা তখন প্রায় তিনটা হবে, ক্ষুদিরাম গুপ্ত-সমিতির নির্দেশমত চলেছে মজঃফরপুর কিংসফোর্ডকে চরম দণ্ড দিতে, দেখা হলো দীনেশের (প্রফুল্ল) সঙ্গে।

এর আগে ক্ষুদিরাম কখনও প্রফুল্লকে দেখেনি।

বুকের মধ্যে প্রতিহিংসার অনির্বাণ অগ্নিজ্বালা নিয়ে দুজনে মজঃফরপুরে কিশোরীবাবুর ধর্মশালায় এসে উঠলো: প্রফুল্লর সঙ্গে একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ।

প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে একটি পিস্তল ও দশটি কার্তুজ দিল: প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষা করো! সে জানত না যে ক্ষুদিরামের কাছে আরো একটি পিস্তল ছিল।

* * *

৩০শে এপ্রিল: রাত্রি আটটা। রাত্রির আকাশপটে অনির্বাণ জ্বলছে অগণিত তারকা।

অদূরে ফিরিঙ্গীদের ক্লাব: আলো জ্বলছে। আনন্দ-কলহাসির টুকরো

টুক্‌রো আওয়াজ।

সামনে খোলা ময়দানে অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত গাছের ছায়ায় কে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে !

অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি যেন দু'টি অঙ্গার-খণ্ড, ধক্‌ ধক্‌ করে জ্বলছে।

একটি ফিটন গাড়ি এগিয়ে আসছে।

হাঁ, ঐ তো ! কিংসফোর্ডেরই ফিটন গাড়ী !

ধক্‌ধক্‌ করে চারজোড়া চোখের দৃষ্টি যেন মুহূর্তে জ্বলে ওঠে।

দুম···দড়াম্‌ !

একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ : ধোঁয়া বারুদের গন্ধ !

দীর্ঘ দিনের ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্‌টা কি কেঁপে উঠ্‌লো !

বাসুকী আর পুরাতন পৃথিবীর ভার বইতে পারছে না !

* * *

সমগ্র মজঃফরপুর শহরটি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে : মিসেস্‌ ও মিস্‌ কেনেডি কোন এক অদৃশ্য আততায়ীর নিক্ষিপ্ত বোমার বিস্ফোরণে প্রাণত্যাগ করেছে।

* * *

কার্য শেষ হয়েছে ভেবে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ঘটনাস্থল হতেই নগ্নপদে ঊর্ধ্বশ্বাসে মোকামা স্টেশনের দিকে দৌড়াচ্ছে।

পিছনে আসছে শিকারী কুকুরের দল।

কিছুটা পথ দৌড়ে এসে ক্ষুদিরাম গেল ওয়ালী স্টেশনের দিকে, প্রফুল্ল ছুটলো সমস্তিপুর স্টেশনের দিকে।

* * *

১লা মে : মজঃফরপুর রেলওয়ে স্টেশনে যেন লোক আর ধরে না। অগণীত জনতা।

একটি ট্রেন এসে দাঁড়াল স্টেশনে : সহসা একটি কমপার্‌ট্‌মেণ্ট হ'তে যেন সুমধুর স্বর্গীয় কণ্ঠ ভেসে এল : বন্দে মাতরম্‌ !

সমবেত জনতার কণ্ঠ চিরে অভিনন্দন ছুটে এল আনন্দঘন সুরে : বন্দে-মাতরম্‌।

দেশবাসী আজ দেখতে এসেছে সেই কিশোর কুমারকে। একদা যে নির্ভীক উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিল : দেশের জন্য নিশ্চয়ই আমি প্রাণ দিতে পারি !

সত্য আজ সে মহাসত্যে লীন হ'তে চলেছে।

ব্রিটিশের লৌহ-শৃংখলে বন্দী হয়েছে আজ সেই কুমার কিশোর ক্ষুদিরাম। মাত্র তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিয়ে যাকে দীর্ঘ ঊনিশ বৎসর আগে তার বড়দিদি যম-রাজের নিকট হ'তে ক্রয় করে নিয়েছিলেন !

মাটির মা আজ আবার প্রসারিত করেছেন তার দু'টি বাহু : ওরে দে, আমার সন্তান—আমার বাছাকে বুকে ফিরিয়ে দে !

* * *

১৯০৮ খৃঃ, ২রা মে।

এদিকে গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা নন্দলাল মুখার্জী প্রফুল্লর সঙ্গ নিয়েছে, বন্ধুর ছদ্মবেশে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে।

অকপটে সরল মনে প্রফুল্ল নন্দলালকে বোমা নিক্ষেপের কাহিনী সব খুলে বলে। মুহূর্তে শয়তানের মুখোস খুলে যায়ঃ ছদ্মবেশী কনেস্টবলদের ইঙ্গিত জানায় শয়তান, প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করবার জন্য।

নিজের ভুল বুঝতে প্রফুল্লর দেরি হয় না। অসহ্য ঘৃণায় সর্বাঙ্গ যেন মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠেঃ ছি।···মশাই! আপনি না বাঙালী। বাঙালী হয়ে এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন!

সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের কর্ণবিদারী আওয়াজ।

বিস্মিত হতভম্ব নন্দলালের চোখের সামনে বিগত-প্রাণ রক্তাক্ত প্রফুল্লর দেহখানি মাটিতে লুটিয়ে পড়লঃ ইংরাজের বন্ধনোদ্যত লৌহবলয় হাতেই রয়ে গেল।

ধরিত্রী আপন সন্তানকে দু'বাহু বাড়িয়ে বক্ষে যেন টেনে নিলেন।

চির-মুক্ত চির-স্বাধীন প্রাণঃ তাকে নন্দলালের সাধ্য কি ছিল বাঁধে!

আর সাধ্য কি তার সেই পরদেশী প্রভুর আদেশে বন্দী করে সেই অনির্বাণ দীপশিখাকে!

কে এই তরুণ যুবক হাসতে হাসতে যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে গেল অবহেলে! দেশের আপামর জনসাধারণ বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় যাকে প্রণতি জানাল!

প্রফুল্ল লহ নমস্কার!

কিন্তু কে এই দুঃসাহসী তরুণ? কিই বা এর পরিচয়?

চলে গেল, কোথায় কে জানে! কিছুদিন আগে প্রফুল্লর দাদা একখানা চিঠি পেয়েছিলেন—দাদা, আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি ভালই আছি। আমি ব্রহ্মচর্য নিয়াছি।······

পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি।······

পরমানন্দে দিন কাটাইতেছিঃ মাস দু'ই পরে হিরণ্ময়ী নীলাঞ্জনের একখানা চিঠি পেলেন।

নীলাঞ্জনের চিঠি, নীলাঞ্জন লিখেছেঃ দিদিগো! আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি মাস্টারদার সঙ্গেই আছি সর্বদা। পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি।

প্রণাম নিও,

তোমার স্নেহের নীলু।

বর্ষা প্রায় শেষ হয়ে এলো। মেঘের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশের বুকে লঘুপক্ষ বিস্তার করে ভেসে ভেসে বেড়ায়। মাঝে মাঝে অবিশ্যি এখনও দু'এক পশলা বৃষ্টি যে হয় না, তাও নয়।

জমিতে এবার ফসল যেন ধরে না।

পূবের জানালাটা খুললে চোখে পড়ে ঐ দূরে সবুজ সাগরের ঢেউ।

বাতাসে পরিপুষ্ট ধানগাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে। হরিৎ সাগরের ঢেউ যেন।

আঙ্গিনার সজিনাগাছটায় অজস্র ফুল ধরেছে : মৌমাছিদের মৃদু গুঞ্জন।

চিরদিনের মধুলোভী ওরা।

মুংলী গাইটার নতুন বাচ্ছা হয়েছে।

ওর দুধ খেতে নীলুর খুব ভাল লাগে। রহিম ঘরামী আবার ঘরের চালগুলিতে নতুন করে খড় তুলে দিয়েছে, তার উপরে হোগ্‌লা পাতা, নীলুই বলেছিল এবারে ঘরের চালে খড়ের উপরে না দিয়ে হোগ্‌লা পাতা দিতে।

ঘরবাড়ী বিষয়-আশয় সবই তো তার।

সাজানো ঘরদুয়ার ফেলে কোথায় সে ছুটাছুটি করে, ঘর-ছাড়া দিক্‌হারা !

হিরণ্ময়ীর চোখের কোলে জল ভরে ওঠে : হায়রে বন্ধনহীন গ্রন্থি !

স্বামীর কথা আর ভাল করে মনেও পড়ে না।

অথচ যার জন্য উনি সব ছেড়ে চলে এলেন, সেও আজ ওকে ভুলতে চায়। আমার জন্য চিন্তা করো না। পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছি।

দেশের ছেলে। দেশ তোমাকে ডাক দিয়েছে। দেশজননী তার আদরের দুলালকে ঘর হ'তে বাহির-বিশ্বে টেনে নিয়ে গিয়েছেন : যেখানে তুমি 'পরমানন্দের' সন্ধান পেয়েছো। তোমাকে আর পিছু ডাকব না।

১৮৫৭র ঝিমিয়ে পড়া ভারতে আবার যেন আসে নবচেতনার সাড়া। আগেই বলেছি, নরম ও গরম দলের মতানৈক্যে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে।

এদিকে একদল মরণজয়ী মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে : হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু !

গোপন বিপ্লবীচক্র গড়ে উঠেছে যে একটি দু'টি করে অনেক, সে সংবাদও হিরণ্ময়ীর অজানা নেই। তাদেরই দলভুক্ত ঐ মাস্টার ও তার বড় সাধের নীলাঞ্জন, নীলু !

কতটুকুই বা জানত দেশ সেদিন ঐ মরণজয়ীদের কথা। জানি শুধু প্রফুল্ল নামে এক দুঃসাহসী তরুণ কিশোর ছিল, যে দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের প্রতিজ্ঞায় দিয়ে গেল প্রাণ হাসিমুখে, না করি একটি কাতর শব্দ।

বগুড়া জিলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিহার গ্রামে প্রফুল্লর জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ চাকী ও মাতা স্বর্ণময়ী। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান প্রফুল্ল। পুত্রলাভের আশায় আশায় দীর্ঘ সতের বৎসর কাল কার্তিক পূজা করবার পর স্বর্ণময়ীর তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। ১৮৮৮ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেদিন যখন শঙ্খ ও উলুধ্বনি উঠেছিল স্বর্ণময়ী কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে, "গৃহের মঙ্গল শঙ্খ নহে তার তরে।" প্রফুল্লর ডাকনাম ফুলু। দুই বৎসর বয়সের সময় প্রফুল্ল পিতাকে হারায়। মনোযোগী ছাত্র। লেখাপড়া

করে, কিন্তু তার চাইতেও বেশি আকর্ষণ খেলাধুলা ও ব্যায়ামে।

১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সময় রংপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রফুল্ল। ঐ সময়ই সে পড়াশুনায় ইস্তফা দেয়। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে সেও ঝাঁপ দিল।

নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়ামে যৌবনের প্রারম্ভেই প্রফুল্লর দেহে যেন শক্তির জোয়ার এসেছিল। উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষপট, আজানুলম্বিত বাহু নির্মল দৃঢ় মুখশ্রী।

রংপুরের স্বনামখ্যাত দেশকর্মী ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র প্রফুল্ল ও সুরেশ চক্রবর্তী প্রফুল্লর সহধ্যায়ী। রংপুরে যে বিপ্লব সমিতি গড়ে ওঠে স্থানীয় তরুণদের নিয়ে, প্রফুল্ল ও সুরেশ তার মধ্যে অন্যতম ছিল। পরে ঐ সমিতির কেউ কেউ যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। প্রফুল্ল চাকীর বৈপ্লবিক সতীর্থ প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বোমা বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যু হয়। বারীন্দ্র ঘোষেদের নির্মিত প্রথম বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে আচম্‌কা বিস্ফোরণ হয়।

প্রফুল্লর ভগিনীপতি অমর নন্দী বলেন: আজও সেই উজ্জ্বল মুখখানা মনে ভেসে ওঠে। বেশী কথা বলত না; কোন কথা জানতে চাইলেই একটু হাসত। মিষ্টি হাসি, বড় ভাল লাগত হাসিটি তার।

গুপ্ত বিপ্লবী চক্রের তিনজন নেতার আদেশে মজঃফরপুরের দায়রা জজ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে প্রফুল্ল মজঃফরপুর যায়।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র দত্ত লিখলেন: আমি প্রফুল্লকে ম্যাট্‌সিনির আত্মজীবনী পড়িতে দিয়াছিলাম।

রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে প্রফুল্ল একজন ছিল।

কতই বা বয়স হবে, সতের কি আঠারো বছর বয়স হয়ত তখন, রংপুর আগড়ার সবচাইতে সেরা ছেলে, লোহার মত শরীর।

অকস্মাৎ একদিন প্রফুল্ল গৃহত্যাগ করে চলে গেল: দেশের ডাক যার ভরে বেজেছে, ঘরের মায়া তাকে কি পিছুটান দিয়ে ধরে রাখতে পারে।

সহস্র বান্ধব মাঝেও যে সে একাকী!

১৯০৬ সালের মাঝামাঝি, পূর্ববঙ্গ-আসামের কুখ্যাত অত্যাচারী লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলারে নাম বিপ্লবী সমিতির খাতায় ওঠে: তাকে হত্যার প্রচেষ্টা হয়: বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার এলেন রংপুরে, তাঁর চোখে পড়ল ১৪/১৫ বৎসরের একটি কিশোর। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র।

সবুজ অগ্নিশিখার মত উদ্ধত জ্বালাময়ী।

আপনার তেজে দীপ্তিমান।

প্রফুল্লর সহপাঠী আরো দু'টি কিশোর ছিল সেদিন, পরেশচন্দ্র মৌলিক ও নলিনীকান্ত গুপ্ত।

কিছু অর্থের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কোথা হ'তে আসবে সেই প্রয়োজনীয় অর্থ।

পরামর্শ করে স্থির হলো: ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে নরেন গোঁসাই, হেমচন্দ্র কানুনগো, প্রফুল্ল ও পরেশ ডাকাতি করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে ব্যর্থ হলো ফুলার বধের প্রচেষ্টাও।

১৯০৭ সাল।

ঘরের বাঁধন কেটে গেল দেশের ডাকে।

প্রফুল্ল কলকাতায় মুরারীপুকুরের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে এসে নাম লেখাল আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত দেশের জন্য।

অলক্ষ্যে দেশজননী তরুণ কিশোরের ভালে এঁকে দিলেন রক্ততিলক।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

দাদার মনে চিন্তা, প্রফুল্ল হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যায়।

মাস্টারের কথাগুলো শুনলে সত্যিই বুক কাঁপে: যদি সত্যিই শোন কোন দিন আমাদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে দুঃখ করো না দিদি, আর ফেলো না খানিকটা চোখের জল, কারণ জেনো দেশের জন্য আমাদের সামান্য প্রাণ দেওয়াটা প্রয়োজন ছিল, এর চাইতে বেশী কিছুই নয়!

তাহলে সত্যিই তোমরা বিপ্লবীদের দলে নাম লিখিয়েছো মাস্টার!

মাস্টার কোন কথা বলে না, কেবল মৃদু মৃদু হাসে।

কিন্তু কেন এ ভয়ানক কাজে নাম লেখালে মাস্টার!

সময় যদি পাই কোনদিন দিদি, এ প্রশ্নের জবাব তোমায় সেদিন দেবো, কিন্তু আজ নয়। দেশকে ভালবাসার নাম যদি বিপ্লব হয়, তাহলে বলবো এত বড় অন্যায় জোরজবরদস্তি ইহসংসারে আর নেই।

কিন্তু তোমাদের এ মুষ্টিমেয়র প্রচেষ্টা অত বড় শক্তিশালী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে কতটুকু মাস্টার!

সংখ্যা দিয়েই সব-কিছুর বিচার হয় না দিদি। তাহলে কুরুক্ষেত্র রণে অক্ষৌহিণী সৈন্য পেয়েও কৌরবের পরাজয় ঘটত না। ধর্মযুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী।

আজ না হয় কাল, না হয় পঞ্চাশ বছর পরে আমরা জয়ী হবোই, সেদিন হয়ত আমরা অনেকেই বেঁচে থাকবো না, কিন্তু যারা থাকবে সেদিন, তাদের অনাগত আনন্দই তো আজকের আমাদের পুরস্কার। তাছাড়া তুমি তো গীতা পড়েছো দিদি: মা ফলেষু কদাচন। কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের পরিচয়।

* * *

কত দিন চলে গেল, নীলাঞ্জন সেই যে ঝড়জলের রাত্রে ঘর ছেড়ে চলে গেল, আর এল না। তারপর?...

* * *

হ্যাঁ। তারপর শুরু হলো সেই মরণ-জয়ী তরুণ কিশোরের বিচার, ইংরাজের

আদালতে। যে দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে আজ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে চলেছে, আজ তাকে সমর্থন করতে একমাত্র স্থানীয় উকিল কালিদাসবাবু ছাড়া আর কেউ এগিয়ে এল না. পরে এসেছিলেন সতীশ চক্রবর্তী।

নির্ভীক কিশোর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। যা কিছু তার বলবার সবই তো সে অকপটে বলেছে এবং বিচারের যা ফলাফল হবে, তা তো জানতে কারো সন্দেহ মাত্র নেই, তবু এ প্রহসন কেন?

'অত্যাচারীর শাস্তিবিধান করতে গিয়েই আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই দায়রা জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে। এর পশ্চাতে কারো প্ররোচনাই ছিল না। দীনেশের সঙ্গে আমার পরিচয় 'যুগান্তর, অফিসে। আমরা দু'জনে একত্রে মজঃফরপুর আসি। সঙ্গে একটি গ্লাডস্টোন ব্যাগে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে 'বোমা'টিও ছিল।'

মুক্তিসেনার অকুণ্ঠ জবানবন্দী।

* * *

বিচারপতি উঠে দাঁড়ালেন: ব্রিটিশ রচিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা, অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধের ধারা। তাই তিনি এবার পাঠ করে শোনাতে চান ক্ষুদিরামকে।

তুমি এ অপরাধ করেছো কি?

হ্যাঁ, এ কাজ আমি করেছি।

বিস্ময়ে স্তব্ধ বিচারপতি এবং নির্বাক উপস্থিত ছিল যারা সেদিন সেই বিচারশালায় সকলেই।

ক্ষুদিরাম, তোমার কাউকে কি দেখতে ইচ্ছা করে?

হ্যাঁ, শেষবারের মত আমার জন্মভূমি মেদিনীপুরকে দেখতে ও আমার দিদি আর তার ছেলেমেয়েদের দেখতে ইচ্ছা হয়।

তোমার মনে কোন রকম দুঃখ আছে?

না, কোন দুঃখ নেই।

কোন রকম ভয় লাগছে কি?

ভয়!……নির্ভীক কিশোর হাসে।

বিচার হয়ে গেল: মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

ক্ষুদিরামের দিদি অপরূপা দেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়: ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ সালে যখন রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটছে, তখন হলো ক্ষুদিরামের ফাঁসী মজঃফরপুর কারাগারে।

আমি কাঁদতে পারিনি, দেশের লোক হায় হায় করে উঠ্‌লো।……

অপরূপা দেবীর লেখনি বার বার থেমে যায়। বৃদ্ধার ছানি-পড়া চোখের দৃষ্টি স্মৃতির অশ্রু বিথারে ঝাপসা হয়ে যায়। তিনি তবু লিখে যান: কলকাতা বাংলা, সারা ভারতে শুরু হলো বোমা পিস্তলের যুগ…মাত্র অল্প কয়েকটা বছর। মেলব্যাগ লুঠের পর যখন প্রথম টের পেলাম, ঝাঁকড়া চুল, পায়ে লোহার বেড়ী পড়া, সেই মা-মরা ছেলে চিরকালের জন্য ক্রমশঃ আমার নাগালের বাইরে

চলে যাচ্ছে—তখন থেকেই অস্পষ্ট ভয়ে লক্ষ্য করে চলেছি তার গতিবিধি। খোঁজ করেছি রাজ্যের উৎকণ্ঠা নিয়ে। ভুলিনি সে-কথা, ক্ষুদিরাম বলেছিল : আগুনেই তার বুকের আগুন নিভবে। হয় ইংরাজের চিতার আগুনে, না হয় তার নিজের চিতার আগুনে।

* * *

শবদেহ বহন করে নিয়ে চলেছেন কালিদাসবাবু ও আরো জনাকয়েক।

পথের দু'ধারে সারা শহর যেন ভেঙে পড়েছে আজ।

গণ্ডকের তীরে চিতাশয্যা রচিত হলো।

জ্বলে উঠ্‌লো আগুন।

অভিমানী কিশোর তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে নিজের চিতার আগুনেই নিজের বুকের আগুন নিভিয়ে।

বাতাসে ছড়িয়ে গেল সেই চিতা-ভস্ম বাংলার দিক হ'তে দিকে।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত : যার শেষ নেই, যার সমাপ্তি নেই।

তাই তো আজিও উদাসী বৈরাগীর কণ্ঠে সেই চিতাভস্মের আভাস পাই :

হাসি হাসি পরবো ফাঁসী
দেখবে ভারতবাসী!

ক্ষুদিরাম, কে বলে ইংরাজের ফাঁসীর দড়িতে তোমার মৃত্যু ঘটেছে? কে বলে তোমার দেহ গণ্ডকের তীরে চিতাভস্মে লীন হয়ে গিয়েছে?

আত্মার মৃত্যু কোথায়?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ

তাই তো স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার খুলে রেখেছি আজিও, আবার একদিন বসন্ত বাতাসে তোমার আহ্বান সঙ্গীত ভেসে আসবে আমাদের ঘরে ঘরে, যেদিন শুভ-শঙ্খ-নিনাদে দিকে দিকে ঘোষিত হবে স্বাধীন ভারতে, যারা তোমারই মত ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান, তাদেরই জীবন দেওয়ার কাহিনী।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ বদ্‌লেছে : সম্মুখ-যুদ্ধে কামান গোলাগুলি দিয়ে—১৮৫৭ হতে গুপ্ত সংগ্রাম, ১৯০৬-এ বোমা পিস্তলে এবং তারও পরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে এবং ক্রমে ১৯৪২-য়ের অগ্ন্যুৎসবে।

কিন্তু আজিকার এই স্বাধীনতার ক্ষণে যারা সকলে স্মৃতির পটে বার বার ঝিলিক জাগিয়ে যায়, তাদের তো কই ভুলতে পারি নে।

তাই তো প্রণাম জানাই যারা আমাদের আগে গিয়েছেন তাদেরই বার বার।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর প্রাণদান : অসঙ্কোচে পরম নির্ভীকতার সঙ্গে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ শঙ্কিত করে তোলে ফিরিঙ্গী প্রভুদের।

তারা এবার স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে হোমানল হ'তে সহসা ঐ ক'টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হলো, সে শুধু ভয়ঙ্করই নয়, মৃত্যুর মতই অমোঘ।

অচিরে সেই হোমানলকে নির্বাপিত না করতে পারলে তাদের এতদিনকার কায়েমী রাজত্বের বনিয়াদ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

অতএব আগুন নিভাও।

মহাসত্যের ইঙ্গিত মাত্র ঐ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী।

মাংসাশী শকুনি পক্ষবিস্তার করেছে নীল নভোতলে: ধারালো বাঁকা নখর, রক্তলোলুপ।

ভারতের শস্যশ্যামলা মাটিতে পড়েছে তার কুৎসিত ছায়া।

ইনাম ও রুপেয়ার লোভে একদল ঘৃণ্য পশু অন্ধকারে ছদ্মবেশে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফিরছে: মীরজাফর, মীরজাফরের বংশধরেরা, যারা বার বার জাতীয় জীবনে এনেছে অভিশাপ, কলঙ্ক, বেদনা, গ্লানি।

এরা কোন দেশের, কোন জাতির বা কোন বিশেষ কালের নয়। এদের মন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতার মন্ত্র! বিশ্বাসের বুকে ছুরি হানাই এদের ধর্ম!

যুগে যুগে এরাই মানবধর্ম সভ্যতা ও সত্যকে করেছে কলুষিত।

মানবাত্মাকে করেছে অপমানিত।

সিরাজ হ'তে শুরু করে মহারাজ নন্দকুমার, মঙ্গল পাঁড়ে, তাঁতিয়া তোপি, প্রফুল্ল চাকী, কানাই, সত্যেন প্রভৃতি এবং পরবর্তীকালে আরো অনেকের বুকের রক্তে ও প্রাণদানে এদের স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে আরো স্পষ্ট হয়ে।

কিন্তু কই তবু তো ঘুম ভাঙেনি, চেতনা হয়নি।

এদের কি কোন দিনই আমরা চিনবো না। এ রক্তবীজের বংশধরের কি মৃত্যু নেই! চিরদিনই কি এরা পৃথিবীর হাওয়া কলুষিত করবে বিষবাষ্পে। মানুষের সহজ চলার পথকে করবে ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল।

যাই আবার বিপ্লবীদের সাধনকক্ষে ফিরে যাই, যেখানে দলে দলে কিশোর, তরুণ যুবকেরা এসে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে: মাগো তোর শিকল ছিঁড়ে ফেলবো আমরা আবার।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি তো মেষ!

* * *

দেবী আমার, সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

সেই ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বরোদার উচ্চ বেতনের কাজ ছেড়ে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রী হয়ে বাংলার রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে এসে উদয় হয়েছিলেন, বিপ্লববাদের তদানীন্তন অবিসম্বাদী ভাবী নেতা তিলকের সহকর্মী শ্রীঅরবিন্দ।

জাতীয় শিক্ষা তো ফিরিঙ্গীদের চোখে ধূলিনিক্ষেপ মাত্র, ফল্গুধারার মত তখন দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে চলেছে জীবন দানের সাধনা।

১৯০৫ সনে শ্রীঅরবিন্দ লিখিত "ভবানী মন্দির" দিলে মৃত্যু সাধনার প্রথম ইঙ্গিত। আসন্ন প্রলয়, ঝটিকার পূর্বাভাস। মহারণ্যের বুকে অরণি সঙ্ঘাত-সঞ্জাত বনানীর লক্ষ লোল জিহ্বার প্রথম স্ফুলিঙ্গ।

মরা গাঙ্গে এলো জোয়ার: ফুলার বধের প্রচেষ্টা, 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্'

প্রকাশ, ঢাকুরিয়ার ও পরে মানিকতলা-বাঘমারীর বাগানে বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠা।

লোকচক্ষুর অন্তরালে সেদিনের সে সাধনা, সর্বপ্রথম প্রকাশ পেলে জনান্তিকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর হস্তনিক্ষিপ্ত বোমার অগ্নিঝলকে।

* * *

মানিকতলার বাগান। একদল তরুণ যুবক সেখানে থাকে।

কারও হাতেই একটি পয়সাও নেই, ঘর-ছাড়ার দল, দু'বেলা দু'মুঠো ভাতেই সবে সন্তুষ্ট। দলপতি বারীন আবার ঘোর ব্রহ্মচারী। জীর্ণশীর্ণ কংকালসার দেহ, প্রশস্ত কপাল, দীর্ঘায়িত টানা টানা দু'টি চক্ষুতারকা, গভীর অতলস্পর্শী দৃষ্টি, স্বপ্ন দেখে। দীর্ঘ উন্নত মোটা নাসা। কল্পনা ও ভাবের আবেগে যাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করে, জানে এও হয়তো তাদেরই একজন।

অদ্ভুত ছেলে ঐ বারীন! কঠিন অংকশাস্ত্রকে কিছুতেই যখন করায়ত্ত করা গেল না, কলেজের গেট দিয়ে বের হয়ে এল মা সরস্বতীর পায়ে প্রণাম জানিয়ে।

কবিতা লেখে, যন্ত্রের তারে তারে তোলে সুর-ঝংকার; কখনো চায়ের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করে, কখনো অন্য কাজে দিয়েছে ডুব।

অথচ অর্থশালী পিতার সন্তান। অর্থের তো কোন অভাবই নেই।

সামান্য পুঁজি পঞ্চাশটি মাত্র টাকা সম্বল করে এসেছিল 'যুগান্তর' কাগজ চালাতে। ঘরছাড়া ছেলে উপেন্দ্রর সঙ্গে দেখা যুগান্তর অফিসে। কত আশার কথা।

এ তুমি দেখে নিও উপেন, দশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবেই।

এত বড় সুযোগে কি ছাড়া যায়, উপেনও পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে এসে দলে ভিড়ে যায়।

শুধু উপেন কেন, মানিকতলার বাগানবাড়ীতে একে একে অনেকেই এসে জুটেছে—হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, আরো অনেকে।

দেশের স্বাধীনতা চায় ওরা। দেশকে স্বাধীন করবে আবার। মৃত্যুর শংকা পর্যন্ত নেই।

রুদ্র বৈশাখ। প্রচণ্ড তাপে পৃথিবী যেন ঝলসে যায়।

রাত্রে ছেলেরা সব অন্নের থালা নিয়ে আহারে বসেছে। নিজ হাতে তৈরী অন্নব্যঞ্জন।

বাইরে জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল। ওদেরই এক চেনা বন্ধু ঘরে এসে প্রবেশ করল।

ওরা সকলে একসঙ্গে মুখ তুলে তাকায়: ব্যাপার কি হে, এই অসময়ে!

দুঃসংবাদ আছে ভাই, খবর পেলাম শীঘ্রই তোমাদের এ বাগানে পুলিস খানাতল্লাসী করতে আসবে। বোমার বিস্ফোরণে নিরীহ কেনেডি পরিবার ভুলক্রমে নিহত হওয়ায় এবং ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর দুঃসাহসিকতায় ব্রিটিশ প্রভুর টনক নড়েছে।

ধরপাকড়, খানাতল্লাস, কারাদণ্ড: সরকারী নিষ্পেষণ শুরু হয়েছে দিকে

দিকে।

তোমরা এক কাজ করো, বাগান ছেড়ে কয়েকদিন তোমরা না হয় অন্যত্র গা-ঢাকা দিয়ে থাক।

ক্ষেপেছো, এই রাত্রে! ঠ্যাং ধরে টেনে বাগান হ'তে বের না করে দেওয়া পর্যন্ত পাদমেকং ন গচ্ছামি। একজন বলে ওঠে।

*   *   *

গ্রীষ্মরাত্রি শেষ হয়ে এল। পূর্বাকাশে আসন্ন প্রত্যূষের রক্তরাঙা ইশারা। শুধুই কি তাই! অগ্নিযুগের রাত্রি প্রভাত হচ্ছে। ক্ষুদিরামের হস্ত-নিক্ষিপ্ত বোমার আগুনে তাই আকাশ লাল।

প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের বুকের রক্তের এ অরুণিমা।

সিঁড়িতে অনেকগুলো ভারি বুটজুতোর মচ্ মচ্ শব্দ শোনা গেল।

একটু পরেই বন্ধ দুয়ারে করাঘাত : Open the door!

সেই রোগা ছেলেটি উঠে দরজা খুলে দেয়।

অপরিচিত ভারী বিদেশী কণ্ঠে প্রশ্ন এলো : Your name ?

Barindra Kumar Ghosh.

বাঁধো ইস্‌কো!

শুরু হলো খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার। একে একে সবাই বন্দী হয়। নীচের আমবাগানে নিয়ে গিয়ে সব জড়ো করে।

তছনছ হচ্ছে বাগানবাড়ী। কয়েকটি বোমা ও আগ্নেয় অস্ত্রও মাটি খুঁড়ে বের হলো।

ওদিকে ঐ রাত্রেই গ্রে স্টীটের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শকুনির দল আকাশ ছেয়ে ফেলল। তীক্ষ্ন নখরাঘাতে সব ছিন্নভিন্ন করে দেবে। বাংলা দেশের উপর দিয়ে যেন এক ঝড় বয়ে যায় শকুনির পক্ষ চালনায়।

অনেকেই গ্রেপ্তার হলো। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র, হৃষিকেশ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পূর্ণ সেন এবং আরো অনেকে। শেষে চৌত্রিশজনের বিরুদ্ধে শুরু হলো রাজদ্রোহের মামলা।

সেই সঙ্গে এলো কানাইলাল, সত্যেন্দ্র, আর ভিড়ের মধ্যে ছিল মীরজাফরের বংশধর বিখ্যাত শ্রীরামপুরের গোঁসাইবাড়ীর একটি সুদর্শন ছেলে নরেন গোঁসাই।

বিচার তো শুরু হলো হৈ হৈ করে। কিন্তু যাদের বিচার হবে, তাদের যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। একান্ত বেপরোয়া নির্বিকার।

হৈ-চৈ করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চারিদিক উচ্চকিত করে কোর্টে আসে সব, আবার বিকালে সব ফিরে যায় কারাগারে। কারাগার তো নয়, এ যেন ওদেরই ঘরবাড়ী।

শ্রীঅরবিন্দ একপাশে চুপটি করে বসে থাকেন, ছেলেদের হট্টোগোল বাঁচিয়ে।

ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের ইশারা। ওরে বেভুল! এ পথ তোর নয়।

যমুনা-পুলিনে বাঁশরী বাজে, শ্রীরাধা উন্মনা হয়ে ওঠেন। মৃন্ময়ী মা চোখের ওপরে ভেসে ওঠেন চিন্ময়ী রূপে। এই গোলযোগের মধ্যে হঠাৎ ওদের কানে এলো এক দুঃসংবাদ।

ওদেরই দলের একটি ছেলে নরেন নাকি রাজসাক্ষী হয়ে স্বীকৃতি দেবে বলেছে।

সর্বনাশ! এ আবার কি?

চঞ্চল হয়ে ওঠে অনেকেই, শান্তিসাগরে অশান্তির ঝড় জাগে। ঢেউ উঠছে—পড়ছে—ভাঙছে!

রোগা সাধারণ চেহারার একটি ছেলে, কথা বলে খুবই কম। ভাসা ভাসা দুটি চোখ। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নিরীহ শান্ত চন্দননগরের ছেলেটি, কবে কোন্ ফাঁকে এসে এই দলে ভিড়েছিল কেউ হয়ত তেমন নজরও দেয়নি।

এমনিই হয়। সে বলে: দেশ মুক্ত হোক, আর না হোক, আমি হবো।

সত্যিই তো! তোমায় বাঁধবে কে? তুমি যে চিরবন্ধনহীন, তখন তো বুঝিনি সেদিন!

নরেনের ব্যাপার শুনে কানাইও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল হয়ত কিছুক্ষণের জন্য।

কিন্তু আশ্বাশের বাণী হয়ত ভেসে এসেছিল অলক্ষ্যে: ওঠো বীর জাগো! এ অন্যায়ের কণ্ঠ চেপে ধর! কে—কে তুমি?

আমায় চেনো না বন্ধু, আমি ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম! বন্ধু, আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলাম।

ওদিকে চন্দননগরের এক গৃহে একটি বিধবা মহিলা এ সংবাদ শুনে আক্ষেপ করছেন, কেউ কি এমন নেই, এই দুরাত্মাকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়?

জননী ব্রজেশ্বরী! তুমি কি জানতে না মা, তোমারই নাড়ী ছেঁড়া ধন কানাই, তোমার মনের আশাকে পূরণ করতে অলক্ষ্যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। শয়তানে বাঁধবে যে গোকুলে বাড়ছে সে।

* * *

সত্যেনের শরীর ভাল নয়, সে হাসপাতালে, জেলের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন সকালে সবাই শুনলে, কানাইয়েরও শরীরটা খারাপ লাগছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কানাই হাসপাতালে চলে গেল।

> রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
> রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
> রক্তবর্ণ ডালি রক্তিম অঞ্জলি
> বীর রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকার মুক্তির বেদনায় যাদের অশ্রু কেঁদেছিল এবং যারা

সেই মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে অবহেলে হাসিমুখে দিয়ে গেল প্রাণ, এমন বীর সৈনিকদের মধ্যে যাদের আমরা কোনদিনই ভুলতে পারবো না, আজ এই স্মরণিকার পাতায় পাতায় তাদেরই ছবি বার বার ফুটে উঠছে : ক্ষুদিরাম, কানাই, প্রফুল্ল, সত্যেন—এদের বুঝি তুলনা নেই ! এদের মধ্যেও সবার চাইতে বেশী মনে পড়ে, কানাই আর ক্ষুদিরাম !

ক্ষুদিরাম সেই মাত্র উনিশ বছরের তরুণ কিশোর, আজিও পুণ্যতোয়া গণ্ডকের তীরে যার চিতাভস্ম বায়ুভরে ভারতের দিক হ'তে দিগন্তে উড়ে উড়ে যায় অলক্ষ্যে স্মৃতির নীল নভোতলে। যার পুণ্যস্মৃতির সুরভিবিথার আজিও বাংলার উদাসী বাউলের একতারায় ও কণ্ঠে কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে চলেছে এবং বহু জনবিপ্লবীর ঊর্ধ্বে যার আসনটি পাতা রইলো চিরদিনের চিরকালের জন্য, তারই পাশে দেখি আমাদের কানাইকে যেন।

মনে পড়ছে কংসের অন্ধকার কারাগৃহের এক ক্ষুদ্র কক্ষে দেবকীর গর্ভে এক মহাবীর্যবান পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন ; কংসের অত্যাচারে জর্জরিত পৃথিবীকে রক্ষা করতে।

আজিও আমরা সেই পুণ্য দিনটিকে ভক্তিনতচিত্তে স্মরণ করি : জন্মাষ্টমী।

১৮৮৭র ১০ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন, বহুবর্ষ পরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে চন্দননগরের এক অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে জননী ব্রজেশ্বরীর কোল জুড়ে জন্ম নিল এক শিশু। অনাগত বিপ্লবের বহ্নিস্ফুলিঙ্গ—যে স্ফুলিঙ্গ কিছুকাল ধরে অন্যের দৃষ্টির অগোচরে থেকে ১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর প্রজ্বলিত মহাগ্নিশিখায় আত্মপ্রকাশ করে, চির অনির্বাণ, চির ভাস্বর হয়ে গেল ২রা নভেম্বর।

১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর : আলিপুর জেল হাসপাতাল।

রাজপক্ষের সাক্ষী নরেন গোঁসাই, আজ হয়ত অনেক গোপনীয় কথাই আদালতে প্রকাশ করবে। অতএব সত্যেন মন স্থির করে ফেললে : যেমন করেই হোক সাক্ষী দেওয়ার আগেই নরেনকে শেষ করতে হবে। মারণ অস্ত্রও পেঁছে গিয়েছে।

কানাই চুপি চুপি বলে : আমিও তোমার সাথী হবো।

সত্যেন প্রথমে রাজী হন না, কিন্তু পরে কানাইয়ের পীড়াপীড়িতে মত দেন।

ঠিক হলো প্রথমে সত্যেন মারবেন, এবং তিনি ব্যর্থ হলে, কানাই।

জেল হাসপাতালে দোতলার ওপর সিঁড়ির পাশে সত্যেন চুপটি করে বসে আছে নরেনের প্রতীক্ষায়, উদ্বেলিত হৃদয়ে।

আর কানাই একটা দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে জেল হাসপাতালের ডিসপেনসারির পাশে সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছে অন্যমনা। নরেন এলো, সঙ্গে দু'জন য়ুরোপিয়ান কয়েদী গার্ড।

সত্যেনের সঙ্গে আজকাল ওর খুব ভাব, সত্যেন ওকে আশ্বাস দিয়েছে, এ ঝামেলা আমার পোষাবে না, আমিও ভাই তোমার মত রাজসাক্ষী হবো।

তাই প্রত্যহই হচ্ছে দু'জনে কত শলা-পরামর্শ। আজও নরেন এসেছে সত্যেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

আচম্‌কা যেন মেঘাবৃত আকাশে দামিনী ঝলক দেখা দিল: বুকের সামনে উদ্যত পিস্তল সত্যেনের হস্তধৃত!

ট্রিগারের শব্দ উঠলো খুট্‌ করে, কিন্তু ও কি কার্তুজ তো আগুন দিল না!

ব্যর্থ হলো সত্যেনের প্রচেষ্টা। কিন্তু পালাবে কোথায় শয়তান বিশ্বসাঘাতক!

বাঘের মত লাফিয়ে এল কানাইলাল। প্রাণভয়ে পাগলের মত ছুটছে নরেন, এক এক লাফে একটার পর একটা সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে।

দুম্‌ দুম্‌ দুড়ুম্‌!......

সচকিত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সমগ্র জেলটি। ঢং ঢং ঢং পাগলাঘণ্টি বেজে চলে মুহুর্মুহু!...

দে দোল দোল! দে দোল! বাসুকী স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

১৮৮৭র জন্মাষ্টমী তিথির আজ ব্রত উদ্‌যাপন হলো ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৮য়ে।

বিশ্বাসঘাতক তার পাপের মাশুল মিটিয়েছে কড়ায় গণ্ডায়: অসাড় নিঃস্পন্দ, গোঁসাই বংশের কলঙ্কই শুধু নয়, দেশের ও জাতির কলঙ্ক নরেন গোঁসাই, অগ্নিযুগের মীরজাফরের স্বপ্ন-সাধ মিটেছে।

কানাই ও সত্যেনকে হাসপাতাল হ'তে ৪৪ ডিগ্রীর দিকে নিয়ে গেল।

মরণজয়ীদের বিচার শুরু হলো।

তুমি দোষী কি নির্দোষ।

I decline to plead not guilty! নরেনকে আমিই খুন করিয়াছি। সত্যেন এ ব্যাপারে কোনরূপেই লিপ্ত ছিল না, যদিও সে সেখানে ছিল।

Revolverটি কোথায় পেলে?

কোথায় পেয়েছি? মৃদু হাসি ওষ্ঠের পরে: ক্ষুদিরামের আত্মা আমাকে ওটি দিয়ে গিয়েছে।

জজ সাহেবের রায় ঘোষিত হলো: কানাই ও সত্যেনের মৃত্যুদণ্ড!

* * *

একটি দু'টি করে দিন, মাস, বৎসর চলে গেল। কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শরৎ, কত হেমন্ত, কত শীত এলো গেল।

পুরাতন পৃথিবী, একঘেয়ে পৃথিবী, ঘুরে চলেছে তেমনি তার চির চেনা চক্রপথে।

দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে আকাশ যেন পুড়ে একেবারে খাক্‌ হয়ে যাচ্ছে।

সূর্য মধ্যগগনে: নীল নভোতল যেন সূর্যকিরণে চোখে ধাঁধা লাগায়।

হিরণ্ময়ীর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

মাস্টার একবার আড় চোখে দেখ্‌লে: কাঁদুক! বাধা দিয়ে লাভ কি!

মাস্টার বাইরের দিকে তাকায় খোলা জানালাপথে: ধু ধু করছে একটা খোলা মাঠ। গত যুদ্ধের সময় সৈন্যদল ওখানে অসংখ্য টেম্পোরারী শেড্‌ তুলে সৈন্যনিবাস তৈরী করেছিল। দিবারাত্র নাকি ঐ সামনের রাস্তাটা কাঁপিয়ে বড়

বড় লরি ছুটতো, উড়তো ধুলো। সে কি শব্দ। যুদ্ধ থেমে গেছে আজ, প্রয়োজনও ফুরিয়েছে ভারতে, চলে গিয়েছে তারা।

এখানে এবারে নতুন বসতি হবে, তারই তোড়জোড় চলেছে। ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়াটা!

হলুদ ধোঁয়ার মত রৌদ্র, মাথাটার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। গ্রীষ্ম হাওয়ায় ঘুম ঘুম পায়ঃ দু'চোখের পাতা বুজে আসে।

অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলোর শিখা। আলোর শিখাটা কাঁপছে থির্‌থির্‌ করে। অস্পষ্ট আবছা এক নারীমূর্তি! শুভ্র থান পরিধানে, কারাকক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছেঃ কে? জননী ব্রজেশ্বরী না?

ধীর অকম্পিত পদবিক্ষেপে ব্রজেশ্বরী একটি অন্ধকার কারাকক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। একটি তরুণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে গীতাপাঠ করে চলেছে।

কানাই।

কে,…মা?

তোকে একবার দেখতে এলাম বাবা!

আমার জন্য কিছু ভেবো না মা। আমি বেশ আছি।

তোর কি খেতে ইচ্ছা হয়, বল্‌ তো বাবা?

যা দরকার সব-কিছুই তো পাচ্ছি মা, আর তো আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই।

* * *

চোখের ওপরে যেন স্বপ্নের মত ছবি ভেসে উঠ্‌ছে। রাত্রি শেষ হয়ে এল। পূর্বাচলে উষার রক্তিম রাগ। নগ্নপদে কারা ঐ নিঃশব্দে গঙ্গার ধারে জেলখানায় ছোট্ট যে দুয়ারটা দিয়ে মেথররা যাতায়াত করে সেখানে এসে দাঁড়াল।

গঙ্গায় বোধ হয় জোয়ার এলঃ কল কল ছল ছল শব্দভঙ্গ।

শুকতারাটা এখনও আকাশের এক প্রান্তে জ্বলজ্বল করছে, নেভেনি!

সহসা শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-বাতাস আকুল হয়ে ওঠেঃ আজ যে ৮ই নভেম্বর। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত শীত করে।

ওদিকে তখন জেলের মধ্যেঃ প্রহরী ছোট্ট একটি কামরার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রস্তুত!

হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

মর্ত্যলোক হ'তে সে ধ্বনি সঙ্গীতের মূর্ছনার মত মহাশূন্যপথে ভেসে গেল বুঝি অদৃশ্য কোন সুরলোকেঃ হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত!

হোমাগ্নির শিখার মত ঊর্ধ্বে উঠছে যেন ওঙ্কারধ্বনিঃ আমি প্রস্তুত!

কতকাল চলে গেল, আজিও কি প্রস্তুতির শেষ হলো নাঃ ভারতের মাটিতে বিদ্রোহের এ প্রস্তুতি কি কোন দিনই শেষ হবে না! ভারত কি চিরদিন এমনি বিপ্লবের পথেই চলবে!

রাত্রির শেষ! আলো ছায়ায় অপূর্ব এক জ্যোতি-শিখা!

জানি না ভগবান, তুমি সত্যিই আছো কিনা? তোমায় দেখিনি, তোমায়

জানি না। যে শুচি ও নির্বিকল্প শান্তির মধ্যে তুমি ধরা দেও, তারও হদিস পাইনি কোন দিন। কেবল শুনেছি সেই মহামানবদের জীবনী প্রসঙ্গে, যারা তোমায় উপলব্ধি করতে পেরেছে, যারা আস্বাদন পেয়েছে তোমার সত্য সুন্দর স্বর্গীয় আনন্দানুভূতির তারাই নাকি সত্যিকারের অমৃতের পুত্র!

আজ এই রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে, নির্জন ভাগীরথীতীরে যাকে আমরা বুক পেতে নিতে এসেছি, তখনও তো জানি না সেও পেয়েছিল অমৃতের সন্ধান!

অমৃতের পুত্র!

ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গলিপথে ধরাধরি ক'রে বয়ে নিয়ে এল বস্ত্রাবৃত একখানি দেহ। নিঃশব্দে চুপে চুপে।

অশ্রু দৃষ্টিকে ঝাপ্‌সা করে দিও না: এ স্বর্গীয় দৃশ্যের অধিকারী হ'তে দাও ক্ষণেকের তরে। নিঃশব্দে শবদেহটিকে বহন করে এনে তুলে দেওয়া হলো শ্মশানযাত্রীদের হাতে। এই নাও তোমাদের, কানাইলাল!

মুখের ওপর হ'তে আচ্ছাদন অপসারিত হলো: আহা! যেন এক স্তবক প্রফুল্ল কমল। চিন্তা নেই, বিষাদের ছায়ামাত্র নেই, নেই এতটুকু চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র আভাস।

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান! জীবন ও মৃত্যুর অপূর্ব সন্ধি! ভগবান অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে সেই অনন্ত ভগবানের লীলাও বুঝি অনন্ত।

Long live Kanailal!

নিঃশব্দে শ্মশানযাত্রীরা শবদেহ বহন করে এগিয়ে চলেছে: কানাইয়ের অগ্রজ আশুবাবু, বন্ধু মতিলাল রায়।

আশুবাবুর কানে সেই ইউরোপীয় ওয়ার্ডারের কথাটি যেন এখনও ঝম্‌ ঝম্‌ করে বাজছে! বিদেশী সে, তবু সে জানে দিতে সৈনিকের সম্মান: He is a wonderful chap!

আর মতিলাল ভাবছেন, কানাইয়ের সেই কথাগুলি: মনে করো না জেলে পচবার জন্য এই কাজে নেমেছি, আন্দামানে বা ফাঁসীকাষ্ঠে নিরীহ মেষের মত প্রাণ দিতে জন্মেছি। তাই কি কানাইয়ের ফাঁসীর পর একজন ইউরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি এসে বারীনকে জিজ্ঞাসা করেছিল: তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?

সূর্য উঠছে। রক্তাক্ত সূর্য। কানাইয়ের প্রাণের রক্তে রাঙানো ১৯০৮ সনের ১ই নভেম্বরের তিমির রাত্রির অবগুণ্ঠনতলে নব অংশুমালী।

রাজপথের ওপরে যেন আর লোক ধরে না। ঘরে ঘরে বাতায়ন যায় খুলে। শুভ শঙ্খধ্বনিতে আকাশ ও বাতাশ মুহুর্মুহু মথিত হয়।

পুষ্পমাল্য বরিষণ। নিক্ষিপ্ত হচ্ছে মুঠি মুঠি পুষ্প ও অসংখ্য গীতা।

সমস্ত কলকাতা শহর যেন বাধ-ভাঙা বন্যার মত আলোড়িত হয়ে ছুটেছে শবদেহের পিছু পিছু।

* * *

পুষ্পমাল্যে চন্দনকাষ্ঠে সুগন্ধি ঘৃতে বহ্নিমান চিতা।

শোকাশ্রু মোচন করছে হাজারো নরনারী সেই প্রজ্বলিত চিতাপার্শ্বে।

স্মৃতির তাজমহল আমাদের পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে রচিত হলো কানাইয়ের চিতাভস্মে তাই বুঝি।

একটি চিতার আগুন নিভতে না নিভতে দ্বিতীয় চিতার আগুন উঠলো জ্বলে ২৩শে নভেম্বর, শহীদ সত্যেনের নশ্বর দেহ ঘিরে।

Kanai was brave, but Satyen was braver !

বৃটিশসিংহ ভীতত্রস্ত! ভারতের মাটিতে না-জানি কি সর্বনাশার বীজ ছড়িয়ে আছে। ভারতে কায়েমী স্বার্থের লোহার ভিতটা বুঝি নড়ে ওঠে।

কে জানত একটি সাধারণ বাঙালী যুবকের মধ্যে এত বড় প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

অগ্নিযুগের দ্বিতীয় বিপ্লবের, প্রথম শহীদ ক্ষুদিরামের মন্ত্রগুরু সত্যেন্দ্রনাথ!

ভাঙাচোরা স্বাস্থ্য, নিরীহ গোবেচারী গোছের একটি তরুণ, যার সম্পর্কে ডাক্তাররাও সন্দেহ করেছেন, ছেলেটি বুঝি ক্ষয়রোগে ভুগছে। হয়েছিল ক্ষয়-রোগ কিছুদিন। তবু সেই রোগজর্জর দেহ যেন জানত না কোনদিন ক্লান্তি এতটুকুও। নিঃশব্দে ১৯০২ সালে একজন বিপ্লবী নেতার হাতে তার দীক্ষা হয়েছিল মেদিনীপুরের কোন এক নিভৃত গোপন কক্ষে। গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হলো রক্তের স্বাক্ষরে।

সত্যেন আর বারীন কিন্তু মামা আর ভাগ্নে। অনেক সময় মতানৈক্য দেখা দিয়েছে মামা ও ভাগ্নের মধ্যে : তবু দেশকর্মী অচল, অটল। মাঝখানে কিছুদিন কলকাতার গুপ্ত সমিতির মধ্যে কাজ করে, মতানৈক্য সত্যেন আবার ফিরে এলো মেদিনীপুরে। একটি অন্ধকার তেতলা পোড়ো বাড়ি : সমিতির আস্তানা।

সেখানে এসে একে একে জোটে সত্যেনের পাশে ক্ষুদিরাম, শচীন ও নিরাপদ রায়। ছেলে তো নয়, যেন খাপখোলা এক একটি বাঁকা তলোয়ার। প্রদীপ্ত বহ্নি-শিক্ষা। আস্তানায় প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ী কালীমূর্তির চোখ দুটো ঝলমল করে। তোরা আমারই সন্তান।

ঘাত প্রতিঘাত! সমুদ্র বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

অবশেষে সামান্য সন্দেহের অজুহাতে সত্যেন ধরা পড়ে অতর্কিতে।

মেদিনীপুর জেলের মধ্যে বসেই সত্যেন সংবাদ পেল তার প্রিয় শিষ্য ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেছে ১১ই আগস্ট!

দু'বিন্দু অশ্রু হয়ত গড়িয়ে পড়েছিল অলক্ষ্যে দু'চোখের কোল বেয়ে সত্যেনের।

তারপর একদিন সেখান হ'তে তাকে আনা হলো আলীপুর জেলে।

দু'দিন না যেতেই রুগ্ন স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে সত্যেন গেল জেল হাসপাতালে।

আচম্‌কা একদিন তার কানে এলো নরেন গোঁসাইয়ের কুকীর্তি !

বলে কি ? Approver হবে নরেন গোঁসাই !

যে একদা রক্তচন্দনের তিলকে বিপ্লবে দীক্ষা নিয়েছিল, কেমন করে যে সেই নরেন গোঁসাই আবার একদিন নিজের সর্বাঙ্গে কলঙ্ককালি লেপন করে সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির ভালে এঁকে দিলে দুরপনেয় কলঙ্কমসী সেও হয়ত এক রহস্যই ! সে রহস্যের মীমাংসা হলো অল্পদিনের মধ্যেই পিস্তলের অগ্নি-ঝলকে !

দিনের পর দিন আত্মীয়ের চোখের জল, স্ত্রীর অশ্রুসজল মিনতি, নরেনকে হয়ত বিচলিত করেছিল। কিন্তু আরো যারা সেদিন তার দলে ছিল তাদের, কই বিচলিত করতে তো পারেনি এতটুকুও ! তাদের সমগ্র দৃষ্টি জুড়ে কেবল মাত্র একটি কথাই জেগেছিল, স্বদেশ আমার, জননী আমার।

জননী আমার। আমার পরাধীন দেশ-মাতৃকা।

সেখানে স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, নেই কোন বন্ধন, মায়া-মমতার পিছুটান, তাই হয়ত তাদের সকল কিছুর মীমাংসা দেশপ্রেমের মধ্যে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

নির্বিকল্প সন্ন্যাসী দেশপ্রেমের সন্ন্যাসে সর্বত্যাগী !

সত্যেন অস্থির হয়ে ওঠে ঃ এ সর্বনাশ কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না।

নিঃশব্দে গোপনে এল মারণ অস্ত্র ! মৌখিক সৌজন্যের ছদ্মবেশের তলে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়।

এগিয়ে আসছে বিচারের নির্মম অনুশাসন ঃ ১১ই আগস্ট ১৯০৮ সাল।

ইউরোপীয় বন্দী ও দেহরক্ষী হিগিনসকে নিয়ে অন্যান্য দিনের মত নিঃশঙ্ক-চিত্তে নরেন এলো সত্যেনের কাছে। সত্যেন তাকে আশ্বাস দিয়েছে, সেও নরেনের মতই রাজসাক্ষী হবে। রাজসাক্ষী নয়, হতভাগ্যের পাপমুক্তির শেষসাক্ষী !

দুজনে কথা বলছে, সহসা এমন সময় ছোট এতটুকু এক ইস্পাতের নলের ছিদ্র-মুখে ঝলকে ওঠে মৃত্যুর অগ্নি-শিখা। ব্যর্থ হলো সত্যেনের লক্ষ্য ! এলো এগিয়ে ব্রজেশ্বরীর স্নেহের দুলাল কানাই।

*　　　*　　　*

এগিয়ে আসছে ক্রমে সেই চরম দিনটি।

ইংরাজের বিচারে সত্যেনের ফাঁসীর দিনটি ঃ ২১শে নভেম্বর।

কানাই চলে গিয়েছে ঃ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তটে তার চিতাভস্ম আজিও ছড়িয়ে আছে।

২১শে নভেম্বরের সেই প্রভাত এলো। জহ্লাদের বেশে আমরাই বিদেশী রাজার অনুশাসনে আমাদের সত্যেনের গলায় এঁটে দিলাম ফাঁসীর রজ্জুটি ! আমাদের হাত একটুও কাঁপেনি সেদিন !

৭ই নভেম্বর, ৮ই নভেম্বর, ৯ই নভেম্বর।

তিনটি দিনই স্মরণ আছে আমাদের আজিও।

কেন তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর স্যার এনড্রু ফ্রেজারকে যতীন্দ্র চৌধুরী হত্যা

করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, আর যতীন্দ্রকে ধরিয়ে দিল বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব।

মহারাজের তক্তাউস সম্মানিত হয়েছিল নিশ্চয়ই!

ইংরাজ প্রভু পিঠও চাপড়ে দিয়েছিল: বাহবা! জিতা রহো বেটা!

পরদিন: ৮ই প্রত্যুষে এক মহাজ্যোতিষ্কের কক্ষচ্যুতি হলো ফাঁসীর দড়িতে।

৯ই কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হলো নন্দলালের বক্ষরক্তে বিপ্লবীর অলক্ষ্য হস্তনিক্ষিপ্ত পিস্তলের অগ্নিঝলকে।

নরেন গোঁসাইয়ের মত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুকের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে। বেচারা (?) নাকি তার আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ জানাতে চলেছিল, অথচ জানতে পারেনি যে তার পারঘাটের নিমন্ত্রণ-পত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেছে আগেই নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য লেখনীতে। মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!

হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরাজ সরকার দেশবাসীর ওপরে: কঠোর দমননীতি। ফাঁসী, কারাগার, আন্দামান! অজস্র বেতনভুক্ত শকুনিতে দেশের আকাশ কালো হয়ে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির পক্ষ নিয়ে আদালতে এসে দাঁড়ালেন।

দেশবন্ধু! যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একদিন পরবর্তীকালে দেশপ্রেম ও বৈরাগ্যের মধ্যে প্রজ্বলিত হ'য়ে ব্রিটিশ সরকার ও সমগ্র দেশবাসীকে অভিভূত করেছিল, প্রথম তার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আদালতে আত্মপ্রকাশ। ঢাকা জিলার তেলীরবাগের দাশবংশের সুবর্ণ দেউটি!

যাঁর স্মরণিকায় ভারতের তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গেয়েছিলেন:

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান॥

ইংরাজের আদালতে বিচার-প্রহসন শেষ হলো: বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড।

উপেন্দ্র, হেমেন্দ্র, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রভূষণ রায় এঁদের সকলের প্রতি আদেশ হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। নয় বৎসরের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হলো পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ ও নিরাপদ রায়ের, এবং অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কানের ও শিশির সেনের হলো সাত বৎসর দ্বীপান্তর।

কৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বৎসর কারাদণ্ড। সতেরো জনের মুক্তি দেওয়া হয়। পরে আবার আপীলে বারীন ও উল্লাসের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। হেমচন্দ্র ও উপেন বাঁড়ুয্যের দণ্ড পূর্ববৎ বহাল থাকে। তবে অন্যান্য যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের দশ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। অপর

সকলের কিছু কিছু কমে যায়। বালকৃষ্ণ কানে মুক্তি পান।

১৯০৭-১৯০৮ অগ্নিবিপ্লবের প্রথম পর্ব এইখানেই শেষ। দেশোদ্ধারের প্রথম প্রচেষ্টার ইতি!···যে সতেরো জন বিপ্লবীকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাঁদেরই অন্যতম শ্রীঅরবিন্দ।

হাইকোর্টের রায় বের হবার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই আন্দামান-যাত্রীরা কারাগৃহের মধ্য হ'তে শেষবারের মত তাহাদের প্রিয় জন্মভূমিকে দেখে জাহাজের অন্ধকার কয়েদী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলে। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলধি মথিত করে অর্ণবপোতটি ভেসে চলে।

বিদায় জননী, বিদায়ঃ Adieu! My native land adieu! হে আমার জন্মভূমি, দূরযাত্রীর প্রণাম লও! পড়ে রইলো পশ্চাতে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেনের স্মৃতিঃ জাহাজ ভেসে চলে আন্দামানের দিকে কালাপানি পার হয়ে।

জাহাজ এসে যখন চতুর্থ দিবসে তীরে ভিড়ল, একজন স্থূলকায় খর্বাকৃতি ফিরিঙ্গী ওদের দিকে তাকিয়ে বললেঃ Well! You see that block yonder! It is there that we tame lions!

হাঁ ঠিকই। কঠিন সত্যটিই অন্তর হ'তে ফুটে বের হয়েছিল ফিরিঙ্গীর। অযোধ্যা হতে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসিত হয়েছিলেন সত্যের পালনে, শ্রীরামচন্দ্র যদি আমাদের পূজা পেয়ে থাকেন, সেদিনকার ঐ নির্বাসিতরাও চিরদিন আমাদের পূজা পাবে। পাবে আমাদের চিত্তের অকুণ্ঠ প্রণাম। কারণ তারাও জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সত্য পালনের জন্য নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছিল নিজ জন্মভূমি হ'তে দূরে কালাপানি পারে আন্দামান দ্বীপে।

সেদিনকার সেই নির্বাসিতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আবার আমরা কালাপানি পার হয়ে ফিরে যাই বাংলার মাটিতে, যে মাটিতে তারা বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে গেল স্বাধীনতার অঙ্কুরোদগমের আশায়।

* * *

দেশপ্রেম যে অপরাধ নয়, শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিই বোধ করি তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নবীন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের যুক্তিকে আদালত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। শার্দুলের হুঙ্কারের মত চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠ হ'তে যে আবেদন সেদিন বলিষ্ঠ দাবী জানিয়েছিল, পরাশ্রিত পদানত নির্জীব সমগ্র বাঙালী তথা সমগ্র ভারতীয়ের পক্ষ হ'তে সে দাবীর রেশ যেন আজিও বহুবছর পরেও দেশ ও জাতির মর্মে মর্মে ঝঙ্কৃত হয়ে ফিরছে ওঙ্কারধ্বনির মত। আজকে নয়, অনেকদিন পরে, যেদিন বিস্মৃতির গর্ভে আজিকার এই মতানৈক্য তলিয়ে যাবে, আজিকার এই বিচারের মত-বিভেদ লোকে ভুলে যাবে, এবং আজকের দিনে যাকে নিয়ে এত গোলমালের ও বিভেদের সৃষ্টি, সেই শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবী হতে চিরতরে বিদায় নেবার বহুকাল পরেও 'দেশপ্রেমের কবি' বলে, জাতির ভবিষ্যৎ বক্তা ও বিশ্বপ্রেমের প্রতীক বলে তাঁর স্মরণিকায় বিশ্ববাসী প্রণাম জানাবে ভক্তি-লুণ্ঠিত অশ্রু-নীরে। তার তিরোধানের বহুকাল পরেও তাঁর অমৃত মধুর বাণী কেবল-

মাত্র ভারতেই নয়, বহু সাগর ও ভূমি পার হয়ে গিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে দূর-দূরান্ত।

মিথ্যা হয় নাই সেদিনকার সেই তরুণ আইনজীবীর কথা : সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রণাম তাই একদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে ও সুরে :

'অরবিন্দ ! রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !···
হে বন্ধু, হে, 'দেশবন্ধু,' স্বদেশ আমার···

মুক্তিলাভ করেই শ্রীঅরবিন্দ, এলেন চিত্তরঞ্জনের বাসভবনে : দু'জনে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলো। দু'জনেই পরস্পরের প্রতি চেয়ে থাকেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে, সে দৃষ্টিতে হয়ত পরস্পরের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। এরপর অরবিন্দ সেই সময়কার রাজনীতি তত্ত্বপ্রচারে নিজেকে নিয়োগ করলেন। বারীন, উল্লাস, উপেন প্রভৃতি সুদূর দ্বীপান্তরের লোহার বেড়ী পরে ফিরিঙ্গীর অকথ্য অত্যাচারে দেশপ্রেমের মাশুল দিচ্ছে। অশ্বিনীবাবু, রাজা সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি নেতারা অন্তরীণাবন্ধ, লোকমান্য তিলক সুদূর মান্দালায় জেলে আবন্ধ। মর্দিতপুচ্ছ শার্দুলের মত শ্রীঅরবিন্দের অন্তরে তখন অপমান ও ব্যর্থতার খাণ্ডবদাহন চলেছে।

'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন' পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে লেখনীমুখে সেই নিরন্তর দহনের অগ্নিফুলিঙ্গ আত্মপ্রকাশ করলে : আমরা তো বেআইনী করি না। আমাদের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ভগবৎ নির্দিষ্ট ভারতের স্বাধীনতা। যাহারা চণ্ডনীতিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আসিবার আবশ্যক নাই। যাহারা একান্ত তোষণনীতির অনুগামী, তাহারাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক, কিন্তু আমাদিগকে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতেই হইবে।

সহসা অতর্কিতে আবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল : ১৯১০ : ২৪শে জানুয়ারী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ, বহু কুকীর্তির হোতা পুলিসের ডেঃ সুপারিনটেনডেণ্ট শামসুল আলম হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। অতর্কিতে একটি তরুণ সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন ধ্বনিত হয় : Are you Shamsul Alam !

Yes !

Here you are ! সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটি আগ্নেয়াস্ত্র অকস্মাৎ অগ্নি-উদ্গীরণ করে। গুড়ুম !···

উৎক্ষিপ্ত ধূম্ররাশির মধ্যে রক্তাক্ত শামসুল আলম সিঁড়ির ওপরে গড়িয়ে পড়ে, শেষ কাতরোক্তির সঙ্গে।

দেশদ্রোহীর চরম পুরস্কার ! যুবক ধরা পড়ে। সেদিনকার সেই নির্ভীক তরুণ কে ? বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত ! বিচারে তাঁর ফাঁসী দেওয়া হয়। ঘটনায় প্রকাশ পায় বীরেন্দ্র, যতীন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক নিয়োজিত হয়েই নাকি শামসুল আলমকে হত্যা করে, যতীনের সঙ্গে অরবিন্দের যথেষ্ট সৌহার্দ ও ঘনিষ্ঠতা।

অতএব দোষ অরবিন্দরই : ব্রিটিশের রোষকষায়িত দৃষ্টি গিয়ে অরবিন্দের

প্রতি পতিত হলো। ১৯০৯ ঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী আরো একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি মামলায় সরকার পক্ষের উকিল ছিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস। মামলার সময় ঐ মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য সাহেবকে-বুঝিয়ে দিত। শুধু তাই নয় আশু বিশ্বাস, কানাই ও সত্যেনের মোকদ্দমায়ও সরকার তরফে থেকে ওকালতী করেছে। খরচের খাতায় আশু বিশ্বাসের নাম আগেই উঠে গিয়েছিল।

গোপন সভায় তার চরম দণ্ডের দিনও ধার্য হয়ে গিয়েছিল। বেলা প্রায় পৌনে চারটে, আলিপুর সুবারবন পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। কাজকর্ম শেষ হয়ে গিয়েছে, আদালতের পূর্বদ্বারে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আশু বিশ্বাস গাড়ীতে উঠতে যাবে, মৃত্যুদূত গর্জে উঠল ঃ গুড়ুম!

লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। প্রাণভয়ে আশু বিশ্বাস লাইব্রেরীর দিকে মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়ায়।

আবার পিস্তলের গর্জন শোনা গেল, লক্ষ্য ব্যর্থ হল না সেবার।

হতভাগ্য বুকের রক্ত দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।

অনেকেই হয়ত আজ সেই বীর দেশপূজারীর নাম পর্যন্ত জানে না।

বহুকাল পরে নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামটি আবার উচ্চারণ করছি ঃ চারুচন্দ্র বসু। খুলনা জিলার শোভনা গ্রামে বাড়ী।

ছেলেটি ছিল বিকলাঙ্গ ঃ দক্ষিণ হস্তটি ছিল নুলো।

ক্ষমতা পর্যন্ত নেই দক্ষিণ হস্তে আগ্নেয়-অস্ত্র ধরবার। কাজেই হাতের সঙ্গে দড়ি দিয়ে অস্ত্রটি বেঁধে রেখেছিলেন।

কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। যে গুরুভার বিপ্লব-সমিতি তাঁর স্কন্ধে বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছিল, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

চারুচন্দ্র ধরা পড়লো পুলিসের হাতে।

পরের দিনই জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা-উপস্থাপিত করা হলো ঃ হুকুমজারী হ'লো ঃ মোকদ্দমা সেসনে সোপর্দ করা হোক।

নির্ভীক তরুণ বললে ঃ দায়রায় পাঠাচ্ছেন কেন? আমাকে কালই ফাঁসী দিন!

* * *

ফাঁসীর দড়িতেই চারুচন্দ্রের বিচার শেষ হয়, ইংরাজের আদালতের সু-বিচারে।

আগুন যেন নিভেও নেভে না।

ফাঁসীর রজ্জুকে উপহাস করে, দূর কালাপানি পারে আন্দামানের লৌহ-বেষ্টনী ও শত প্রকারের নির্লজ্জ কুশ্রী অত্যাচারকে ব্যঙ্গ করে যেন থেকে থেকে তবুও বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশে ফুটে ওঠে প্রোজ্জ্বল রক্তিমাভায়।

ভারতের মাটি হ'তে অলক্ষ্যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উড়ে গেল সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে মহামান্য ব্রিটিশ বাহাদুরের খাস রাজধানী লণ্ডন শহরে পর্যন্ত।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল মদনলাল ধিংড়া : সাহসী ভারতীয় যুবক। কঠোর প্রতিজ্ঞায় তার দু'টি চক্ষু যেন আগুনের শিখার মত জ্বলতে থাকে। কানাই সত্যেনের চিতাভস্ম যেন তাকে গিয়ে স্পর্শ করেছে : লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জাহাঙ্গীর হল : প্রীতিভোজের উৎসব সেদিন ! গীত-বাদ্যে হাস্যে-লাস্যে হলঘরটি আনন্দমুখর বহু অভ্যাগতের উপস্থিতিতে। ১লা জুলাই রাত্রি আটটা। বাইরে আলোকমালায় শোভিত কর্মব্যস্ত লণ্ডন নগরী। প্রীতিভোজের উৎসব সভায় বহু অভ্যাগতের মধ্যে লণ্ডনস্থ ভারত দপ্তরের রাজনৈতিক এ. ডি. সি এবং ভারত-সচিব লর্ড মর্লি'র অন্যতম সহকারী কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলিও উপস্থিত।

উৎসব তখনও শেষ হয়নি, লঘুচিত্তে কার্জন ওয়াইলি হাসিমুখে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। পাশে পাশে মিষ্ট হাসির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে মদনলাল ধিংড়া। হঠাৎ কোথা হ'তে কি হলো : মুখের হাসি রূপান্তরিত হলো অবিমিশ্র ঘৃণার বিদ্যুতে। তড়িদ্‌বেগে ওভারকোটের পকেট হ'তে মদনলাল কার্জনের অলক্ষ্যে ছোট্ট একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে উঁচিয়ে ধরল কার্জন ওয়াইলির প্রতি।

পিস্তলের অগ্ন্যুদ্গারের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক সচকিত হয়ে ওঠে, গুড়ুম্ ! ওয়াইলীর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল রক্তাপ্লুত হয়ে।

মদনলাল আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়। মদনলাল ধৃত হলো।

ধৃত অবস্থায় তার পকেট অনুসন্ধান করে কতকগুলো কাগজ পাওয়া যায় : তার মধ্যেই পাওয়া যায় কার্জন ওয়াইলীর হত্যার নিদর্শন : 'ভারতীয় যুবকদের প্রতি নির্বিচারে কারা ও প্রাণদণ্ডের আদেশের ক্ষীণ প্রতিবাদ হিসাবে আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ইংরাজের রক্ত-মোক্ষণের চেষ্টা করিলাম। ভারতের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক হত্যা একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।' স্তম্ভিত হয়ে যায় সমগ্র লণ্ডনবাসী। চারিদিক ঘোর সমালোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠে।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্যারিস হ'তে Times কাগজে লিখলেন : আমি এইরূপ হত্যাকে হত্যা (murder) আখ্যা দিতে পারি না। আমার মতে যাঁরা এইরূপ রাজনৈতিক হত্যানুষ্ঠান করেন, তাঁরা প্রকৃতই ধর্মার্থে কার্য করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্যেই দেশ স্বাধীন হইবে। দেশের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত বলিয়া ইহা গর্হিত হইতে পারে না।······আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, ইংরাজ যদি ভারত ত্যাগ না করে, তবে তাহাদের ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

Erelong there will be a catastrophy which will stagger humanity unless the British withdraw from India !

ইংরাজের দেশের মাটিতে, ইংরাজের আদালতে, ইংরাজের তৈরী আইনে বিচার শুরু হলো ২৩শে জুলাই। বিচার করলে লর্ড এনভারস্টোন : রায় দেওয়া হলো : মৃত্যুদণ্ড !

সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে জন্মভূমির বহু দূরে, পরদেশীয়া মদনলালের গলায় ফাঁসীর দাঁড় পাড়িয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে। দেশের জন্য স্বজন-

পরিত্যক্ত দেশপ্রেমিক সুদূর বিদেশের মাটিতে রুজ্জুবন্ধনে শেষ নিঃশ্বাসে আত্মদান করে গেল। আমরা তো ভুলি নাই কোন দিনই, তারাও ভুলবে না, যারা সেদিন বিচারের নামে প্রহসন করতে বসেছিল, সেই প্রহসনের দরবারে ভারতীয় যুবকের সেই অকুণ্ঠিত ঘোষণা : Thank you my Lord, I am glad to have the honour of lying for my country.

কে বলেছে মদনলাল তুমি মৃত! জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত-ইতিহাসের পাতায় তোমার স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে লেখা রইবে চিরকাল।

তোমার মৃত্যুহীন অমর পায়ে ভারতবাসী চিরদিন দেবে ভক্তিনত নমস্কার। চিরঞ্জীবী নায়ক : কবির ভাষায় বলি :

মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরব দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়।

* * *

তুমি কি জান না বীর, দেশের বিনাশ ঘটলেও, তোমার 'তুমি' সেদিন যা ছিলে, মৃত্যুর পরও তোমার 'তুমি' তেমনিই আছে!

য এনং বেত্তি হন্তারম্ যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তে ন বিজানীতো নায়ং হন্তি না হন্যতে।

মদনলালের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে সেই সময় মহারাষ্ট্রীয় যুবক বিনায়ক দামোদর সাভারকারকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের জন্য সাভার-কারকে জাহাজে বোম্বাই প্রেরণ করা হয়। অকুতোভয় দুর্জয় সাহসী ঐ মহারাষ্ট্রীয় যুবক বীর সাভারকার!

ভারতের পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক। তাঁতিয়ার দেশের লোক দামোদর—পরাধীনতার অগ্নিময় জ্বালা তার অন্তর ও বাহিরকে সর্বদা জ্বালিয়েছে। তাঁতিয়ার আদর্শ তাকেও করেছে উদ্বুদ্ধ।···

কিন্তু জাহাজ যখন দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছেছে, এমন সময় গভীর রাত্রে ঐ দুঃসাহসী যুবক জাহাজের পোর্টহোলের ফোকড় দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরের জলে। রাত্রির অন্ধকারে সাগরের সীমাহীন জলরাশি ফুঁসে গর্জায় : কালো জল তো নয়, যেন লক্ষ কোটি বিষধর কাল-নাগিনী। এতটুকু ভয় নেই, নিঃশব্দে সাঁতরে দামোদর ফরাসী দেশে গিয়ে উঠে, সেখানকার পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করলে। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই : অতএব ফরাসী পুলিস ইংরাজ পুলিসের হাতে দামোদরকে সঁপে দিল।

* * *

তারপর একদিন বোম্বাইয়ের আদালতে দামোদরের বিচারের প্রহসন বসল। বিচারে হলো তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড!

দেশপ্রেমের পুরস্কার হলো : অন্ধ কারাগার!

* * *

তবু কি নির্বাপিত হয় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা! জ্বলে ভারতের মাটিতে আকাশে বাতাসে চির অম্লান, চির অমলিন। অত্যাচার, ফাঁসী, নির্বাসন, কিছুতেই কি ভয় নেই এদের! নাজানি কি দিয়ে গড়া এরা! তবু এরা দেবে প্রাণ, তবু মাথা পেতে নেবে চির নির্বাসন-দণ্ড, হাসিমুখে তুলে নেবে কারাযন্ত্রণার অগ্নিদাহ, সর্বাঙ্গে পেতে নেবে নির্মম অত্যাচারের শত লাঞ্ছনা।

* * *

হাসিমুখে চির নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়ে দামোদর বিদায় নিল জন্মভূমির মাটি হতে। লণ্ডনে কার্জন ওয়াইলীকে হত্যার সপ্তাহতিনেক পূর্বে নাসিকে বিনায়ক সাভারকারের ভ্রাতা গণেশ সাভারকারের নামে 'লঘু অভিনব ভারত খেলা' নামে একখানা কবিতা পুস্তকের প্রকাশের জন্য দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ব্রিটিশ শাসকগণ তাঁকে ১৯০৯এর ৯ই জুন দ্বীপান্তরিত করে।

বিচার করেছিল শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন্। বিনায়কের চির নির্বাসন দণ্ডের কিছুদিন না যেতে যেতেই মিঃ জ্যাকসনের মাথায় অকস্মাৎ নীলাকাশের বুক হ'তে নেমে এল বজ্র, চরম দণ্ড: মৃত্যু!

শ্বেতাঙ্গর রক্তপাত! শিকারী কুকুরের দল হন্যে হ'য়ে উঠল: নির্মম অত্যাচারের চাবুক হেনে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও খানাতল্লাসী করে দুদিনেই তোলপাড় করে তুলল সমগ্র নাসিক শহরটি। বহুজনকে গ্রেপ্তার করা হলো ঐ হিড়িকে। দেখা গেল একটিমাত্র শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর হত্যার সূত্রটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র নাসিক শহরটি জুড়ে এতদিন ধরে গোপনে গোপনে চলছিল এক বিরাট গুপ্ত বিপ্লবের প্রস্তুতি।

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা!

কিন্তু আসলে এই বিপ্লবের মূল কোথা হ'তে কোন্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? বোম্বাই হ'তে গোয়া পর্যন্ত যে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলবর্তী ভূভাগ, তারই নাম কঙ্কন।

এইখানে একশ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের বাস ছিল: এদের বলা হতো চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী! মহারাষ্ট্র কুলপ্রদীপ বীরেন্দ্র-কেশরী শিবাজী মহারাজের পৌত্র যখন সাতরায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন কঙ্কনের এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ঐ ব্রাহ্মণই প্রধানমন্ত্রিত্বকালে পেশোয়া উপাধি নিয়ে পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যের রাজা হয়ে বসেন। একজন পেশোয়ার নাবালকত্বের কালে নানা ফারনবীশ নামে একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ান। তাঁরই আধিপত্যকালে দাক্ষিণাত্যের দেশস্থ ব্রাহ্মণদের শাসনবিভাগ হ'তে উচ্ছেদ করে চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের একে একে এনে শাসন বিভাগে নিযুক্ত করা হতে থাকে। বস্তুতঃ মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে যে যুদ্ধে ইংরাজ ক্ষমতা হস্তগত করে, তাহা প্রধানতঃ চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই ঘটেছিল। ইংরাজ শক্তির কাছে অতীত অপমানের লজ্জা ও গ্লানি, যা একদা ক্রম-ক্ষীয়মাণ ক্ষমতা ও

ঘরোয়া বিবাদের জন্য মহারাষ্ট্রীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর হৃতরাজ্য ও লুপ্ত আধিপত্যের মধ্যে অন্তরের অন্তঃস্থলে সঞ্চিত হয়ে তুষের আগুনের মত এই দীর্ঘকাল ধরে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, বহুকাল পরে নাসিকের 'অভিনব ভারত সমিতির' সভ্যদের মধ্যে যেন তাই মূর্ত হয়ে উঠতে চেয়েছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। সেই লজ্জাকর অন্তর্বেদনারই পরিস্ফুটন আমরা পেয়েছিলাম সমসাময়িক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মধ্যেই।

তাই হয়ত মহারাষ্ট্রে যে বিপ্লবের বহ্নিশিখা ফুটে উঠেছিল, তার প্রদীপ্ত আলোয় আমরা দেখতে পেয়েছি মুখ্যত চিৎপাবন ব্রাহ্মণদেরই পুরোভাগে: চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ, লোকমান্য তিলক, পরাঞ্জপে ইত্যাদি। একমাত্র সাভারকারই ঐ গোষ্ঠীর নন।

মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাতনামা মনীষী, চিরস্মরণীয় রাজনীতিক, নির্ভীক রাণাডে ও গোখলেও ছিলেন ঐ চিৎপাবন গোষ্ঠীর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর অবদান চিরদিন থাকবে অম্লান ও স্মরণিকার পাতায় চির উজ্জ্বল চির ভাস্বর।

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার সূত্র ধরে ধরে যাদের গ্রেপ্তার করে বিচার শুরু করা হলো, তাদের মধ্যে সাতাশ জনকে কারাদণ্ড, তিনজনকে ফাঁসী দিয়ে তবে তার সমাপ্তি ঘটলো।

এমনি করেই বিপ্লবের প্রস্তুতি দেশ হতে দেশান্তরে ভারতের সর্বত্র আগুনের শিখায় বিস্তৃত হয়ে চলেছে তখন।

কোথা হ'তে কোথায় চলে এসেছি, বিপ্লবের অগ্নিমশাল বহন করে নদ-নদী গিরি-কান্তার বনভূমি অতিক্রম করে ছুটে চলেছি দেশ হ'তে দেশান্তরে, বিদ্রোহী ভারতের অগ্নিজ্বালা, এ কি কোনদিনই নিভবে না?

শ্রীঅরবিন্দের বুঝি আর দেশে থাকা হলো না। গোপনে ভগিনী নিবেদিতা জানালেন: আর বিপ্লব করো না, যত শীঘ্র পার ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাও। ব্রিটিশ সরকার তোমাকে আবার গ্রেপ্তার করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এবার বিনা বিচারেই তোমাকে গ্রেপ্তার করে চির-অন্তরীণ করবার ব্যবস্থা করেছে। তোমার নামে ওয়ারেণ্টও বেরিয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা হ'তে পালিয়ে চন্দননগরে গিয়ে উঠলেন। বিপ্লবী মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করে রইলেন।

তারপর একদিন এলো সুযোগ: এক গভীর রাত্রে শ্রীযুক্ত অমর চট্টোপাধ্যায় নৌকায় করে গোপনে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গিয়ে সৌম্যেন ঠাকুরের পরিচয়ে ফরাসী জাহাজ 'ডুপ্লে'তে উঠিয়ে দিলেন। এমনি করেই এক অক্লান্তকর্মী দেশপ্রেমিককে গোপনে ফিরিঙ্গীদের চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে পণ্ডিচেরীর পথে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম সাশ্রুনেত্রে! তারপর আরো কতদিন চলে গেল, তারপর সেই পলাতক অরবিন্দ,—শ্রীঅরবিন্দ দেশের মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে মানুষের বৃহত্তর মুক্তির পথ নির্দেশ দিয়ে গেলেন। প্রণাম হে ঋষি তোমায়!

আবার চল ফিরে যাই বাংলার শস্যশ্যামলা মাটিতে, যেখানে বহু রক্ত-বিপ্লবের চিহ্ন বার বার মুক্তির আশায় ঝিলিক হেনে গিয়েছে। কলকাতায় 'যুগান্তর' দলের নেতৃত্বে বিপ্লবী গুপ্ত সংঘ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে অতি গোপনে আর একটি গুপ্ত সমিতিও ধীরে ধীরে আশার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠছিল: অনুশীলন সমিতি, যার শাখা-প্রশাখা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বাংলার মাটিতে মাটিতে গোপনে গোপনে বহু দূর পর্যন্ত রস সঞ্চার করেছিল। যদিও ঢাকা ও কলকাতাই ছিল ঐ সমিতির প্রধান কেন্দ্র। একসময় কেবল মাত্র ঢাকাতেই ছিল অনুশীলন সমিতির পাঁচশত শাখা।

সে ১৯০৫-৬ সালের কথা, ঢাকা শহর যেন হঠাৎ প্রাণাবেগে চঞ্চল ও ঊর্মি-মুখর হয়ে উঠেছে। সেই বঙ্গভঙ্গের যুগ: স্বদেশী আন্দোলন।

বিপ্লবী নেতা অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান পাণ্ডা পুলিন দাস ও ব্যারিস্টার পি. মিত্র ঢাকা শহরে এসে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়িয়ে গেলেন: আপোষ-নীতি নয় আর! বিলাতী লবণ বা চিনির পিকেটিং করে কি হবে? তা দিয়ে আর যাই হোক স্বাধীনতা আসবে না দেশের। চাই রাষ্ট্রবিপ্লব! লাঠি খেলা, বন্দুক, তরোয়াল চালনা শিক্ষা করো। সমিতি গঠন করো। দলে দলে নির্ভীক যুবা তরুণ কিশোর ছেলেরা সমিতিতে এসে নাম লেখাচ্ছে আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বলছে স্থির উদাত্ত কণ্ঠে: প্রতিজ্ঞা করি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি—স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না, সর্বদা সমিতির পরিচালকের আদেশ মানিয়া চলিব। নিভৃতে অন্যের অলক্ষ্যে চলল সব হাজার হাজার একলব্যের সাধনা, আম কাঁঠাল ও বাঁশবনের মাঝে। তৈরী হ'তে থাকে বঙ্কিমের স্বপ্নে দেখা আনন্দমঠের সন্তানদল।

বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে চালু ও সজীব রাখতে হলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। এখন সেই অর্থ কোথা হ'তে কেমন করে আসবে, বিপ্লব সমিতির নেতাদের এই হলো চিন্তা। অবিশ্যি দেশের কয়েকজন সহানুভূতিশীল ধনী লোক গোপনে গোপনে সমিতিকে অর্থসাহায্য করতেন, কিন্তু সমুদ্রের নিকট তা গোষ্পদের মতই সামান্য। সমুদ্রপ্রমাণ চাহিদা কি সামান্য পুষ্করিণীর জলে কভু পূরণ হয়।

এদিকে আবার কিছুদিন বাদে সরকারের শ্যেন দৃষ্টির ভয়ে ঐসব ধনীরাও হাত গুটিয়ে নিল। সমিতির পরামর্শ সভায় স্থির হলো: ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। শুরু হলো বাংলায় রাজনৈতিক বা স্বদেশী ডাকাতি।

১৯০৮ সালের ২রা জুন: মানিকগঞ্জের বায়রা গ্রামে শশী সরকার নামে এক কুখ্যাত ধনশালী ব্যক্তি ছিল। আশেপাশে অনেকগুলো নামকরা চোর ডাকাতের লুঠের মাল সব শশীর কাছেই গচ্ছিত থাকত। ভণ্ড শশী নির্বিঘ্নে ভদ্র মুখোস পরে চোরাই মালের কারবার করে সিন্দুক ভরিয়ে তুলত। সর্বদাই শশীর বাড়ীতে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ও কাঁচা রূপা মজুত থাকত। সমিতির সভ্যদের কাছে এ গোপন তথ্যটি অজ্ঞাত ছিল না।

আশুতোষ দাসগুপ্ত, অমৃত হাজরা, শচীন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি ত্রিশজন যুবক দু'খানি বড় নৌকায় লাঠি, বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি নিয়ে ঢাকা হ'তে রওনা হলো। সকলেই মুখে মুখোস এঁটে গিয়েছিল।

যাহোক, ২রা জুন শশী সরকারের বাড়ী লুণ্ঠন করে প্রায় পনের হাজার টাকা মূল্যের অলংকার ইত্যাদি সহ সকলে এসে ঢাকায় পুলিনবাবুর নিকট উপস্থিত হয়। এর পর আরো একটি বড় রকমের স্বদেশী ডাকাতি হয় ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুরের অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামে। ৩১শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলাস্থ নড়িয়া বাজারে আর একটি ডাকাতি হয়। সামান্য কিছু টাকা পাওয়া যায়। পর পর এইভাবে কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতির ফলে সরকারের পুলিস তখন হন্যে কুকুরের মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোয়েন্দায় দেশ গেছে ছেয়ে। গোয়েন্দারা সভ্যের তালিকায় নাম লিখিয়ে সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে। এদের মধ্যে কয়েক জনের নাম ঃ নগেন্দ্র রায়, হেমেন্দ্র রায়, উপেন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি। এমনি করেই দিন যায়। এমন সময় ১৯০৮-য়ের ডিসেম্বর মাসের ১২ই, ১৪নং সংশোধিত ফৌজধারী আইন সরকার পাশ করলে। এই আইনে ব্রিটিশ সরকারের মর্জিমত নির্দিষ্ট কতগুলি অপরাধের ক্ষেত্রে জুরী বা এসেসার ছাড়া হাইকোর্টের তিনজন জজকে নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চেতে বিচারের ব্যবস্থা করা হলো। বড়লাটকে এই আইনানুযায়ী যে কোন প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করবার ক্ষমতা দেওয়া হল।

ঐ কুখ্যাত আইনের প্যাঁচে ফেলেই ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতি, সাধনা সমিতি, সুহৃদ সমিতি, ব্রতী সমিতি প্রভৃতি যাবতীয় তরুণদের মুক্তিপ্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কণ্ঠ চেপে শ্বাসরোধ করা হলো, বলা হলো ঃ ওসব বে-আইনী কাণ্ড, বন্ধ করো। তারও আগেই বরিশালের অক্লান্ত কর্মী অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্র-প্রসাদ বসু, অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায়, পুলিন দাস ও ভুপেশ নাগকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতি বন্ধ ঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত কলকাতায় চলে এলেন।

আশুতোষ কলকাতায় এসে পি. মিত্রর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি কলকাতায় অনুশীলন সমিতিতে বাস করতে লাগলেন। এদিকে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল ঃ গবেশ ওরফে যতীন চট্টোপাধ্যায় নামে এক যুবক অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল। পুলিসের ধাপ্পায় পড়ে ভড়কে গিয়ে সে সমিতির অনেক গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। দেশদ্রোহী বিশ্বাসহন্তা গবেশকে হত্যা করতে গিয়ে সমিতির লোকেরা ভুলক্রমে তার ভাইকে গুলি করে মারলে। ১৯১০, ১৩ই ফেব্রুয়ারী পুলিন দাস মুক্তি পেয়ে ঢাকায় এলেন, কিন্তু তিনি তখনও জানতেন না পুলিসের কর্তৃপক্ষ গোপনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁদ পেতে জাল গুটাতে ব্যস্ত। ১৯১০, ৩রা আগস্ট রাত্রি দুই ঘটিকার সময় ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার জাল গুটান হলো ঃ ৪৫ জন গ্রেপ্তার হয়। রমনার একটি নির্জন বাড়ীতে আদালতের স্থান নির্দেশ হলো।

বিচারপতি নিযুক্ত হলো মিঃ বেণ্টিঙ্ক। মহাসমারোহে চলল সরকারের বিচার প্রহসন। দীর্ঘ ২/৩ মাস ধরে সাক্ষীদের জবানবন্দী নেওয়া হলো ঃ এবং মামলা দায়রা সোপর্দ করা হলো। ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাড়ীতে ১৯১১, ২রা জানুয়ারী জজ মিঃ কুট্সের আদালতে বিচার বসে। মানিকতলা বোমার মামলার প্রখ্যাতনামা শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস এবারেও স্থির থাকতে পারলেন না, ছুটে এলেন ঢাকায় আসামীদের (?) পক্ষ সমর্থন করতে। মামলার শেষে রায় বেরুল ঃ পুলিন দাসের সাত বৎসর ও আশুতোষের ছয় বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর, বাকী একুশজন মুক্তি পেল।

পুলিনবাবু ধৃত ও বিচারে দ্বীপান্তরিত হওয়ায় অধুনা-লুপ্ত বিখ্যাত সংবাদ-পত্রসেবী দৈনিক ভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন অনুশীলন সমিতির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন।

এদিকে ১৯১০র সেপ্টেম্বর মাসে ইন্সপেক্টার শরৎ ঘোষ গুলিবিদ্ধ হলো গুপ্ত বিপ্লবী-সঙ্ঘের নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ও হিরণ্য গুপ্ত, দুটি তরুণের হাতে।

ঢাকার আগুন নিভতে না নিভতে ঢাকা হ'তে বরিশালে বিপ্লবের অগ্নি শিখা বিস্তৃত হলো।

১৯১০—১৯১৩।

ঢাকায় যখন বিপ্লব সমিতির গঠন চলেছে অনুশীলন সমিতির নাম দিয়ে, স্বাধীনতাকামী একতাবদ্ধ দুর্জয় তরুণদের নিয়ে, বরিশালেও তখন তার প্রেরণা পেঁৗছে গিয়েছিল, এবং বরিশালের অনুশীলন সমিতিতে যাঁরা নাম লিখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন ঘোষ পরিচালক ও অল্পবয়স্ক দুর্ধর্ষ যতীন রায় (ওরফে, ফেণ্ড রায়)। বরিশালের ষড়যন্ত্র মামলার নাম দিয়ে ব্রিটিশ সরকার আবার জাল বিস্তার করল ঃ জাল তুলে যখন আনা হলো, বহুজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে দেখা গেল। অভিযোগও ছিল বহু ! এগারটি জায়গায় ডাকাতি, যেমন হলদিয়া, কলারগাঁও, দাদপুর, পণ্ডিতসার, গাউদিয়া সুকার, মাদাদীগঞ্জ, বিড়ঙ্গল, কুমিল্লা শহর, লাঙ্গলবন্দ প্রভৃতি। এছাড়া গোলকপুরে বন্দুক চুরি, সারদা চক্রবর্তীকে খুন করা প্রভৃতি অভিযোগও ঐ ষড়যন্ত্র মামলায় আনা হয়।

দুই দফায় বিচার শেষ হয় ঃ প্রথম দফায় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ ষড়যন্ত্রের জন্য ২৬ জনের মধ্যে ১৪ জনকে মুক্তি দিয়ে বাকী রমেশ আচার্য ও যতীন রায়ের বারো বৎসর দ্বীপান্তর। রোহিণী গুপ্ত, নিবারণ কর ও যতীন ঘোষের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর, প্রিয়নাথ আচার্য, কুমুদ নাগ, দেবেন্দ্র বণিক, গোপাল মিত্র প্রভৃতির সাত বৎসর কারাদণ্ড। নিশি ঘোষ, চণ্ডী বসু ও দেবেন্দ্র ঘোষের পাঁচ বৎসর কারাবাস হয়।

১৯১৫, ২৯ মে ঃ দ্বিতীয় দফায়, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী ও খগেন চৌধুরীর বিচার হয়। মামলার রায় প্রকাশিত হলো ১৯১৬ সনে। বিচারে এঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর, অন্যান্যদের ১০ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়। পরে অবিশ্যি শেষোক্ত প্রতুল ও রমেশের মুক্তি মেলে হাইকোর্টের পুনর্বিচারে ও অন্য তিন

জনের দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। ব্রিটিশ সরকার ও তার চেলা চামুণ্ডারা তখন বাংলা দেশের সর্বত্র জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে সুরু করেছে। অক্লান্তকর্মী অত্যুৎসাহী বিপ্লবী-চক্রেরও কাজ চলেছে পুরোদমে। যেখানে যত বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর দল ঐসব বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, চক্রান্ত করেছে, অত্যাচার করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

১৯১১, ১০ই এপ্রিল ঃ বিক্রমপুর রাউৎভোগের গোয়েন্দা মনোমোহন দে ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষী দিয়ে ফিরবার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলো।

ময়মনসিংয়ের গোয়েন্দা দারোগা রাজকুমার রায়কে মারা হয় ১৯১১, ১৯শে জুন।

নারায়ণগঞ্জের দারোগা মনোমোহন ঘোষ নিহত হয় ১৯১১, ১১ই ডিসেম্বর।

১৯১২, ২৪শে সেপ্টেম্বর বন্দুকের গুলিতে কনেস্টবল রতিলাল ও সারদা চক্রবর্ত্তী নিহত হয় জুন মাসে। পর পর বিপ্লবীদের এই তৎপরতায় বাংলা দেশ যেন সচকিত হয়ে ওঠে। বাংলার মাটিতে বিপ্লবের রক্ত-স্রোত বইতে থাকে।

১৯১১, সোনারংয়ে আর একটি মামলা হয়, মামলায় অভিযুক্ত হন সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের চৌদ্দজন শিক্ষক ও ছাত্র। ১১ই জুলাই ঐ মামলার সরকার পক্ষের তিন জন সাক্ষী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলো। মামলার ফলাফল ঃ সাতজনের প্রতি দণ্ডাদেশ হল।

* * *

ব্রিটিশ-সরকার স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, ভারতের মাটিতে সর্বত্র গুপ্ত বিপ্লবী-সংঘ গড়ে উঠেছে, এবং গোপনে গোপনে তারা ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাতে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মৃত্যুকে তারা ভয় করে না। তাদের

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনা হীন।

বাংলা দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ বাহাদুরের যেন কতকটা 'সাপের ছুঁচো গেলবার' মত অবস্থা হয়েছিল। কারণ আমলাতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্রের কাছে মর্যাদাই আসল, এবং সেই মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য জনগণের কোনরূপ স্বার্থের কাছেই সেই মর্যাদাকে তারা বিসর্জন দিতে যে সম্মত হতে পারে না, এ তো অবধারিত। সেই সময়কার গভর্ণমেণ্টের মর্যাদাবোধ সম্পর্কে লর্ড মিণ্টোর একটি মাত্র উক্তি এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেই হয়ত ব্যাপারটা কারো বুঝতে তেমন কষ্ট হবে না।

লর্ড মিণ্টো বলেছিলো ঃ গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের আন্দোলনের কাছেও বশ্যতা স্বীকার করবে না বা উপরের কর্তাদের হুকুমের কাছেও আত্মসমর্পণ করবে না, তারা যা করবেন সেটা একান্ত ভাবে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত ও প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ। কাজেই আমলাতান্ত্রিক এই স্বৈর-শাসনের মর্যাদা রক্ষা করে বাংলা তথা ভারতের উগ্র জাতীয় আন্দোলনের মূলোচ্ছেদের জন্য শাসকেরা এক নতুন পন্থা বের করলে। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে যে

দরবার অনুষ্ঠিত হলো, তাতে ইংলণ্ডেশ্বর ভারতের কয়েকটা প্রদেশের সীমানা নতুনভাবে বণ্টনের কথা ঘোষণা করলে।

এই সীমানা পুনর্বণ্টনের মধ্যেই কৌশলে বিভক্ত বঙ্গভূমিকে আবার জোড়া লাগানো হলো। ধন্য চক্রী ইংরাজ! ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করা হলো। দিল্লী হলো এবারে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী।

বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে পশ্চিম বাংলা হ'তে বিচ্ছিন্ন করে একজন লেঃ গভর্ণরের শাসনাধীন করা হলো। আসামকে পূর্ব বঙ্গ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে, একজন চীফ্ কমিশনারের ওপরে শাসনভার অর্পিত হলো। এইভাবে আবার উভয় বঙ্গকে জোড়া লাগিয়ে সপরিষদ একজন গভর্ণরের উপরে সমগ্র যুক্ত ভুখণ্ডের শাসন দায়িত্বভার অর্পণ করা হলো।

চক্রী সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের অভিসন্ধি সাময়িক ভাবে সফল হলো। দেশের চিরবিপ্লবী নেতাদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞর পর জাতীয়তাবাদীরা প্রায় সকলেই দেশের মধ্যে তদানীন্তন একমাত্র প্রকাশ্য ও আইনসঙ্গত জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হ'তে সরে এসেছিলেন। দীর্ঘ মেয়াদের জন্য লোকমান্য তিলক মহারাজের কারাদণ্ড, পাঞ্জাব-কেশরী লাজপত রায়ের দেশান্তর, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিন পালের গতিবিধির ওপরে খবরদারী এবং শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ ও বিপ্লবীচক্রের ওপরে ইংরাজ সরকারের অকথিত জঘন্য অত্যাচার প্রকাশ্যে যেন ব্রিটিশ-বিরোধী-আন্দোলনের উগ্রতায় অল্প বিস্তর ভাবে সাময়িক মন্দা আনলেও ভিতরে ভিতরে ভারতের নাড়ীতে তখনও অতি গোপনে চলছিল আর একদল বিপ্লবীর অগ্নি-সাধনা। যে দুর্নিবার প্রেরণা দেশের যুবগণের অন্তরে এসে সাড়া জাগিয়েছিল, তার সমাপ্তি সেদিন তো দূরের কথা আজিও বুঝি হয়নি। বিদ্রোহী ভারতের সেদিনকার সে মুক্তির জন্য অগ্নি-সাধনা আজিও তেমনি চলেছে এবং ভারতের এই মুক্তি পূর্ণ হবে জাতির পরম এক স্বার্থগন্ধহীন আত্মনিবেদনের মাঝে আজিকার এই রাজনীতিক নেতার দল যতদিন এই পরম সর্বাঙ্গসুন্দর মুক্তির মন্ত্রে না দীক্ষিত হবেন, ততদিন অখণ্ড ভারতের খাঁটি মুক্তি রূপ কিছুতেই নেবে না। না। না! মুক্তির নামের পাশ্চাত্য দেশগুলির মত ভারতের চলতে থাকবে নানা স্বার্থের হানাহানি ও ছিন্নমস্তার আত্মঘাতিনী লীলা। সে যাই হোক, বঙ্গভঙ্গ রোধ হলেও শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠীর লৌহকঠিন বজ্রমুষ্ঠি এতটুকুও সিথিল হলো না। নিত্য নতুন দমন নীতি প্রায় অব্যাহত ভাবেই দেশের উপর দিয়ে পৈশাচিক ভাবে চলতে লাগল।

সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন, বিপ্লব পন্থীদের প্রকাশ্য দমননীতির এই বেড়াজালের মধ্যে প্রকাশ্য আন্দোলন একপ্রকার অসম্ভব দেখেই বিপ্লবী চক্রের আন্দোলন নিঃশব্দে ফল্গুধারার মত অন্ধকারে অন্যের অলক্ষ্যে গুপ্ত পথে প্রবাহিত হয়ে চলল।

প্রাচ্যে তখন একটা বিপর্যয় ঝড়ের মত চারিদিক কালো করে অত্যাসন্ন হ'য়ে

আসছে। তখনকার সেই আন্তর্জাতিক পরিবেশই ভারতের গুপ্ত মুক্তি-আন্দোলনের আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। উপর্যুপরি কয়েকবার ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবীচক্র তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে, সহসা যেন এমন সময় বয়ে এল অনুকূল বাতাস। আগষ্ট ১৯১৪ সাল: সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে ঘনঘোর ঘটায় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সাম্রাজ্যলোভীদের হিংস্র নখরাঘাতে চারদিক বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে!

ভারতে যখন গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘ খণ্ড খণ্ড বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মাথা তুলে জাগছে, সুদূর প্রাচ্যে জার্মানীতে একদল ভারতীয় বিপ্লবী ভারতের বিরাট এক স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গোপনে গোপনে আয়োজন চালাচ্ছেন। ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দেশের বিপ্লবী চক্র আজ চালিয়ে গিয়েছে ধীর মন্থর গতিতে। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রের ও গোলা-গুলির অভাব তাদের অত্যন্ত বেশী বোধ করতে হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বিপ্লবী সঙ্ঘের অনেক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা অস্ত্রের অভাবেই অনেক সময় নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সামান্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি তাদের হাতে যা এসে পেঁছাত, কিছুটা তার ফরাসী চন্দননগর হতে গোপনে সরবরাহ হয়েছে, কিছু হয়েছে বিদেশ হ'তে চোরাকারবারীদের হাত দিয়ে, অতিরিক্ত মূল্যে। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ না হলে বড় রকমের একটা সশস্ত্র বিপ্লব যে সম্ভবপর নয়, একথা বিপ্লবীরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল। ঐ কারণেই হয়ত সুদূরে জার্মানীতে কয়েকজন বিপ্লবী গিয়ে বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। জার্মানী হতেই হরদয়াল কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিরাট মুক্তিগামী দল গড়ে তোলেন। হরদয়াল দিল্লীর বাসিন্দা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে পড়াশুনা করে স্টেট্ স্কলারসিপ নিয়ে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কিন্তু যে মুক্তির বেদনা অহর্নিশি তাঁর প্রাণে আগুনের মত জ্বলছিল, তা তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। পড়াশুনায় ইতি দিয়ে হরদয়াল দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন। কালিফোর্নিয়া থেকে হরদয়াল 'গদর' নাম দিয়ে এক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এবং ক্রমে ঐ 'গদর' পত্রিকাকে ভিত্তি করে 'গদর-দল' নামে বিরাট এক সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। জার্মানীতে থাকাকালীন সময়েই হরদয়াল বরকৎউল্লা ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সাহায্যে সুদূর প্রাচ্য ও কাবুলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কাবুল হ'তে জার্মানরা মুসলমানদের যে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে, তাহাই কালে "রেশমীচিঠি ষড়যন্ত্র" রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঐ সময়ে বিপ্লবীরা আরো একটি প্রচেষ্টা করেছিল, বাটাভিয়া ও শ্যামের পথে অস্ত্র আমদানী করে বাংলার সর্বত্র অস্ত্র ছড়িয়ে সমগ্র বঙ্গভূমে এক মহাবিপ্লবের সূচনা করবেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদর দল স্থির করে, বহু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে, ভারতে আসবে। এবং সেই পরিকল্পনানুযায়ী 'কোমাগাতা মারু' জাহাজে শিখ গদর নায়ক বাবা গুরুজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট গদর দল ভারতের দিকে রওনা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য!

গুপ্তচরের মুখে এ সংবাদ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কর্ণগোচর হ'তে দেরি হয়নি। এক বিরাট সশস্ত্র বিপ্লবের আশু সম্ভাবনায় তারা সচকিত হয়ে ওঠে, 'কোমাগাতা মারু' বজবজ এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই গদর দল শুনলে, তাদের ডাঙ্গায় নামতে দেওয়া হবে না। যখন তারা দেখ'লে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা বুঝি স্বপ্নবৎ হাওয়াতেই মিলিয়ে যায়, কুলে এসে তরী ডুববে! অসম্ভব! তখনই পরামর্শ করে স্থির হলো : অস্ত্রমুখে তারা সকল বাধা অতিক্রম করে জন্মভূমিতে পদার্পণ করবে। বীর স্বাধীনতাকামী সৈনিকরা মৃত্যুপণে রুখে দাঁড়াল।

গর্জে উঠলো একসঙ্গে অকস্মাৎ বন্দুক ও রিভলভার। শুরু হলো বাধাদানকারী সমগ্র পুলিসবাহিনীর ওপরে গুলিবৃষ্টি। বন্দুকের গুলিতে এলো প্রত্যুত্তর।

সকলে সচকিত হয়ে ওঠে হাজারো মিলিত কণ্ঠের উচ্চ চিৎকারে : ওরা গুরুজী কি ফতে! হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! গুলিবর্ষণ করতে করতে স্বদেশ প্রেমিকের দল গুলি খেয়ে কতজনে রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হয়, কত সৈনিকের শেষ নিঃশ্বাস বায়ুহিল্লোলে মিলিয়ে যায়। দু'পক্ষই গোলাগুলি চালায়।

পুলিস কমিশনার মিঃ হ্যালিডে আহত হলো; ২০।২৫ জন শিখ নিহত হলো। শেষ পর্যন্ত তারা পুলিসের সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রমুখে পরাজিত হল। দলের নেতা বাবা গুরুজিৎ সিং ২৯ জন সঙ্গীকে নিয়ে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। বাকী ৬০।৭০ জন পুলিসের হাতে বন্দী হলো।

বন্দী শিখদের বিচারার্থে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হলো। হাওয়ার বেগে কলকাতায় গদর দলের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের সংঘর্ষের কাহিনী পাঞ্জাবে ভেসে এল। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় এই সংবাদে একেবারে যেন ক্ষেপে উঠলো : বিপ্লবীদের সঙ্গে পিরোজপুরে পুলিসের এক সংঘর্ষ হলো। চৌ বিমান স্টেশন বিপ্লবীরা লুঠ করলো। এই সময়ই বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যুপণে এগিয়ে আসেন। যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাংলার সমস্ত বিপ্লবী দলকে একত্রে মিলিত করবার চেষ্টা করছেন তখন।

রাসবিহারী বসু। গায়ের রং ময়লা : উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান এক যুবক।

১৮৮৪ খৃঃ বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারীর জন্ম। রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী বসু ছিলেন সিমলাতে সরকারী ছাপাখানার **Head Assistant.** ছেলের লেখাপড়ায় তেমন মন নেই, অথচ নানাপ্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়ামে অত্যন্ত পটু। আর একটি বিশেষ গুণ ছিল রাসবিহারীর, ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, গুরুমুখী, মারহাট্টি প্রভৃতি অনেকগুলো বিভিন্ন ভাষার অদ্ভুত দখল।

১৯০৮ সালে ২রা মে যখন মুরারীপুকুরের বাগানে খানাতল্লাসী হয়, সেই সময় সেখানে কাগজপত্রের মধ্যে রাসবিহারীর দু'খানা পত্র পাওয়া যায়। সেই সময় বিপদের আশঙ্কায় শশীভুষণ রায়চৌধুরী রাসবিহারীকে দেরাদুনে পাঠিয়ে দেন। রাসবিহারী কিছুকাল ঐ সময় দেরাদুনেই থাকেন।

১৯১০।১১ঃ রাসবিহারী দেরাদুনে থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে সেখান হ'তে চন্দননগরে যাতায়াত করেন। ঐ সময়ই প্রকৃতপক্ষে রাসবিহারীর প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। তাঁর মনে হয় মুরারীপুকুরের দল ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির কর্মপন্থাই ঠিক। এবং সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাবেন স্থির করেন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে। দিল্লীতে আমিরচাঁদের সঙ্গে রাসবিহারীর আলাপ হলো। আমিরচাঁদের চেষ্টায় বালমুকুন্দ রঘুবর শর্মা, বালরাজ, হনুমন্ত সহায় ও দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচয় ঘটে। এঁরা সকলেই গদর দলের নেতা হরদয়ালের ভক্ত ও অনুবর্তী। অবশেষে রাসবিহারী হরদয়ালের সঙ্গেও পরিচিত হলেন।

আরো কিছুদিন পরে রাসবিহারী বাংলাদেশে এসে ১৫।১৬ বৎসরের একটি সুশ্রী তরুণ বসন্ত বিশ্বাসকে দেরাদুনে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

* * *

দিল্লী মহানগরী।

১৯১২, ২৩শে ডিসেম্বরঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক শোভাযাত্রা করে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেওয়ান ই-আম-এর দিকে চলেছে। ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লীতে সে প্রথম রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

বিরাট উৎসব। অগণিত মানুষের ভিড়, কত রাজা মহারাজা, সরকারী কর্মচারী, সৈনিক, একটি বিরাট শোভাযাত্রা। রাজপথের ধারেই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সুবৃহৎ ত্রিতল বাটী।

বহুলোক ভিড় করেছে দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সেই বাড়ীতে। দোতলায় মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েছে, সেই ভিড়ের মধ্যে একটি সুশ্রী তরুণীও তার জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না সেই সুশ্রী তরুণীটির আসল ও সত্যিকারের পরিচয়। পাশ হ'তে কে প্রশ্ন করে, তেরি নাম ক্যা বহিন ?

মৃদু সলজ্জ হাসিতে তরুণী জবাব দেয়। মেরি নাম। লীলাবতী!

বলার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী যেন নিজের গাত্রবস্ত্র সামলায়, ও কি! সর্বনাশ গাত্রবস্ত্রের তলে লুক্কায়িত ওটা কি ? একটা সাংঘাতিক বোমা, না ? হাঁ তাইতো ? বোমাই তো!

শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে ক্রমে কাছে। আচমকা লীলাবতী বস্ত্রান্তরাল হ'তে বোমাটি বের করে লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল। মুহূর্তে চারিদিকে হৈ-চৈ হুলস্থুল পড়ে যায়। লর্ড সাহেব আহত হয়েছে, শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আহত লর্ড হার্ডিঞ্জকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। চারিদিকে হৈ-হল্লা গোলমাল। এই ফাঁকে লীলাবতী সরে পড়ে।

অল্প কিছুদূরে রাস্তার একপাশে রাসবিহারী উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে। লীলাবতীকে দ্রুতপদে ঐদিকে আসতে দেখে রাসবিহারী এগিয়ে আসেনঃ বসন্ত!

হাঁ! কাজ হাসিল। তাহলে আমাদের লীলাবতী মোটেই তরুণী নয়! শ্রীমান বসন্ত! ধন্যি ছেলে! ধন্যি বুকের পাটা! সমগ্র দিল্লী নগরী জুড়ে

তখন ধরপাকড়, খানাতল্লাসী সুরু হয়েছে, ওরা দু'জনে সেই ডামাডোলের মধ্যে একেবারে স্টেশনে চলে আসেন। বসন্তকে লাহোরের গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজে দেরাদুনের গাড়ীতে চড়ে বসলেন রাসবিহারী।

দেরাদুনে এসে রাসবিহারী দিব্যি খোস্ মেজাজে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান, বড় বড় শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপপরিচয় হয়। বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ! কি ভয়ংকর কাজ। এক সভা হলো, সভাপতির আসন অলংকৃত করে রাসবিহারী তীব্র ওজঃস্বিনী ভাষায় বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ, এই গর্হিত কার্যের প্রতিবাদ করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। শ্বেতাঙ্গ দল বললে: Oh! What an angel Rashbehari.

দেখতে দেখতে ঐ ঘটনার পরে তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেল: ১৯১৩, ২৮শে মার্চ আইনের একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত হলো: পিনাল কোডের ১২০ 'ক' ধারা: ঐ আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি খুন করবে, সে ছাড়াও তার দলে থেকে যে বা যারা তাকে সাক্ষাৎ পরামর্শ দিয়েছে, এমন যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে খুনের সময় সে উপস্থিত না থাকলেও প্রথম ব্যক্তির মত তার সমান দণ্ড হবে।

বড় লাটকে বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর রাসবিহারী ও লাহোরের গুপ্তচক্রের অন্যান্য বিপ্লবীরা স্থির করে: বাংলা দেশে জগৎশশীর আশ্রমের ব্যাপারে যে গর্ডন সাহেব লিপ্ত ছিল, এবং যাকে খুন করতে গিয়ে বোমার আঘাতে মৌলবী বাজারে বিপ্লবী যোগেন্দ্র চক্রবর্তী নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাকে এবার চরম দণ্ড দিতে হবে। কিছুদিন আগে গর্ডন সাহেব মৌলবীবাজারে যখন হাকিম ছিল, তখন জগৎশশী আশ্রমে নির্দোষদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করেছিল। নিরীহ ডাক্তার ক্যাঃ মহেন্দ্র দেকে গুলি করে হত্যা করেছিল। অতএব গর্ডনের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তারপর গভর্ণর স্যার জেমস্ মেস্টনকে ও বড়লাট যখন কপূরতলায় আসবে তাকেও চরম দণ্ড দিতে হবে। এই সব কাজ করতে হলে কিছু বোমার প্রয়োজন।

১৯১৩: মার্চে রাসবিহারী চন্দননগরে গিয়ে কয়েকটা বোমা নিয়ে এলেন। ১৯১৩, ১৭ই মে: প্রথমেই বিপ্লবী বসন্ত গর্ডনকে লাহোরের লরেন্স উদ্যানে বেড়াতে এলে সাইকেলে চেপে এসে বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু গর্ডনের কোন ক্ষতি হয় না, রামপদার্থ নামে একজন দারোয়ান নিহত হলো। বিপ্লবীদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। পুলিশের কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস আপ্রাণ চেষ্টা করেও ঐ হত্যার রহস্য ভেদ করতে পারলে না।

*　　　*　　　*

১৯১৩: ২১শে নভেম্বর রাজাবাজারের অমৃত হাজরার বাড়ী খানাতল্লাসী করে পুলিশের কর্তৃপক্ষ। ঐ সময় একজন সভ্যের পকেটে একটি সাংকেতিক চিঠি ছিল। এবং ঐ চিঠির ভিতর থেকেই পুলিশ দিল্লীর বিপ্লবী আমিরচাঁদ ও আরও কয়েক জনের নাম জানতে পারলে। আর এই পত্রের সাহায্যেই পুলিশ বুঝতে পারে দিল্লীতে একটি বিপ্লবী সংঘ কাজ চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমির-

চাঁদের বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয় এবং অনুসন্ধানে দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতি কয়েকজনের নাম পুলিশ জানতে পারলে। দিল্লীতে ধরপাকড় শুরু হলো ; রাসবিহারী তখন লাহোরে। দীননাথও তখন লাহোরেই ছিল। পুলিশ দীননাথকে গ্রেপ্তার করলে। বিপ্লবী গুপ্তচরের মুখে রাসবিহারী সে সংবাদ জানতে পেরে ঐ রাত্রেই ট্রেনে চেপে দিল্লীতে চলে গেলেন।

অসম সাহসী ছিলেন এই বিপ্লবী রাসবিহারী। মুহূর্তে তিনি বেশ বদল করে চেহারার সম্পূর্ণ অদলবদল করে ফেলতে পারতেন, অনেকগুলো ভাষায় দখল থাকার দরুন তাঁর পক্ষে যখন তখন ছদ্মবেশ ধারণ করাটা খুবই সহজ ছিল। কখনো বাঙালী, কখনো শিখ, কখনো পাঞ্জাবী, কখনো উড়িয়া, কখনো মদ্রদেশীয় রূপে তিনি সরকারের চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে ভারতের সর্বত্র আত্মগোপন করে ঘুরে ঘুরে বিপ্লবী জীবনযাপন করছেন। তাঁর হৃদয়ে দেশের মুক্তির জন্য যে অনির্বাণ হোমানল জ্বলত, তার দাহনে তিনি যেন উম্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। এক বিরাট, বিপুল সশস্ত্র বিপ্লব প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে তিনি দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসনের চির অবসানের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, জীবনে তা সফল হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য হলেও চির আশাবাদী রাসবিহারী কোনদিন সামান্য হতাশাকেও প্রশ্রয় দেননি। অক্লান্ত কর্মী বিপ্লবীর সেদিনকার সে জীবনকাহিনী, তাঁর পরবর্তী জীবনের ধারার সঙ্গে হয়ত কোন মিলই ছিল না, কিন্তু তবু এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে সন্ত্রাসবাদের যুগে রাসবিহারীর মত বিপ্লবীর সত্যিই প্রয়োজন ছিল এই ভারতে।

পরবর্তীকালে তাঁর চাঞ্চল্যকর কর্মতৎপর জীবনের সঙ্গে আর এক বাঙালী বিপ্লবীর অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়েঃ বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সুভাষচন্দ্র নেতাজী। তিনিও রাসবিহারীর মতই যেন স্বপ্ন দেখেছিলেনঃ রক্ত দিয়েই ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। Give me blood I will give you freedom !

কিন্তু যা বলছিলাম। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় হতভাগা দীননাথ রাজসাক্ষী হয়ে নিজেদের সব গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়। পুলিশে এতদিনে রাসবিহারীর নাম জানতে পারে। বিচারে বালরাজ ও বসন্তকুমারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আর আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, ও আবেদবিহারীর হলো ফাঁসির আদেশ।

প্রিয়দর্শী বসন্তকুমারের অল্প বয়স থাকায় শ্বেতাঙ্গ জজ তার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ দেয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট লাহোর হাইকোর্টের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলেঃ তারা জজ সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট নয়, অতএব আবার বিচার হোক! আপিলে পুনর্বিচারে রায় দেওয়া হলোঃ Basanta to be hanged by neck till death.

যথাসময়ে নির্ভীক কিশোর হাসিমুখে ফাঁসির দড়িটি গলায় পরে দেশের তরে প্রাণ দিয়ে গেল। ইংরাজের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হলো।

এতদিনে নিঃসন্দেহে পুলিশ রাসবিহারীর নাম জানতে পেরেছেঃ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলেঃ রাসবিহারীর মাথার দাম ৭৫০০ টাকা। কিন্তু কিছু

হলো না। পুরস্কারের অংক আরো বাড়িয়ে দেওয়া হলো : বারো হাজার টাকা!

সদাজাগ্রত ধূর্ত ব্রিটিশ প্রহরীর চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে রাসবিহারী তখন কাশীতে মিছরীপোকরায় বসে আছেন নানা ছদ্মনামে ও ছদ্মপরিচয়ে। ঐ সময়কার আর একজন বিপ্লবী, ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় যাঁর কীর্তিকাহিনী চিরদিনের জন্য অক্ষয় হয়ে থাকবে, বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়! সশ্রদ্ধ নমস্কারে তাঁর অমর স্মৃতিকে দৃষ্টির শতদলে মেলে ধরছি অশ্রুনিবেদন।

যে একদল তরুণ একদা স্বপ্ন দেখেছিল. সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আবার একদিন শৃংখলিতা ভারতভূমির মুক্তি আসবে, আসবে আবার দেশের লক্ষ কোটি মুমূর্ষু হৃতসর্বস্ব, সর্বহারা জনগণের হারানো স্বাধীনতা, তাদেরই একজন ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। এই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসের পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি উল্টে গেলে আমরা বহুবার দেখেছি : যখনই কোন জাতি তার পরাধীনতার লৌহশৃংখল মোচনে সংগ্রামী হয়েছে, তখনই তাকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোন না কোন বৈদেশিক শক্তির অল্পবিস্তর সাহায্য নিতে হয়েছে। এবং বহুক্ষেত্রে এও দেখা গিয়েছে, যে কোন কারণেই হোক না কেন বহু বিদেশী সে প্রচেষ্টায় তাদের সাহায্যও করেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও নরম ও গরম দলের মত ও পন্থার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদল মৃত্যুঞ্জয়ী যুবক যখন স্বাধীনতার পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালতে জীবনমরণ পণ করেছিল, তখন সুদূরের জার্মানী সেই পঞ্চ-প্রদীপে অনেকটা তৈল সিঞ্চন করেছিল। কিন্তু আকস্মিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই সাহায্যের তৈলটুকু যেন ফুরিয়ে এল।

কিন্তু তবু চির আশাবাদী বিপ্লবীর দল হতাশ হলো না; ভারতের এক-প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশের শত অত্যাচার ও শ্যেনদৃষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দেখিয়ে নিজেদের সাধনার পথকে সুগম করে তুলতে অবহেলে বহু জীবন দিয়েছিল ডালি। এবং সেই সংগ্রামের পীঠস্থানই ছিল শস্য শ্যামলাং মলয়জ শীতলাং এই বঙ্গভূমি, আমাদের বাংলা দেশ। কত শহীদের বুকের রক্তে আজিও বুঝি বাংলার মাটি তাই রক্ত রক্তিম; স্মৃতির বিস্মরণদ্বারপথে আজো দেখি চলেছে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের নিঃশব্দ মিছিল। মৃত্যুগহন পার হয়ে যাদের পদধ্বনি আজিও শুনি অমৃতলোক হ'তে ভেসে ভেসে আসে দূর হ'তে কাছে, আরো কাছে, সেই দূর ও নিকটেরই একজন যতীন্দ্রনাথ। যাঁর অমর কীর্তিকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায় ভক্তিনত চিত্তে গেয়ে গেল আমাদেরই আর এক বিদ্রোহী কবি কম্বুকণ্ঠে :

> "বাঙ্গালীর রণ দেখে যারে তোরা রাজপুত, শিখ, মারাঠী, জাঠ,
> বালাশোর, বুড়ি বালামের তীর নবভারতের হলদিঘাট।"

* *

১৯১৪র য়ুরোপীয় যুদ্ধের ঘনঘটায়, যখন বিশ্বের আকাশ জুড়ে জমে উঠছে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ, বহু বিপ্লবী যারা তখনও গোপনে গোপনে

মৃত্যুপণে দেশের মুক্তির জন্য প্রথম দলের বিপ্লবীদের ব্যর্থতার পর আবার প্রস্তুত হচ্ছে, যতীন্দ্রনাথ তখন সেই সব বাংলার বিপ্লবীদের আবার একত্রে মিলিয়ে হাতে হাত মেলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আর বাংলার বাইরে চেষ্টা করেছেন বিপ্লবী রাসবিহারী।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সময় ঢাকা সমিতি চন্দননগরের দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়, কাশীর দলও ঐ ঢাকা সমিতির চেষ্টাতেই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সঙ্গে পরিচিত হয়। ক্রমে ঐভাবে এক বিরাট বিপ্লবীচক্র গড়ে ওঠে : পূর্ব বাংলা হতে শুরু করে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত। ঢাকা, চন্দননগর, কলকাতা, কাশী, লাহোর, দিল্লী জুড়ে এক রক্তরাখিতে যেন বাধা পড়ে এক বিরাট প্রাণশক্তি! কলকাতার রাজাবাজারে অমৃত হাজরা (ওরফে শশাংক) বোমার কারখানা গড়ে তুলেছে, কাশীতে রাসবিহারী ও শচীন সান্ন্যালের মিলিত চেষ্টায় চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। বেনারস, সিক্রোল, দানাপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, মীরাট, দিল্লী, রাওলপিণ্ডি ও লাহোরের সমস্ত সিপাহীদের মধ্যেও একযোগে বিপ্লবের ডাক পেঁছে গিয়েছে। তারা আবার স্মরণ করছে অতীতের ফেলে আসা ১৮৫৭র সেই চিরস্মরণীয় দিনগুলো। তরুণ বিপ্লবী হিরণ্ময় ব্যানার্জীর প্রচেষ্টায় নিত্যনিয়মিতভাবে অমৃত হাজরার কাছ হ'তে বোমা ও রিভলভারের আদানপ্রদান চলেছে।

চেম্পাকরাম পিলাই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে, হরদয়াল, বরকতউল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী হেরম্বলাল গুপ্ত প্রভৃতি বার্লিন থেকে য়ুরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, তুরস্ক, আফগানিস্থান, জাপান প্রভৃতি দেশগুলোতে যাতে ইংরাজ-বিদ্বেষ জাগে তার জন্যে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন। সুফি অম্বাপ্রসাদ ও অজিৎ সিং পারস্যে ও কাবুলে থেকে বিদ্রোহীদের কাজ করে যাচ্ছেন। চারদিকে চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি!

'কোমাগাতামারু'র ঘটনার অল্পকাল পরে কাশীতে এসে গোপনে হাজির হলেন সুদূর আমেরিকা হ'তে গণেশ দত্ত পিংলে ও বিনায়ক রাও কাপ্‌লে দুইজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী। পরামর্শ করে স্থির হলো : বিনায়ক বাংলা ভাষা জানেন, অতএব তিনি বাংলা দেশ ও এলাহাবাদে বিপ্লবের বার্তা নিয়ে যাবেন। আর পিংলে যাবেন পাঞ্জাবে। রাসবিহারী ও শচীন সান্ন্যাল থাকবেন কাশীতে।

এঁদের সঙ্গে কর্তার সিংও ছিলেন, তিনিও পিংলে ও বিনায়কের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করতে শুরু করলেন। দামোদরস্বরূপ গেলেন এলাহাবাদের সৈনিক নিবাসে ছদ্মবেশে সৈনিকদের দিতে বিপ্লবের আহ্বান। কাশীর সৈন্য শিবিরে গেলেন বিভূতি হালদার ও প্রিয়নাথ। রামনগরে বিশ্বনাথ পাঁড়ে ও মঙ্গল পাঁড়ে। সিক্রোলে দিল্লা সিং। জব্বলপুরে নলিনী মুখার্জী। রাসবিহারী ঘুরতে ঘুরতে পিংলের সঙ্গে এলেন অমৃতশহরে।

চারিদিকে বিপ্লবের অগ্নি-আহ্বান পেঁছে গিয়েছে : শীঘ্রই ভারতের একপ্রান্ত হতে আর একপ্রান্ত অবধি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে—প্রস্তুত হয়ে থাকুন।

ঢাকা হ'তে লাহোর অবধি বিদ্রোহের বিপুল আয়োজনে নেতারা ব্যস্ত।

ঢাকা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীতে তখন শিখ সৈন্য ছিল। লাহোরের শিখ ষড়যন্ত্রকারী সেনারা ঢাকার শিখদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য পরিচয়পত্রও পাঠিয়ে দিয়েছে।

ময়মনসিং ও রাজসাহী সুদূরের জঙ্গলে তরুণ যুবকেরা সন্ধ্যার পর কুচ-কাওয়াজ অভ্যাস করছে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণকৌশল শেখার জন্য বাঙালী যুবকেরা তখন বর্তমান 'রণনীতি' ইত্যাদি বই পড়ে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চয় করতো।

গদর দল আমেরিকায় বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জার্মানীর সাহায্যে আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারতে অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে। হাজার হাজার শিখ ও প্রবাসী ভারতীয় বিদ্রোহে যোগ দেওয়রা জন্য ভারতে ফিরে আসছিল। ত্রিশ হাজার রাইফেল, দু'হাজার পিস্তল, হাতবোমা, ও বিস্ফোরক পদার্থ, লক্ষ লক্ষ কার্তুজ ও বুলেট ইত্যাদি জাহাজে প্রেরিত হবে বলে নাকি ভারতে সংবাদও পৌঁছে গিয়েছিল বিপ্লবীদের কাছে। অস্ত্রশস্ত্র তো আছেই, লক্ষাধিক টাকাও নাকি ঐ সঙ্গে আসছে।

পরপর চার-পাঁচখানা অস্ত্রবোঝাই জাহাজ বিদেশ থেকে এসে বঙ্গোপসাগরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এলোও,—কিন্তু পথিমধ্যে সরকারের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারল না। সব বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের গোপন পরামর্শ চলতে থাকে জার্মানীর ভারতীয় বিপ্লব-কেন্দ্রে, তারা আন্দামানে নির্বাসিত বারীন, উল্লাসকর, হেমদাস, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতিকে মুক্ত করে জার্মানীতে নিয়ে যাবে। ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবের প্রস্তুতি প্রায় শেষ ঃ বিপ্লবী-চক্রের গোপন অধিবেশনে স্থির হলো, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উত্তর ভারতের সর্বত্র একযোগে সিপাহীমণ্ডলী কোষমুক্ত অসি নিয়ে সংগ্রামে হবে অগ্রসর। নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে মন্দিরে শয়তান প্রবেশ করল, রক্তপূজার আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এল, লখাইয়ের লোহবাসরে চুলপ্রমাণ ছিদ্রপথে প্রবেশ করলে দুর্দান্ত কালনাগিণী! এক যবন ডেপুটি সুপারিটেনডেন্টের কৌশলে কালনাগিণী গোয়েন্দা কৃপাল সিং কখন যে লৌহবাসরে প্রবেশ করেছে, কেউ তা জানে না। কৃপাল সিং অতি গোপনে সরকারের দপ্তরে সংবাদ পেঁৗছে দিয়েছে। হতভাগ্য চাঁদ সদাগরের লৌহবাসরেও মৃত্যু প্রবেশ করল।

সরকারের দপ্তরে সংবাদটা পেঁৗছানোর কিছু পরেই বিপ্লবীদল জানতে পারলে কালনাগিণী তার মৃত্যু-ছোবল হেনেছে। দুয়ার বন্ধ হলো, কৃপাল সিংকে বন্দী করা হলো। ২১শে বদলিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য করা হলো জাগরণের।

কৃপাল সিং নজরবন্দী ঃ বাইরে বের হবারও তার পথ নেই কোন, তাকে নিহত করাও যায় না। একেবারে, এখুনি তাহলে পুলিস সজাগ হয়ে উঠবে, সুরু হবে ধরপাকড়! এত আয়োজন সব হবে ব্যর্থ।

বিপ্লবীচক্রের কেউ কেউ তখনও কিন্তু জানে না যে কৃপাল সিং সরকারের গুপ্তচর। এই ত্রুটির ফাঁক দিয়েই কালসাপ কোন ফাঁকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আবার গিয়ে পুলিশে সংবাদ দেয়! না না, ২১শে নয় ১৯শে!

পাঞ্জাব প্রদেশের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার মাইকেল ও'ডায়ার আর কালবিলম্ব না করে এক ছাউনি হ'তে অন্য ছাউনিতে সৈন্য অদলবদল করে ফেলল।

নানা জায়গায় শুরু হলো জোর খানাতল্লাসী, বহুবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। দোষী-নির্দোষ বহু লোককে লাহোরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল!

১৯শে ফেব্রুয়ারীর পরিকল্পনা হলো ধূলিসাৎ।

রাসবিহারী কাশীতে আত্মগোপন করলেন: শচীন সান্ন্যাল ও পশুপতি গেলেন বাংলাদেশে। নগেন্দ্র দত্ত ও প্রিয়নাথ গেলেন চন্দননগরে।

রাসবিহারীর মাথার দাম এখন ১২৫০০ টাকাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিল্লী ষড়যন্ত্রের জন্য—৭৫০০ টাকা

লাহোর „ „ —২৫০০ „

বেনারস „ „ —২৫০০ „

ওদিকে জার্মানীর ভারতীয় বিপ্লব কেন্দ্র হ'তে বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, সুফি অম্বাপ্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন তুরস্কে এসে পেঁাচেছেন।

তুরস্ক থেকে এলেন ও'রা আফগানিস্থানে আমীরের দরবারে।

বিশেষ কোন আশা মিলল না আমীরের কাছ হ'তে; শ্বেতাঙ্গর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সে নারাজ। যদিও আফগানিস্থানের মন্ত্রী দেখালে সহানুভূতি।

কিন্তু সেপাইদের একযোগে ১৯শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় তাদের আফগানীস্থানের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভারত ও কাবুলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সমগ্র ভারত জুড়ে বিপ্লব অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও মিলিয়ে গেল নিশার স্বপ্নের মতই।

'জানি আমাদের শক্তি কম, কিন্তু তবু প্রচেষ্টা চাই। বার বার আঘাত হেনে হেনে ও বন্ধ দুয়ার একদিন খুলবই! একশত বার যদি বিফল হই, একশত একবারে হবো সফল নিশ্চয়ই।' চির আশাবাদী মুক্তিযজ্ঞের সৈনিক!...

বিপ্লবী কর্তার সিং ও হরনাম সিং কাবুলের পথে আবার অগ্রসর হলেন: কিন্তু রাস্তায় যে সেপাইদের তিনি বলতে গেলেন দেশের জন্য অস্ত্র ধরতে, তারাই তাদের ধরিয়ে দিল বিশ্বাসঘাতকতা করে। রক্তবীজের বংশধর!

বিষ্ণু পিঙ্গলে লাহোরে সর্বত্র ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী হচ্ছে শুনে মীরাটে এলেন পালিয়ে, লাহোরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, মীরাটের সৈন্যদের জাগাতে হবে: সঙ্গে ছিল তাঁর ১০টি বড় রকমের মারাত্মক বোমা।

আবার কালসাপের আবির্ভাব: মীরাট সৈনিক নিবাস।

পিঙ্গলে সৈনিকদের বলছেন: এখনও তোমরা করছো কি! সব একত্রে

অস্ত্রধারণ কর। এগিয়ে এসো বীর, শৃঙ্খলিতা মাকে তোমাদের মুক্তি দাও। ধারালো অসির আঘাতে আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দাও তার সর্বাঙ্গের লৌহশৃঙ্খল।

একজন মুসলমান দফাদার এগিয়ে আসে হিংস্র সর্পের মত নিঃশব্দে : ভেইয়া মেরা সাথ আও !···ম্যায়নে সব ইনতাজার কর দুঙ্গা !

পিঙ্গলে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই যবন দফাদারের সঙ্গে এগিয়ে এলেন।

দু'জনে কথাবার্তা বলতে বলতে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইনে এসে দাঁড়ায় : সামনে সর্বনাশ ! ওকি সশস্ত্র পুলিশবাহিনী !

পিঙ্গলের দু'চোখের তারা দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়।

সঙ্গের একটি ছোট বাক্সে বোমাগুলি ভরা ছিল : বোমার বাক্স সমেত পিঙ্গলে ধরা পড়লেন ১৯১৫-র ১৯শে মার্চ।

মাত্র কয়েকদিন আগে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাগীরথীর তীরে সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়লো হয়ত পিঙ্গলের।

* * *

নির্মল সলীলা ভাগীরথী বয়ে চলেছে একটানা কুল কুল বীচিভঙ্গে। সন্ধ্যার মন্থর বাতাসে ভাসিয়ে আনে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার সঙ্গীতধ্বনি। দেবাদিদেব বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতির সময় হলো বুঝি।

ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে।

সিঁড়ির ওপরে দু'টি আবছা মূর্তি চুপে চুপে কথাবার্তা বলে : রাসবিহারী ও পিঙ্গলে।

পিঙ্গলে তুমি যে কাজে যাচ্ছ তাতে কত বিপদের সম্ভাবনা আছে তা জান নিশ্চয়ই। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু অনিবার্য ! কথাটা ভেবে দেখেছো কি? অন্ধকারে যেন বিদ্যুৎশিখার মত একঝলক্ হাসি বিপ্লবীর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে ক্ষণেকের তরে : মরা বাঁচা আমি কিছু জানি না। যখন যা আদেশ দেবেন তখন তা পালন করবোই। তাতে মৃত্যুকেও যদি আলিঙ্গন করতে হয় তো হবে ! বীর সৈনিক ! Order is order !

পায়ের তলায় একটানা বয়ে চলে ভাগীরথীর নির্মল স্রোত : মা গঙ্গে ভুলেছো কি সেই চির অম্লান সন্ধ্যাটির কথা ! কবে কোন অতীতে তোমার কুলে বসে এক ধূসর সন্ধ্যার আবহাওয়ায় ভারতের এক বিপ্লবী সৈনিক মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করে নিজের সংকল্পে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, স্মৃতির অন্ধকার হ'তে আজিও কি সেই অশ্রুত প্রাণাঞ্জলির প্রতিজ্ঞা তোমার কুলু কুলু নিনাদকে ওঙ্কার ধ্বনির মত পূর্ণ করে তোলে না—রচেনা আবর্তের পর আবর্ত। ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বসন্তকুমার, বালমুকুন্দ, কর্তার সিং, জগৎ সিং প্রভৃতি অনেকের মত পিঙ্গলেও একদিন হাসিমুখে দেশের প্রতি শেষকৃত্য প্রাণাঞ্জলিতে দিয়ে গিয়েছিল : সমস্ত জাতির ঐ সকল পরমাত্মীয়রা, যারা আত্মীয় হতেও পরমাত্মীয়, বড় আপনার জন, তাদের কথা তো কোন দিনই আমরা ভুলতে পারবো না। এখনো তাদের কথা মনে হলে দু'চোখের দৃষ্টি অশ্রুবাষ্পে

ঝাপসা হয়ে আসে। প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দুর্নিবার কান্নার ঢেউ জাগে। বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে।

মানুষের ছদ্মবেশে ভুবনচারী দেবতার দল, আমরা যেন ভুলে না যাই, এই ভারতের মাটির পথেই তোমরা একদিন হেঁটে গিয়েছো, হেসেছো, কেঁদেছো। স্বপ্ন দেখেছো দেশকে আবার করবে স্বাধীন মুক্ত। তোমাদের পদরেণু আজিও ভারতের মাটির পরে মিশে আছে, সেই মাটিতেই মাথাটি আমাদের নোয়াই বার বার শতবার প্রণামের অশ্রুপুষ্পেঃ ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

শ্বেতাঙ্গ বণিকের বিচারসভায় সুরু হলো বিচার-প্রহসন একে একে।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাঃ অভিযোগঃ গদর পত্রিকা, কোমাগাতামারুর যাত্রীদের অবস্থাও পরিণতি, রাসবিহারীর প্রচারকার্য, গণেশবিষ্ণু পিঙ্গলের সহায়তা সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিঃ প্রথমবারে আসামী হয় ৬৬ জন।

১৯১৫, ৯ই নভেম্বর মামলা দায়রায় সোপর্দ করা হয়।

১৯১৬, ২০শে এপ্রিলঃ দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলাঃ

ফলাফলঃ ২৪ জনের ফাঁসি, ২৭ জনের দ্বীপান্তর। এবং অনেকের ৫, ৭, ১০ বৎসরের মেয়াদে দীর্ঘ কারাবাস।

ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুবরণ করে গণেশবিষ্ণু পিঙ্গলে, বিষেণ সিং, জগৎ সিং, সুরণ সিং, সুরণ সিং (২), হরণাম সিং ও কর্তার সিং।

রাজসাক্ষী দশজন, তাদের মধ্যে মুলো সিং ও সুচা সিং ছিল।

হাজার চেষ্টা করেও বিপ্লবী রাসবিহারীকে শ্বেতাঙ্গ শিকারী কুকুরের দল ধরতে পারেনি। পালিয়ে গেলেন তিনি ছদ্মবেশে সহকর্মী ও বাল্যবন্ধু পশুপতিকে সঙ্গে নিয়ে কাশী হ'তে ফরাসী চন্দননগরে। * * * ফরাসী চন্দন নগরঃ

একটি ব্রাহ্মণ এসেছেন সেখানে, স্থির সৌম্য মূর্তি। গলদেশে শুভ্র উপবীত, মস্তকে শিখা। কেউ এসে পায়ের ধুলো নেয়, কেউ নেয় আশীর্বাদ।

কয়েকদিন চন্দননগরে কাটিয়ে ব্রাহ্মণ এলেন নবদ্বীপে এক বৈরাগীর আশ্রমে। প্রতাপ সিং সে সংবাদ পেয়ে বৈরাগীর আশ্রমে এলো ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করতে।

কে, প্রতাপ সিং! এসো ভাই!

এ বেশ কেন?

বিদেশে যাচ্ছি ভাই। এখানে আর কোন সুবিধা হবে না। বিদেশে গিয়ে আবার নতুন করে চেষ্টা করবো।

আবার কবে দেখা হবে?

তা তো জানি না। হয়ত আর এ জীবনে দেখা নাও হ'তে পারে।

প্রতাপের দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে।

কাঁদছ কেন প্রতাপ! ছিঃ, বিপ্লবীর চোখে জল শোভা পায় না!

নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ এলেন আবার চন্দননগরে।

একখানা চিঠি ঃ সহকর্মী বিভূতিকে।

'ভাই আমি পাহাড়ের দিকে যাইতেছি! দু'ই বৎসর পরে আবার আসিব। সব ভার শচীন্দ্র ও গিরিজাবাবু (নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী-র ওপরে তুলে দিয়ে গেলাম।'

১৯১৫, ১২ মে দ্বিপ্রহর ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ছদ্মনামে জাপানের টিকিট কেটে ব্রাহ্মণ (?) এক জাহাজে যাত্রী হলেন।

পরিচয় দিলেন, বিশ্বকবি জাপান ভ্রমণে যাবেন, পি এন. ঠাকুর তার আগে থাকতে গিয়ে সব ব্যবস্থা করবেন জাপানে।

বিপ্লবী রাসবিহারী জাপানে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

বিপ্লবী রাসবিহারীর স্মৃতির ওপরে এইখানেই যবনিকাপাত হোক তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রণতি জানিয়ে। কারণ দুর্বলতাকে বাদ দিয়ে মানুষ নয়, মানুষ ভালবেসে সুখী, ভালবাসা পেয়ে হয় ধন্য! কিন্তু প্রেমের স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবীকে পথভ্রান্ত করবো না। তাই যে বিপ্লবী রক্তক্ষত চরণে অগ্নিদগ্ধ ভারতের মাটি হ'তে নিল বিদায় কোন এক বৃহত্তর স্বপ্নের আহবে, তার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে স্মৃতির রোমন্থন করবো না।

* * *

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ বাঘাযতীন!

ক্ষুধিত শার্দুলের হুংকারকে অবহেলা করে যে বাঙ্গালী বীর বাঘাযতীন হয়েছিলেন, যাঁর অশ্রুতর্পণে আজিও বুড়িবালামের তটভূমি জাতির তীর্থক্ষেত্র হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো চিরকালের জন্য, সেই বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ এই বাংলার শ্যামলিমার মধ্যেই প্রথম প্রাণস্পন্দন লভেছিল। কে বলে রে বাংলার ঘন সবুজের প্রাচুর্যে ঢাকা পড়েছে তার ত্যাগের গৈরিক! কে বলে বাঙালী যুদ্ধ করতে জানে না! কে বলে বাঙালী সামরিক জাতি নয়!

জোর করে আইনের প্যাঁচে ফেলে বাঙালীকে শ্বেতাঙ্গর দল একদিন অস্ত্রহীন না করলে বুঝতাম তোমাদের এই রাজ্যস্বপ্ন কোথায় থাকত!

১৮৫৭ সাল হ'তে ফিরিঙ্গীরা যত কলঙ্কের কালি নির্বিবাদে আমাদের গায়ে ছিটিয়ে এসেছে, তার সওয়াল জবাব তারা পেয়েছে বহুবার এই পদদলিত হৃত-সর্বস্ব ভারতবাসীর অস্ত্রমুখে ঃ সেই বহু সওয়াল জবাবেরই একটি খণ্ডাংশ ঃ ১৯১৫ সনের বুড়িবালামের তীরে পাঁচটি বীর বাঙালী যুবকের অস্ত্র ও গোলা-গুলির মুখে অগ্ন্যুদ্গারে ও রক্তাঞ্জলিতে!

বিপ্লবের হোমাগ্নিশিখা হ'তে এক ঝলক অগ্নি যেন সহসা বাংলার আকাশকে রক্তারিত করে ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে গেল দিগন্তে, পশ্চাতে উত্তর বাংলার জন্য রেখে গেল স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপ্রতিজ্ঞা।

গল্প নয়, নয় কাহিনী ঃ মাত্র ৬৭ বৎসর আগে এই বাংলা দেশেরই ছায়া-সুনিবিড় শান্ত পল্লী কয়া, কুষ্ঠিয়া মহকুমায়। গ্রামের পাশ দিয়ে বহে গেছে

গড়াই নদীটি।

উমেশচন্দ্র মুখার্জীর স্ত্রী শরৎশশী দেবীর গর্ভে ১৮৮০, ৮ই ডিসেম্বর একটি শিশু জন্মাল। দিন যায়, শিশুর বয়স বাড়েঃ মার যেমন ছেলে-অন্ত প্রাণ, ছেলেরও তেমনি মা-অন্ত প্রাণ। কি দুষ্টুই যে ছেলেটি হচ্ছে দিনকে দিন, অথচ মা দেন তার দুরন্তপনায় উৎসাহী।

এই তো চাই! এমন নাহলে ছেলে, এমন নাহলে মা!

রাস্তায় একটা কুকুর তাড়া করেছে, ছেলে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসে রন্ধনরতা মাকে পশ্চাত হ'তে জড়িয়ে ধরে দু'হাতেঃ মা! মাগো!

কিরে? অমন করে ছুটে এলি কেন?

একটা কুকুর মা।

মা উঠে দাঁড়ান, উনুনের পাশ হ'তে একটা কাঠ তুলে নিয়ে বললেনঃ যাও এই কাঠটা দিয়ে কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দাও গিয়ে। যাও।

ছেলে মায়ের মুখের দিকে তাকায়ঃ মায়ের চক্ষু তো নয় যেন অন্ধকারে দুটি জ্বলন্ত মশাল-বর্তিকা। ছেলে হাত বাড়িয়ে দেয়।

বালক কিশোর আরো নির্ভীক আরো দুর্দান্ত হয়।

মা ও ছেলে গড়াই নদীতে স্নান করতে গিয়েছে। মা ছেলেকে দু'হাতে তুলে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, ছেলে আবার সাঁতরে এসে মাকে ধরে।

বাঘা যতীনের মা যে!

এমন মায়ের ছেলে না হলে কি শুধু হাতে কেউ বাঘের সঙ্গে লড়তে পারে!

পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে শরীর-চর্চাও চলতে থাকেঃ ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ! সত্যম শিবম্ সুন্দরম্!

সেবারে কয়াগ্রামে হঠাৎ বাঘের উৎপাত দেখা দিয়েছে; এর বাড়ীর ছাগল, ওর বাড়ীর গরু ব্যাঘ্ররাজ নির্বিবাদে হজম করে চলেছেন।

যতীনের কানে যখন কথাটা পেঁছাল, আর দেরি নয়, কয়েকজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে চলল কোথায় বাঘ ঘাপটি মেরে বসে আছে খুঁজে বের করতে।

দলের মধ্যে যতীনের এক জ্ঞাতিভ্রাতার হাতে এক বন্দুক ও যতীনের হাতে একটি ছোরা। মাত্র এই হাতিয়ার সম্বল ব্যাঘ্র শিকারের অভিযানে।

ব্যাঘ্ররাজের দেখা পেতে বিলম্ব হলো নাঃ সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছুটলো। সর্বনাশ! লক্ষ্য ভ্রষ্ট! বিরাট এক হুঙ্কার ছেড়ে ব্যাঘ্র মশাই দিলেন এক লাফ একেবারে যতীনের ঘাড়ের ওপরে। বীর জননীর বীর সন্তানঃ এক হাতে ক্রুদ্ধ বাঘের গলাটা লৌহবেষ্টনীতে জড়িয়ে অন্য হাতে যতীন সুরু করলেন ছোরা চালাতে। শক্তিতে কেউ কম যায় নাঃ তেজও কারু কম নয়।

অবশেষে মানুষের শক্তির কাছে পশুশক্তি হার স্বীকার করলে।

যতীনের অবস্থাও সংগীন। তারপর দীর্ঘকাল ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীর চিকিৎসাধীনে থেকে যুবক ভাল হয়ে উঠল! লোকে বল্লে, 'বাঘা যতীন'!

মুখে মুখে নামটা প্রচার হয়ে গেল সর্বত্রঃ বাঘা যতীন! বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঘকে মেরে যে হলো বাঘা যতীন!

আর এক দিনের ঘটনা ঃ ভারতের শ্বেতাঙ্গ প্রভু পঞ্চম জর্জের সিংহাসনে আরোহণের উৎসব সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়ে।

কলকাতা শহরও রোশনাই আলোকমালায়, লাল, নীল, সবুজ, নারাঙ্গী— যেন ফুলঝুড়ি ছড়াচ্ছে চারদিকে অগুন্তি মানুষের।

একটা গাড়ীর ছাতে কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক বসে আলোকশোভা দেখছে। সহসা কোথা হতে জনকয়েক কাবুলী সেখানে এসে হাজির। জোর যার মুলুক তার। অতএব কাবুলীরা গাড়ীর ছাতের উপর থেকে ভদ্রলোকদের একপ্রকার জোর করেই নামিয়ে দিয়ে নিজেরা গিয়ে গাড়ীর ছাতের ওপরে ঠেলে উঠল। গাড়ীর মধ্যে বসে কয়েকজন ভদ্রমহিলা ঃ ধুলি-ধুসরিত নাগরা শোভিত পদ যুগল কাবুলীদের ঝুলছে মহিলাদের প্রায় মুখ ছুঁয়ে। নিরুপায় ভদ্রসন্তান কয়টি একপাশে সরে দাঁড়িয়ে নিজেদের গৃহলক্ষ্মীর অবমাননা দেখছে। উপায় কি!

ভিড়ের মধ্যে একজনের নজর কিন্তু এড়ায়নি ব্যাপারটা ঃ সিংহপুরুষ বাঘা-যতীন হুংকার দিয়ে এগিয়ে এলেন এবং নিমেষে কাবুলবাসীদের ঘাড়ে ধরে নীচে নামিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাংলার শান্ত-শীতল শ্যামলিমার সুনিবিড় ছায়া-তলেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঘুমিয়ে থাকে এবং সেখানে কাবুলের পাহাড়ী দুর্দান্ত শক্তিকেও মাথা নীচু করতে হয়। ব্যাঘ্ররাজ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঃ বাংলার মাটিতে মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা হুংকার শোনা যায় ঃ আকাশ-বনানী কেঁপে কেঁপে ওঠে ঃ

১৮৯৮ সালে এণ্ট্রান্স পাস করে যতীন্দ্রনাথ এলেন এফ্. এ. পড়তে কলকাতায়। সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্তি হলেন। পাঠ্যপুস্তকে কোন আকর্ষণই যেন নেই ঃ বুকের তলে তলে জ্বলছে পরাধীনতার তুষের আগুন, শান্তি তার কোথায়! কলেজ ছেড়ে দিয়ে সুরু করলেন স্টেনোগ্রাফি শিখতে।

বোধ হয় স্টেনোগ্রাফিতে মন বসে গিয়েছিল, চট্‌পট্ ব্যাপারটা করায়ত্ত করে নিলেন। ছোটখাটো দু'এক জায়গায় চাকুরি করে, স্থায়ী চাকুরী নিলেন বাংলা সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের কাছে।

ব্যাপারটা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, কেমন যেন হাস্যকরও মনে হয় ঃ পরাধীনতার গ্লানি, দাসত্বের অবমাননা, কিশোরকাল হতেই যে মনের মধ্যে এনেছিল বিষের জ্বালা, আজ সে কেমন করে সেই দাসত্বকেই মেনে নিল সেটাই আশ্চর্য!…

না এ সেই বিশ্ববিধাতারই ইঙ্গিত তাই বা কে জানে! গিরিকন্দর হ'তে যে ধারা উচ্ছল আবেগে নেমে এসেছে, তাকে রোধ করা যায় না ঃ পথভ্রান্ত পথিক ইতস্তত তাকায় পথের সন্ধানে ঃ পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

নবকুমার চকিতে পশ্চাতের দিকে তাকালেন ঃ আহা কি রূপ! আলুলায়িত-কুন্তলা নিরভরণা এ কি কোন বনদেবী? না না, বনদেবী নন ঃ শৃংখলিতা ভারতমাতা। দু'নয়নে অশ্রুধারা। কেমন করে তোমায় মুক্ত করবো মা? কোন্ পথে যাবো? আমায় পথ দেখাও।

কল্পলোকে ভেসে ওঠে একটি পথ, যে পথের প্রান্তে শৃংখলিতা দেশজননী ঃ

যার অশ্রুআবিল দু'টি চক্ষু, ম্লান দীপবর্তিকা ঃ সে পথ, ঘন দুর্যোগ যে পথের সাথে জড়িয়ে আছে, যে পথ কণ্টকে কণ্টাকাকীর্ণ। সংগ্রামের পথ ঃ পথিকের পথচলা হয় সুরু।

বিপ্লবীর সাধনা হলো সুরু ঃ আত্মানং বিদ্ধি! চললো নিজেকে জানবার সাধনা। আবার সেই পুরোনো কাহিনী, বঙ্গভঙ্গ ঃ ১৯০৫ ঃ

প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী যখন নীরবে নিভৃতে কেঁদে মরছে, সর্বংসহা ধরিত্রীর বুকখানি বেদনায় ফেটে চৌচির হয়ে গেল ঃ সর্পিল ক্রুর বহ্নিশিখার মত উঠছে বিপ্লবের মৃত্যু-আহ্বান ধরিত্রীর অসংখ্য ফাটলে সেই অনুচ্চারিত মরণ আহ্বান যতীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করলে।

১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতিতে যতীন্দ্রনাথের নাম লেখা হলো ঃ বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ বিপিন পালের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা তাঁকে বিচলিত করেছিল। দীক্ষা হলো শিকল ছেঁড়ার বহ্ন্যুৎসবে।

* * *

আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান। আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ। দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারি হুঁসিয়ার।

অলক্ষে খল খল হাস্যে ভাগ্যবিধাতা যে ফঁসিয়া বেড়ায়। দুর্মদ ঝড়ের বেগে আকাশ কালো হয়ে আসে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।

১৯০৯ সালের গোড়ার দিকে শ্বেতাঙ্গ পদলেহী পাবলিক প্রসিকিউটার আশুবাবু বিপ্লবীর গুলিতে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তখন হতেই পুলিশের নজর যতীন্দ্রনাথের উপর ঃ মানিকতলার বোমার মামলাও তখন চলেছে।

গুপ্ত বিপ্লবীচক্রের সংগ্রাম তখন পুরাদমেই চলেছে ক্ষণে ক্ষণে বজ্র-বিদ্যুতের চকিত ইসারার মত। আরো কতকগুলো ব্যাপারে ফিরিঙ্গীদের সন্দেহ যতীন্দ্র-নাথের উপরে এসে পড়ে। ১৯০৮-১৯০৯ সালের মধ্যে কতকগুলো ডাকাতি হয় এবং প্রকৃতপক্ষে ঐসব লুণ্ঠন ব্যাপারে বিপ্লবীচক্রের হাত ছিল বলেই অনুমান। শিবপুরের ডাকাতি সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের মামা কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর মুহুরী নিবারণকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ৯ই নভেম্বর নন্দলাল ব্যানার্জী নিহত হলো।

বিশ্বাসহন্তা ললিতমোহন চক্রবর্তী ১৯০৯ সালের ৯ই নভেম্বর এক স্বীকারোক্তি দেয় ঃ ঐ স্বীকৃতিতে সে গুপ্ত সমিতির ৩২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং বলে, যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী সমিতির একজন নেতা। এই স্বীকারোক্তির ফলে মৌলভী সামসুল আলম 'হাওড়া ষড়যন্ত্র' নামে এক বিরাট মামলা তৈরি করে। কিন্তু মৌলভীর আশা পূর্ণ না হতেই অকস্মাৎ ১৯১০, ২৪শে জানুয়ারী তার মাথার উপরে অমোঘ মৃত্যুদণ্ড নেমে এল। মৌলভীর মৃত্যুদণ্ড-দানকারী বীরেন পুলিশের হাতে ধরা পড়লো।

কেন তুমি এ কাজ করলে? বীরেনকে প্রশ্ন করা হলো। যা তোমাদের ইচ্ছা আমাকে নিয়ে করতে পার, আমি কিছুই বলব না।

২৭শে জানুয়ারী যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হলেন যতীনবাবু, অধুনা আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সুরেশ মজুমদার, যতীন্দ্রনাথের মামা ললিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর মুহুরী নিবারণ মজুমদার। বিচারে বীরেন দাশগুপ্তর মৃত্যুদণ্ড হয়।

নির্ভীক যুবক একটি কথাও বললে না, আত্মপক্ষ সমর্থন করে: তার কোন অভিযোগই নেই। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফাঁসির দিন স্থির হয়ে গেল। কিন্তু···

চক্রী শ্বেতাঙ্গ জাত! তাদের চক্রান্তের বুঝি তুলনা হয় না!

বেলোয়ারী চুড়ি, কাচের বাসন ও পুতুল ঝাঁকা ভর্তি করে একদা ফিরিঙ্গীরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সুবে বাংলার মাটিতে পা ফেলেছিল।

বেলোয়ারী পাত্রের রঙিন সুরার সঙ্গে তারা যে কি বিষ মিশিয়ে ধরলে, কানে কানে গোপনে কি পরামর্শই যে দিলে দিনের পর দিন, রাজতক্ত পর্যন্ত সেই বিষের কালিমায় কালো হ'য়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল: সিপাহশালার সেই বিষ আকণ্ঠ পান করে সংক্রামিত করে গেল তার দুর্নিবার ক্রিয়া বহুজনের মধ্যে।

তারই ক্রিয়ায় বীর বিপ্লবী বীরেনও মুহ্যমান হয়েছিল মুহূর্তের জন্য।

জেলের মধ্যে গোয়েন্দা কুকুরের দল ঘন ঘন যাতায়াত করছে, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারে না। অবশেষে এক জঘন্য চাল চালল তারা, একমাত্র ফিরিঙ্গীদের দ্বারাই হয়ত সেটা ছিল সম্ভব। বিপ্লবীচক্রের কাগজ এক সংখ্যা যুগান্তর এনে বীরেনকে দেখানো হলো। আসলে কিন্তু কাগজখানা একেবারে সম্পূর্ণ নকল, ফিরিঙ্গীদের নিজেদের ছাপা।

দেখ হে ছোকরা, তোমাদেরই দলের লোক তোমার বিরুদ্ধে তোমাদেরই বিপ্লবীদের মুখপত্র যুগান্তরে কি লিখেছে। 'বীরেন কাপুরুষ! নেতা কর্তৃক নিয়োজিত হইলেও সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারে নাই। বিনা কারণে গুলি ছুঁড়িয়া ধরা দিয়াছে এবং দলকে দমাইবার জন্যই ধরা দিয়াছে।' যে অসমসাহসী বীর একটিমাত্র প্রতিবাদও না করে, আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা পর্যন্ত না করে অবিচলিত সুমহান চিত্তে ফাঁসির দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে, অভিমানে তার হৃদয় ভরে ওঠে।

হায় বিপ্লবী, মান-অভিমান যে তোমার জন্য নয়, তা কী তুমি জানতে না! এ জগতের যাবতীয় সব-কিছু অম্লান হাসিমুখে জীবন হ'তে বিসর্জন দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির লাগি যে প্রতিজ্ঞা তুমি নিয়েছিলে, তুমি একবারও বুঝলে না, নিছক অভিমানের বশবর্তী হয়ে তা' হতে তুমি ক্ষণেকের জন্য চ্যুত হলে! কপালজোড়া অক্ষয় অনির্বাণ রক্ততিলকের পাশে একটি ছোট্ট কালির বিন্দু এসে পড়ল। অম্লান কুসুমে কীট দংশন করলে।

দেখুন আপনি যতীনবাবুকে বাঁচালেন, আর সেই যতীনবাবু নেতা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে এইভাবে অপবাদ দিলেন। বটেই তো! যতীনদা কি জানেন না যে আমি কাপুরুষ নই!

অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে বের হলো এক স্বীকৃতি। কিন্তু সে লজ্জার কলঙ্ক-কালিমা মুছে দিয়ে বীর হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িটি গলায় তুলে নিল ২১শে ফেব্রুয়ারী। আকাশে তখন ঊষার সোনালী আলোর রক্ত পরশ লেগেছে। বীরেনের নির্ভীক আত্মদানে ২১শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য রক্ত-হাসিতে জানিয়ে গেল শহীদ বীরেনের সাক্ষী রইলাম আমি ২১শের অংশুমালী!

অভিমানে অন্ধ হতভাগ্য জানলে না পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ কতখানি ভালবাসতেন তাকে। আগাগোড়া সবটাই ফিরিঙ্গীদের কারসাজি।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সময়ই সরকার জানতে পারে: যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ উদ্যমের প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতা। তাঁরই উপরে ন্যস্ত ছিল নদীয়া, রাজসাহী, যশোহর ও খুলনার সকল ভার। ননীগোপাল সেনগুপ্ত ২৪ পরগণার নেতা। ইন্দ্রনাথ ছিলেন অস্ত্রাদির যোগানদার।

তবু এত করেও এবং দীর্ঘকাল ধরে যতীন্দ্রনাথকে কারাগারে আটকে রেখে মামলা চালিয়েও তাঁকে অভিযুক্ত করা গেল না। যতীন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেন।

বাঘাযতীনকে বাঘে ছুঁয়েছে, আর বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। অতএব সরকারী চাকুরি ছাড়তে হলো তাকে। এতদিনে বুঝি বিপ্লবীর কর্মের সত্যিকারের সুযোগ এলো।

তিনি একটা মহাসত্য উপলব্ধি করেছিলেন: পরাধীন ভারতকে আবার মুক্ত ও স্বাধীন করতে হলে সর্বাগ্রে যে বস্তুটির প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এক মহাশক্তিশালী এবং ব্যাপক সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। এবং তার জন্য প্রয়োজন বাংলার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট বিপ্লবী চক্রগুলিকে একসূত্রে নিয়ে আসা। আর প্রয়োজন ইংরাজ-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা ও সাহায্য।

নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ।

যারা তাঁর সংস্পর্শে এলো, বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তারাও মাথা নত করলে। কোথায় মিলবে খাঁটি কর্মী? দেশের লাগি কে দেবে প্রাণ!

কে আছো বীর এগিয়ে এস, খড়্গ ধর, কৃপাণ লও। মায়ের চরণে গ্রহণ করো প্রতিজ্ঞা! হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ অবনী মুখার্জীর মধ্যে দেখা পেলেন অত্যুৎসাহী এক তরুণ কর্মীর।

তাকে তিনি দলে টেনে আনলেন এবং পরামর্শ করে তাকে বিদেশে পাঠালেন বিপ্লবের প্রস্তুতির পথে। অবনী জাপানে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন, কিন্তু নিরাশ হলেন না। গেলেন জার্মানীতে।

এদিকে তখন পাশ্চাত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে যুদ্ধের ঘনঘটা: প্রলয় ডম্বরু উঠছে বেজে থেকে থেকে। নাগিনীরা নিঃশ্বাস ছড়াচ্ছে।

১৯১৪ সাল: দুই সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ হয়েছে শুরু। আর এদিকে শস্য-শ্যামলা বাংলার শহরের গলিতে বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে অত্যাচারীরা। ঠিক এমনি সময়ে সরকার পক্ষের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বার্লিন ভারতীয় বিপ্লব 'চক্রের' অন্যতম সদস্য জিতেন লাহিড়ী নিরাপদে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে জিতেন লাহিড়ীর দেখা হলো, অনেক শলা-পরামর্শ হলো,

শেষে 'বিষ্ণু এণ্ড কোম্পানী' নামে এক কাল্পনিক কোম্পানীর এজেণ্ট হয়ে অবনী মুখার্জী জাপানে গেলেন।

বিশেষ কোন ফল হলো না প্রচারেও, অবশেষে তাঁর দেখা হয়ে গেল চীনের রাষ্ট্রগুরু, চীনের মুক্তিদাতা পথপ্রদর্শক ডাঃ সুনিয়াৎসেনের সঙ্গে। সুনিয়াৎসেন তাঁকে দিলেন সাহস ও উৎসাহ এবং সেই সঙ্গে দিলেন ৫০টি পিস্তল, কার্তুজ ও বহু টাকা। কিন্তু রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে দেশে ফিরে আসবার হুকুম ছিল না, তাই ঐ জিনিসগুলোও আর কোনদিনও দেশে পেঁছাল না এসে।

হায়! অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস!

কারণ রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত খবরাখবর নিয়ে ভারতে আসবার পথেই অবনী সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হলেন এবং সেইখানেই তাঁর বিচার শেষ করে সিঙ্গাপুরেই অবনীকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

দেশকে আবার মুক্ত করবার স্বপ্ন নিয়ে, দেশপ্রেমিক দেশের জন্যই দেশ হ'তে বহু দূরে পাকানো একটি দড়ির ফাঁসে দেশের প্রতি তাঁর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে অঞ্জলি পুরে নিঃশেষে প্রাণটুকু দিয়ে গেল হাসতে হাসতে। বিপ্লবী চিরজীবী হউক! বিদ্রোহী ভারত! তোমার চরণে আবার নোয়াই মাথা! আর এদিকে ১৯১৪ সনের আগস্টের এক সন্ধ্যা:

সংবাদপত্রে সেদিন বড় জোর খবর: হকাররা চিৎকার করছে: টাটকা খবর বাবু, টাটকা খবর: পড়ে দেখুন!

বিখ্যাত অস্ত্রবিক্রেতা রডা কোম্পানী হ'তে ৫০টি মশার পিস্তল ও ৪৬০০০ রাউণ্ড গুলি কেমন করে না-জানি চুরি হয়ে গিয়েছে। ফিরিঙ্গীর দল কেঁপে ওঠে: শিকারী কুকুরগুলো হন্যে হয়ে শহর তোলপার করে ঘোরে। করুক তারা তোলপাড় সমস্ত শহর। এতক্ষণে ঐ পিস্তল ও গুলিগুলো বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের মধ্যে বণ্টন হয়ে গিয়েছে। মৈমনসিং, বরিশাল সর্বত্র!

১৯১৫ সাল: ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ঐ সালটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন। কারণ ঐ বৎসরেই কলকাতায় থানা পুলিশ ও গোয়েন্দাদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবী নেতাদের এক জরুরী গুপ্ত বৈঠক হয়।

ঐ বৈঠকেই জার্মানদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ভারতব্যাপী এক বিরাট সশস্ত্র ব্যাপক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়। সবাই একমত। পরাধীনতার এ অসহ গ্লানি আর সহ্য হয় না। হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু! স্থির হলো নিকট হ'তে দূর-দূরান্তে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরী হবে: ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, শ্যাম, ব্যাংকক্, বাটাভিয়া, পোল্যাণ্ড, সাংহাই, সিঙ্গাপুর ও জাভা সর্বত্র যোগাযোগ থাকবে।

আরো থাকবে সানফ্রানসিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া ও বার্লিনের সঙ্গে। সর্ববাদিসম্মতক্রমে নেতা হলেন যতীন্দ্রনাথ। এ তাঁরই পরিকল্পনা।

কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই প্রচুর অর্থ। ভিক্ষায় পেট ভরবে না। চাঁদা দিয়ে দেশের লোকও সাহায্য করবে না। অতএব ডাকাতি করে জোর করে লুণ্ঠন করে আনতে হবে। প্রস্তুত এ প্রস্তাবে তোমরা! সর্বকণ্ঠে ধ্বনিত হলো: প্রস্তুত! শুরু হলো লুণ্ঠন।

১২ই জানুয়ারী গার্ডেনরীচে: বার্ড এণ্ড কোম্পানীর ১৮,০০০ টাকা লুঠ।

২২শে ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটায় ৪০,০০০ টাকা লুঠ। পুলিশ ও গোয়েন্দারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে: মাদারীপুরে যে সব যুবকদের সরকারের লোকেরা সন্দেহ করত তাদের গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখবার জন্য গোয়েন্দা দারোগা সুরেশ মুখার্জী নির্দিষ্ট হয়।

কিন্তু হতভাগ্যের দিন শেষ হয়ে এসেছিল: ২০নং ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে এক বাড়ীতে বিপ্লবীদের যাতায়াত আছে ওই জানতে পারে সর্বপ্রথম। তার আশেপাশে লুকিয়েচুরিয়ে ঘোরাফেরা শুরু করে আরো উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এবার বুঝি বরাত খুলল। এমন সময় ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্য দিবালোকে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে চিত্তপ্রিয়ের গুলিতে সুরেশের জীবনান্ত হলো। প্রমোশন ও পুরস্কারের বুকভরা আশা নিয়ে সুরেশ মুখার্জী এ পৃথিবীর মাটি হ'তে বিদায় নিল। বুকের রক্ত দিয়ে করলে হতভাগ্য তার লোভ ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মাদারীপুরের বিপ্লবীচক্রের প্রাণ ছিল চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন ও নীরেন। অসম-সাহসী তিনটি তরুণ। যতীন্দ্রনাথের এরা ছিল নিত্যসঙ্গী। কলকাতা, পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চল। সরু একটি প্রায়ান্ধকার নির্জন গলি: তার মধ্যে পুরাতন আমলের দোতলা একটি বাড়ী: নম্বরটা ৭৩। মানুষের যাতায়াত এদিকটায় বড় একটা নেই।

ফণীভূষণ রায় নামে এক ভদ্রলোক বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে আছেন।

ফণীভূষণ অত্যন্ত সাদাসিধে ও নির্বিরোধী লোক, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ২৪শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সেদিন।

কলকাতা শহরে শীতটা তখনও যেন একেবারে যায়নি, যাই যাই করছে।

সকালবেলা একটি লোক নিঃশব্দে এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে নির্জন গলিপথে ৭৩নং বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল: গোমস্তা মশাই আছেন! ও গোমস্তা মশাই! ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে চিৎকার শুরু করে।

পাশের বাড়ী হ'তে কে একজন প্রশ্ন করলেন: কাকে চান মশাই?

এটাই তো ৭৩নং বাড়ী? এখানে গোমস্তা মশাই থাকেন বলতে পারেন?

জানি না, বাড়ীর মধ্যে লোক আছে, ভিতরে গিয়ে খোঁজ করুন।

লোকটি আর দ্বিরুক্তি না করে সরাসরি দ্বিতলে উঠে গেল। সামনেই একটা ঘর: কয়েকজন তরুণ ও একজন মধ্যবয়সী লোক ঘরের মেঝেতে বসে পিস্তল সাফ করছে। লোকটি যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠে দাঁড়ান: কে?

সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক বলে ওঠে স্মিতভাবে: আরে কে ও, যতীনবাবু না?

হাঁ, যতীনবাবুই। বাঘা যতীন! শার্দুলের গহ্বরে পা দিয়েছো মূর্খ!

বজ্রগম্ভীরস্বরে বাঘা যতীনের নির্দেশ শোনা যায়ঃ Shoot!

মুখের আদেশ শেষ না হতেই আগন্তুক একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেঃ দোহাই বাবা! মেরো না বাবা! আমি একেবারে তাহলে খুন হয়ে যাবো বাবা! কিন্তু সকাতর মিনতিতে কোন ফল হলো না। অমোঘ কঠোর আগ্নেয়াস্ত্র বজ্রগর্জনে হুংকার দিয়ে উঠল ঃ দ্রুম্! বিদ্যুতের মত অগ্নিঝলক! বারুদ ধোঁয়া ঃ একটা আর্ত করুণ চিৎকার ও ভারী দেহ পতনের শব্দ। হতভাগ্যের নাম নীরদপ্রকাশ হালদার, চাঁদনীতে টেলারিংয়ের কাজ করত।

চিত্তপ্রিয়ের অব্যর্থ লক্ষ্য তখন নীরদের কণ্ঠদেশ ভেদ করে চলে গিয়েছে।

He is dead! আর দেরি নয়, চট্‌পট্ সরে পড়। রক্তাপ্লুত মৃতদেহ (?) ঘরের মেঝেতে পড়ে রইলো। বাঘা যতীন ঘর ছেড়ে পালাল।

কিন্তু হিসাবের একটু ভুল হয়েছিল, শয়তান নীরদ সত্যিই মরেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরে আসে। কোনমতে রক্তাপ্লুত দেহে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েঃ একটি দুটি করে পাড়ার লোক নীরদের চিৎকারে আশেপাশে এসে জড়ো হয়।

নীরদকে ওরাই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। মৃত্যুর পূর্বে নীরদ যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতির নাম বলে গেল। মৃত্যুশিয়রেও শয়তানের শয়তানী গেল না।

পুলিশ ও গোয়েন্দাদের টনক নড়ে ওঠে ? খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়।

চারিদিকে সুরু হয় খানাতল্লাসী। কিন্তু কোথায় সেই বাঘা যতীন! হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেছে কর্পূরের মতই।

আড়াই হাজার টাকা! ফিরিঙ্গীরা ঘোষণা করলে বাঘা যতীনের মাথা যদি কেউ এনে দিতে পারে, তবে নগদ আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার দেবে! চিত্তপ্রিয় নীরদকে গুলিবিদ্ধ করবার পর যতীন্দ্রনাথ যখন পাথুরিয়াঘাটা লেনের বাড়ী হ'তে পালিয়ে আসেন, তিনি জানতেন নীরদ তখনও একেবারে মরেনি, কিন্তু নিতান্ত করুণাপরবশ হয়েই তিনি নীরদকে একেবারে শেষ করে আসেননি, এলেই ভাল করতেন, তাহ'লে অন্ততঃ দেশদ্রোহীর কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নির্বাক হয়ে যেত। ২৮শে ফেব্রুয়ারী চিত্তপ্রিয়র গুলিতে সুরেশ গোয়েন্দার মৃত্যুর পর, যতীন্দ্রনাথ গার্ডেনরীচের ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত নরেন ভট্টাচার্যকে (পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র রায়) মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন।

যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় নরেন ভট্টাচার্য জামিন পেয়ে দেশান্তরিত হলেন আত্মগোপন করে।

নরেন ভট্টাচার্য ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ডাকাতির অভিযোগে ধৃত হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ দু'জন সত্যিকারের বিপ্লবী কর্মীকে হারান। নরেনের পক্ষে জামিনে খালাস পেয়ে আত্মগোপন করে আর দেশে থাকা সম্ভবপর ও যুক্তিযুক্ত হবে না বলেই বোধ হয় যতীন্দ্রনাথ যাদুগোপাল মুখার্জী ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে C. Martin এই ছদ্মনাম দিয়ে তাকে

বাটাভিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

এপ্রিলের শেষাশেষি নরেন মার্টিনের ছদ্মনামে বাটাভিয়ায় এসে সেখানকার জার্মান কন্‌সালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন।

জার্মান কনসাল নরেনকে নিয়ে গিয়ে থিওডোর হেলফ্রিক নামে এক জার্মানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কথায় কথায় থিওডোর একদিন নরেনকে বললেন: S. S. Mavarick জাহাজখানা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়ে গেছে তুমি বোধ হয় জান না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্যই মাভারিকে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে পাঠানো হয়েছে: জাহাজটা শীঘ্রই করাচীতে গিয়ে পেঁছাবে।

নরেন বললে: জাহাজটা করাচীতে না গিয়ে তোমরা এমন ব্যবস্থা করতে পার না যে একেবারে জাহাজটা বাংলাদেশে গিয়ে পেঁছায়!

নরেনের অনুরোধে থিওডোর সম্মত হলেন এবং জার্মান কনসালকে ধরে সেই ব্যবস্থা করলেন: জাহাজটা করাচীতে না গিয়ে বাংলাদেশেই যাবে।

বাংলার বিপ্লবীচক্রে সংবাদ পেঁছাল মাভারিক জাহাজে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে। বিপ্লবীচক্রের অন্যতম সভ্য হরিকুমার চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে 'হ্যারি এণ্ড সনস' নাম দিয়ে একটি ফার্ম খোলা হলো। ঠিক হলো 'হ্যারি এণ্ড সনস্' অস্ত্রগুলো খালাস করে নেবে। সমস্ত আয়োজন সেরে নরেন ১৯১৫ জুন মাসের মাঝামাঝি আবার বাটাভিয়া থেকে ভারতে ফিরে এলেন। বিপ্লবী চক্রের জরুরী পরামর্শ সভা বসল: ডাকাতি করে অর্থের যোগাড় হয়েছে, অস্ত্রও এসে পড়ছে। প্রধান দু'টো অভাব মিটল, এবারে ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব অভ্যুত্থান। ঠিক হলো সুন্দরবনের কাছাকাছি রায়মঙ্গলে এসে জাহাজ নোঙর করবে, সেখান হ'তে অস্ত্রগুলো জাহাজ হ'তে নামিয়ে নেওয়া হবে।

যাদুগোপাল ও অতুল ঘোষ চলে গেলেন রায়মঙ্গলে: জাহাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আলোর ব্যবস্থাও হলো। ব্যাগ্রব্যাকুল দৃষ্টিতে যাদু-গোপাল ও অতুল নদীপথের দিকে তাকিয়ে আছেন: জাহাজ আসছে। এদেশের প্রধান প্রধান সেতুগুলো ধ্বংস করে। প্রধান তিনটি রেলপথকেই অচল করে দিতে হবে।

যতীন্দ্রনাথের ওপরে ভার পড়ে বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলপথটিকে অচল করবার। ভোলানাথ গেল চক্রধরপুরে। সে করবে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথটিকে অচল।

পূর্ববাংলায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দল গেল। নরেন চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তীর ওপরে দেওয়া হলো সেদিককার ভার।

নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলী কলকাতার আশেপাশে থেকে অস্ত্রশস্ত্র সব দখল করে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে কলকাতাকে ধ্বংস করবে।

১লা জুলাই প্রথম ক্ষেপে অস্ত্রশস্ত্র নামানোর কথা। আরো একটি পরিকল্পনা ছিল। মাভারিক জাহাজটি আনি লার্সেন নামক আর একটি অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই

ভারতগামী জাহাজের সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু এতবড় ফিরিঙ্গী শক্তির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী বিপ্লবীদের সে প্রচেষ্টা নিয়তির একটি ফুৎকারে নিভে গেল।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে মাভারিক ভারতে এসে পৌঁছাতেই পারলে না, জাভায় আটক হলো ২২শে জুলাই। নির্জন নদীতটে বসে এরা যখন আশায় আশায় দিন গুনছে, জাহাজ তখন পথিমধ্যে আটকা পড়ে গতিহীন হয়ে আছে।

বিপ্লবীদের আশার স্বপ্ন এইভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

মাভারিকের ব্যর্থতার পরও জার্মান কনসাল জেনারেল আরও তিনটি জাহাজ ভর্তি করে ভারতে অস্ত্র গোলা বারুদ প্রেরণের চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে একটির কথা ছিল বালেশ্বরের কাছাকাছি কোথাও এসে নোঙর ফেলবার, অন্য দু'টি যাবে গোয়া ও রায়মঙ্গলে।

কিন্তু নরেন ভট্টাচার্য বললেন, বর্তমানে রায়মঙ্গলে অস্ত্রভর্তি জাহাজ পাঠানো যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ গোয়েন্দা পুলিশরা সন্দেহ করেছে। তার চাইতে সাংহাই হ'তে বারবার একটা স্টীমারে করে 'হাতিয়া'য় অস্ত্র ও গোলা বারুদ পাঠানো হোক।

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হলো। ডিসেম্বরের শেষভাগে স্টীমার হাতিয়ায় পেঁছানোর কথা। মার্টিন (নরেন)-এর সঙ্গে যে অবনী মুখার্জী বাটাভিয়ায় গিয়েছিল, তাকে আবার সাংহাইতে পাঠানো হলো এবং ঠিক হয় সে-ই সাংহাই হ'তে অস্ত্রভর্তি হাতিয়াগামী স্টীমারটায় চেপে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সিঙ্গাপুরেই গ্রেপ্তার হলেন।

তিনখানি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজের একখানা আন্দামানে যাবে ঠিক ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজটি আন্দামানের কাছাকাছি এলো, কিন্তু ব্রিটিশ রণতরী এচ এম্ এস্ কর্ণওয়ালের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে জাহাজটি নিদারুণ একটি গোলার ঘায়ে জলমগ্ন হলো।

একটি জাহাজ নাকি নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুদিন পরে ভারতের দিকে আসে এবং সুন্দরবনের কাছাকাছি এসে কারো দেখা না পেয়ে আবার চলে যায় উল্টোপথে।

এইভাবে ভাগ্যবিড়ম্বনায় নানা কারণে 'ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র' ব্যর্থ হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গদের জয় সূচিত হয়।

মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী বিপ্লবীদের এই ব্যাপক বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় বলতে গেলে উমিচাঁদ প্রভৃতির বংশধর এক বাঙ্গালীরই বিশ্বাসঘাতকতায়ঃ কুমুদনাথ মুখার্জী।

ব্যাপক বিপ্লব অভ্যুত্থানের ব্যর্থতাকে পশ্চাতে ফেলে আমরা এগিয়ে যাই বালেশ্বরেঃ নব হলদিঘাটের দিকেঃ বুড়ীবালামের তীরে। ঐ চলেছে আমাদের বাঘা যতীন, সঙ্গে আরো চারটি তরুণ—চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন্দ্রনাথ ও যতীশচন্দ্র। পশ্চাতে আসছে রক্তলোভী নেকড়ের দল।

বাঘের পশ্চাতে ফেউ লেগেছে। যতীন্দ্রনাথ তখনও জানেন না জাহাজে করে

জার্মানদের দ্বারা অস্ত্র প্রেরণের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বালেশ্বরে একটি মনোহারী দোকান : ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম্।

দোকানে নানা ছোটখাটো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রয় ছাড়াও কাটা-কাপড় বিক্রি ও ঘড়ি মেরামত হয়। প্রথমে যতীন্দ্রনাথ ঐখানেই এসে উঠলেন। কিন্তু বুঝলেন এখানে বেশীদিন থাকা নিরাপদ নয়, তাই আবার হাঁটাপথে ময়ূর-ভঞ্জের জঙ্গলের দিকে চলা হলো শুরু।

বালেশ্বর থেকে ২০ মাইল দূরে ছোট্ট একটি গ্রাম কাপ্তিপোদা।

সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাত্রীরা আবার আরো বারো মাইল এগিয়ে আর একটি গ্রাম তালহিদায় এসে উঠলেন। সকলে একত্রে এক জায়গায় থাকা উচিত হবে না ভেবে চিত্তপ্রিয় ও যতীশ তালহিদায় ছোট্ট একটা দোকান খুলে বসল, যতীন্দ্রনাথ নীরেন ও মনোরঞ্জনকে নিয়ে কাপ্তিপোদায় গিয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে ওরা বালেশ্বরে গিয়ে সংবাদ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে আনতেন। বালেশ্বর থেকে তালহিদা মাত্র ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

গুপ্তচরের মারফৎ বাঘা যতীনের সদলবলে কাপ্তিপোদা ও তালহিদায় অবস্থানের কথা ফিরিঙ্গী কর্তাদের কানে গিয়ে পৌঁছাল অতি গোপনে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সংবাদ বিভাগের বড়কর্তা, আই. জি. ডেনহাম ও তার দুজন ডেপুটি কমিশনার টেগার্ট ও চার্লসকে সঙ্গে নিয়ে সোজা একেবারে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবীর বাংলোতে এসে উঠলে : কয়েকজন সাংঘাতিক বিপ্লবী এদিকে আত্মগোপন করে আছে, আমরা তাদের সন্ধান পেয়ে গ্রেপ্তার করতে আসছি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় সই করে দাও।

ম্যাজিস্ট্রেট কিলবী চতুর লোক। সে ভাবলে কেন নেপোয় মারে দই, সদলবলে তিনি একদিন বালেশ্বরের 'ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম'য়ে গিয়ে খানাতল্লাসী করলে দু'একটা কাপ্তিপোদা সংক্রান্ত কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

পরের দিনই কিলবী গেল 'কাপ্তিপোদায়', সেখানেও বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না বটে, তবে জানা গেল এদেরই দলের কয়েকজনে মিলে 'তালহিদায়' একটা দোকান করে চালাচ্ছে। আর বিশেষ ঘাঁটাঘাঁটি না করে কিলবী বালেশ্বরে ফিরে এল।

উদ্দেশ্য পুলিশের সাহায্যে বালেশ্বরে ও অন্যান্য নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে করে ঐসব পথে কেউ না গা-ঢাকা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। কিলবী যখন ৬ই সন্ধ্যায় কাপ্তিপোদায় পৌঁছায়, যতীন্দ্রনাথ তখন সেখানেই ছিলেন। ঐ রাত্রেই তিনি কাপ্তিপোদা ছেড়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু চিত্তপ্রিয় যতীশকে ফেলে তিনি যাবেন না, তাই উল্টোপথে হেঁটে চলে গেলেন তালহিদায়। দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পথ। বিপদ-সঙ্কুল।

সঙ্গীদের নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ঐ পথ ধরেই এগিয়ে চললেন বালেশ্বরের দিকে!

এগিয়ে চলে বিপ্লবীর দল। ৭ই গেল ৮ই গেল, দিবারাত্র ওরা হেঁটে

চলেছে তো চলেছেই। দুর্গম পথ, ক্ষতবিক্ষত চরণ। বালেশ্বরের নিকটবর্তী কোন রেলষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতেই হবে।

ক্ষুধায় অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ দুর্গম পথ হেঁটে হেঁটে সকলেই ক্লান্ত অবসন্ন।

৯ই : সকাল আটটা কি ন'টার সময় বিপ্লবীরা পাঁচজন এসে পেঁছায় বুড়ী-বালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুরে। ভাদ্র মাস। বর্ষাস্ফীতা নদী উন্মত্ত কলরোলে বহে চলেছে। আবর্তের পর আবর্ত রচিত হচ্ছে, ক্রমে ভাদ্রের সূর্য প্রখর হ'তে প্রখরতর হয়ে উঠছে। ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠতালু প্রায় শুষ্ক : চলচ্ছক্তিহীন।

কিন্তু এখন নদী কেমন করে পার হওয়া যায়? ভরা বর্ষার এই উন্মত্ত নদী তো নৌকা ছাড়া পার হওয়া যাবে না।

অনেক অনুসন্ধান করেও নদীতীরে পারাপারের জন্য একটি নাও তো দেখা গেল না। হঠাৎ একজনের নজরে পড়ল ওপারে একটি নৌকা নিয়ে কে একজন লোক মাছ ধরছে নদীর জলে। যতীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন : ওহে শুনছো! ও কর্তা, আমাদের তোমার নৌকায় করে নদীটা পার ক'রে দেবে গো!

পথশ্রান্ত বিপ্লবী আজ নদীপারে এসে ডাকছে : পার করে দেবে গো!

যে লোকটা নদীতে মাছ ধরছিল তার নাম সানি সাহু। সে জবাব দেয়। পারব না,—'নাই পারি হোই জিবা'। ওহে শুনছো, আমরা সরকারী লোক, পার করে দাও।

আমার নৌকা খেয়া পার করবার জন্য নয়, এতলোক নৌকায় নিলে নাও ডুবে যাবে। আমাদের না পার করে দাও, অন্ততঃ আমাদের সঙ্গের এই বোঝাগুলো পার করে দাও, আমরা না হয় সাঁতরেই নদী পার হবো। হবে না বাবু, হবে না! আরো একটু দক্ষিণে যান, সেখানে খালি নৌকা পাবেন, তাদের বললেই পার করে দেবে। অগত্যা ওরা আরো দক্ষিণে এগিয়ে যায়, সত্যিই সেখানে নৌকা পাওয়া গেল। তাদের বিশেষ করে অনুরোধ করায় তারা পার করে দিল। ক্ষুধায় তখন বত্রিশ নাড়ী চোঁ চোঁ করছে, হাত-পা কাঁপছে গুরু পরিশ্রমে দীর্ঘ অনাহারের ক্লান্তি অবসন্নতায়।

ওহে মাঝি, তোমাদের কাছে ভাত আছে? আমাদের চারটি করে ভাত দিতে পার? আজ্ঞে কর্তা, ভাত তো নেই। পয়সা দেবো, ভাত রেঁধে দাও। ছিঃ, ওকথা বলবেন না, আপনারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, আপনাদের আমরা ভাত রেঁধে দিলে যে আমাদের পাপ হবে। মু ছোট জাত অছি, মু হাতেরে পানি খাই পারিবে না।

পুলিশ ও গোয়েন্দারা যে বালেশ্বরের চতুর্দিকে কয়েকজন বিপ্লবীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আশেপাশের লোকেরা অনেকেই সে কথা শুনেছিল। আরো শুনেছিল কোন বাবুদের যদি সন্দেহযুক্তভাবে এমনি চলাফেরা করতে কেউ দেখে, পুলিসে সংবাদ দিলে পুরস্কার মিলবে। সানির মনে এদের দেখে কেমন একটা সন্দেহ জাগে।

দুষ্ট প্রলোভন দরিদ্রের ভাঙা খড়খড়ি-পথে উঁকিঝুঁকি দেয়। ও সোজা এপারে

ওদের কাছে চলে এল ঃ বাবু আপনরা কোণ্টি যিবে ? কোথা হ'তে আসছেন ?

আমরা স্টেশনে যাবো।

তবে আপনারা স্টেশনের দিকে না গিয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছেন কেন ? বাঁধ ধরে বরাবর এগিয়ে যান।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন সেখানে এসে ভিড় করেছে, সানি তাদের চুপি চুপি ওদের ওপরে লক্ষ্য রাখতে বলে সোজা দফাদারকে সংবাদ দিতে চলে গেল।

পরিশ্রান্ত বিপ্লবীদের সেদিকে কোন খেয়াল নেই, তারা গিয়ে একটি ছায়াশীতল বৃক্ষের নীচে বিশ্রামের জন্য তখন বসেছে। এদিকে ক্রমেই দু'চার জন করে লোকের ভিড় জমে উঠছে, এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা ভাল নয়, ওরা উঠে আবার চলতে সুরু করে। লোকগুলো ওদের পিছু নেয়, উপায়ান্তর না দেখে ওরা একটা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেই ভয় পেয়ে সব পালাল।

দামুদা গ্রামে আসতে মাতব্বর গোছের কয়েকজন গ্রামবাসী ওদের অগ্রসরে বাধা দেয় ঃ চোর আছি, ধর, ছাড় না ! মনোরঞ্জন তখন গুলি চালায়, একজন মারা যায় গুলিবিদ্ধ হয়ে, বাকী সব পালায় এবং কয়েকজন ছুটে যায় শহরে সংবাদ দিতে।

ওরা আবার এগিয়ে চলে। সামনেই একটা ক্ষেত। ইতিমধ্যে চিন্তামণি সাহু নামে একজন দারোগা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়।

কিন্তু বিপ্লবীরা দলে ভারি বলে অগ্রসর হ'তে সাহস পায় না। গ্রামবাসীরা তখনও ওদের পিছু পিছু চলেছে। ময়ূরভঞ্জের রাস্তা পার হয়ে এবারে ওরা সামনে একটা খাল দেখতে পেল। পিস্তল ও টোটাগুলো ঝোলার সঙ্গে মাথায় বেঁধে সকলে খাল পার হয়ে গেল সাঁতরে। ওরা খাল পার হয়ে চসুকন্দ গ্রামের দিকে এগুচ্ছে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ওরা দেখলে, একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গা। শুষ্ক একটা পুষ্করিণী, সম্মুখে উলু-ঢিপির বাঁধের মত। পুষ্করিণীর পাড় ঢালু ও নীচে পুষ্করিণীর খাদ ; তার চতুর্দিক জঙ্গলে ঘেরা।

এসো, এইখানে আপাততঃ আশ্রয় নেওয়া যাক, যতীন্দ্রনাথ সকলকে বললেন।

বাঁধের উপরে উঠে দাঁড়ালে চতুঃপার্শ্বস্থ বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমি দৃষ্টি-গোচর হয়। ভাদ্রের মধ্যাহ্নের খরতাপে নীল আকাশ ঝলসে যাচ্ছে।

চারিপার্শ্বস্থ জঙ্গলে মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মাঝে মাঝে কম্পন তুলছে।

গুরুপরিশ্রমে সবাই ঘর্মাক্ত-কলেবর, অবসন্নদেহ, শ্রান্তপদযুগল।

মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্য হ'তে দু'একটা বুনো পাখীর শ্রান্ত কিচিরমিচির শব্দ মধ্যাহ্ন-তপ্ত হাওয়ায় ভেসে আসে। যদি সম্মুখযুদ্ধ করতেই হয়, তবে যুদ্ধের পক্ষে এই উপযুক্ত স্থান, জঙ্গলের ব্যারিকেড্ চতুষ্পার্শ্বে। একবার যখন গ্রামের লোকেরা তাদের এদিকে আসবার কথা টের পেয়েছে, যুদ্ধ তখন অবশ্যম্ভাবী। ঢালু খাদ—চারিদিকে খাড়া পাড়। পরিশ্রান্ত বিপ্লবীদের বিশ্রাম দিয়ে আমরা শহরে যাই এই ফাঁকে কিছুক্ষণের জন্য। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট যতীন্দ্রর খোঁজে বিরাট সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে তখন খুব কাছাকাছি এক অঞ্চলে ওঁৎ পেতে বসে আছেন।

বালেশ্বরের পুলিশ সাহেবের কাছেও সংবাদ ততক্ষণে পেশছে গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট কিলবী স্বয়ং সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ও সার্জেণ্ট রাদারফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে চলল মোটরে চেপে। মোটরগুলো ধুলো উড়িয়ে বুড়িবালাম নদীর ফুল্লরীঘাটে এসে পেশছাল।

সব একসঙ্গে একদিকে যাবো না, কিলবী বলে। আমি যাই মেদিনীপুরের রাস্তার দিকে, তুমি যাও ময়ূরভঞ্জের রাস্তার দিকে। এক জায়গায় গিয়ে আমরা মিলিত হবো। ইন্‌স্‌পেক্টর খসনবিস আমার সঙ্গে থাকুন।

ক্রমে উভয় দল এক জায়গায় এসে মিলিত হলো এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন প্রস্তুত হও! ব্যাঘ্রের হুঙ্কার শোনা গেল।

১৮৫৭র স্মৃতি অস্পষ্ট। রণকৌশলী তাঁতিয়া, নানাসাহেব। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ১৮৫৭র যুদ্ধস্নাত রক্তাক্ত ভারতের দিনগুলো। পঙ্গু বাঙ্গালী ঃ পল্টন নয়!···

দীর্ঘ আটান্ন বৎসর পরে আবার রণদামামা বেজে উঠছে কি!

রক্তে দেয় দোলা। সূর্য মাথার ওপরে হেলে পড়েছে, জঙ্গলে পত্রমর্মর, মন্থর বায়ুর আনাগোনা।

১৯১৫র ৯ই সেপ্টেম্বর।

কোথায় স্মৃতি! খুলে দাও আবার বিস্মরণ-লোকের বন্ধদুয়ার। আমরা এগিয়ে চলি।

বাংলাদেশ! আমার শস্যশ্যামলা জননী বঙ্গভূমি, তোমার চরণে নোয়াই মাথা।

কত যুগযুগান্ত চলে গেল, এই সেই বাংলাদেশ, যেখানে পেয়েছি আমার পলাশীপ্রান্তরে মোহনলাল হ'তে শুরু করে কত কত বীর যোদ্ধা, যারা দেশের জন্য জন্মভূমির জন্য অবহেলে হাসিমুখে দিয়ে গেল প্রাণ, তাদেরই বংশধর এই বাঘাযতীন, নীরেন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন। বিদ্রোহী বাঙ্গালী।

* * *

কিন্তু যতীশ অসুস্থ! বাঘা যতীনের কপালে পড়ে চিন্তার রেখা।

চিত্তপ্রিয় ও নীরেন বলে, যতীদা, সকলে একসঙ্গে মরা হবে না। আমরা এখানে রইলাম। আপনার অমূল্য জীবন। আপনি পালিয়ে যান।

বিপ্লবীর চোখেও কি সেদিন অশ্রু দেখা দিয়েছিল! না ভাই, তা হয় না। যতীশ অসুস্থ—তাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও তো যেতে পারি না। ভুলে যাও ওসব কথা। ভীরুর মত আজ আমরা এখানে ধরা দেব না। আমাদের কাছে অস্ত্র আছে, মরতে যদি হয়ই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেই মরবো। মৃত্যু তো একদিন আছেই। তবে এই সুবর্ণসুযোগ কেন ছেড়ে দেবো? যুদ্ধে মৃত্যু তো বীরেরই কাম্য। তোমরা একখানা কাপড় উড়িয়ে ওদের জানিয়ে দাও, আমরা এখানেই আছি এবং যুদ্ধের জন্য আমরাও প্রস্তুত।

দুম্ দুম্…গুড়ুম ! প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো। যুদ্ধং দেহি !

দূর আকাশের অলক্ষ্যচারী দেবতারা সেদিন রণ-দামামা বাজিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে পৃথিবীর হাওয়ায় জঙ্গলের পত্রমর্মর তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল।

কিলবী দূরপাল্লার বন্দুক ছুঁড়েছিল, সে ভেবেছিল প্রতিপক্ষের পিস্তলের গুলি এতদূর কিছুতেই আসবে না। তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে।

কিন্তু তার সে ভুল ভাঙতে দেরি হলো না বিপ্লবীদের প্রত্যুত্তরে গুলি নিক্ষেপে। এগিয়ে আসছে দুই দল অল্পে অল্পে রাদারফোর্ড ও কিলবীর দল। ওদিক হ'তে মাঝে মাঝে গুলি ছুটে আসছে। ক্রমে উভয় পক্ষের ব্যবধান রইলো মাত্র পাঁচশ হাত।

শরতের সূর্য শেষ দেখা দিয়ে পশ্চিম আকাশকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়ে পৃথিবী হ'তে বুঝি সেদিনের মত বিদায় নিচ্ছে। দিনান্তের শেষ আলোয় ওদিকে পঞ্চবীরের চলেছে শেষ সংগ্রাম। মুহুর্মুহু গুলি ছুটছে দু'পক্ষ হ'তে।

পুলিশ কমিশনার ভেবেছিল, মাত্র কয়টি ভেতো বাঙ্গালী যুবক, কতটুকুই বা তাদের শক্তি, কি বা অস্ত্র আছে তাদের সঙ্গে, কতক্ষণই বা যুঝবে তারা এই পুলিশবাহিনীর সঙ্গে। বণিকের ছদ্মবেশে একদিন যখন এই শ্বেতাঙ্গরা এদেশে এসেছিল, বাঙ্গালীরাই এদের অন্ধগলিপথে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিল, আজ সেই বাঙ্গালীই তাদের তাড়াতে বদ্ধপরিকর। জাতির পাপস্খালন এরা আজ করবেই ঃ মৃত্যু আসে আসুক!

ক্রমে বেলা আরো গড়িয়ে আসে ঃ পরিখার মধ্যে জল নেই, আহার্য নেই, গোলাবারুদও প্রায় ফুরিয়ে এলো। তবু তারা যুদ্ধ করে চলেছে ঃ মৃত্যু-ভয়হীন, মুক্তিপাগল কয়টি বীর বাঙ্গালী সন্তানের অবিশ্রান্ত গুলির সামনে ব্রিটিশের সুশিক্ষিত সশস্ত্র পুলিশবাহিনীও বুঝি দাঁড়াতে পারছে না। একটু একটু করে পিছু হটে।

*　　　*　　　*

বালেশ্বরের যুদ্ধ ঃ Balasore Trench Fight ! বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় একটি পৃষ্ঠা। জাতির মহাকাব্য !

*　　　*　　　*

নির্মম নিয়তি ! তুমি আসন্নকালে মহাবীর কর্ণের রথচক্র পৃথিবীকে দিয়ে গ্রাস করিয়েছিলে। ছদ্মবেশে কবচ ও কুণ্ডল হরণ করিয়েছিলে, আজ তোমারই অলক্ষ্য ইঙ্গিতে আবার একটি বুলেট এসে সহসা অতর্কিতে ভেদ করলো চিত্তপ্রিয়ের বক্ষ।

ঝলকে ঝলকে উঠে এলো তাজা লাল রক্ত।

চোখের ওপরে ঘনিয়ে আসে জীবনের শেষ অন্ধকার।

পৃথিবীর আলোও শেষ হয়ে এলো ঃ আসছে তমিস্রা !…

তৃষ্ণার্ত ধরণী। মাটির মায়ের রক্ত-তৃষ্ণা কি আজিও মিটল না মা তোর !

একটু জল ঃ মৃত্যুপথ-যাত্রীর মুমূর্ষু ক্ষীণকণ্ঠে শেষ কাতরোক্তি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে, তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন নিকটবর্তী জলাশয়ে। কোন জলপাত্র নেই, পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়ে নিয়ে এলেন, অনন্তপথের যাত্রীর শেষতৃষ্ণার বারি। সহসা একটা গুলি এসে যতীন্দ্রনাথের উরুদেশ বিদ্ধ করলে।

মনোরঞ্জন ও নীরেন যেন আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে, তারা গুলির পর গুলি ছুঁড়তে থাকে। আর কেন ভাই! ভগ্নকণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ নীরেন ও মনোরঞ্জনকে বললেন ঃ যুদ্ধ বন্ধ কর।

নিশান উড়িয়ে দাও।

কিন্তু যতীদা!...

না ভাই! নেতার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে ঃ যুদ্ধ বন্ধ কর।

নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই নীরেন ও মনোরঞ্জন নেতার আদেশ শির পেতে নেয়।

দু'খানা সাদা কাপড় কম্পিত হস্তে তুলে তারা উড়াতে সুরু করে ঃ আত্ম-সমর্পণ করছি।

ম্যাজিস্ট্রেট কিলবী এতক্ষণে কাছে এলো ওদের। আহত রক্তাক্ত বীর শার্দুল তৃষ্ণায় কাতর।

একপাশে রক্তরাঙা চিত্তপ্রিয়ের প্রাণহীন দেহখানি পড়ে আছে। যতীশও আহত। পাশে দাঁড়িয়ে নীরেন ও মনোরঞ্জন।

শ্বেতাঙ্গদের চোখেও আজ জল। টুপিতে করে স্বয়ং নিজে গিয়ে জল এনে আহতদের পান করায়, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ জলগ্রহণ করেন না।

মুগ্ধবিস্ময়ে শ্বেতাঙ্গ কিলবী বাঙ্গালী বীরের দিকে চেয়েছিল, ভাবছিল হয়ত এমনি ব্যাঘ্র আর কত আছে বাংলাদেশ, বাঙ্গালীদের মধ্যে!

সাহেব তখুনি তিনখানা খাটিয়া এনে মৃত চিত্তপ্রিয় ও আহত যতীন্দ্রনাথ ও যতীশকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

আমি আর চিত্তপ্রিয়ই গুলি করেছি। এরা তিনজন সম্পূর্ণ নির্দোষ। এরা আমাদের সঙ্গে এসেছিল মাত্র। সমস্ত দায়িত্ব আমার ও আমার লেফ্‌টেনেন্ট চিত্তপ্রিয়র। আপনি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি, দেখবেন এই দু'টি বালকের প্রতি যেন কোন অবিচার না করা হয়। এরা সত্যিই নির্দোষ, এ সব-কিছুর জন্য একমাত্র আমিই দায়ী। **Whatever was done, I am responsible!**

শেষের সময় ঘনিয়ে আসছে, তবু স্নেহ ও কর্তব্যবোধ যেন চরণ আঁকড়িয়ে ধরে। যদি ওরা বাঁচে! হায়রে দুরাশা!

যারা রাজ্য-বিস্তারের লোভে জঘন্যতম ও ঘৃণ্যতম কাজেও কখনো দ্বিধাবোধ করেনি, যাদের দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসরের রাজত্ব করবার প্রতিটি দিন অত্যাচার ও অবিচারে কলঙ্কিত, তাদের কাছে কেন এ ভিক্ষা! এই কি বিপ্লবীর ভালবাসা?

কোথায় রইলো পড়ে আত্মীয়পরিজন, স্ত্রীপুত্র স্নেহের দুলাল! মনে রইলো

শুধু তাদেরই কথা, তাদেরই শুভাশুভ, যারা মৃত্যুযজ্ঞে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল !…

ভারতের নব হলদিঘাট বুড়িবালামের তীরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এমনি করেই একদিন শেষ হয়েছিল পলাশী প্রান্তরের সংগ্রাম, ১৮৫৭র সংগ্রাম। জঙ্গলের উপর দিয়ে ঘনিয়ে এলো কালো পক্ষ বিস্তার করে কালরাত্রির অন্ধকার। পত্রমর্মরে সকরুণ বিলাপধ্বনি। বুড়িবালামের জলকল্লোলে অশ্রুত কান্নার ধ্বনি। যতীন্দ্রনাথের এতবড় বিপ্লব-প্রচেষ্টা কি সত্যি ব্যর্থ হয়ে গেল ?

যুগে যুগে দেশে দেশে বিপ্লবীরা অম্লান হাসিমুখে মৃত্যু, ব্যর্থতা, দুঃখ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই তাদের পথ রচনা করে গেছে।

এই মাটির পৃথিবীর বুকে তাদের রক্তক্ষত চরণচিহ্ন রেখে গেছে যুগ-যুগান্তরের জন্য সঞ্চিত করে যে পথরেখা, সে তো কোনদিনই মুছে যাবার নয়।

পৃথিবীর ধূলায় সে রক্তক্ষত চরণচিহ্নগুলি কোনদিনই হারিয়ে যাবে না।

মাটির দেহ একদিন আবার মাটিতেই যাবে মিশিয়ে, কিন্তু জ্বলন্ত পাবকশিখা-রূপিণী স্মৃতির অক্ষয়পটে লেখা থাকবে চিরদিন চিরকাল।

এই পৃথিবীর অগণিত মৃত্যু-মিছিলের মধ্যে তাদের 'মৃত্যু' জীবন-স্বপ্নকেই স্মরণ করিয়ে দেবে বার বার।

ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় অনেক তরুণ কিশোর যুবকদের মুখ উঁকি দিয়ে গেছে। অকস্মাৎ উল্কার মত তারা জ্বলে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে আবার।

যাদের কেউ কোনদিন চিনত না, মৃত্যু তাদের চিনিয়ে দিয়ে গেছে।

See that no injustice is done to these two boys !

নীরেন, মনোরঞ্জন।

নিঃশব্দে গোপনে একদিন এসে তারা বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখিয়েছিল : দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেহের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত দিতে নিয়েছিল প্রতিজ্ঞা !

নীরেন ও মনোরঞ্জন ওরা দুজনে সম্পর্কে ভাই।

খয়েরডাঙ্গায় বাড়ী।

ললিত দাসগুপ্ত নীরেনের বাবা, মাদারীপুরে কবিরাজী করতেন, শান্তশিষ্ট লোকটি।

আর মনোরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রফুল্লবাবু মাস্টারী করতেন মাদারীপুরে।

নদীর ধারে ছোট্ট শহর। আড়িয়াল খাঁ বর্ষাকালে রুদ্রমূর্তি ধরে, ভেঙে নেয় মাটি, ভয়ঙ্কর সে রূপ।

সেই ভয়ঙ্কর নদীর পাশে ওরা দু'টিতে মানুষ হয়েছে।

রুদ্রের সঙ্গে তাই ওদের পরিচয় শিশুকাল হতেই।

অশান্ত, দুর্বার, চঞ্চল, বেপরোয়া দুজনেই। খেলা, সাঁতার, কুস্তী প্রভৃতিতে অত্যন্ত পারদর্শী।

নীরেনের দিকে চাইলে চোখ ফিরানো যেত না। ফর্সা ধবধবে গায়ের রং,

কুঞ্চিত ঘন কেশদাম, দীর্ঘ সরল চেহারা : সরল ঋজু নাসা : যেন উদ্ধত অগ্নিশিখা, খাপমুক্ত তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

*　　　*　　　*

হাসপাতাল : আহত যতীন্দ্রনাথকে খাটিয়ায় বহন করে চিকিৎসার জন্য শ্বেতাঙ্গরা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু কার চিকিৎসা !···

বালেশ্বরের সমরপ্রাঙ্গণ হতে আহত বীর শার্দুলকে বালেশ্বরের হাসপাতালে নিয়ে এলো।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমে ভারতব্যাপী মুক্তিযজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর আজ ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আহত, রক্তাক্ত।

রুধিরে ভিজে গিয়েছে বসন, ক্লান্ত আঁখির পাতায় নেমে আসে বুঝি শেষ ঘুম।

*　　　*　　　*

বালেশ্বরের হাসপাতালের একটি কক্ষ। বাইরে সশস্ত্র পুলিশ। অন্ধকারে বিশ্বপ্রকৃতি যেন ঢেকে গেছে।

অমারাত্রির বুকে আজিও নিভে যায়নি অবিনশ্বর সেই ক্ষীণ দীপশিখাটুকু।

একটু জল ! ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ বলেন।

পাশেই শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার মিঃ টেগার্ট দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি গ্লাসভর্তি জল এনে দেয় : Mr. Mookherjee water please.

শ্বেতাঙ্গ কণ্ঠস্বর শুনে তাকায় যতীন্দ্রনাথ : No thanks ! আমি যার রক্ত দেখতে চেয়েছিলাম, তার দেওয়া জলে আমার তৃষ্ণা মিটাতে চাইনে।

শ্বেতাঙ্গ টেগার্ট স্তব্ধ হয়ে যায়। কি অবিমিশ্র ঘৃণা ! মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও জীবনের শেষ তৃষ্ণাকে প্রত্যাখ্যান !

সময় শেষ হয়ে এসেছিল। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ক্লান্ত রক্তাক্ত শেষ নিশ্বাস নেয়।

মহাবীর চির নিদ্রাভিভূত ! ঘুমাও বীর ঘুমাও ! কেউ তোমরা ভাঙিয়ো না ওর ঘুম।

*　　　*　　　*

কলকাতার ব্যারিস্টার জে. এন. রায়ের সঙ্গে মিঃ টেগার্টের দেখা। মিঃ রায় বলেন : অনেকে বলে যতীন্দ্রনাথ নাকি মরেন নাই, বাঁচিয়া আছেন আজিও—একথা কি সত্য ?

শ্বেতাঙ্গ মাথা নাড়ে : No, Unfortunately he is dead !

শ্বেতাঙ্গের কণ্ঠও কেঁপে ওঠে।

দুর্ভাগ্যের কথা বলছেন কেন ?

I had to do my duties but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench. (আমার কর্তব্য করতে হয়েছিল, তাহলেও তার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে।

তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী যিনি ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন।)

* * *

বালেশ্বর সংগ্রামের বিচার শুরু হলো ইংরাজের আদালতে। শ্বেতাঙ্গের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল। আসামী তিন জন: মনোরঞ্জন, নীরেন ও অসুস্থ যতীশ।

১৯১৫, ১৬ই অক্টোবর বিচার প্রহসন শেষ হলো। দেশকে ভালবাসার অপরাধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অপরাধে।) মনোরঞ্জন ও নরেনের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ, যতীশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

* * *

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক মনোরঞ্জন। সামনে ঝুলছে কালো চর্বিমাখানো দড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট: তোমার কিছু বলবার আছে?

ব্রিটিশের অত্যাচার নিবারণকল্পেই আমরা মৃত্যুপথ-যাত্রী। আমাদের মৃত্যুতে ব্রিটিশের অত্যাচার প্রশমিত হউক।

* * *

যতীশের কথাও মনে আছে। দ্বীপান্তরে তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং পরে মস্তিষ্কের পীড়ায় পরিণত হয়।

রংপুরের উন্মাদাগারে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বালেশ্বর সংগ্রামের ওপরে যবনিকাপাত হয়।

দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও নিষ্পেষণে যে আগুন জ্বলেছে, তাকে নির্বাপিত করা কি এতই সহজ! বাংলার বাঘা নেতা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের মাত্র চারজন সশস্ত্র বিপ্লবী যুবক নিয়ে সরকারের সুশিক্ষিত সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দুঃসাহসিক প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামের পর ফিরিঙ্গীরা যেন একেবারে লগুড়াহত কুকুরের মত ক্ষেপে উঠলো।

তারা স্বপ্নেও হয়ত সেদিন ভাবতে পারেনি, যে জাতকে তারা দীর্ঘদিন ধরে শত নিয়মের শৃঙ্খলে হাত-পা বেঁধে একেবারে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছে, তারা আবার কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারে!

আইন দিয়ে যে আগ্নেয় অস্ত্রের সংস্পর্শ হতে পর্যন্ত এদের সরিয়ে রেখেছে, সেই আগ্নেয় অস্ত্রই আবার যোগাড় করে মৃত্যুপণে তাদেরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে! বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরের সংগ্রাম তাদের চেতনার ভিত্তিমূলকে পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেল। সুরক্ষিত প্রাসাদের তলে ঘুণ ধরেছে, সাবধান!

শুরু হলো আবার নব নব আইনজারী করে অত্যাচার ও নিষ্পেষণ। ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে প্রবর্তিত হলো 'ভারত রক্ষা আইন' (Defence of India Act). ঐ আইনের বলেই ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে বহু লোক মাত্র সরকারের সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হলো। হলো দ্বীপান্তরিত। প্রত্যহ ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সন্ধানে যখন-তখন যত্র-তত্র পুলিশের আবির্ভাব ও নানা অত্যাচার, আত্মগোপনকারীদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি নিগ্রহ ও জোরজুলুম,যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল।

ফিরিঙ্গী শাসকের অর্থে পরিপুষ্ট ঘরভেদী বিভীষণ ও গুপ্তচরে দেশ যেন ছেয়ে গেছে, পথেঘাটে, স্কুলে, কলেজে সর্বত্র। ছাত্র, শিক্ষক, রাস্তার মোড়ে পান বিড়িওয়ালা, জংশন স্টেসনের হোটেলওয়ালা, ছাত্রাবাসের ম্যানেজার টাকা খেয়ে পুলিসে সংবাদ বেচাকেনা করছে অন্ধ গলিপথে। ১৯১৭ সনে নানা ধরনের অত্যাচার যেন চরমে ওঠে।

গুপ্ত বিপ্লবী সংঘের সভ্যরা বাংলার এই গরম আবহাওয়ায় বাংলাদেশ ছেড়ে গোপনে গোপনে গিয়ে আসামের গৌহাটিতে জমা হতে শুরু করেছে। অনুশীলন সমিতির অনেক পলাতক সভ্যও সেখানে এসে জমা হয়েছেন। চরম ব্যর্থতার পর আবার চলছে নিভৃতে শক্তির সাধনা। সংগঠনের কাজ চলতে থাকে আসামের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা জুড়ে।

বিপ্লবীদের কেন্দ্র হয় গৌহাটির দু'টো বাড়ীতে। ব্যবসার ছুতা ধরে সব ব্যবসায়ী হয়ে বসেছে।

স্বহস্তে রান্না, সাধারণ বেশভুষা, সাধারণ শয্যা, অতি সাধারণ জীবনযাত্রা।

উপর্যুপরি ব্যর্থতার আঘাতেও যে ওদের বিচলিত করতে পারেনি, বার বার হতাশ হয়েও যে ওরা তখনও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত, এবং সেটাই যে বিপ্লবীর ধর্ম, ভারতে খণ্ডে খণ্ডে ছোট বড় বিপ্লব অভ্যুত্থানই বোধ হয় তার একমাত্র ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দুর্যোগ ও বেদনার ঘন কালোছায়া সুনিবিড় হয়ে ওঠে, আর সেই ছায়ায় অস্পষ্ট দেখতে পাই এক মৃত্যুমিছিল: পশ্চাতে যারা পড়ে রইলো তাদের জন্য কোন দুঃখ নেই, কোন অশ্রুমোচন নেই। আত্মদানের মধ্য দিয়েই আজ তারা আত্মবিশ্বাসের ভিতটা যেন গড়ে তুলেছে। তাই তারা গেয়ে চলেছে হাজারো নিঃশব্দ কণ্ঠে সেই গান, যুগের স্মৃতি পার হয়ে আজিও যে গানের সুর ঝংকৃত হয়ে চলেছে:

> না হইতে মাগো বোধন তোমার,
> ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গলঘট।
> জাগো মা রণচণ্ডী, জাগো মা আমার,
> আবার পুজিব তব চরণতট॥

* * *

প্রতি রাত্রে তারা পালা করে জেগে একজন করে প্রহরা দেয়, বাকী সব সেই সময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নেয়।

কোন সামান্যতম সন্দেহের কিছু ঘটলেই সংকেত দেবে, সবাই সতর্ক হয়ে যাবে। আসামের শীত—হু হু করে শীতের হাওয়া বইছে।

শীতের গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, দলের একটি ছেলে সতীশ পাকড়াশী আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে গুলিভর্তি একটি মশার পিস্তল হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে খোলা জানালা-পথে অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে বসে আছে। রাত্রির অন্ধকার ঝিঁঝিঁর অশান্ত করুণ ডাকে পীড়িত হচ্ছে।

পাশেই কম্বল মুড়ি দিয়ে পাঁচ ছয়জন গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

কি প্রচণ্ড শীত! যেন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলে!

নিদ্রাহীন চোখের পাতায় কত চেনা-অচেনা মুখ ভেসে ভেসে ওঠে। কত ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কাহিনী হয়ত বা।

পিছনে ফেলে আসা অশ্রু-হাসি মেশানো দিনগুলো।

বিদ্রোহীর দল আমরা। আনন্দমঠের সন্তানদলের মত বিদ্রোহীর দল। বাড়ী-ঘর স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনবর্গ—সব ছেড়ে আসা এক অপূর্ব জীবন! কাজ কেবল কাজ! রোদ-বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে যায়—শীত-গ্রীষ্ম দেহের উপর দিয়ে যায় তবু দিনগুলো কিন্তু স্ফূর্তিতেই কাটে। জীবনে অবসাদ নেই, ভয় নাই মরণেও।

ভাবতেও বুঝি ভাল লাগে। কতকাল তো চলে গেল কালের বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে, তবু যেন শুনি বন্ধুর পার্বত্য পথে বহু অশ্বখুরের খট্ খটা খট্ ধ্বনি ঃ দেখি কালো অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে দলপতি শিবাজী সর্বাগ্রে, পশ্চাতে তার সুশিক্ষিত মাউলি সেনা।

রাজপুতানী রাণী পদ্মিনীর জহরব্রতের লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে দেখি সেই রাজপুত বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুপণ অমর স্বাক্ষর।

মেবারের রুক্ষ প্রান্তরে হলদিঘাটে রাণা প্রতাপের রাজপুত সেনাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি। অসি বেজে চলে ঝন্‌ঝন্। লড়ছে তারা স্বাধীনতার জন্য, দেশমাতৃকার জন্য।

জননী জন্মভূমি!

সাত সাগরের ঢেউয়ের কলকল্লোলে শুনতে পাই আর্যনারী দল, জেকোবিন দল, সিনফিন ও নিহিলিস্টদের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু-সংগ্রামের বার্তা!

তবে আমরাই বা সফল হবো না কেন?

হবে, হবে জয়, নাহি ভয়।

> 'জয়-যাত্রায় বাহির হয়েছি কতকাল আগে মোরা,
> যাত্রা হয়নি শেষ
> গিরি-মরু-বন কত অগণন একে একে হ'ল ঘোরা
> বদল হল যে বেশ,
> দূর দিগন্ত পারে, বারে বারে চাই
> সেদিনের সাথী সঙ্গীরা সব নাই
> বুকভরা আশা ছিল যাহাদের
> দেখিবে নূতন দেশ
> দুর্গম পথে চলিতে চলিতে
> হল তারা নিঃশেষ।

বুকখানা যেন সহসা কেঁপে কেঁপে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে। অলক্ষ্যে বুঝি দেশের কবির কণ্ঠে শোনা যায় ঃ

> স্বপনে যাহারে দেখেছি আমরা
> পাব তার উদ্দেশ

কণ্টক ভেদি' হবেই একদা
কুসুমের উন্মেষ।

হাঁ, হবে বৈকি! কবি তোমায় প্রণাম জানাই।

* * *

রাতের প্রহরী হঠাৎ যেন চমকে ওঠে : অকস্মাৎ একটা লোক দ্রুতগতিতে অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটে গেল না? চকিতে সামান্যক্ষণের জন্য যেন একটা আলোর মৃদু ইসারা জানালার উপর দিয়ে সরে গেল।

চাপা সতর্ক পায়ে সতীশ জানালার সামনে এসে দাঁড়াল, অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে।

আরো একটা ছায়ামূর্তি চলে গেল, তার পিছনে আরো একটা।

এত শীতেও শরীরের রক্ত যেন তপ্ত হয়ে ওঠে : চোখের পলক পড়ে না : অন্ধকারে শয়তানের ছায়ামূর্তি ওৎ পেতে আছে ক্ষুধিত নেকড়ের মত, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে : আসছে এগিয়ে নিঃশব্দে ধারালো নখবিস্তার করে : উঠুন, আপনারা, পর পর তিনটে লোককে দেখলাম, সন্দেহজনক ভাবে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছে, সতীশ বলে।

একজন প্রশ্ন করে : স্বপ্ন দেখনি তো!

হাঁ, স্বপ্নই বটে।

তবু সকলে যে যার আগ্নেয়অস্ত্র মুষ্টিবদ্ধ করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।

শীতের রাত্রি নিঃশেষিত প্রায় : পূর্ব তোরণে আলোর ইসারা অস্পষ্ট কুহেলিকাজালকে ছিন্ন করেছে : সূর্য-সারথির আসার সময় হলো বুঝি : সপ্ত অশ্বের হ্রেষারব।

জাগ অমৃতের পুত্র, কে কোথায় আছো, আজিকার এই রাঙা প্রভাতকে আহবান জানাও। দিকে দিকে তোল শুভ শঙ্খনাদ। বল উদাত্ত মিলিত কণ্ঠে : অমৃতের পুত্র মোরা, অমৃত-সন্ধানী।

কুহেলিকার মায়াজাল ছিন্ন হয়ে গেল, এমন সময় বন্দুকের শব্দ…দুম্ দুম্…!

কারুরই আর বুঝতে বাকী থাকে না, অদূরবর্তী বাড়ীটায় যে কয়জন বিপ্লবী বাস করে এ আক্রমণটা তাদেরই উপর এবং এ বাড়ীটাও শীঘ্রই পুলিশের লোকেরা আক্রমণ করবে।

ভোরের আলো আরো একটু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতেই দেখা গেল অসমিয়া বন্ধুকধারী পুলিশবাহিনী বাড়ীটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

তোমাদেরই দেশের পথ আজ তোমাদেরই কাছে রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে ওরা সঙ্গীন উঁচিয়ে। রাজপথে যখন প্রবেশ নিষেধ, অন্যপথ বেছে নিতে হবে : চলার গতি রোধ করে কে?

দুরন্ত বন্যার গতি আসে ওদের চরণে। হাতে গুলিভর্তি পিস্তল, কিন্তু কোন ভয় নেই, একযোগে সকলে বের হয়ে আসে প্রভাতী কুয়াশার অবগুণ্ঠন ঠেলে।

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে !···লঙ্ঘিতে হবে যাত্রীরা হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার বিপ্লবী !

দুম্···দুম্···দুড়ুম ! পিস্তল গর্জে ওঠে। প্রত্যুত্তর দেয় অসমিয়া পুলিশের বন্দুক।

দুলিছে তরণী। ফুঁসিছে নাগিনী।

উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়ের মধ্যেই পথ করে বিপ্লবীরা কামাখ্যা পাহাড়ের দিকে ছুটে যায়।

জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়। ঘরছাড়া বিপ্লবীর দল সব সেখানে এসে মিলিত হয়। ক্রমে সূর্য মাথার ওপরে ওঠে। অগ্নিতপ্ত রৌদ্রে আকাশ যেন ঝলসে যাচ্ছে।

আহার্য নেই, নেই তৃষ্ণার জল। পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে ফেলেছে ফিরিঙ্গীর বন্দুকধারী পুলিশবাহিনী।

শুধু তাই নয় ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে ধারে, গৌহাটি, আমীনগাঁও, কামাখ্যা, পাণ্ডুঘাট রেলস্টেশনেও সশস্ত্র পুলিশ শিকারী কুকুরের মত ওৎ পেতে আছে।

এত করেও কয়েকজন বিপ্লবীর গতি ওরা রোধ করতে পারে না।

রোদ পড়ে আসে। বেলাশেষের ম্লান আলোয় পৃথিবী ম্লান হয়ে এল। ইতিমধ্যে একজন গিয়ে কিছু খাবার সংগ্রহ করে এনেছে। ক্ষুধার্তের দল সবে আহার্য মুখের সামনে তুলতে যাবে, অকস্মাৎ দুম্ দুম্ দুড়ুম···বন্দুকের আওয়াজ।

ওরা চেয়ে দেখলে, পাহাড়ের নীচে পশ্চিমদিকে অসংখ্য বন্দুকধারী পুলিশ, পড়ন্ত রোদের রাঙা আলোয় বেয়োনেটগুলো যেন মৃত্যুঝিলিক হানছে, সর্প-জিহ্বা হিল্ হিল্ করছে। Ready ! প্রস্তুত ! সেনাপতির আদেশ ধ্বনিত হয়।

পড়ে রইলো ক্ষুধার আহার, বীর সৈনিকের দল উঠে দাঁড়ায় যে যার আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞায়।

প্রথমে ওরা পাহাড়ের উপর হ'তে ঢিল পাটকেল নীচে এদের দিকে ছুঁড়তে শুরু করে। নীচ হ'তে প্রত্যুত্তর আসে বন্দুকের ঘন গর্জনেঃ দুম্···দুম্··· দুড়ুম ! সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ছায়া ফেলছেঃ ঘন কালো।

নীচ হ'তে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসে। এই অবসরে নিঃশব্দে ওরা উপত্যকায় নেমে এসে আবার উপরে উঠতে শুরু করল।

দূর, অনেক দূরের পথ ! দুর্গম পথ ! কণ্টক ভেদি হবে কুসুমের উন্মেষ !

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন।

উন্মুক্ত প্রকৃতি। দুর্দান্ত শীতে পাহাড়ের জঙ্গলে নিদ্রাহীন দ্বিতীয় রাত্রি প্রভাত হলো।

ক্রমে বেলা বাড়তে থাকে, গতকালকের সঞ্চিত শেষ খাদ্যাংশটুকুও শেষ হয়ে যায়। পাহাড়ের ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা মিটায়।

এমন সময় অকস্মাৎ নতুন পুলিশবাহিনীর আবির্ভাব। শুরু হলো গুলিবর্ষণ।

এরাও প্রত্যুত্তর জানায় পিস্তলমুখে। কিন্তু ব্যবধান বেশী, এদের গুলি

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায় না। এরা নীচে উপত্যকায়, পুলিশবাহিনী পাহাড়ের শীর্ষদেশে।

ক্রমে গুলিবর্ষণ করতে করতে সশস্ত্র পুলিশের দল নীচে এদের দিকে অগ্রসর হয়ে আসে। Hands up! Surrender! আত্মসমর্পণ করো!

বিপ্লবীদের গুলি প্রায় নিঃশেষ দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধ'রে আজ ও গতকাল দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করে।

এতক্ষণ এদের গুলির মুখে পুলিশের দল অগ্রসর হ'তে সাহস পায়নি, কিন্তু এখন ওরা টের পেয়ে গেছে: এদের গোলাগুলি ফুরিয়ে এসেছে।

সম্মুখ-সমর: গুলি নেই, কিন্তু আছে এখনো দেহে শক্তি!

শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি শুরু হয়।

* * *

একে একে সকলেই লৌহবলয়ে বাধা পড়ে।

কিন্তু এই ফাঁকেই দু'জনে কখন চলে গেছে ছুটে নাগালের বাইরে। শিকারী কুকুরের দল ছুটলো তাদের অনুসন্ধানে, কিন্তু পারলে না ধরতে।

কে সেই দু'টি দুঃসাহসী তরুণ! নলিনী বাকচী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, জঙ্গলের শীর্ষে শীর্ষে ধূসর আবহাওয়া।

ওরা দু'জনে ছুটছে সেই ঘনায়মান অস্পষ্ট আঁধারে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্য দিয়ে: কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত চরণ, দু'দিনের অনাহার, অনিদ্রা, ক্লান্তি ও অবসন্নতা, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই, ছুট্ছেই ছুট্ছে!

ক্রমে রাতের অন্ধকারে সব কালো হয়ে এলো। বন্যপশুর সতর্ক পদসঞ্চার খস্‌খস্‌ শব্দ তোলে শীতের ঝরাপাতার ওপরে: শীতের বন্য হাওয়া। ক্লান্তিতে চরণের গতি শিথিল হয়ে আসে। বিশ্রাম!

গৃহে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা নয়, মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদন নয়। তারকাখচিত চন্দ্রাতপতলে, শিশির-ঝরা অনাবৃত রজনীর অন্ধকারে বন্য হিংস্র পশুর নখরের তলে, শুষ্ক পত্র-কণ্টক শয্যায় ওরা গা এলিয়ে দিল।

এসো নিদ্রা—দু'চোখের পাতায় সোনার কাঠির পরশ বুলিয়ে যাও। রূপ-কথার পরীকন্যা চামর দোলাও। আমরা ঘুমাই।

ধরিত্রী মায়ের লক্ষ হাতে স্নেহের পরশ। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

কণ্টক-ক্ষত দেহ ও পদযুগল, রক্ত চুইয়ে পড়ে।

ভোরবেলা নিদ্রা ভাঙতেই আবার চলা শুরু।

দূরে আরো দূরে, ফিরিঙ্গীর লৌহ-বলয়ের সীমানার বাইরে যেতে হবে।

এগিয়ে চল বীর! এগিয়ে চল!

সামনেই একটা ছোট্ট পল্লীগ্রাম দেখা যাচ্ছে না! হাঁ, তাই তো!

নিজেদের অসমীয়া বলে পরিচয় দিয়ে সামান্য গুড় ও চিঁড়া ওরা সংগ্রহ করে। তাই দিয়ে নিদারুণ ক্ষুধার কিছুটা উপশম করে।

সোজা পথে নয়, পাহাড়ী জঙ্গলের পথ ধরেই আবার ওরা হাঁটা শুরু করে।

রাত্রে আবার পাহাড়ে আশ্রয় নেয়।

বিশ্বের ঘরের দুয়ার রুদ্ধ বলেই কি প্রকৃতি আজ জঙ্গলের দুয়ার খুলে দিল ওদের সম্মুখে!

আরো একটা দিন কেটে গেল : চলেছে, দু'জনে চলেছেই : সম্মুখে পথ, পায়ে চলার গতি অবিরাম, বিশ্রামহীন, অফুরন্ত সামনে…আরো সামনে।

একটা দু'টা করে পাঁচ-পাঁচটা দিন কেটে গেল।

শেষে এক রেলস্টেশনে পৌঁছে লামডিংয়ের টিকিট কেটে দুই যাত্রী ট্রেণে উঠে বসল।

লামডিং থেকে শ্রীহট্ট, সেখান হ'তে গৌহাটিকে পশ্চাতে ফেলে বিহারের পথে। কিন্তু প্রবোধ বিহার পর্যন্ত পেঁীছাতে পারলে না—ধরা পড়ল বাংলা দেশেই।

অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢাকা কলতাবাজারের এক বাসায় এসে এক রাত্রিশেষে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বীরের মত প্রাণ দেয়।

আহত মৃত্যুপথ-যাত্রী নলিনীর শেষ কথা একটি পুলিশকে : আমাকে বিরক্ত করবেন না। শান্তিতে মরতে দিন্! Let me die peacefully!

এই শহীদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ দশবৎসর ধরে ভারতে বিপ্লব-সংগ্রামের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের যবনিকাপাত হলো। বালেশ্বর ও গৌহাটির স্মৃতিকে পশ্চাতে ফেলে এবারে আমরা আসব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে : ইংরাজ শাসিত ভারতে, নব অত্যাচারের কাহিনীর গোড়ার কথায় ফিরে যাই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে।

* * *

'কোমাগাটামারু'র শোচনীয় ব্যর্থতা সব চাইতে বেশী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে পাঞ্জাবেই। বিদেশে যে সব শিখরা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এই সংবাদ পেয়ে ভারতে ফিরে আসতে শুরু করে। অবশ্য ধূর্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার এরকম যে একটা কিছু ঘটবে, তা পূর্বাহ্ণেই বুঝতে পেরে, ঐ সব বিদেশ প্রত্যাগত শিখরা যাতে ভারতে না প্রবেশ করতে পারে সেজন্য এক আইন জারী করে, ফলে বহু শিখ ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়।

১৯১৪-১৮ যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে প্রায় আট হাজার শিখ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় তিন হাজার শিখকে আইনের জোরে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কারাগারে প্রেরণ বা অন্তরীণ করে ফেলে। ক্রমে অসন্তোষের ধোঁয়া বিষবাষ্পের মত জমা হতে থাকে। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে সেই প্রধূমিত বহ্নি লেলিহান হ'য়ে ওঠে। পাঞ্জাবে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিল।

১৬ই অক্টোবর ফিরোজপুর লুধিয়ানা লাইনের চৌকীমান স্টেশন লুণ্ঠিত হলো।

২৭শে নভেম্বর প্রকাশ্যে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশবাহিনীর ফিরোজপুর জিলায় এক সংঘর্ষ হয়ে গেল।

এই সব সংঘর্ষে যারা বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে ভাই পরমানন্দ, রাসবিহারী বসু পিংলে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আর একজন শিখবিপ্লবী। কর্তার সিং সারাভা, জনে জনে পাঞ্জাবের সর্বত্র তখন বিপ্লবের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন ; সেনানীর ছদ্মবেশ সৈন্য-শিবিরেও তাঁর গতিবিধি ছিল। কিন্তু সেকথা আগেই বলেছি।

* * *

১৯১৫ঃ ওয়াহাবী আন্দোলনের পর আবার আর একবার ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমানদের অভ্যুত্থান দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য চেষ্টা হয়েছিল।

ঐ উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সনে মৌলানা ওবায়েদুল্লা সিন্ধী আরো তিনজন সঙ্গীসহ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে যান।

তাঁদের ভারত হ'তে চিরতরে ইংরাজকে বিতড়ন করবার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবার জন্য তিনি কাবুলে উপনীত তুর্ক-জার্মাণ মিশনের সঙ্গে দেখা করে গোপনে পরামর্শ শুরু করেন।

তাঁদের ঐ পরিকল্পনাকে সফল করে তোলবার প্রচেষ্টায় হেজাজের তুর্কী সামরিক গভর্ণর গালিব পাশাও গোপনে তাদের সঙ্গে হাত মিলান।

ওবায়েদুল্লা ফিরিঙ্গী শাসনের উচ্ছেদের পর ভারতে যে অস্থায়ী সরকার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে রাষ্ট্রপতি করবেন স্থির করেছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ১৯১৪ সনের শেষাশেষি ভারত ত্যাগ করে ইউরোপে যান এবং ইতালী, সুইট্জারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়ান। জেনেভায় এলে সেখানে বিখ্যাত গদর বিপ্লবী নেতা হরদয়ালের সঙ্গে দেখা হয়।

সেখান থেকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ গেলেন জার্মাণীতে, সেখানে কাইজারের সঙ্গে আলাপে তার সুযোগ ঘটে।

তুর্ক-জার্মাণ মিশনের জার্মাণ সদস্যরা ১৯১৬ সালে আফগানিস্থান ত্যাগ করে চলে গেলেও, সেই সময় আফগানিস্থানে যে সব ভারতীয় বিপ্লবীরা ছিলেন, তাঁরা বিপ্লবের প্রস্তুতি একইভাবে চালাতে থাকেন, এবং সেই সম্পর্কে বিপ্লবীদের পরস্পরের মধ্যে যেসব চিঠিপত্র চতুর্দিকে প্রেরিত হয়, সহসা তার কতকগুলো ব্রিটিশদের হাতে কেমন করে না-জানি পড়ে গেল।

ঐ চিঠিগুলোর একটা বিশেষত্ব ছিলঃ রেশমীর কাপড়ের টুক্রোর ওপরে লেখা হতোঃ তাই সমগ্র আন্দোলনটি রেশমী ষড়যন্ত্র বলে খ্যাত।

১৯১৬ সালের জুন মাসে হঠাৎ ঐ আন্দোলনের মধ্যমণি মক্কার শেরিফ স্বয়ং তুর্কীদের দল ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকের মত ফিরিঙ্গীদের দলে গিয়ে ভিড়ল। এবং ফলে সমগ্র আন্দোলনটি একটিমাত্র মীরজাফরের হীন বিশ্বাসঘাতকতায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল।

* * *

তুমি আমি ও আরো দশজন শিক্ষা পেয়েছি এবং আমাদের মাস্টারমশাইরাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপার অক্ষরে মোটা মোটা বই ছেপে, এবং আমাদের গ্যাটের টাকা খরচ করিয়ে সেই সব বই কিনিয়ে এবং নিয়মিত অধ্যাপন

করিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ দু'টি ভারতের কথা—বৃটিশ ভারত (British India) এবং ভারতীয় ভারত (Indian India)। আরো একটু খুলে বলা যাক্, বৃটিশ ভারত ব্যতীত ভারতবর্ষের আর যে অংশ আছে তা হচ্ছে ভারতীয়দের ভারতবর্ষ ঃ অর্থাৎ কিনা সব হু—য—ব—র—ল খেতাবধারী ভারতীয় স্বাধীন (?) রাজাদের রাজ্য। তার ভাব্যর্থ এই ঃ ওই সব ভারতীয় স্বাধীন রাজ্যের শাসনকার্যে বৃটিশরাজ কোনই হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু এতটুকুও যাদের বুদ্ধি বা বোধশক্তি আছে, তাদের নিশ্চয়ই বুঝতে এতটুকু কষ্টও হবে না, আসলে ওর ভাবার্থটি কি !…

সবই সেই চিরন্তন পুতুলনাচের ইতিকথা ! যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই সেই সব 'ভারতীয় ভারতে'র সম্মানিত অধিবাসীদের একজন নয়, তথাপি 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হই, তখন কাশ্মীরের মহামান্য মহারাজকে 'Son of the soil' অর্থাৎ এই দেশেরই ছেলে বলে ফেলি। অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অতীতের রক্তাক্ত পাতাগুলো ওল্টালে চোখে পড়ে, মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই সত্যেনের জয়গানে মুখরিত রঙ্গিণ ভারতের আকাশ বাতাস। কানাই বৃটিশ রাজসাক্ষীকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কই তার জন্য কেউই তাকে Son of the soil বলে সেদিন ক্ষমা করেনি !

বস্তুতঃ এটাই হলো 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। ঐসব তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যসমূহের মহামান্য ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের (রেসিডেণ্ট) সামান্য অঙ্গুলি হেলনে যেসব স্বাধীন রাজন্যবর্গের বুক কেঁপে ওঠে থর থর করে, অর্থহীন ভুয়া কতকগুলো আবোল-তাবোল গালভরা ব্রিটিশের দেওয়া খেতাবের লোভে যারা অসংখ্য দরিদ্র অসহায় প্রজার রক্ত শুষে, অর্থ বার করে, অবসর আলস্যে মেদবৃদ্ধি ও গুম্ফচর্চা করে, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ প্রভুর কৃপালাভের আশায় ব্রিটিশের সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অজস্র মুদ্রা চাঁদা দিয়ে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়ে, যারা একদিন হঠাৎ বেশী খেয়ে মরে যায়, তারা আসলে যে কতদূর স্বাধীন সেকথা তারাও যেমন জানত আমরাও হয়ত জানতাম বা জেনেও না জানার ভান করেছি।

চতুর চক্রী ফিরিঙ্গীর জাত সন্দেহ নেই, নচেৎ মুষ্টিমেয় লোক এসে এই এত বড় একটা মহাদেশের সংখ্যাতীত জনসাধারণের চোখে এমনি করে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে বুকের ওপরে চেপে বসে থাকতে পারত !

একটা কথা তারা স্বীকার করেছে বহু পূর্বেই, এই দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে ঃ যদি আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে কতকগুলো জিলাতে বিভক্ত করতাম, তাহলে আমাদের ভারত সাম্রাজ্য ৫০ বৎসরও টিকতো না। কিন্তু তা না করে কতকগুলো দেশীয় রাজ্যের সৃষ্টি দ্বারা, যাদের রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা নেই, আমাদের সাম্রাজ্যেরই যারা কেবল হাতিয়ার, সারা দেশটাকে আমরা দাবিয়ে রেখেছি এবং রাখবোও আমাদের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যতদিন অব্যাহত থাকবে।

এই উক্তি করেছিল লর্ড ক্যানিং এবং ভারতব্যাপী সিপাহী আন্দোলনের

অভিজ্ঞতার ওপরেই সুকঠোর ভিত্তি করে।

মজা এই যে, ঐসব তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যসমূহের মালিকদের অস্তিত্ব ব্রিটিশ আদালত এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কৃপার ওপরে যে নির্ভর করেছে এবং ব্রিটিশ শক্তি আঠার শতকের শেষাংশে ও উনিশ শতকের প্রথমাংশের সংগ্রামে এদের সাহায্য না করলে যে এদের অনেকেরই অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেত, এই অবধারিত সত্য কথাটাই হতভাগ্যের দল কোনদিনই বুঝতে পারেনি।

ঐসব সামন্ততান্ত্রিক তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যগুলো সারা ভারতে ছড়িয়ে থেকে চিরদিন নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এক পক্ষে বলতে গেলে ব্রিটিশ সরকারের রক্ষা-কবচ ছিল তো এরাই। শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত পোষা গৃহপালিত দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতময় ছড়িয়ে থাকার দরুনই ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশকে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ করে দূর করে দেওয়া কষ্টকর হয়েছে। তবু দেশীয় রাজ্যের প্রজারা চিরদাসত্বই তাদের দুর্লঙ্ঘ্য ভাগ্য বলে মেনে নিতে চায়নি। ইতিহাস চিরদিন একথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে, ১৮৫৭র বিদ্রোহে যেমন দেশীয় রাজ্যের কিয়দংশ মৃত্যুপণে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আবার তাদেরই মধ্যে অনেকেই সব চাইতে ঘৃণ্য ও জঘন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এবং ফলতঃ তা-ই সেই বিরাট অভ্যুত্থানের সকল প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দেবার অন্যতম কারণ। অথচ দেশীয় রাজ্যের প্রজারা দারিদ্র্য ও দুঃখের যে মাশুল দিয়েছে তাও তো নগণ্য নয়।

শ্রীমন্ত নানা, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন নেতারা ১৮৫৭র ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে রক্তদান করে অমর হয়ে আছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

মজার ব্যাপার এই যে, হায়দরাবাদের শাসক সিপাহী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সেই কথাটুকু কেবল ইতিহাসে বেঁচে রইলো। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের তথাকথিত ভদ্রলোক রাজনীতি যখন 'আবেদন-নিবেদনের' পালা শেষ করেনি, দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রজা আন্দোলন তখনই কোন কোন স্থানে জঙ্গীরূপ গ্রহণ করেছে। প্রজা আন্দোলন বলতে আমরা বিশেষ অর্থে যা বুঝি, সেই কথাতেই আসছি। কোন একটি আন্দোলনের পূর্ণ তাৎপর্য সংগ্রহ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সেদিনকার প্রজা আন্দোলন, সেটা ছিল সংগ্রহের বা প্রস্তুতির যুগ। যদিও বাইরে থেকে সেই আন্দোলনের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়নি, কিন্তু সেই আগামী ভবিষ্যৎ রূপেরই বিকাশের জন্য মাল-মশলার সংগ্রহ চলছিল। এবং তারও অনেক পরে দীর্ঘদিনের ঐ প্রস্তুতি যখন অখণ্ড রূপ একটা ধারণ করতে চলেছে, আমরা তাকে চিনলাম, বললাম, প্রজা আন্দোলন।

এদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীই হলো সাম্রাজ্যবাদের চরম বিকাশ মুহূর্ত।

তারপর শুরু হলো ভাঙন! বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যে অভিশাপ অর্থাৎ আভ্যন্তরিক বিরোধ তা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠতে লাগল সর্বত্র, যার আংশিক রূপ আমরা দেখলাম ১৯১৪-১৮র বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে এবং ঐ যুদ্ধবিরতির মাত্র কুড়ি বৎসরের ব্যবধানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতায় তাকেই আবার আমরা আরো প্রকটরূপে প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু তবু বলবো

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আপাত-বিরোধিতাতেই আমাদের একমাত্র উৎফুল্ল হবার কারণ নয়। কারণ একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না যে জনগণের সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান-আন্দোলনই একমাত্র ও পথের প্রতিশ্রুতি।

ভারতে ব্রিটিশের শান্তশিষ্ট গৃহপালিত মেদবহুল অলস প্রকৃতির হীনবীর্য দেশীয় রাজ্যের তথাকথিত স্বাধীন রাজাদের হতভাগ্য প্রজার দল তখনও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে শেখেনি। কিন্তু তাই বলে একান্ত অসহায় ভাবে ভাগ্যের হাতেও নিজেদের সমর্পণ করেনি। এইটাই ছিল সবার বড় কথা।

১৯০৮ সালে ত্রিবাঙ্কুরের বর্তমান রাজবংশ ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য শুরু হওয়ার পর থেকেই ক্রমে শক্তিশালী (?) হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পরদেশী রাজশক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে তাদের শক্তির তলে আশ্রয় পায়।

১৯০৮ সালের বিদ্রোহে বিপ্লবী নেতা ভেলু থাম্পি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অকস্মাৎ ত্রিবাঙ্কুরের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালোছায়া ঘন হ'য়ে আসে। সশস্ত্র কৃষাণেরা ভেলু থাম্পির নেতৃত্বে রাজপ্রাসাদ সহসা আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। কিন্তু এ বিজয় স্থায়ী হলো না। পরাক্রান্ত ফিরিঙ্গী শক্তির চাপে সোনার পেয়ালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বিদ্রোহ দমিত হলো! ভেলু থাম্পিও বীরের মত মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যের যথার্থ ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য, কারণ ভারতে ইতিহাস বলতে যা আমরা পাই, তা হচ্ছে বিদেশী লেখক রচিত সম্পদশালী শাসকের একতরফা ঐশ্বর্যবন্দনা, মন ভোলানো মাত্র।

* * *

উনিশ শতকের প্রারম্ভে যখন চারিদিকে বিপ্লবের বজ্রবিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে যাচ্ছে, ফিরিঙ্গীরাজ শশব্যস্ত ও তটস্থ হয়ে পড়েছে সেদিনকার সে অভ্যুত্থানের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকেই কণ্ঠ টিপে মারবার জন্য। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার বহু আইন জারী করে বহু ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল। কিন্তু তবু দেখা গেল নির্মম কঠোর দমনীতির ব্যাপক প্রয়োগ সত্ত্বেও আন্দোলন আরো জোরালো ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠ্‌ছে। দিশেহারা সশঙ্কিত ফিরিঙ্গীরাজ তখন বিপ্লব আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ধারণ এবং উহা সমূলে উৎপাটনের উদ্দেশ্যে সরকারের হাতে কি কি ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক সেই সম্পর্কে সুপারিশ করবার জন্য ১৯১৭ সনের ১৭ই ডিসেম্বর ভারত সরকার লণ্ডনস্থ হাইকোর্টের কিংস্ চেম্বার্স ডিভিশনের জজ মিঃ জাস্টিস্ রাউলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করলে। ঐ কমিটির রিপোর্টই 'রাউলাট' কমিটির রিপোর্ট নামে কুখ্যাত।

১৯১৮, ১৫ই এপ্রিল কমিটি তাদের মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করলে। কমিটি বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ দমনের জন্য সুপারিশ করে: কোন ব্যক্তি প্রকাশ বা প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজ হেফাজতে কোন নিষিদ্ধ (?) কাগজপত্র রাখলে তাকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি লাভের পর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা; জুরী বা এসেসরের সাহায্য ছাড়াও তিনজন জজ নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চের সমক্ষে রাজদ্রোহাত্মক মামলার বিচার

এবং বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বাসস্থানের এলাকা নির্দেশ ও পুলিশের নিকট নিয়মিত হাজিরা দানের নির্দেশ দেওয়া যাবে, এবং সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার ও পরোয়ানাসহ খানাতল্লাসও করা যাবে। বন্দীদের কয়েদখানা ছাড়াও অন্যত্র আটক রাখা যাবে প্রভৃতি কতকগুলো নতুন ফাঁদ পাতা হলো।

পাঁচ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধের প্রকোপে এতদিন ফিরিঙ্গী শাসকের দল নানাভাবে অত্যাচার ও দমননীতি চালিয়েও যখন দেখলে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে নির্বাপিত করতে পারছে না, তখন তারা মনস্থ করে 'ভারত রক্ষা আইনে'র স্থলে এবারে বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে অরাজকতা নাম দিয়ে সকল প্রচেষ্টার মূল উৎপাটনের জন্য রাউলাট কমিটির সুপারিশে একটি স্থায়ী ব্যাপক আইনের ফাঁদ পাততে হবে। ঐ কুখ্যাত আইনটি 'রাউলাট আইন' নামে সর্বজনবিদিত।

আসলে ঐ কুখ্যাত আইনের পাশবিক নাগপাশে ফেলে, কয়েকজন মুক্তিযজ্ঞের বীর সৈনিককে নিষ্পেষিত করবার ছলে লক্ষ কোটি ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার মুক্তির আন্দোলনকে খর্ব ও সঙ্কুচিত করবার প্রচেষ্টাই হলো এই আইন প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য। প্রভুদের সামান্য মাত্র সন্দেহের প্যাঁচে ফেলে গ্রেপ্তার, অন্ধ কারাকক্ষে নির্বাসন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইন-শৃংখলা-ভঙ্গকারী বলে ঘোষণা ও সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি অনুরূপ আচরণ প্রভৃতি এই আইনের বিষয়-বস্তু।

পদদলিত জর্জরিত জনগণের কণ্ঠ চিরে আর্তনাদ জাগল: বন্ধ কর এ আইন। এ অন্যায়। এ হ'তে পারে না। চারিদিকে প্রতিবাদ।

কিন্তু খাদ্য-খাদক যেখানে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, সেখানে এই ক্ষীণ প্রতিবাদের মূল্য কতটুকু!

বন্যার মুখে স্রোতের তৃণখণ্ডের মতই প্রতিবাদের যা কিছু ভেসে গেল। ব্রিটিশ সিংহের উচ্চহাসির অট্টরোলে চাপা পড়ে গেল শত শত বুভুক্ষিত জর্জরিত অসহায় ভারতবাসীর ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ-কাকুতি!

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যের জোরে ১৯১৯, ১৮ই মার্চ সত্যসত্যই ঐ কুখ্যাত 'রাউলাট আইন'টি পাকাপোক্তভাবে স্থায়ী জগদ্দল পাথরের মত জনগণের বুকে চাপিয়ে দেওয়া হলো।

প্রতিবাদ জানিয়ে তদানীন্তন ব্যবস্থা পরিষদের ভারতীয় সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন।

ভারতের ঐসব দুর্যোগের মধ্যে ভারতের ভাগ্যাকাশে ঠিক ঐ সময় শুকতারার মত একটি আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে এলেন উত্তর ভারতের

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, অহিংসা ও প্রেমের অবতার মহাত্মা গান্ধী। কম্বুকণ্ঠে ১৯১৯ এর ১লা মার্চ তিনি বলেছিলেন: যদি সরকার ঐ কুখ্যাত আইন পাস করে, তা'হলে তার প্রতিবাদে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবেন।

আইন বিধিবদ্ধ হলো। সত্যাগ্রহী মহাত্মা ৩০শে মার্চ জনগণের এক মিলিত সভায় ঘোষণা করলেন: ৬ই এপ্রিল হবে সর্বত্র 'হরতাল'।

আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবাসী তাঁর এ আহ্বানে সমগ্র প্রাণ দিয়ে সাড়া দিল: হরতাল। সরকার ক্ষেপে উঠ্‌লো। দিল্লী নগরীতে তাদের বন্দুক হ'তে গুলি বর্ষিত হল, অসহযোগী অহিংস সাধকদের ওপরে, তাদের স্বতঃস্ফুর্ত দেশ-মাতৃকার শ্রদ্ধাঞ্জলিকে, রক্ত, আর্তনাদ ও ধোঁয়া-বারুদের পৈশাচিকতায় কণ্ঠ চিপে ধরা হলো।

ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দীন কিচলুকে ৯ই এপ্রিল পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল কারাগারে। অমৃতসহরে হরতাল।

রেলস্টেশনের দিকে আগত সমবেত জনতার ওপরে লাঠিয়াল পুলিশের দল লাঠি চালাল। এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে গুলিবর্ষণ করলে দু'দুবার। এত অত্যাচার ও নিষ্ঠুর পীড়ন কার সহ্য হয়, লগুড়াহত পশুর মত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে: বন্যার বাঁধ ভেঙেছে! কলরোলে উন্মত্ত স্রোতে ছুটে আসছে।

দাউ দাউ করে অসন্তোষের আগুনে সরকারী ব্যাংক ও অফিস পুড়ছে।

পাঞ্জাবের পথের ধুলায় বহুকাল পরে আবার শ্বেতাঙ্গের তপ্ত শোণিত রক্ত-আলিম্পন পড়ে।

পাগলা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত সরকার ১১ই এপ্রিল ঘোষণা করলে: মার্শাল ল।

সহরের সর্বত্র মোতায়েন হলো সশস্ত্র সৈনিক: তাদের পরিচালক ও সহরের শান্তিরক্ষক হলো: জেনারেল ডায়ার!

জেনারেল ডায়ার!

জেনারেল ডায়ার!

জেনারেল ডায়ার!

(১৯১৪—১৮)-র সাম্রাজ্যলোভী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোর হিংসানলে ভারত-বাসী ধনে প্রাণে রাজার সাহায্য করেছে, আত্মোৎসর্গ করেছে, জানতে তো কারও সেকথা বাকী ছিল না সেদিন এবং আজও।

ভারতবাসী সৈন্য দিয়ে রাজাকে তুষ্ট করেছিল। কিন্তু সেই সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে রাজাকে শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের দল কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দীন-দুঃখী-দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি যে অত্যাচার চালিয়েছিল ইতিহাস তার জবানীতে চিরদিন সাক্ষ্য দেবে।

যে পাঞ্জাব একদা ভারতীয় বহু জাতির মধ্যে শৌর্যে বীর্যে অপরাপর অনেক জাতির শ্রদ্ধা ও আদর্শের গৌরব পেয়েছিল, তাদের সেদিনকার অপমান, বিনাশ ও তাচ্ছিল্যের কথা দুঃখই জানায় মনে আজিও, কিন্তু নিরুপায়।

যুদ্ধ থেমে গেলে ভারতবাসীরা যখন বার বার সরকারের কাছে মিনতি

জানাল, তাদের নেতাদের অন্তরীণ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক—মিঃ মণ্টেগু প্রচার করলেন : সকল সমস্যার শীঘ্রই একটা মিটমাট হবে। শুধু তাই নয়, ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনই দেওয়া। ভারতবাসী তখন ভাবছে এবারে 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ' শুরু করবে, কিন্তু মিঃ মণ্টেগু ভারতে এসে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং দেশীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আনী বেসান্টকে মুক্তি দেবে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে সমুচিত বিচারও করবে বলে স্থির করে।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস জানাল : Declaration of rights-য়ের দাবী, তার প্রত্যুত্তর এলো রাউলাট আইন।

সেদিনকার ভারতীয় জনগণের বিক্ষোভের কি ঐ একটিমাত্র কারণই ছিল! না।

অসহায় ভারতবাসীরা ভেবেছিল, যুদ্ধের পর তাদের আর্থিক অবস্থা একটু হয়ত ভাল হবে, কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেল, যত দিন যাচ্ছে ততই মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে দৈনন্দিনের অতি আবশ্যকীয় জিনিসগুলো ক্রমেই মহার্ঘ্য হয়ে উঠ্ছে। চারিদিকে 'ধর্মঘট' শুরু হলো।

এদিকে কর্তৃপক্ষ অসহায় প্রজাদের অভিযোগে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে নানা জোরজুলুম শুরু করে দেয়।

ডাক্তার কিচ্লুর সেই তীব্র প্রতিবাদ আজিও ভারতবাসী ভোলেনি : We will be even prepared to sacrifice personal over national interest. Be ready to act according to your conscience, though this may send you to jail or bring an order of internment on you!

আমরা এখন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে গিয়ে দেশের জন্য, জনসাধারণের জন্য আমাদের দেহের শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত নিয়োগ করবো।

৯ই এপ্রিল অমৃতসহরে এক উৎসব হয়, ঐদিন হিন্দু মুসলমানেরা মস্ত এক মিছিল বের করে, অথচ সেইদিনই ডাঃ কিচ্লু ও সত্যপালকে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা গ্রেপ্তার করলে।

নেতাদের মুক্তি চাই! উন্মত্ত জনস্রোত চলেছে কমিশনারের বাংলোর দিকে।
সামনেই হলগেট্ ব্রীজ : পথ রুখেছে সবাকার সশস্ত্র পুলিশবাহিনী : হল্ট!
কিন্তু তরঙ্গ রোধিবে কে? ভাঙার দেবতার বাঁশী রুদ্রতালে বাজে ঐ।
চল এগিয়ে চল : মৃত্যুকে নাহি ভয়।
দুম্ দুম দুড়ুম! শ্বেতাঙ্গের বন্দুক গর্জে ওঠে : সাবধান! মৃত্যু!
রক্তে হলগেট্ ব্রীজ ভেসে যায়। কত প্রাণ নিঃশেষ হয়।

একজন শ্বেতাঙ্গ নাকি ঐ দৃশ্য দেখে বলেছিল : Its a spectacle unknown to Indians in Indian soil!

আহত ক্ষতবিক্ষতদের আত্মীয়স্বজনরাও ছুটে এল : হাসপাতাল থেকে এলো এম্বুলেন্স গাড়ী, আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হবে।

অসংখ্য আহতদের নিয়ে এম্বুলেন্সগুলো হাসপাতালে এসে প্রবেশ করছে।

ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট শ্বেতাঙ্গ মিঃ প্রোমার বললেঃ Go back ; ফিরে যাও! কালা আদমীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল খোলা হয়নি!

ভারতীয়দের প্রতি সেদিনকার সে দুর্নীতি ও পাশবিকতা দু'একজন শ্বেতাঙ্গকেও বিচলিত করেছিল।

মিঃ বি. জি. হর্ণিমান তো স্পষ্টই বলেছিলঃ The fact is established that however indefensible the conduct of the mob, the disturbances were initially provoked by the stupidity and wanton violence of the authorities.

জনসাধারণ যতই উত্তেজিত হয়ে উঠুক না কেন, তাতেও এমন পৈশাচিকতা ঘটতে পারে না। সরকারের খেয়াল ও নির্বুদ্ধিতার জন্যই সব কিছু দায়ী।

হাঁ, কি বলছিলাম! জেনারেল ডায়ার! ভারতের পৌনে দুই শত বৎসরের পরাধীনতার ইতিহাসে রাজার দেওয়া যত অত্যাচার ও অন্যায়, জুলুম ও নৃশংসতা ঘটেছে! জেনারেল ডায়ারের কীর্তি বোধ করি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীষণতম!

ইংরেজ প্রভু ঘটা করে কলকাতার সদর রাস্তায় আমাদের অন্ধকূপ হত্যার অবিশ্বাস্য দুর্নীতির সাক্ষ্য খাড়া করেছিল এক প্রস্তরস্তম্ভ গড়ে তুলেঃ অথচ অমৃতসহরে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' ময়দানে তাদের স্বহস্ত রচিত শত শত নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবণিতার কবরখানা রচনার জন্য বিলাতের সুশিক্ষিত স্বাধীন জনগন জালিয়ানওয়ালাবাগের কবর রচয়িতা জেনারেল ডায়ারকে পুরস্কারে সম্মানিত করতে এতটুকু সংকোচও বোধ করেনি। এই কি বিলাতী শিক্ষা!

যে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য—সমগ্র শ্বেতজাতকে কলংক মুক্ত করতে, প্রয়োজন ছিল জেনারেল ডায়ারের ফাঁসিঃ সে কিনা পেল পুষ্পমাল্য!

ভারতে রাজ্য চালাবার অজুহাতে ফিরিঙ্গীদের বহু দুষ্কৃতির ও পাপানুষ্ঠানের কথা ভারতবাসীর মনে চিরদিনের জন্য রক্তাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু 'জালিয়ানওয়ালাবাগের' রক্তাক্ত স্মৃতি বুঝি সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়।

১৭ই এপ্রিলঃ ১লা বৈশাখ, হিন্দুদের নব বৎসর।

প্রতি বৎসর ঐদিন বহু দূর পথ হ'তে পল্লীবাসীরা সহরের উৎসবে যোগদান করতে আসে চিরদিন। সেবারেও এসেছে অনেকে। হংসরাজ নামে এক ব্যক্তি চারিদিকে ঘোষণা করে দেয় যে এবারে নববর্ষ উৎসবে অমৃতসহরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন উকিল কানাইয়ালাল দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন।

সর্বত্র সে সংবাদ ছড়িয়ে যায়ঃ দলে দলে আবালবৃদ্ধবণিতা শিশু 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' ময়দানে এসে জড়ো হয়।

এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রায় ২৩।২৪ হাজার লোক 'জালিয়ানওয়ালাবাগে' এসে উপস্থিত। জালিয়ানওয়ালাবাগ! পাঞ্জাবের তীর্থ! অমৃতসহরের রক্তাক্ত পুণ্যভূমি!

জালিয়ানওয়ালাবাগ চারিদিকে সুউচ্চ কঠিন প্রাচীর ঘেরা বড় একটা মাঠ।
বাগের মধ্যে মাত্র তিনটি গাছ ও একটি ভগ্ন সমাধি-মন্দির ছাড়া লক্ষ্য করবার আর বিশেষ তেমন কিছুই নেই।
বাগে প্রবেশের একটি মাত্র সংকীর্ণ পথ এবং তাছাড়া ৪।৫টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক। ঐসব ক্ষুদ্র ফাঁকের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে হয়ত একজন লোক ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। অগণিত নিরীহ জনতাকে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের' প্রাচীর বেষ্টিত ময়দানে রেখে আর একবার হংসরাজের খোঁজ নেওয়া যাক।
তখনকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের গোপন নথিপত্রের মধ্যে গুপ্তচর হংসরাজের নামটা খুব ভাল করেই লেখা ছিল। শ্বেতাঙ্গ সরকারের দপ্তরে প্রবেশের অনেকগুলো গোপন অন্ধকার গলিপথ ছিল, সেই গলিপথে চলাচল করতো কতকগুলো কুৎসিত শয়তান কুকুর—কয়েক খণ্ড গোমাংসের লোভে কুকুরগুলো পদলেহন করে কৃত কৃতার্থ হতো, রাজ্যের যেখানে যত গোপন তথ্যের প্রয়োজন হতো ঐ কুকুর-গুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হতো। হংসরাজ ছিল অমনিই একটি। অমৃতসহরের ষড়যন্ত্র মামলার এপ্রুভার ছিল হংসরাজ।
আসলে হাজার হাজার নিরীহ আবালবৃদ্ধবণিতাশিশুকে ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানাওয়ালাবাগের ময়দানে সমবেত করাটা হংসরাজেরই একটা চক্রান্ত। কানাইয়ালাল ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে তাঁকে সভাপতি হতে হবে বা বক্তৃতা দিতে হবে। সভার কাজ আরম্ভ হলো : ভোঁ ও···ভোঁ একটা ক্রুদ্ধ শব্দ শোনা গেল মাথার উপরে, জনতা মাথা তুলে দেখলো একখানা উড়োজাহাজ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।
গেঁয়ো জনতা ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে, মক্ষিকা-গুঞ্জনের মত একটা অস্পষ্ট মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। শয়তান হংসরাজ আশ্বাস দেয়, ভাই সব, ভাবনা নেই তোমরা শুধু স্থির হ'য়ে থাকো।
আরো দুই শয়তানও সেখানে উপস্থিত ছিল হংসরাজের সঙ্গে, সকলের মধ্যে মৃদু চাপা কণ্ঠে কানাকানি শুরু হয়। জনতার মধ্যে দেখা দেয় আতংক।
তিন বৎসরের শিশু হ'তে আশি বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সে সভায় এসেছে।
পিতা পুত্রকে নিয়ে, বড় ভাই ছোট ভাইকে নিয়ে, দাদামশায় নাতিকে নিয়ে—কত সহস্র লোক যে এসেছে ! এমন সময় ঘটলো জেনারেল ডায়ারের আবির্ভাব !
সঙ্গে তার ২৫ জন রাইফেলধারী শিখ, ২৫ জন খুকরীধারী গুর্খা সৈন্য এবং একটা কামানের গাড়ী।
বেলা তখন পাঁচটা !
বিদায় গোধূলি : পশ্চিমাকাশকে রক্তরঞ্জিন করে ১৩ই এপ্রিলের সূর্য জানাচ্ছে অস্ত ইঙ্গিত।
১৭৫৭র পলাশী প্রান্তরে যে রক্তোৎসব শুরু হয়েছিল ফিরিঙ্গীর বন্দুকের গুলিতে তার কি অবসান নেই ? ১৯১৯-য়েও কি সেই রক্ত-নদীর ধারা এমনি করেই বয়ে চলবে উত্তর ভারতের মাটি সিক্ত করে।
ধমনীর রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে যায়, কর্ণ বধির হয়ে যায়, প্রাণস্পন্দন যায় থেমে।

বাতাস আর বহে না। পাখীর কলগীতি বন্ধ হ'য়ে গেল, শুধু ভেসে আসে এক অনাগত হাজারো কণ্ঠের মৃত্যু-আর্তনাদ!

একটিমাত্র পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। ফিরিঙ্গীর অনলবর্ষী কামান।

Fire! Shoot!

শয়তানের বজ্রকণ্ঠ হুংকার দিয়ে ওঠে: চালাও গুলি।

আকাশে কি সেদিন বজ্র ছিল না: পৃথিবী কি কম্পন ভুলে গিয়েছিল:

দুম্ দুম্…দুড়ুম্…দুড়ুম্…দুড়ুম্!…দুম্!…

গুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কর্ণ বধির।

সহস্র সহস্র, নিরস্ত্র নিরপরাধ জনতার করুণ আর্তনাদে আকাশ ধরণীতল মুহূর্তে কেঁপে ওঠে।…

দীর্ঘ দশ মিনিট ধরে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ চলে। রক্তে, মানুষের মৃত্যু-আর্তনাদে, ধোঁয়া-বারুদের গন্ধে জালিয়ানওয়ালাবাগ যেন নরকখানা হয়ে উঠ্‌ল।

একটি গুলি যতক্ষণ ওদের পুঁজিতে ছিল, ওরা থামেনি।

যেদিকে বেশী লোকের ভিড়, কামানের মুখ সেদিকেই ঘুরিয়ে গুলিবর্ষণ চলে।

শ্বেতাঙ্গ মিঃ বি. জি. হর্ণিমান বলেছিল: General Dyer proceeded with an armed force to the Jallenwalla Bagh and opened fire without warning on a large mass meeting of a wholly peaceful character, shooting down in cold blood without a word of warning, two thousands of them lying dead and wounded on the ground.

সেদিনকার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের একটা তদন্ত নাকি হয়েছিল: এবং তদন্তের সময় শ্বেত রাক্ষস, হিংস্র শয়তান ডায়ার নাকি লর্ড হাণ্টারের নিকট বলেছিল যদি বড় মেসিন কামানগুলো বাগের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার এতটুকু সুবিধাও থাকত তবে সেই বড় মেসিন কামান নিয়ে গিয়ে ঐ কালো নিগ্রোগুলোকে গুলি করে মারতেও আমি সেদিন পশ্চাৎপদ হতাম না।

১৬৫০টি গুলি ডায়ার জনতার ওপরে নির্বিবাদে বর্ষণ করে।

বিলাতের সুধীসমাজ কি জেনারেল ডায়ারকে অভিনন্দন জানাবার সময় তাদেরই দেশীয় একজন লোক হর্ণিমানের উক্তিটুকু শোনেনি বা ডায়ারের তদন্ত-ভাষণ শোনেনি।

সভ্যতা ও কৃষ্টির গর্ব করে ইংরাজ। ভারতের শাসন ইতিহাসে কি তারা একথাগুলো লিখে রেখেছে কোনদিন! অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ ভারতবাসীকে নাকি ফিরিঙ্গীরা এসে নব চেতনা দিয়েছে, চেতনাই বটে। জুতোর তলায় মাড়িয়ে রক্তবমনের চেতনা। নরপশু জেনারেল ডায়ার গুলি চালিয়ে সগর্বে চলে গেল। আর পশ্চাতে পড়ে রইলো প্রায় দুই হাজার হতাহত আবালবৃদ্ধবণিতা।

'জালিয়ানওয়ালাবাগের' মাটিতে বইছে তপ্ত রক্ত-স্রোত। অসহায় আহতের মৃত্যু-আর্তনাদ।

বহুবার বহু প্রায়শ্চিত্ত করেছি আমরা ১৭৫৭র পলাশী প্রান্তরের অনুষ্ঠিত মহাপাপের,—দিয়েছি বহু প্রাণ দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর ধরে হাসিমুখে। মুঠো মুঠো দিয়েছি রক্তজবার অঞ্জলি।

কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৩ই এপ্রিল যেন জাতির মহারক্ত-তর্পণ হলো।

সে ভয়ংকর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বুঝি তুলনা নেই! সে কি নিদারুণ পাশবিকতা! যেদিকে অসহায় জনতা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটে যাচ্ছে, সেদিকেই গুলি ছোটে, যারা সংকীর্ণ ফাঁকের মধ্য দিয়ে বাইরে আসতে পেরেছিল তাদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি—তাদেরও গুলি করে মারা হয়। যারা রক্তাক্ত আহত হয়ে করুণ আর্তনাদ করছে, মরণ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে, তাদের ওপরে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে গুলি চালাতে সৈন্যেরা দ্বিধাবোধ করেনি এতটুকু। এমন কি যে হতভাগ্যরা গুলির আঘাতে রক্তস্রাবে হতচৈতন্য, সেই অসহায় হতচৈতন্যদের ধারালো সঙ্গীণের সাহায্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রাণান্ত ঘটানো হয়।

রাক্ষসের প্রতিমূর্তি জেনারেল ডায়ার ও কয়জন ইংরেজ নাকি বলেছিল: হলগেট ব্রীজে যেদিন উন্মত্ত জনতার পথ রোধ করা হয় এবং গুলি ও লাঠি চালিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেদিন ফেরার পথে ওরা কয়েকটি দালান, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, দুটো ব্যাংক লুট করে, ভারতীয় খৃষ্টানদের গীর্জা আক্রমণ করে, তাতে অগ্নিসংযোগ করে এবং কয়েকটি শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক মিস্ সেরউড নামে এক ইংরাজ মহিলাকে আক্রমণ ক'রে যথেষ্ট প্রহার ক'রে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়। অবিশ্যি একথাও সত্যি, কিন্তু কেন? তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছিল বলেই না! তাছাড়া সেদিন শ্বেতাঙ্গের দল ভুলে গেলেও আমরা জানি এবং ভুলিনি, ভারতীয় কয়জন ভদ্রলোক, রাস্তার ওপরে মিস্ সেরউডকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা ক'রে সুস্থ ক'রে তুলে তাদের কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

ঐ ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ ডায়ার বলেছিল গর্ব করে: for every one European life one thousand Indians would be sacrificed

এক-একজন ফিরিঙ্গীর জীবনের মূল্য ১০০০ হাজার হতভাগ্য ভারতীয় জীবনের তুল্য।

আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলেছে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে: বোমা ফেলে সমস্ত সহরটাকে উড়িয়ে দাও।

একথা দূরে দেশান্তর হ'তে আগত সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজ ঠিকই বলেছো। সাগরজলে নাও ভাসিয়ে বণিকের চোরা বেশে এসে সেলাম ঠুকে নজরানা দিয়ে বাদশাহী হুকুমনামা নিয়েছিলে কিনা, তাই নীচতা, শঠতা, জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে আমাদের জন্মভূমিকে অধিকার করে নিয়ে, আমাদেরই শ্রমের ফল, এবং আমাদেরই মুখের ক্ষুধার গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজেদের ঘরবাড়ী ভিটেমাটি সব উচ্ছেদ করে আজ তোমাদের জীবন আমাদের দেশে মূল্যবান বই কি! আমাদের চাইতেও হাজার গুণে মূল্যবান।

নিশ্চয়ই। For every one European life one thousand Indians would be sacrificed.

একটি ফিরিঙ্গীর জীবনের মূল্য শোধ করতে হবে হাজার ভারতবাসীর জীবন দিয়ে। ১৯১৯য়ের সমগ্র পাঞ্জাব রক্তাক্ষরে তারই সাক্ষ্য দেবে চিরকাল।

রক্তাক্ত অমৃতসহরের ওপরে চাঁদ উঠছে: জালিয়ানওয়ালাবাগের কবরখানায় সে চাঁদের আলো পড়েছে কি!

চারিদিকে স্তূপাকার মৃতদেহের রক্তস্রোতে মাটি ভিজে লাল, আহতের শেষ করুণ আর্তনাদ। সেই করুণ আর্তনাদে রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

১৪ই এপ্রিল: কোতোয়ালীতে স্থানীয় অধিবাসী, মিউনিসিপাল কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট ও সওদাগরদের এক সভা বসেছে।

বক্তা স্বয়ং ফিরিঙ্গী প্রতিনিধি ফিরিঙ্গী কমিশনার: তোমরা যুদ্ধ চাও না শান্তি চাও? Of course we are agreed to both! আমরা উভয়েতেই রাজী। গভর্ণমেণ্ট মহাশক্তিশালী। সরকার জার্মান-যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। জেনারেল ডায়ারের হাতে আমি সহরের সমস্ত ভার দিয়েছি, আমার আর কিছুই করবার ক্ষমতা নেই—তার আদেশ মান্য করেই এখন তোমাদের চলতে হবে।

হঠাৎ এমন সময় দেখা গেল জেনারেল ডায়ার, মিঃ মাইলস্ আইরভিং, রোহিল, প্লোমার সকলে তাদের অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে সভাস্থলে এসে ঢুকছে জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ তুলে।

ডায়ার এবার বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ায়: মৃত্যু চাও না শান্তি চাও? আমাদের হুকুম—হরতাল এখুনি বন্ধ করতে হবে। যদি শান্তি চাও তো দোকান-পাট সব খোল। নতুবা আমরা জানি কেমন করে বন্দুকের গুলিতে দোকান খোলাতে হয়! আমার কাছে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র যা এই অমৃতশহরও তাই! বল—যুদ্ধ চাও! Otherwise show me the ring-leaders—the scoundrels! I will shoot them!

নিশ্চয়ই তো, ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র যা, অমৃতশহরও তাই। এতে আর ভুল কি!

এবারে ফিরিঙ্গী আইরভিংয়ের বক্তৃতা: ইংরাজদের হত্যা করে তোমরা বড় অন্যায় করেছো। এর প্রতিশোধ তোমাদের প্রত্যেকের উপর এবং তোমাদের সন্তানদের ওপরে নেওয়া হবে। 'জালিয়ানওয়ালাবাগের' পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ওপরে কর্তাদের আক্রোশ তাহলে মেটেনি! মার্শাল ল জারী হয়েছে অমৃতসহরের ওপরে। শুধুই তাই নয়:

১। মিস্ সেরউড্কে যে রাস্তার ওপরে দুর্বৃত্তরা প্রহার করেছিল, ফিরিঙ্গী কর্তারা বিশেষ করে সেই স্থানটিই 'এ্যারেনার' মত বেছে নিল, তাদের মতে যারা অপরাধী তাদের সেখানে এনে প্রকাশ্যে পৈশাচিকভাবে বেত্রাঘাত করবার জন্য। যারা সেখান দিয়ে যাতায়াত করবে তাদের বুকে হেঁটে পশুর মত যেতে হবে।

২। প্রত্যেক ভারতবাসীকেই ফিরিঙ্গী কর্তাদের ইচ্ছা ও খেয়ালানুযায়ী কায়দায় সেলাম ঠুকতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৩। সামান্যতম কারণেও বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হতো।

৪। আইন ব্যবসায়ীদের জোর করে স্পেশাল কনেস্টবলের কাজ দেওয়া হতো এবং তাদের টেনে এনে রাস্তায় কুলীর মত খাটানো হতো।

৫। যেখানে খুশী সেখানে যাকে তাকে সামান্যতম সন্দেহের বশে আটক করে বেত্রাঘাত করা হতো!

৬। সর্বোপরি বিচারের জন্য একটি স্পেশাল আদালত খোলা হয়েছিল: সেখানে শ্বেতাঙ্গ আইনের দোহাই দিয়ে বিচারের নামে যথেচ্ছ কুৎসিত ও পৈশাচিক অত্যাচার চললো।

একদিন বা দু'দিন নয়, দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ কাল, অসহায় নিরস্ত্র সহরবাসীর ওপরে যে পৈশাচিক অত্যাচার করা হয়েছিল, কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে নজির মিলেছে কিনা জানি না—একমাত্র সুসভ্য ইংরাজের ভারত শাসনের ইতিহাসের পাতায় ছাড়া।

শিয়াল-কুকুরেরও চলে-ফিরে বেড়াবার, খাবার, ঘেউ ঘেউ শব্দ করবার স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ—ভারতীয়দের তাও ছিল না সেদিন।

ফিরিঙ্গীরা তো বলবেই না, এবং আমাদেরও সেদিন কণ্ঠ টিপে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আজ বলবো—আজ শুনতে হবে সবাইকে:

একশত পঞ্চাশ গজ যে সরু প্রায়ান্ধকার সংকীর্ণ একটি গলিপথ, সেই গলি-পথের দু'পাশের অধিবাসীদের কোথায়ও যেতে হলে বুকে হেঁটে যেতে হতো।

লর্ড হান্টার যখন জেনারেল ডায়ারকে জিজ্ঞাসা করে: ঐ জায়গার অধি-বাসীদের বাইরে কোথাও যেতে হলে কেন এমন কঠোর আইনে বাধ্য করা হয়?

ডায়ার জবাব দেয়: তারা তো ইচ্ছা করলেই নির্দিষ্ট সময়ের পর বুকে না হেঁটেও যেতে পারত।

ভোর ৬টা হ'তে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কেবল ঐ আইন বলবৎ থাকতো।

কিন্তু শয়তান জেনারেল ডায়ার বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল, ঐ আইনটির সঙ্গে আরো একটি আইনও সে জুড়ে দিতে ভুল করেনি: রাত্রি ১০টার পর কেউ রাস্তায় বের হলে তাকে গুলি করে মারা হবে!

শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী, সম্মানিত, বালক, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ কাউকেই সেই আইনের কবল হ'তে রেহাই দেওয়া হয়নি।

পঞ্চান্ন বৎসরের এক অন্ধ বৃদ্ধ কাহানচাঁদকে পর্যন্ত বুকে হাঁটতে বাধ্য করা হয়।

তারপর পাশবিক ভাবে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা—দোষী-নির্দোষের কথা নয়, সন্দেহ হয়েছে ব্যাস্! লাগাও বেত!

বেত্রাঘাতের একটি দৃশ্য: ছয়জন বালককে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। সুন্দর সিং তাদের মধ্যে একজন, চতুর্থ বেত মারার পরই হতভাগ্য বালক অজ্ঞান হয়ে পড়ে, মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে তার চৈতন্য ফিরিয়ে এনে আবার শুরু হয় বেত্রাঘাত। আবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এইভাবে বার বার অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও ৩০টি বেত্রাঘাত করবার পর পশু-জিঘাংসা শান্ত হয়। হতভাগ্য তখন রক্তাক্ত অচৈতন্য!

সামরিক আইনের প্যাঁচে গ্রেপ্তার যারা হয়, তাদের মধ্যে অনেককেই বন্যপশুর

মত ৭ ফুট উঁচু লোহার খাঁচায় তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য যে কোন অত্যাচার, জোর-জবরদস্তি ও জুলুম করতেও তাদের বাধে নি। ঐসব অত্যাচারেও যে কত নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ দিয়েছে তার সংখ্যা নেই।

অমৃতসহর সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট : The massacre in the Jalleanwala Bagh was an act of inhumanity and vengence, unwarranted by anything that then existed or has since transpired; on General Dyer's own showing the introduction of martial law in Amritasar was not justified by any local causes and that its prolongation was a wanton abuse of authority, and its administration unworthy of civilised Government.

শুধুই কি পাঞ্জাবের অমৃতসহর! তার্ন-তরণ, লাহোর, কাসুর, পত্তি ও খেমকরণ, গুজরানওয়ালা, ওয়াজিরাবাদ, নীজামাবাদ, আকলগড়, রামনগর, হাফিজাবাদ, সাঙ্গলাপাহাড়, মোমান, মানিয়ানওয়ালা, নওয়ান পিণ্ড, চুহারকাণা, সেথুপুরা, লায়েলপুর, গুজরাট, জালালপুর, জাশুন, মালাকারাল—সর্বত্র সেই পাশবিক অত্যাচারের রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে—রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করেছে বহু শত অসহায় নিরীহ জনসাধারণকে, ধনেপ্রাণে তারা নির্যাতিত হয়েছে।

দু'একটি দৃশ্য শুধু এর মধ্যে তুলে ধরি চোখের সামনে : **লাহোর**—পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর, 'রাউলাট বিলের' প্রতিবাদে যখন সমগ্র ভারতে প্রতিবাদ উঠেছে, সেদিন চুপ করে থাকেনি।

১০ই এপ্রিল লাহোরবাসী শুনতে পেলে গান্ধীজীকে অমৃতসহরে সরকার পক্ষ আসতে দেবে না হুকুমজারী করে বম্বেতে আঁকে অন্তরীণ করা হয়েছে।

সর্বত্র দেখা দিল হরতাল! সরকার পক্ষ রাগে ফুলতে থাকে।

একদল লোক গান্ধীজীর মুক্তি প্রার্থনা করে গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশ বাধা দেবার চেষ্টা করে, পরে তাতে কৃতকার্য না হয়ে গুলি চালায়।

পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী এই অকারণ গুলির সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ ব্রডওয়েকে অনুরোধ জানান, এমনি করে গুলি চালিয়ে জনতাকে ক্ষেপিয়ে দেবেন না। আমাকে একটু সময় দিন, আমি ওদের বুঝিয়ে ঠিক করবো।

কিন্তু অস্থির-প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গ কমিশনার জনতা ফিরে যাওয়ায় দেরি হচ্ছে দেখে আবার আদেশ দেয় গুলি চালাবার।

বহুলোক হতাহত হয়। হরতাল চলছে লাহোরে, শ্বেতাঙ্গরা বললে : বন্ধ কর হরতাল।

পণ্ডিতজী এক সভা ডেকে সহরবাসীদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় শ্বেতাঙ্গরা বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে এসে হাজির।

পণ্ডিতজীর অনুরোধে লোকের মন শান্ত হয়ে আসছিল, এবং যখন তারা

সভাভঙ্গে বাড়ীর পথে রওনা হয়েছে, তখন হঠাৎ বন্দুক গর্জে ওঠে : দুম্‌··· দুম্‌···দুড়ুম্‌ !···

মৃত ও আহতের আর্তনাদে বাতাস ভরে গেল—বইলো রক্তস্রোত।

৫ই এপ্রিল ১৯১৯ হ'তে ২৯শে মে পর্যন্ত জনসন ছিল লাহোরের শাসনকর্তা। সে এক আদেশ জারী করে, সন্ধ্যার পর কেউ রাস্তায় বের হলে তাকে গুলি করা হবে। সহরবাসীর লাহোর ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না।

ভারতবাসী দু'জন পাশাপাশি চললেও নাকি বে-আইনী। ফিরিঙ্গী দেখলে রাস্তা না ছেড়ে দেওয়াটা শান্তিভঙ্গের পরিচায়ক।

সামারি কোর্ট স্থাপন করে নানা অত্যাচার অবাধে চলতে থাকে বিচারের নামে। কেউ অপরাধী সন্দেহ হলে তাকে একটা কাষ্ঠ-ফলকের সঙ্গে দুই হাত ঊর্ধ্বদিকে পৃথক পৃথক ভাবে এবং দুই পা ঐভাবে বেঁধে নিদারুণ বেত্রাঘাত করা হতো।

সাধারণ নগরবাসী হ'তে শুরু করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এমন কি স্কুলের নাবালকদেরও সে চরম শাস্তি হ'তে রেহাই দেয়নি তারা।

হর্ণিমান বলেছিল : Colonel Johnson showed not only an intensity but a malignant efficiency in devising means for the terrorisation of the population, which if not always as cool-blooded was as ingenious and refined in the cruelty of method as any displayed by his competitors.

ফিরিঙ্গী জনসন যে কেবলমাত্র একজন পাকা লোকই ছিল তা নয়, পরন্তু নিরীহ লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবারও তার অশেষপ্রকার শয়তানী কুটবুদ্ধিও ছিল। তার চেয়ে নিষ্ঠুর ফিরিঙ্গী কর্মচারী তখন আর কেউ ছিল না।

কাসুর : এখানকার নিরীহ অধিবাসীদের ভাগ্য অর্পিত ছিল কর্ণেল ম্যাকরের ও তার সহকারী ক্যাপ্টেন ডোভেটেনয়ের ওপরে। তারা এমন ভীষণ অত্যাচার কাসুরে করেছিল যা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

অনেকের অন্তঃপুরে সামরিক আইনের বলে প্রবেশ করে জোর করে খানা-তল্লাসী করেছে, স্ত্রী-পুরুষ আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলকে স্টেশনে আনিয়ে প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে নির্বসনা করে আকণ্ঠ তৃষ্ণায় একবিন্দু জল পর্যন্ত না দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। স্ত্রীলোকের শ্লীলতা রাজপথের জনসাধারণের চোখের সামনে অপমানে জর্জরিত করে পৈশাচিক অট্টহাসি হেসেছে।

প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করিয়ে নির্বিবাদে দোষী নির্দোষ না বিচার করে ৪৮ জনকে শ্বাসবন্ধ করে হত্যা করেছে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ঐরূপ অমানুষিক ভাবে নির্দোষদের ফাঁসি দেওয়া বন্ধ হয়।

গুজরানওয়ালা : এখানে নির্বিবাদে পাইকারী হত্যালীলা চলেছে শ্বেতাঙ্গদের নির্দেশে, অথচ প্রথমে শ্বেতাঙ্গরাই গো-বধ করে ও মসজিদে শুকরের মাংস ছড়িয়ে দিয়ে ধর্মানুরক্ত ভারতবাসীর ধর্মের ওপরে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করে।

দলে দলে হিন্দু মুসলমান স্টেশনের দিকে চলে, ওয়াজিরাবাদের একখানা ট্রেন সে-সময় আসে, সেই ট্রেনের একজন যাত্রী ওদের বলে : ১৩ই এপ্রিল ভীষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে অমৃতসহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে।

জনতার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে : তারা কাঁচী ব্রিজের দিকে ছোটে। পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট্ গুলি ছুঁড়তে শুরু করল জনতার ওপরে সেই সময়।

দু'দিন পরে যখন শহর কতকটা শান্ত হয়ে এসেছে, সেখানে এলো কর্ণেল ওব্রায়েন। আবার শুরু হলো নতুন করে হত্যা-উৎসব : এরোপ্লেন এনে নির্বিবাদে শহরবাসীর ওপরে বোমা ফেলা চলতে লাগল। কত নিরীহ লোক যে বোমার আঘাতে হতাহত হলো তার সংখ্যা নেই।

মেজর কারবারির কীর্তিও কম নয়। এ তার নিজের মুখেরই সদম্ভ উক্তি : আমি বহুশত মেসিনকামানের গোলা শহরের উপর ছুঁড়েছি। প্রায় ২০০ শত কৃষককে একটা মাঠের মধ্যে একত্র দেখে আমি বোমা নিক্ষেপ করেছি। যখন দল ভঙ্গ ক'রে ওরা এদিক ওদিক প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে তখন ২০০ ফিট ওপর থেকে তাদের ওপর গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে গ্রাম পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলাম। কে দোষী, কে নির্দোষ তা বেছে আমি গুলি করিনি। গ্রাম হ'তে ফিরে এসে আমি শহরের সর্বত্র গুলি চালিয়েছি।

এর উপর ছিল সামরিক আইন : আটটার পর কেউ ঘরের বার হলে তাকে তখুনি গুলি করে মারা হতো। সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকের দ্বারা বাজারের পচা ড্রেন সাফ করিয়ে নেওয়া হয়েছে পর্যন্ত।

ওয়াজিরাবাদ : ১৫ই হরতাল পালন করা হয়, আর ১৬ই দুরাত্মা ওব্রায়েনের সেখানে আবির্ভাব হয়। ১৮ই একটি প্রকাশ্য দরবারে ওব্রায়েন তার মুখোস খোলে : শোন্ মূর্খ! তোরা বুঝি মনে করিস যে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। শোন্ ক্ষ্যাপার দল, তোদের মাথা খারাপ হয়েছে, তোদের চিকিৎসার জন্য উত্তম ব্যবস্থা হাজির।

ভাবছি শক্তিগর্বে উম্মাদ কুকুর সত্যি কে হয়েছিল—শ্বেতাঙ্গ ওব্রায়েন না ওয়াজিরাবাদের নিরীহ জনসাধারণ!

ওব্রায়েনের প্রেতাত্মা শূন্যলোকে আজিও ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না জানি না, কিন্তু তার সেই দম্ভোক্তি আজিও কি আমরা কেউ ভুলতে পেরেছি! তোদের জানা আছে যে, গভর্ণমেণ্ট যে কোন লোকের সম্পত্তি ইচ্ছা করলেই বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

হাঁ, ১৭৫৭র শুরু হ'তে দীর্ঘ পোনে দুইশত বৎসরের ভারতে শ্বেতাঙ্গ প্রজা-পালনের ইতিহাসে ঐ ধরনের বহু কীর্তির সত্যিই যে অভাব নেই!

: তোদের ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ করে ফেলতে পারে গভর্ণমেণ্ট, বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে—এমন ব্যবস্থাও আছে।

অত্যাচারের পাষাণ-রথ ঘর্ ঘর্ শব্দে চলে : লোকের মাথার পাগড়ী খুলে সেটা সেই লোকের গলায় বেঁধে, পাগড়ীর অন্য দিকটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়-দৌড় করানো হচ্ছে।

সেলাম করবার সময় রাজপুরুষ বা গোরা সৈন্য, যেই হোক না কেন, সেই সাদা মুখওয়ালা ব্যক্তি যদি সেই সেলাম লক্ষ্য না করে, তবে সেই সেলামওয়ালাকে সাদা মুখওয়ালা ব্যক্তির জুতো চুম্বন করতে হবে।

স্থানীয় লোকদের ব্যবহার্য খাট-তক্তপোষ সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমস্ত নগরবাসীকে থানায় নিয়ে গিয়ে, শিশু, বালক ও গুণ্ডা, শয়তান প্রকৃতি লোকদের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষী দিইয়ে অমানুষিক উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা করা হয়েছে। ওব্রায়েন বলেছিল: ঐ মূর্খ কালা আদমীগুলোকে নানারূপ শাস্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তারা নূতন শাসকের কর্তৃত্বাধীনে আছে।

মানিয়ানওয়ালা: ছোট্ট একটি গ্রাম, রেল স্টেশনের খুব কাছে, স্টেশনের পার্শ্ববর্তী কতকগুলো লোক অমৃতসহরের ভীষণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা লোকপরম্পরায় শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। না হওয়াটাই আশ্চর্য।

যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে, সেই উত্তেজিত হবে ঐ ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে। যাহোক উত্তেজিত অবস্থায় যদি তারা স্টেশন লুঠ করে ও আগুন ধরিয়ে দিয়েই থাকে তার জন্য দায়ী কারা?

কিন্তু সেই সামান্য অপরাধের যে শাস্তিবিধান ফিরিঙ্গী করলে, তা শুধু অচিন্ত্যনীয়ই নয়, আদিম পৈশাচিক জগতেও বোধ হয় তার জুড়ি মিলে না।

শ্বেতাঙ্গিনী সেরউড্‌কে একটু প্রহার করা হয়েছিল বলে হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে অমানুষিক কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছিল। তখন কর্তারা বলেছিলেন: আমরা সব সইতে পারি, কিন্তু মেয়েলোকের উপরে অত্যাচার সইতে পারি না।

সেদিন তো কেউ জবাব দেবার ছিল না, তাই ওই শ্বেতাঙ্গের মিথ্যা ভাষণের প্রত্যুত্তর দিতে পারেনি! কিন্তু আজ!

ফিরিঙ্গীদের হয়ত সেদিন শক্তি মদগর্বে অন্ধ হয়ে জানা ছিল না যে, ভারতের কালা-আদমীরা সত্যিই কোন যুগে কোন কালে আজ পর্যন্ত মায়ের বা বোনের অপমান সহ্য করতে শেখেনি।

তবু যা ঘটেছে তাদের রাজত্বকালে সে তাদেরই রাজ্যপরিচালনার বিষময় পরিবেশে! ফিরিঙ্গী বসওয়ার্থ স্মিথ্ মানিয়ানওয়ালাতে যে অমানুষিক জঘন্য কাজ করেছিল, তার উদাহরণ হয়ত একমাত্র তিনিই স্বয়ং।

সামান্য একটু বর্ণনা: এক অত্যাচারিতা ভদ্রমহিলা গুরদেবীর প্রত্যক্ষ বর্ণনা: একদিন আট বৎসর বয়স হতে শুরু করে বয়স্ক অতি বৃদ্ধ পর্যন্ত নগরের সমস্ত পুরুষকে ডাক্‌বাংলোয় জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তারপর আনা হলো ধরে সমস্ত স্ত্রীলোকদের। জোর করে আমাদের লজ্জাভরণ অবগুণ্ঠন খুলে দিল। লাইন করে আমাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর আমাদের হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে আমাদের সর্বাঙ্গে পৈশাচিকভাবে উপর্যুপরি বেত্রাঘাত শুরু করল। আমাদের মুখে থুতু দিতে লাগল ও অকথ্য কুৎসিত নোংরা ভাষায় যতপ্রকার অশ্রাব্য গালাগালি দিতে শুরু করল।

এ পৈশাচিক নৃশংস কাহিনীর আর কত বর্ণনা দেবো! যে রক্ত-তাণ্ডবের, মৃত্যু-উৎসবের পৃথিবীর ইতিহাসে হয়ত দ্বিতীয় নজির নেই, শ্বেতাঙ্গের ভারত-শাসনের ইতিহাসে তাই লেখা হলো চিরদিনের জন্য।

পাঞ্জাবে মোট চারজন ফিরিঙ্গীর প্রাণহানি ও শ্বেতাঙ্গিনী মিস্ সেরউড্‌কে প্রহার করা ও সামান্য লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মাশুল হলো:

সরকারী রিপোর্ট: ৩,৮০০জন লোক হতাহত। আহতের সংখ্যা-নির্ণয় দুঃসাধ্য। ৪,০০০ ব্যক্তির উপরে নির্মম দণ্ড ও অত্যাচার, এ ছাড়াও ৪,৫০,০০০ লক্ষ লোককে অকথ্যভাবে বিব্রত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়; এবং যে সব পাষণ্ড পশুর দল এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের সহায়তা দান করেছে, তাদের প্রায় ৬ লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়েছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্ত-নদী হ'তে শেষ বিদায় নেওয়ার আগে আর একবার সদ্য হতভাগিনী বিধবা ভদ্রমহিলা রতন দেবীর কথা স্মরণ করছি:

প্রত্যক্ষদর্শিনী রতন দেবী: যেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড হয়, সেদিন আমি বাড়ীর এক কক্ষে শুয়েছিলাম, জালিনওয়ালাবাগ আমার বাড়ীর খুব নিকটে। হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। অনবরত গুলির শব্দ কানে আসতে থাকায় শয্যা হতে উঠে বসলাম। আবার বড় ভাবনা হলো, আমার স্বামী বাগের সভায় গিয়েছেন। আমি তখন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তাড়াতাড়ি দুজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে বাগে এসে উপস্থিত হলাম। শত শত মৃতদেহ এখানে সেখানে পড়ে আছে। সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনো ভুলব না। আমার স্বামীর খোঁজ করতে করতে একটা মস্তবড় মৃতদেহের স্তূপে তাঁকে পেলাম। যতদূর গিয়েছিলাম শুধু মৃতেরই স্তূপ দেখতে পেলাম, রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। একটু পরেই লালা সুন্দরদাসের দুই ছেলে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আমি স্বামীর মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য তাদের একখানা চোপায়া এনে দিতে বলি। তারা যখন চলে যায় তাদের সঙ্গে যে দুজন স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে বাগে এসেছিলেন তাদেরও পাঠিয়ে দিই। তখন রাত্রি প্রায় আটটা, কোন লোককে পর্যন্ত বাইরে চলাচল করতে দেখছি না। কেননা সামরিক আইন জারী হয়েছিল। কে প্রাণ দেওয়ার জন্য রাস্তায় বের হবে? আমি ওদের প্রত্যাগমনের আশায় বিলম্ব করতে লাগলাম ও চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলাম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় একজন শিখ ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আমি অনুরোধ জানাই: আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে আমি আমার স্বামীর মৃতদেহ এই রক্তস্রোতের মধ্য হ'তে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে পারি। তিনি সম্মত হলেন। তখন তিনি আমার স্বামীর মাথার দিকটা ধরলেন আর আমি পা দু'খানি ধরে বহন করে কোনরকমে একটা শুষ্ক ভূমির ওপরে এনে আমার স্বামীর মৃতদেহ রাখলাম।

রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য যখন এলো না, তখন আমি উঠে আহ্লাওখাত্রার দিকে চললাম, মনে করে-

ছিলাম যে ঠাকুরদ্বার থেকে কোন ছাত্রকে আমার সাহায্যের জন্য নিয়ে আসব। কতক দূর গিয়েছি, হঠাৎ কে একজন কোন একটা বাড়ীর জানালার নিকট হতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অত রাত্রে আমি একাকী কোথায় যাচ্ছি!

আমার মৃত স্বামীকে বাগ থেকে বহন করে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন লোকের দরকার ঃ জবাব দিলাম।

আমি একজন আহত লোককে শুশ্রূষা করছি, তাছাড়া রাত্রি এখন আটটা বেজে গেছে, এখন তো কেউই বাড়ীর বাইরে যাবে না ঃ তিনি বললেন।

আমি আবার অগ্রসর হলাম, কিছুদূর অগ্রসর হ'তে আবার আর একজন লোক আমাকে আগের মত প্রশ্ন করলে। আমি তাকেও পূর্ববৎ বললাম। সেখানেও আমাকে নিরাশ হ'তে হলো। নিরাশ হয়ে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি, এক বৃদ্ধ বসে ধূমপান করছেন। তাঁর কাছে হাত জোড় করে আমার দুঃখের কাহিনী বলার পর তিনি তাঁর পার্শ্বে শায়িত কয়েকজন লোককে বললেন ঃ এই মহিলাটি বিপদে পড়েছেন, একে তোমরা গিয়ে সাহায্য করো।

কিন্তু তারা কেউ কিছুতেই অত রাত্রে আমার সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। বললেন ঃ কে বাবা এত রাত্রে বাইরে বের হয়ে গুলি খেয়ে মরবে!

কি আর করা যায়, বিফল-মনোরথ হয়ে আমি আবার বাগে আমার স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলাম।

কুকুর শিয়াল তাড়াবার জন্য হাতে একখানা বংশদণ্ড নিলাম।

অন্ধকার যেন চাপ বেঁধে বসেছে ঃ একটুও হাওয়া নেই কোথাও।

তিনটি আহত লোককে দেখলাম, মৃত্যু-যন্ত্রণায় তারা ছট্‌ফট্ করছে, একটা মহিষও আহত হয়ে মাটির উপর পড়ে ভয়ানক চীৎকার করছে।

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হবার উপক্রম হলো।

দেখলাম একটি ১২ বছরের শিশু আহত হয়ে পড়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে মৃত্যুপথের পথিক বালকটি কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে ঃ মা, তুমি আমায় ফেলে যেও না।

না বাবা, আমি আমার স্বামীর মৃতদেহ ফেলে কোথায়ও যাবো না।

আমার কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী বালকটির মুখখানি যেন আশায় একটু প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। আহা! কার বাছা রে! কি সুন্দর মুখখানা!

আমি তাকে আমার গায়ের কাপড়খানি খুলে দিতে চাইলাম, কিন্তু সে শুধু একটু জল চাইলে ঃ একটু জল দাও মা! বড় পিপাসা!

হায়রে অদৃষ্ট! এই মৃত্যুকবরে জল কোথায় পাবো! তার মুখে একটু জল দিতেও পারলাম না।

ক্রমে রাত্রি বেড়ে চলেছে। চারিদিকে স্তূপীকৃত অসংখ্য শবদেহ, মৃত্যুকাতর যন্ত্রণায় চারিদিককার বাতাস যেন বিষিয়ে উঠেছে।

রাত্রি দু'টো। একজন আহত জাঠ তার পা'টা উঁচু করে ধরবার জন্য আমাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল, দেখলাম হতভাগ্য আহত হ'য়ে দেয়ালের গায়ে ঝুলে আছে। যেভাবে বলছিল সেইভাবে আমি পা'টা তুলে ধরলাম।

তারপর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আর কারো সঙ্গে আমার দেখা বা কথাবার্তা হয়নি।

ক্রমে ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেলা প্রায় ছয়টার সময় লালা সুন্দরদাস ও তার পুত্ররা চৌপায়া নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তাদের সাহায্যে আমার স্বামীর মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

সারাটা রাত্রি সেই ভীষণ শ্মশানে কেটে গেল আমার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে।

সেসময় আমার যে কিরূপ অবস্থা হয়েছিল, তা আমি নিজেই বর্ণনা করতে অক্ষম।

স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত শবদেহ, কেউ চিৎ কেউ উপুড়, কেউ কাত হয়ে মরে পড়ে আছে। সেইসব মৃতদেহের মধ্যে অসংখ্য অবোধ শিশুর মৃতদেহও ছিল।

সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন এক প্রবল ঝড়ে ওলট-পালট করে রেখে গিয়েছে।

কোথাও সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই—সবাই কাল-নিদ্রায় অভিভুত!

মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের ডাক শুধু শুনতে পেয়েছি। সমস্তটা রাত্রি আমি কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি।…………

'জালিয়ানওয়ালাবাগে'র অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পর স্যার মাইকেল ওডায়ার, বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের অনুমতি নিয়ে ১৮০৪ সালের এক জরাজীর্ণ আইনের জোরে পাঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতসহরে ১৫ই এপ্রিল এবং গুজরান-ওয়ালা ও অন্যান্য কয়েকটি জেলায় ১৬ই, ১৯শে ও ২৪শে এপ্রিল সামরিক আইন-জারী করে। মার্শাল ল।

ঐ আইন রেলওয়ে জমি ছাড়া অন্যত্র ১১ই জুন ও এখানেও ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত বহাল থাকে।

এই আইনজারীর প্রতিবাদে তদানীন্তন শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যার শংকরণনায়ার পদত্যাগ করলেন।

নিজেদের কুকীর্তি যে বেশী দিন চাপা দেওয়া যাবে না, এ মহাসত্যটি ফিরিঙ্গীরা সেদিন হয়ত খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল, তাই তারা আইনের বলে দেশের যাবতীয় সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠ রোধ করে। মহামতি সি. এফ. এণ্ড্রুজ পীড়িতের আর্তনাদে স্থির থাকতে না পেরে পাঞ্জাবে ছুটে গেলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। পণ্ডিত মদনমোহনকে পাঞ্জাব প্রদেশে গমনে বাধা দিল শয়তান সরকার।

দেশের মহাকবি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল, তাই অনেক মার খেতে হচ্ছে।

মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তাই শত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইছে, কিন্ত আজও শিক্ষা শেষ হয়নি…………

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, repealed to our minds the helplessness of our

position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized Governments, barring some conspicuous exception, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it claim no political expediency, for less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons.

অথচ মজা এই যে, আমাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে জেনেও দো-আশলা সংবাদপত্রগুলো (যারা আমাদের দেশের লোকের কৃপায় তাদের তহবিল ভরিয়ে তুলেছে) কর্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের প্রশংসাই করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের রক্তক্ষরা বেদনাকে কৌতুক করেই প্রকাশ করেছে, যার ফলে কর্তৃপক্ষ সামান্যতম প্রতিকারের বা বিচারের প্রয়োজনও বোধ করেনি আমাদের আর্ত চিৎকারে।

আমাদের কণ্ঠ তো রুদ্ধই। তাই কবি-হৃদয় মথিত করে শত-সহস্র লাঞ্ছিত জর্জরিত নরনারীর আর্ত করুণ কণ্ঠ যেন ভাষায়িত হয়ে ওঠে ঃ

Knowing that our appeals have been in vain and the passion of vengence is building the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting it's physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror.

শ্বেতাঙ্গের দেওয়া একমাত্র সম্মান বিশ্বকবিকে ১৯১৫, ৩রা জুন স্যার' উপাধি আজ আর বিজয়-মাল্য নয়—কণ্টক-ক্ষতে হয়ে উঠেছে রুধিরাপ্লুত! মালা হয়েছে বিষধর কালনাগ ঃ কণ্ঠকে আজ বেষ্টন করেছে বিষের জ্বালায়।

তাই কবি ছিঁড়ে ফেলে দেন পরদেশীর দেওয়া পুষ্প-মাল্য পরাধীনতার অবিমিশ্র ঘৃণা ও আত্মগ্লানিতে ঃ

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King.

মহাত্মা গান্ধীও তাঁর প্রতিবাদ জানালেন—তাঁর 'কাইজার ই-হিন্দ্' পদবী ত্যাগ করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম অত্যুগ্র আঘাত যেন সহসা সমগ্র ভারতের মর্ম-মূলে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মতই সতীব্রভাবে হানলো দ্বিতীয় আঘাত : অসহযোগ আন্দোলনের জন্য গান্ধীজীর নিকট হ'তে এলো আহ্বান।

শাসক-গোষ্ঠীর সকল কিছুর সঙ্গেই অসহযোগের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু এদেশের মহাকবি গান্ধীজীর এ আহ্বান ও নেতি কর্মপন্থাকে যেন ঠিক হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না : Let us forget the Punjab affairs—but never forget that we shall go on deserving such humiliation over and over again until we set our house in order.

: অপমান ও অন্যায়ের জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমরা য়ুরোপকে তাহা ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছি ; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আমরা আপনাকেই ক্ষুদ্র করিতেছি। আমরা যেন আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলি, কলহ বা দ্বন্দ্ব করিবার প্রবৃত্তি হইতে ক্ষুদ্রতার দ্বারা ক্ষুদ্রতার জবাব না দিই। আমাদের চরম নৈতিক প্রতিবাদ যখন স্বাভাবিকভাবে অসহযোগ আকারে দেখা দিবে, তখন ইহা মহিমা-মণ্ডিত হইবে, তখন ইহা সত্য হইবে ; কিন্তু ইহা যখন ভিক্ষারই রূপান্তর, তখন ইহা বর্জনীয়।

* * *

এখনো মাঝে মাঝে তাই মাস্টারের মনে হয়, বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করবার যে স্বপ্ন তারা, বিপ্লবীরা, দেখেছিল—তা কি শুধুই স্বপ্ন!

সত্যিই কি সেই স্বপ্নের মূলে ছিল না কোন মহাসত্য!

যে অন্তর্বেদনায় একদা তারা আত্মীয়-স্বজন গৃহ ছেড়ে, স্নেহ ভালবাসা মায়ার সকল কিছুর বন্ধন অক্লেশে ছিঁড়ে ফেলে মুক্তি-যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়েছিল, সে কেবলমাত্র ভাবেরই কী বাষ্পে ঠাসা ফানুস!

তা নয়তো কি! আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে। বিপ্লব-যুগের অগ্নি-

সাধক সুষ্টিধর সান্যাল—আজ কি তার সকল প্রয়োজনের শেষ হয়ে গেল!

কেন অন্তরে আজ তার এই নিঃস্ব রিক্ততা!

এ শুধু আজ নয়, কিছুদিন হ'তেই ঘুরে ফিরে কেবলই যেন এই কথাটাই তার মনে হয়।

সত্যিকারের সেদিন তারা—বিপ্লবীরা, কি চেয়েছিল: কোন্ মহাসত্যের লাগি তারা সেদিন অবহেলে ফিরিঙ্গীদের ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়ে গেল একের পর এক!

তারা—বিপ্লবীরা, জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অসংখ্য সভ্যবৃন্দ ও নেতারা যে এই দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করে গেল, সে কি ১৯৪৭য়ের এই স্বাধীনতার জন্যই!

এই কি তাদের চির প্রার্থিত বিপ্লবের রূপ?

তবে দেশের লোকের মুখে অন্ন নেই কেন? কেন নেই লজ্জা নিবারণের পরিমিত বস্ত্রখণ্ড, নেই কেন মাথা গুঁজবার মত সামান্য ঠাঁই? না না, এ তো তারা চায়নি! তবে?...

* * *

আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতের সর্বত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিচলিত বিক্ষুব্ধ। কাজেই একটা লোক-দেখানো তদন্ত ছাড়া আর বোধ হয় ফিরিঙ্গীদের দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। হলোও তদন্ত: সরকারী ও বেসরকারী তদন্ত।

২৫শে মার্চ বেসরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, স্বাক্ষর করলেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, মুকুন্দ রামরাও জয়াকর, ফজলুল হক্ ও আব্বাস তায়েবজী। দীর্ঘকাল পরে তদন্তে নেমে তারা পাঞ্জাবে তেমন কোন বিদ্রোহের লক্ষণ দেখতে পাননি। তবে ঐ পাশবিক অত্যাচারের জন্য তারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড, স্যার মাইকেল ও'ডায়ার ও জেনারেল ডায়ার থেকে আরম্ভ করে বহু উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে দায়ী করলেন।

সরকারী নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট (যে সমিতি গড়া হয়েছিল অধিকাংশ ফিরিঙ্গীদের নিয়েই) সামরিক আইনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে মত প্রকাশ করে অত্যাচারী কর্মচারীদের মৃদু ভর্ৎসনা করলেন: ছিঃ! তোমাদের কিন্তু এতটা বোকামি করা উচিত হয়নি! ফলে জনমত ক্রমে অধিকতর তীব্র হয়ে উঠতে লাগল।

অতঃপর সাগরপারে হাউস অফ্ কমন্সেও ৮ই জুলাই তারিখে পাঞ্জাবের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হলো। মহামান্য ভারত-সচিব সুবিখ্যাত মিঃ মণ্টেগু ডায়ারের গুলিচালনার কথা উল্লেখ করে সখেদে বললে: Oh! it is nothing but a grave error of judgement.

ভারতের প্রবাসী ইংরাজ মহিলারা বীরশ্রেষ্ঠ ডায়ারের গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে চাঁদা তুলে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিল তাকে।

পরাধীন দেশবাসী সব দেখলে, সব শুনলে—কিন্তু ১৯১৯য়ের এপ্রিলে জেনারেল ডায়ার যে লেলিহ আগুন জেলে ভারতের মাটিকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল,

তার প্রতিবাদ এলো অগ্নিঝলকে দীর্ঘ আঠারো বৎসর পরে, পাঞ্জাবের এক তরুণ কিশোর উধম সিংয়ের হস্তধৃত পিস্তলের মুখে ১৯৩৬ সালে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটির তলায় হাজারো দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুত হাহাকারের শেষ রক্ত-তর্পণ হলো ১৯৩৬ সালে উধম সিংহের হাতে লণ্ডনে জেনারেল ডায়ারের মৃত্যুতে।

যে রক্তপাত ডায়ার দীর্ঘ আঠার বৎসর আগে সুদূর পাঞ্জাবের মাটিতে করে এসেছিল, তা যে সেদিনও শুকিয়ে যায়নি, মৃত্যু-মুহূর্তে হয়ত সেকথা সে জানতে পেরেছিল।

* * *

ভারত কি বিদ্রোহীই রবে চিরদিন?

শান্তির বাণী কি কোনকালেই এখানে উচ্চারিত হবে না?

নীলাঞ্জনের মত বিদ্রোহীদের অদেহী আত্মা কি কোন দিনই তাদের পথ খুঁজে পাবে না।

দুজনে একসঙ্গে ধরা পড়ে বহরমপুর জেলে গেল: মাস্টার ও নীলাঞ্জন। গোয়েন্দা শিকারী কুকুরদের দল তাদের পিছু পিছু তাড়া করে ফিরছিল। গোয়ালন্দের এক হোটেলে তারা যখন নিশ্চিন্তে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে, অতর্কিতে পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে—প্রতিরোধের সময় পর্যন্ত পায়নি ওরা। তাছাড়া নীলাঞ্জনের পায়ে একটা দগ্‌দগে ঘা হয়ে, পা ফুলে উঠেছে এবং ভীষণ জ্বরে সে তখন আচ্ছন্ন। এ অবস্থায় তো ও এক পাও চলতে পারবে না। মাস্টার ইচ্ছা করলে হয়ত পালাতে পারত, কিন্তু নীলাঞ্জনকে ফেলে পালাতে পারেনি, তাই ধরা দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

অনেকগুলো অভিযোগ ছিল ওদের বিরুদ্ধে। বিচারে দু'জনারই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হলো। কালাপানি পারে নিয়ে যাওয়ার আগে কিছুদিনের জন্য ওদের বহরমপুরের বন্দীশালায় এনে রাখা হয়।

কিন্তু এ বন্ধন, এ শৃংখল অসহনীয়।

ভাদ্রের এক ঘনঘোর রাত্রে আকাশ ভেঙ্গে নেমেছে বৃষ্টি।

এই অবসরে জেল থেকে দুজনে পালায়। মাস্টার প্রথমে প্রাচীর টপ্‌কে গেল; নীলাঞ্জন কোনমতে যখন প্রাচীরের ওপরে উঠেছে, রাতজাগা এক প্রহরীর নজরে সে পড়ে গেল। বন্দুক হ'তে অব্যর্থ অগ্নি-ঝলক ছুটে এল-দুড়ুম!

উঃ! একটা মৃদু যন্ত্রণাকাতর শব্দমাত্র শেষবারের মত বৃষ্টিধারার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তারপর একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ।

চারিদিকে সোরগোল জেগেছে তখন: বাজতে শুরু করেছে কয়েদখানার পাগলাঘণ্টি মুহুর্মুহু।

পিছন পানে ফিরে তাকাবার আর সময় নেই। নেই সময়, দুফোঁটা অশ্রু বরিষণের বিলাসের।

যে পশ্চাতে রইলো পড়ে থাক সে। তার কাজ শেষ হয়েছে।

সৃষ্টিধর বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

পাগলা ঘণ্টি তখনও বেজে চলেছে—ঢং···ঢং···ঢং !···

তারপর পথে, ঘাটে, মাঠে, প্রান্তরে, জঙ্গলে—ঝড়ো হাওয়ার মুখে ছিন্ন পাতার মত সৃষ্টিধর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, একবারও কি মনে পড়েনি তার সেই নীলাঞ্জনের কথা।

মনে পড়েছে বৈকি : আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ধরা পড়ে নীলাঞ্জনের কথা। ফাঁসি হয়ে গেল একদিন।

বীরের মতই সে ফাঁসির দড়িতে আত্মদান করে গেল।

সেকথা কি আজ বলবার দিন এসেছে ?

সৃষ্টিধর দিদি হিরণ্ময়ীর শেষশয্যার পাশে বসে তাই হয়ত ভাবছে আনমনে।

কেন সত্য এসে দিদির অন্ধদৃষ্টি খুলে দিয়ে যায় না !

দিদি হিরণ্ময়ী কাঁদছে। কাঁদুক। উতলা মধ্যাহ্ন বাতাসে বিস্মৃতির দুয়ার আজ আবার খুলে যদি যায় যাক।

মৃত্যুমিছিলের একটি পাশে এসে আমরা সকলে দাঁড়াই অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধার কৃতাঞ্জলিবদ্ধ প্রণতি নিয়ে।

মৃত্যুবাসরে কত কত প্রদীপ জ্বালিয়ে একে একে যারা খোলা দুয়ার দিয়ে চলে গেল, যাদের মাটির কবরে আবার একদিন দেখা দেবে নব অঙ্কুরোদ্গম, স্মৃতির বিস্মরণী পার হ'য়ে সেই সব মৃত্যুহীনদের হাতে হাত মিলিয়ে আজিও আমরা এগিয়ে চলেছি তেমনি কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে নবারুণ এক প্রভাতের তীর্থে—যে তীর্থযাত্রার শেষ প্রান্তে তেত্রিশ কোটি আমাদের আশার আনন্দের ভারত স্বপ্নে ও গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে ; যার দ্বারদেশে আজিও আমরা পৌঁছতে পারলাম না—যে স্বপ্ন আজিও সত্য হয়ে ধরা দিল না !

বিদ্রোহী ভারত তারই প্রস্তুতি। তারই আগমনী। এবং সেই অনাগতের স্বপ্নেই ভারত চির-বিদ্রোহী !

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

বিদ্রোহী ভারত

তৃতীয় পর্ব

অশ্বের খুরে ঝলসে আগুন—ঝলকায় তলোয়ার ঃ
কাঁপে কানপুর—কাঁপিছে মীরাট—কাঁপে হিন্দুস্থান
ঝান্সীর রাণী, নানা তাঁতিয়ার রক্তের স্বাক্ষরে
কালপুরুষের পাণ্ডুলিপিতে লেখা হলো ইতিহাস।

লেখা হলো ইতিহাস ঃ
চৌরিচোরায়, কত ধলঘাটে, জালিয়ানওয়ালায়
বুড়ীবালামের বলিমণ্ডপে আহুতির উপচারে
শৃঙ্খল-ভাঙ্গা দিনগুলি জাগে অমর মরণ লয়ে।

* * *

স্বাধীনতা এল—আকাশে জেগেছে নবজাতকের দিন ঃ
ধন্য হল কি রক্তের অভিসার ?
তোমার আমার জীবনের 'পরে গুরুভার দুঃসহ
কাঁটাবন আর শঙ্খচূড়ের ফণা—
কিউ কণ্ট্রোল—কালোবাজারের অযুত অক্টোপাস ;
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা—ভারত-পাকিস্তান
মাঝখানে বালুচর।

আমাদের বালুচর—
যূথিবন নেই—বিকচ কেতকী কোথা,
ভাগাড়ের হাড়ে হাতছানি দেয় প্রেতপঞ্চাশ সাল,
এল কি বন্ধু নবজাতকের দিন ?

গুরু গুরু মেঘ কোথা ধমকায় কালবৈশাখী আসে,
ক্ষাত্রবিনাশ কোটি কোটি মুঠি মৌর্বী-কিণাঙ্কিত
তেলেঙ্গানায়, গোল্ডেন্ রকে, তেভাগার মাঠে মাঠে
কতদূরে স্বাধীনতা ?
মরা বালুচরে, ভাগাড়ের হাড়ে আমরা স্বপ্নাতুর ঃ
তুমি আর আমি স্বাধীন মানুষ আকাশে তুলেছি মাথা !

আজো পথে পথে ফণিমনসায় শঙ্খচূড়ের ফণা—
আশা নেই—নেই আলো ?
ওই তো মেদিনীপুর !
পাঁজরে পাঁজরে হোমাগ্নি জ্বলে, স্বপ্ন—স্বপ্ন নয় ;
বুকের ভেতরে জেবলেছি মশাল—সমুখে ত্রিবাঙ্কুর।

তাদের আমরা ভুলি নি!

ভুলতে পারি না। সুজলাং সুফলাং ভারতের এই মাটি। শত শহীদের বুকের রক্তে রাঙা এই ভারতের মাটি। এর প্রতি ধূলিকণায় ধূলিকণায় শুকিয়ে যাওয়া রক্তকণিকাগুলো রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে। বাতাসে এখানকার আজও শুনি দীর্ঘশ্বাস। বিহগের কলকাকলীতে শুনি সেই মরণজয়ীদের অতৃপ্ত কামনার অন্তিম গুঞ্জরণ। উড্ডীয়মান তেরঙ্গা পতাকার অশোক-চক্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে—ফিরিঙ্গীর শ্বেত-চক্রতলে দীর্ঘ দুই শত বৎসর ধরে আমরা নিষ্পেষিত নির্যাতিত হয়েছি।

দীর্ঘদিনের সে যন্ত্রণা তো ভুলবার নয়।

ভুলবার নয়।

কিন্তু তবু বুঝি ভুলেছি!

ভুলেছি আজকের এই দিনটি কত রক্তপিচ্ছিল সড়ক ডিঙিয়ে এল?

অবিরাম কাশতে কাশতে ভলভল করে খানিকটা তাজা লাল রক্ত গলা দিয়ে বের হয়ে এল।

সতী স্তম্ভিত হয়ে বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চর্মসার শুষ্ক হাড়-জাগানো মুখখানার মধ্যে কেবলমাত্র দু'টি চক্ষু যেন আজও শাণিত ছুরির ফলার মতই ঝকঝক করছে।

রুক্ষ তৈলহীন রেশমের মত চুলগুলো খোলা বাতায়ন পথে আসা সাগর-বাতাসে উড়ছে এলোমেলো হয়ে।

পরিশ্রান্ত বিনয় তখনও হাঁপাচ্ছে।

'আবার যে রক্ত পড়া শুরু হলো বিনয়?' কোন মতে কথা ক'টি উচ্চারণ করে সতী।

বিনয় কিন্তু হাসে।

মুমূর্ষু প্রদীপশিখার মতই ক্ষীণ হাসিটুকু।

ভেবে ভেবে বেদনায় ও দুশ্চিন্তায় সতীর সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

সতীর একখানা হাত নিজের রোগ-জীর্ণ কঙ্কালসার হাতের মধ্যে টেনে এনে পরম স্নেহে চেপে ধরে, মৃদু ক্লান্ত কণ্ঠে বিনয় বলে: 'হাঁ, রক্ত। ভয় পেলে সতী?'

'ভয়! না।'

বিনয় বলে: 'দীর্ঘ নিষ্পেষণের রক্তরাঙা পৃষ্ঠাগুলো আজ একটির পর একটি ঝরে পড়ছে সতী! বিষাক্ত এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু। তোমাদের অনাগত

মানুষদের দিন আসছে। অন্ধকার কণ্টকে ভরা পথ ধরে আমারা যাত্রা শুরু করেছিলাম, সে যাত্রা আজ শেষ (?) হতে চললো। আমরা তো চলে যাবো, তোমরাও আমাদের ভুলে যাবে, কিন্তু এই রক্তের ফোটাগুলো শুকিয়ে গেলেও এ নিঃশেষ হয়ে যাবে না। একদিন যে আমরা এই ভারতের মাটিতে বাস করে গিয়েছি, চলাফেরা করে গিয়েছি, এগুলো তারই স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রইলো।'

'কিন্তু আমার! আমার কি থাকলো? অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমার কি থাকলো?' সতী বলে।

'জানি আমি তোমার দুঃখ, সতী! কিন্তু তার জন্যই বা দুঃখ কি? তোমার মত কত সতী, কত অনসূয়া, তোমারই পাশে পাশে হয়ত আছে, চেয়ে দেখো। তোমার মত তাদেরও ঘর বাঁধবার স্বপ্ন এমনি করে হয়ত ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহী ভারতের এ তামস তপস্যার শেষ যেদিন, যেদিন সত্যিকারের হবে অবসান এই ঘন তিমির রাত্রির, সেই মুহূর্তটিতেই জানবে আমাদের ও তোমাদের নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু হলো। তোমাদের ও আমাদের কামনা ছিল সেই মুহূর্তটিরই, না? সেদিনই আমরা বাঁধবো পৃথিবীর মাটির উপরে নতুন করে আমাদের বাসা। আত্মার যদি সত্যিই শেষ না থাকে, মৃত্যুর পর হতে আবার আমরা ফিরে আসবো নতুন পরিচয়ে, নতুন নাম ও গোত্র নিয়ে, চিনে নেবো আমরা আমাদের; স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে আমরা, গড়ে তুলবো নতুন করে নিজেদের ঘর বাড়ি এই পৃথিবীর মাটিতে।'

সতী তবু বিনয়ের কথায় কান দেয় না। বলে: 'ডাক্তার চৌধুরীকে আজ একবার ডেকে পাঠাবো, হঠাৎ আবার রক্ত পড়া শুরু হলো কেন?'

'না। না। আর ডাঃ চৌধুরী নয় সতী। কি করবে আর ডাক্তার? এ রক্ত বন্ধ করবার মত তাঁর শক্তি কোথায়? ডাক্তার বলবে এসে বুকটা আমার ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে, সেই ঝাঁঝরা পথে রক্ত ক্ষয়ে পড়ছে। কিন্তু তারা তো জানে না এ রক্ত আমার বুক থেকে নয়, অন্তর থেকে, দেহের প্রতিটি কোষ থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। অনেক অনেক দিনকার জমা রক্ত হঠাৎ আজ বাঁধ ভেঙে নেমে এসেছে; সমস্তটুকু ঝরে না পড়া পর্যন্ত তো এর শেষ হবে না।' শেষের দিকে বিনয় হাঁপাতে থাকে।

সতীর চোখে আজ আর অশ্রু নেই—দৃষ্টি জুড়ে জ্বলে উঠেছে অকম্পিত এক আগুনের শিখা।

স্থির অকম্পিত অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে বিনয়ের মুখের দিকে।

কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত বিনয়কে ঘিরে সতী যে স্বপ্ন দেখেছিল, তার নিভৃত মনের আকাশে যে কল্পনার সাতরাঙা রামধনু জেগেছিল, আজ সবকিছু তার রৌদ্রতাপদগ্ধ চৈত্র-শেষের ঝরা পাতার মতই অগ্নিতাপে নিঃশেষে ঝরে ঝরে পড়ছে।

১৮৫৭র আগুন থেকে শুরু করে খণ্ডে খণ্ডে যে আগুনের শিখা বার বার

এই ভারতের মাটিতে জবলে জবলে উঠেছে এবং সেই আগুনে সত্যিকারের যারা পুড়ে মরেছে, যাদের পোড়া কঙ্কালগুলো আজও ভারতের পোড়া মাটিতে ছড়িয়ে আছে ; তাদেরই শ্মশানশয্যার পাশে পাশে আজ সেখানে যেন সে দেখতে পাচ্ছে আরো দু'টি নতুন কঙ্কাল।

বিনয় ও তার।

বিনয়কে সান্ত্বনা দেবে ! কিন্তু কি সান্ত্বনা আজ আর সে দেবে ওকে ?

হাজারো দেশব্রতীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যদি শেষ হয়েই থাকে, প্রায় পৌনে দুই শত বৎসরের দীর্ঘশ্বাসরোধী তমিস্রার অবসান সত্যিই যদি আজ অত্যাসন্ন হয়ে থাকে, ভারতের পোড়া মাটির নিভৃত গহ্বরে শিলীভূত কঙ্কালের বুকে যদি আজ সত্যিই প্রাণ-সঞ্জীবনীর স্পর্শ লেগেই থাকে, তো লাগুক। কিন্তু তার তাতে কি লাভ ?

সে সৃষ্টিধর সান্যালও নয়, বিনয় বোসও নয়।

সে সতী। সামান্য সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি মেয়ে মাত্র।

সতী আবার বিনয়ের দিকে তাকাল। বালিশের উপরে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে পড়ে আছে বিনয়। ক্লান্ত চোখের পাতা দু'টি বোজা।

খাড়া খড়্গের মত নাক ; চকচকে মসৃণ রক্তহীন চর্ম ভেদ করে গালের দু'পাশের হাড় দুটো যেন উদ্ধত হয়ে জেগে আছে।

সামনে মেঝের দিকে তাকাল। অনেকখানি জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কালো রক্ত, লাল নয়।

মৃত্যুর অমোঘ নির্দেশ জারী হয়ে গিয়েছে।

নিঙড়ানো প্রাণনির্যাস ! রক্ত নয়—প্রাণসঞ্জীবনী।

মুঠো ভরে যেন দেশমাতৃকাকে অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

বিনয় কি ঘুমিয়ে পড়লো ?

বক্ষের মৃদু উত্থান-পতন ধীরে—অতি ধীরে যেন উচ্চারণ করছে মৃদুচ্চারিত নিঃশব্দ সতর্কতায় : আমি যাই—আমি যাই—আমি যাই।

একটা বালতিতে করে জল ও খানিকটা ছেঁড়া কাপড় এনে সতী মুছে নিতে থাকে জমাট রক্তটা মেঝে থেকে ঘষে ঘষে।

এখন আর কালো নয়, বালতির সমস্ত জল রাঙা হয়ে ওঠে।

দুর্জয় বন্য একটা আক্রোশে সতীর সমস্ত অন্তর যেন সহসা গর্জন করে ওঠে : চলে যাচ্ছে ! চলে যাচ্ছে ! ১৫ই আগস্ট সাড়ম্বরে হচ্ছে ক্ষমতার হস্তান্তর ! কিন্তু এ রক্তের ঋণ কে শোধ করবে ?

দুই শত বৎসরের এই রক্ত-ঋণকে ! কে শোধ করবে ?

সরকারী ফতোয়া জারী হয়েছে : ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-দিবসে গন্ধ পুষ্প মাল্যে পল্লবে সাজাবে ঘর-দুয়ার। জবালাবে প্রদীপ : করবে শুভ শঙ্খধবনি।

কিন্তু তা না করে যদি এই সব শহীদদের প্রত্যেকের কবর রচনা করতো

দেশবাসী এবং সেই শুভ চরমাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটিতে একটি করে জ্বালিয়ে দিত সেই কবরের উপরে মাটির প্রদীপ—ছড়িয়ে দিত নিঃশব্দে একমুঠো সাদা ফুল! লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানাত! বলতো: তোমাদেরই স্মরণ করি সর্বাগ্রে। তোমাদের দুস্তর সাধনার বেদনাসিন্ধু মন্থন করে আজ আবির্ভূতা হয়েছেন দেশলক্ষ্মী। তোমাদের আমরা ভুলি নি! ভুলতে পারি না।

তবেই না বোঝা যেতো সত্যিকারের স্বাধীনতা-উৎসব!

আজকের এই শুভদিনটির পশ্চাতে কত দুঃখ, কত বেদনা, কত রক্তপাতের ইতিহাসকে আমরা পার হয়ে এলাম এবং আজ যেখানে এসে পেঁছেছি এও আমাদের পথের শেষ নয়।

এখনো অনেক পথ যে বাকী!

১৮৫৭র পর জুন ১০ই-এর এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে প্রজ্বলিত বিপ্লবের মশাল হাতে, মীরাট হতে তৃতীয় অশ্বারোহী দল দিল্লী অভিমুখে ছুটে চলেছিল; পশ্চাতে ফেলে রেখে প্রজ্বলিত ধূম্রাচ্ছন্ন আর্ত কোলাহল, মুখরিত রক্তাক্ত মীরাট শহর: সে যাত্রার তো আজও শেষ হয় নি।

দিল্লী দূর অস্ত্।

দূর! এখনো যে অনেক দূর!

শুধু নামেই স্বাধীন নয়, বা নামেই 'স্বাধীন ভারতবর্ষ' নয়।

বাঁচতে চাই! মানুষ আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই!

শুধু ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, বেনিয়ার বেচা-কেনা নয়।

প্রাসাদের কোন আলোকিত কক্ষে বসে, এপক্ষ ও ওপক্ষের মধ্যে রাজকীয় উৎসবে ক্ষমতা-হস্তান্তর নয়। সত্যিকারের শোষকের হাত হতে শোষিতের হাতে তুলে দেওয়া—সম্প্রদান। মুক্তি ও স্বস্তির মন্ত্রোচ্চারণ।

আমরা যে ভুলতে পারি নি এই দিনটির জন্যই বার বার আগুন জেলেছি।

আর সে আগুনের শিখা এখনো নেবে নি!

সিরাজের বুকের রক্তে মুর্শিদাবাদের মাটিতে যে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছিল, মহারাজ নন্দকুমার, মীরকাশিম, বাঘা যতীন, কানাইলাল বিপ্লবের যে মশাল এক হাত হতে অন্য হাতে তুলে দিয়ে গেল এবং যে মশালের অকম্পিত আলোকশিখাকে নির্বাপিত করতে ক্ষ্যাপা শ্বেতাঙ্গের স্বৈরাচার অন্ধ আক্রোশে বার বার ভারতবাসীর কণ্ঠ চেপে ধরেছিল, সে ইতিবৃত্তের পাতাগুলো তো এত সহজেই উল্টে যাওয়া যায় না। ভোলাও যায় না!

তাই তো মাইকেল ওডায়ারের দানবীয় নিষ্ঠুর জিঘাংসায় রাইফেলের গুলিবিদ্ধ জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদভূমি ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হলো।

তখনো যে রক্তদান শেষ হয় নি, স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নিতে সমিধ সংগ্রহ শেষ হয় নি। দিতে হবে ফাঁসির দড়িতে আরো কত প্রাণ। কারাগারের লৌহ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে, নির্মম অত্যাচারের অলিখিত অনেক

পর্ব যে তখনও বাকী!

ফিরিঙ্গীর অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত 'রৌলাট আইন' বিধিবদ্ধ হওয়ার তীব্র প্রতিক্রিয়া ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাযজ্ঞে তার পূর্ণাহুতি: চারিদিকে বিক্ষুব্ধ জনতা ভারতীয় তদানীন্তন নেতারা এগিয়ে এলেন, সবার পুরোভাগে এলেন উত্তর ভারতের সর্বপূজ্য অর্ধউলঙ্গ অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা গান্ধী!

গুলিবিধ্বস্ত পাঞ্জাবে কোন নেতাকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো না, ফিরিঙ্গীর সামরিক আইনের বলে।

মহাত্মা ব্যর্থ হলেন।

ব্যর্থ হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়।

অনাচার ও অকথ্য অত্যাচার তখন চলেছে পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে—ধূর্ত শয়তান ফিরিঙ্গী সেখানে কি নেতাদের প্রবেশাধিকার দেয়?

পদদলিত অত্যাচার-জর্জরিত ভারতবাসী—কোটি কোটি ভারতবাসী গান্ধীজীর নেতৃত্বে যেন নতুন আশার স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

প্রথম বিশ্বসংগ্রামের পরে, মিত্রশক্তি তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করে, তুর্কী সুলতানের উপরে নানাবিধ অপমানজনক সন্ধি-শর্ত আরোপ করে; ফলে ভারতের সমগ্র মুসলিম সমাজ বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হয়ে উঠলো।

সূত্রপাত হলো খিলাফৎ আন্দোলনের।

ওদিকে তারও আগে প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেও ১৯১৯ এর ২৩শে ডিসেম্বর মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার, ভারত-সংস্কার-আইন ক্রমে বিধিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

সত্য। ফিরিঙ্গীর মত এমন বন্ধু (?) বুঝি আর ভারতের ছিল না।

কত না সংস্কার করলে তারা, কত না পরিকল্পনা!

তবু হলো না সন্তুষ্ট মূর্খ, নিরীহ ভারতবাসী, তবু অভিযোগ! তবু অসন্তোষ!

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের শাসন-সংস্কার বা ভারত-সংস্কার-আইনের অন্য নাম ডায়ার্কি! অর্থাৎ আরো সোজা ও সরল কথায়, দ্বৈত-শাসন পরিকল্পনা।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রদেশগুলোতে দ্বৈত-শাসন শুরু হয়ে গেল।

দ্বৈত-শাসনে সবই স্বীকৃত হলো, হলো না কেবল ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মহামান্য সদস্যগণের সৈন্যব্যয়, সিবিলিয়ান কর্মচারীদের বেতন অর্থাৎ ফিরিঙ্গীর ভারত সরকারের পোষ্যপুত্রদের বেতন ভাতা ইত্যাদির ব্যাপারে ভোটদানের ক্ষমতা। কিন্তু কোন প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে অগ্রাহ্য হলে বড়লাট বাহাদুর তাঁর প্রতি শ্বেতাঙ্গেশ্বর কর্তৃক ন্যস্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে তা বহাল রাখতে পারবেন স্থির হলো। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলোর উপরে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া

হলো। মহাপ্রভুরা তাঁদের নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশিমত অবশ্য নিজ দায়িত্বে (?) ছয় মাসের জন্য অর্ডিনান্স বা জরুরী আইন জারি করতে পারবেন। শ্বেতাঙ্গ রাজত্বে এই অর্ডিনান্সই ছিল ভানুমতীর খেলা। যা হোক, ওর মধ্যে আবার একটা হাস্যকর পরিকল্পনাও ছিল, অর্থাৎ ছয় মাস পরে ঐ অর্ডিনান্স বা জরুরী আইনের ব্যাপারটা ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করতে হবে। কিন্তু পরিষদ অগ্রাহ্য করলেও লাট বাহাদুরের আবার নিজ দায়িত্বে সেটাকে স্থায়ী আইনে পরিণত করবার ক্ষমতা থাকবে। অর্থাৎ তোমরা রাজী হও ভাল, বহুৎ আচ্ছা, না হও মরগে! হামারা বাত রহেঙ্গে।

শ্বেতাঙ্গের চিরাচরিত নীতি অনুসারে আর এক দফায় অভাগা ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটুকুও এইভাবে সোজাসুজি অস্বীকার করা হলো।

রাজাধিরাজের মন্ত্রণাকক্ষে আইন প্রবর্তিত হল : এবং আইনবলে প্রাদেশিক বিভাগগুলোকে দু'ভাগ করে, দেশ শাসনের পক্ষে আসল চাবিকাঠিটা অর্থাৎ রাজস্ব, পুলিস, আইন আদালত সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিজের হাতে রেখে, ফলাও করে নাম দেওয়া হলো—রিজার্ভ বা সংরক্ষিত। বাকী স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সংরক্ষণের ভুয়ো ভারগুলো সাড়ম্বরে দেশীয় লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

বহুৎ মিলা!

মুঠি ভর গিয়া।

আদাবরস্! সুক্রিয়া!

জনাব খোদাবন্দ! আপকো মেহেরবানী। ওগো করুণাময়! তোমার করুণার অন্ত নেই।

সেলাম! তোমার বুটজুতাকে সেলাম!

এতবড় বঞ্চনার মধ্যেও সামান্য সান্ত্বনা রইলো হতভাগ্য ভারতবাসীর, সাক্ষাৎভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারটুকু পেলে তারা।

ক্রমে খিলাফৎ আন্দোলনে, এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হলো।

১৯১৯ খৃঃ জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অমৃতসরের অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কলকাতায় গৃহীত হলো মহাত্মার অসহযোগ প্রস্তাব।

হাতিয়ার নয়, মারামারি কাটাকাটি নয়, অহিংস সংগ্রাম! অসহযোগ। No violence! Non-violence! Passive resistance!

পৃথিবীর দেশে দেশে জাতির মুক্তি-সংগ্রামে, কত অভিনব পন্থা কলা-কৌশলের পরিকল্পনার নিদর্শনই না আমরা পাই! কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-

সংগ্রামে, অসহযোগের যে পরিকল্পনা—এর তুলনা নেই। অভূতপূর্বই নয় শুধু, অচিন্তনীয়। কল্পনাতীত, স্বপ্নাতীত।

পৃথিবীর ইতিহাস আবার যখন একদিন শতবর্ষ বা হাজারবর্ষ পরে রচিত হবে, এই অপূর্ব মহিমা—জাতির হিংসামথিত রক্ত-সাগরে ভেসে থাকবেন শ্বেত-শতদলের মত মহাত্মা আর তাঁর অসহযোগ আন্দোলন।

ভারতের ইতিহাসে শক, হূণ, মুঘল, পাঠান, তাতার কত না জাতি এলো গেলো! পদচিহ্নক্ষত ভারতের এ মাটিতে কত স্মৃতি জড়ানো। এখানে দেখেছি আমরা রাজার ছেলে গৌতমের বৌদ্ধ-তপস্যা—তাঁকে স্মরণ করে সেই বাণী: সংঘং শরণং গচ্ছামি! শুনেছি নদের পাগল শ্রীশ্রীচৈতন্যের প্রেমগান: মেরেছো কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না। দেখেছি তাতার দস্যু তৈমুরের রাজ্যবিস্তার, মহম্মদ তুঘলকের মত একাধারে মহাজ্ঞানী চিন্তাশীল অথচ উম্মাদ খেয়ালী সম্রাটের যথেচ্ছাচার। বাবরের প্রজাপ্রীতি, আকবরের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সাধনা, শাহজাহানের প্রিয়ার লাগি দিগ্‌দেশাগত মণি-মুক্তাপ্রবালখচিত দেশবিশ্রুত অপূর্ব মর্মরসৌধের প্রেম-স্মৃতি প্রতিষ্ঠা। ঔরঙ্গজীবের অহং প্রতাপ। মহারাষ্ট্র বীর শিবার স্বপ্ন। এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি; দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবতসাধনা, শুনেছি রামপ্রসাদের গান ও কালী-বন্ধন। বিবেকানন্দের সমাজ ও ধর্ম সংস্কার। কিন্তু সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছে, করেছে অতিক্রম এক অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসীর অহিংস সংগ্রাম-নীতি। সমগ্র ভারতের আত্মার যেখানে পড়েছে নাড়ীর বন্ধন। দেশে দেশে নতশিরে যাঁর সংগ্রাম ও সাধনাকে জানিয়েছে অন্তরের প্রীতি ও নমস্কার।

সমগ্র ভারতের আত্মা যার মধ্যে গন্ধে সৌন্দর্যে আপন কৃষ্টি ও সত্তায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে আপন মহিমায়—আপন গৌরবে।

হাজার বছর পরে হয়ত একদিন উত্তরমানুষের দল যখন শুনবে: একদা হিংসামত্ত পৃথিবীর বুকে এমনি একটি মানুষ এসেছিলেন, এই পৃথিবীরই মাটির বুকে যিনি পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন: কল্যাণ ও শান্তির সাধনায় যিনি আমাদেরই হাতে পিস্তলের গুলিতে হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে গিয়েছেন—সে কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য? না গল্পকথা, রূপকাহিনী?

তিনি বলেছিলেন: বাঁচবার পথ হিংসা নয়। রক্তারক্তি মারামারি নয়।

মানুষকে হতে হবে আরো মহৎ! আরো আরো ক্ষমাশীল।

কিন্তু যাক সে কথা।

বলছিলাম মহাত্মার অহিংস অসহযোগ পরিকল্পনা ও তাঁর প্রাণের কথা, তিনি বললেন: না। আর সরকারের কাছে দীনতম ভিক্ষুকের মত মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা নয়। সরকারের সাহায্য ও আশ্রয়কে বর্জন করে এবার হতে অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মুক্তির একমাত্র পথ

সেইখানেই।

আত্মশক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

শুরু হলো আন্দোলন, অভিনব অহিংস সংগ্রাম।

সরকারী বিদ্যালয়, আইনসভা, বিচার প্রতিষ্ঠান সব—সব বর্জন করো।

মাদকদ্রব্য বিদেশী পণ্য—করো, করো সব বর্জন।

দেশের বুকে এলো যেন নব অভ্যুদয়ের এক সাড়া।

সচকিত হয়ে উঠল সহসা ভারতের অগণিত নরনারী।

নাই। নাই ভয়। হবে হবে জয়। খুলে যাবে এই দ্বার।

১৯২১ সাল। প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতপরিদর্শনে আসবেন ২১শে নভেম্বর। ভারতবাসী মহাত্মার নির্দেশে ঘোষণা করলে হরতাল: যাও। ফিরে যাও।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই বোম্বাইতে শুরু হলো সংগ্রাম, মারামারি, রক্তারক্তি—দাঙ্গা!

মহাত্মার অন্তর উঠলো কেঁদে, বললেন: উপবাসই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! জলস্পর্শও করবো না। এ কি লজ্জা!

সরকারও ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে: অর্ডিনান্স রচনা করে বজ্ররবে ঘোষিত হলো: স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী বেআইনী!

দেশবন্ধু, মোতিলাল, জওহরলাল—দেশের তদানীন্তন নেতারা লৌহশৃংখল আবদ্ধ হয়ে রাজরোষে অন্ধকার কারাগৃহে প্রেরিত হলেন একের পর এক।

এদিকে মহাত্মা প্রথম 'করবন্ধ' আন্দোলন শুরু করবেন বললেন বার্দোলীতে।

১৯২২এর ৫ই ফেব্রুয়ারী: পীড়িত অত্যাচারজর্জরিত জনসাধারণ সহসা আবার গর্জন করে উঠলো: ভাঙ! ভাঙ! ভাঙ রে কপাট। কারার ঐ লৌহ-কপাট!

গোরক্ষপুর জেলায় যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ছোট একটি থানা চৌরিচৌরায়, জনসাধারণের উপরে সেখানকার শ্বেতাঙ্গের খয়ের খাঁ একদল লালপাগড়ী ও তাদের কর্তারা যথেচ্ছ অত্যাচার করছিল। আচমকা কোণঠাসা লগুড়াহত ক্ষিপ্ত পশুর মত সেখানকার জনসাধারণ ক্ষেপে উঠলো।

পিনাকীর প্রলয় ডমরু উঠলো বেজে, ডুম্-ডুম্-ডুম্।

জ্বলে উঠলো আগুন, লেলিহান শিখায় আকাশ লাল হয়ে উঠলো।

একুশজন কনেস্টবল সহ দারোগা সাহেবকে সেই অগ্নিযজ্ঞে আহুতি দেওয়া হলো।

অহিংসায় চিরবিশ্বাসী মহাত্মার অন্তর এ সংবাদ শ্রবণে কেঁদে উঠলো। তিনি বললেন: জনগণ এখনো অহিংস সংগ্রামের জন্য দেহ ও মনে প্রস্তুত তো হয় নি।

অতএব বন্ধ কর অহিংস সংগ্রাম, বন্ধ কর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ফলে ১২ই ফেব্রুয়ারী মহাজাতির অধিবেশনে বার্দোলীতে মহাত্মা প্রস্তাবিত 'করবন্ধ'-আন্দোলন বন্ধ করা হলো।

১৯২২এর ৫ই ফেব্রুয়ারীর অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ১২ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তার ভাল বা মন্দের বিচার আজ থাক্, কিন্তু সামান্য ঐ একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় পাতায় অগ্নিশিখা আবার নতুন করে দেখা দিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ অনেক গুপ্ত বিপ্লবীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; এঁরা ছাড়াও আরো অনেক গুপ্ত বিপ্লবী স্বাধীনতা-সংগ্রামী যারা এতকাল ধরে সরকারের শ্যেনচক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করে, ভারতের সর্বত্র এখানে ওখানে আত্মগোপন করে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে মহাত্মার ঐ 'করবন্ধ' আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণেচ্ছু হয়ে সংগ্রামে এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অন্তরের নিরুদ্ধ দুর্বার কর্মপ্রেরণা যা এতকাল মুক্তির পথ না পেয়ে অন্তরের মধ্যেই আবর্ত রচনা করে চলেছিল, সহসা মহাত্মা-প্রবর্তিত গণআন্দোলনের মধ্যে সে যেন মুক্তির ইশারা পেয়েছিল। তাই অতর্কিতে মহাত্মা যখন 'চৌরীচৌরা'র অগ্নিযজ্ঞকে প্রাধান্য দিয়ে অভিমানে নিজেকে দূরে টেনে নিয়ে বলে বসলেন: বন্ধ কর 'কর বন্ধ'-আন্দোলন, সংগ্রামীদের হৃদয়ে বিপ্লবের আগুন আবার জ্বলে উঠলো দ্বিগুণ হয়ে।

মানুষের কল্পনায় বহু ঊর্ধ্বে মহাত্মার কল্পনা! সুখ দুঃখ হিংসা মান অপমানে গড়া সাধারণ মাটির মানুষ হয়ত বা তখনও মহাত্মাকে চিনতে পারেন নি। বাংলার পলাতক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দৌত্য নিয়ে এলেন অবনী মুখোপাধ্যায় রাশিয়ার পরিকল্পনায় ভারতেও কম্যুনিস্ট দল গড়ে তোলবার বাসনা ও প্রেরণা নিয়ে।

দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ গড়ে উঠতে শুরু হলো। শুধু তাই নয়, সমগ্র ভারতে ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও নানা গণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল একটি দুটি করে ক্রমে ক্রমে।

মহাত্মার মতবাদের সঙ্গে বিপ্লবী সংঘের গরমিল এবং তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে দেশের জনগণের মধ্যে আবার দু'টো দল হয়ে গেল।

এক দল নরমপন্থী—অন্য দল চরমপন্থী।

সেই সঙ্গে ঐ প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে শ্বেতাঙ্গ সরকারের চণ্ডনীতি আবার করলো ধারালো বিষাক্ত নখর বিস্তার।

যথেচ্ছ দানবীয় উল্লাসে অত্যাচার ও পেষণ আবার হলো শুরু।

কোণ-ঠাসা জর্জরিত পশুর মত আবার জনসাধারণ গর্জে উঠলো।

নাই! নাই ভয়! হবে হবে জয়!

অত্যাচারের নির্মম কশাঘাতে দেশের হাওয়া বিষাক্ত : সরকারের বেতনভুক গুপ্তচরের দল কুত্তার মত মানুষের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে : আবার আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে কালো মেঘ ও বিদ্যুতের ইশারা।

১৯২৩য়ের ৩রা আগস্ট, কলকাতা শহরে বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে : মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষণক্লান্ত মেদুর আকাশ।

শহরের কর্মতৎপরতার বিরাম নেই।

এই বর্ষামেদুর অপরাহ্ণে বরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি চারজন যুবক সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত হয়ে প্রবেশ করল শাঁখারীটোলা পোস্টঅফিসের মধ্যে।

টক্ টক্ করে টেলিগ্রাফের আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যায়।

পিওনরা যে যার ডাক বিলি করতে বের হয়েছে।

জন দুই কেরানী কেবল নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

পোস্টমাস্টার শ্রীঅমৃতলাল রায় মহাশয় তাঁর নিজের টেবিলে একটা মোটা খাতা খুলে কি সব লিখছেন : হঠাৎ পদশব্দে মুখ তুলে চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর তারা দুটি গোলাকার ও স্থির হয়ে গেল, সামনেই একজন মুখোশধারী, হাতে তার উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। ইতিমধ্যে কখন সেই নিরীহ চারজন পথিক এসে পোস্ট-অফিসের মধ্যে চড়াও হয়েছে। দলপতি বরেন্দ্র ঘোষেরই বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল : মাস্টার মশাই, দেশের নামে ডাকঘরে আজ যত টাকা আছে দাবী করছি। ভালয় ভালয় দিয়ে দিন—নচেৎ দেখতেই পাচ্ছেন।

অমৃতলাল রায়ের মাথায় যেন বজ্র ভেঙে পড়লো : অ্যাঁ অ্যাঁ একটা অস্পষ্ট শব্দ।

অন্য দুজন কেরানীও হতবাক্।

সময় হাতে অত্যন্ত অল্প। তাড়াতাড়ি করুন। আবার বজ্রকঠোর নির্দেশ।

অমৃতলাল তবু ইতস্তত করছেন—সহসা চোখের সামনে অগ্নিঝলক : ধোঁয়া বারুদের গন্ধ ও বিস্ফোরণের শব্দ।

দলপতির আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠেছে!

এর পর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়—বিপ্লবীরা পলায়ন করে।

কিন্তু পোস্ট-অফিসের কর্মচারী দুজন বাঙালী, একজন কেরানী শ্যামদুলাল দাস, দ্বিতীয় প্যাকার হরিপ্রসাদ দাস বরেন্দ্রকে অনুসরণ করে পশ্চাদ্ধাবন করে—বরেন্দ্রও ছুটছে।

কর্মচারী দুজনও ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে সামনেই সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার। বরেন্দ্র তার মধ্যেই ঢুকে পড়ে।

স্কোয়ারে তখন সান্ধ্যভ্রাম্যমানদের ভিড় জমে উঠেছে। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে পালাবার ফাঁকা রাস্তাও নেই!

বরেন্দ্র ধরা পড়ল।

পুলিসের জিম্মায় তাকে তুলে দেওয়া হলো।

অন্ধকার লৌহবেষ্টনী। শ্বেতাঙ্গের লৌহকারাগার। বরেন্দ্রর চোখের উপরে ভাসতে থাকে সিন্দূরচর্চিতা ঢলঢল কমনীয় একখানি মুখ বুঝি।

মাত্র তিনমাস আগে সে বিবাহ করেছে, গৃহে নববধূ।

সেই রাত্রেই বরেন্দ্রর বাসস্থান খানাতল্লাসী করে পুলিস দুটো রিভলবার পেল।

আবার শুরু হলো বিচার প্রহসন।

নির্ভীক সত্যাগ্রয়ী বিপ্লবী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলে: হাঁ, আমি দোষী। আমি হত্যা করেছি।

বিচারপতি শ্বেতাঙ্গ মিঃ পেজের আদেশ হলো: প্রাণদণ্ড! To be hanged till death!

অবিশ্যি পরে রাজানুকম্পায় প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে বরেন্দ্রর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো।

আসল দলপতি এ ব্যাপারের ছিলেন সন্তোষ মিত্র—পরবর্তী কালে যে সৈনিক ১৯৩১এর ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী-নিবাসে পুলিসের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন, এবং সকলেই ছিলেন শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী মশাইয়ের দলভুক্ত।

যা হোক, চক্রীর চক্রান্তের অভাব হয় না—কর্মতৎপর শ্বেতাঙ্গ-পদলেহীদের প্রাণপণ চেষ্টায় এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হলো—অভিযুক্ত হলো সন্তোষ মিত্র, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো কয়েকজন।

১৯২৩এর সেপ্টেম্বরেই ডাঃ যাদুগোপাল মুখুজ্জে, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি ১৯১৮র '৩' নং আইনানুযায়ী গ্রেপ্তার হয়ে কারাগৃহে আটক হলেন।

ইতিমধ্যে দুর্দান্ত সরকারী গ্রেহাউণ্ড সুদক্ষ অনুসন্ধানী পুলিসের কর্তা চার্লস টেগার্টের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল।

ইংলণ্ডের তথা ব্রিটিশ রাজশক্তির যে সব অনুচর ভারতের মাটিতে এসে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে—মিঃ চার্লস টেগার্ট তাদের অন্যতম।

অতবড় সত্যিকারের সুদক্ষ পুলিস কর্মচারী ভারতে বড় একটা আসে নি।

টেগার্টের কর্মতৎপরতা ও কর্মশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ।

বাংলার গুপ্ত সংগ্রামীদের অতবড় শত্রু আর দ্বিতীয় ছিল না।

গুপ্তসংগ্রামীরা টেগার্টের তৎপরতায় সচকিত হয়ে উঠলো: সাড়া পড়ে গেল সংঘের মধ্যে—যেমন করে হোক ঐ গ্রেহাউণ্ডটিকে সরাতেই হবে।

এবং টেগার্টকে নিহত করবার সংকল্প নিল গোপীনাথ নিজের মনে।

কলকাতার নিকটবর্তী হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনের

একটি বাড়িতে বাস করতেন মধ্যবিত্ত একজন গৃহস্থ শ্যামাচরণ সাহা—তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ।

গোপীনাথ তখন বয়সে কিশোর, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্‌স্টিটিউটের নবম শ্রেণীর সামান্য একজন ছাত্র মাত্র। কিশোর-মনের কিশোর কল্পনায় রঙিন মনের রক্ত স্বপ্নে বিভোল!

কিশোর ক্ষুদিরামের মত কিশোর গোপীনাথও স্বপ্ন দেখেছিল বন্দিনী মায়ের শৃঙ্খল-মোচনের। আরো দশজন কিশোরের মত শুয়ে, বসে, খেয়ে, ঘুমিয়ে, গল্প করে জীবনের সহজ দিকটাকে সে গ্রহণ করতে পারে নি।

এ জীবন নহে নিশার স্বপন: এ বাণী পেঁছেছিল তার দু কান ভরে।

দুর্গম পথে যাত্রা যাদের, পথে পথে তাদের কণ্টক বেদনা: মৃত্যুর হিম আবেষ্টনী তাদের কণ্ঠের ভূষণ, এ জেনেও সে দুরাশার সেই ডাককে এড়াতে পারে নি।

কে দিয়েছিল তার কানে ও মরণমন্ত্র কে জানে?

মৃত্যুসংগ্রামীরা তখন বাংলার অন্তপ্রত্যন্তে ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে শুধু ঘোর অন্ধকারে বিজলীচমকের মত ঝিলিক হেনে চকিতে লুকিয়ে যেত।

এদেরই মধ্যে হয়ত কেউ কোন এক গভীর নিশীথে তার রুদ্ধ শয়নকক্ষের দ্বারে করাঘাত হেনে বলে গিয়েছিল: বাংলার কিশোর জাগো! আর ঘুমিও না।

দুর্ধর্ষ টেগার্টের কথা গোপী পূর্বে বহুবার শুনেছে। ব্লাডহাউণ্ডের মত সে বিপ্লবীদের অনুসরণ করে বেড়ায়, তাদের গতিকে দেয় বাধা!

অন্তত টেগার্টকেও যদি সে ইহলোক থেকে সরাতে পারে কিছুটা অন্তত সেবা করা হবে দেশ-মাতৃকার।

হায় রে! কিশোর-কল্পনা।

বুকের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল স্বপ্নচারী কিশোর গোপীনাথ।

ব্লাডহাউণ্ড চার্লস টেগার্টের শির চাই। রক্ত চাই।

অবশেষে এলো সেই চরম মুহূর্তটি: ১৯শে জানুয়ারী: কিন্তু উত্তেজনার মুখে গোপীনাথের হলো মুহূর্তের দৃষ্টিবিভ্রম।

ব্লাডহাউণ্ড চার্লস টেগার্টের বদলে প্রাণ দিল গোপীনাথের গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন নির্দোষ শ্বেতাঙ্গ।

১৯শে জানুয়ারীর শীতের সকাল।

কিলবার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানীর কর্মচারী একজন শ্বেতাঙ্গ নাম, আর্নেস্ট ডে।

প্রত্যহ তার প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস। সেদিনও তিনি যথারীতি প্রাতঃকালে হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গীর হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডার্সনের দোকানের সুসজ্জিত শো'কেসের

সামনে দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র দেখছেন যেমন আরো দশজন পথিক পথ চলতে চলতে সহসা পথিপার্শ্বে কোন দোকানের সামনে শো'কেসের দিকে চেয়ে দেখেন তেমনি সাধারণ কৌতূহলে। সহসা আচম্বিতে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠলো : গুড়ুম ! গুড়ুম !

রক্তাক্ত আহত মিঃ ডে আর্তচীৎকার করে লুটিয়ে পড়লেন রাস্তার উপরে।

ভূপাতিত গুলিবিদ্ধ প্রায় সংজ্ঞাহীন মিঃ ডের দেহের উপরে আরো কয়েকটি গুলি উপর্যুপরি বর্ষিত হলো : দুম্ দুম্ ! দুড়ুম !…

গুলি চালিয়েই গোপীনাথ পিস্তল মুঠোর মধ্যে ধরে সোজা দৌড় দিল পার্ক স্ট্রীট ধরে।

ট্যাক্সি নিয়ে একজন ট্যাক্সিচালক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। গুলির শব্দে আকর্ষিত হয়ে ধাবমান গোপীনাথকে সে অনুসরণ করতে গিয়ে তলপেটে গুলি-বিদ্ধ হয়ে রাস্তার উপরেই লুটিয়ে পড়ল।

সামনেই একটা মোটর গাড়ি দেখে গোপীনাথ তাকে ওয়েলস্লী স্ট্রীটের দিকে চালাতে অনুরোধ জানায়, কিন্তু গাড়ির চালক সম্মত না হওয়ায় সেও গুলি খায় গোপীনাথের হাতে। শেষ পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে ওয়েলস্লী ও রিপন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে গোপীনাথ এক শ্বেতাঙ্গের হাতে ধৃত হলো।

তাড়াতাড়ি কয়েকজন কনেস্টবলও ছুটে এলো ঘটনাস্থলে। গোপীনাথের দেহ অনুসন্ধান করে পাওয়া গেল পাঁচ চেম্বারের একটি রিভলভার,একটি মশার পিস্তল, কতকগুলো কার্তুজ ও কার্তুজের কয়েকটা খোল।

মিঃ ডে পরদিন মেডিকেল কলেজে মারা গেলেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড বিক্ষোভ —আন্দোলন।

সরকার পক্ষ হন্যে কুকুরের মত জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে উঠলো।

কারাগারের লৌহ আবেষ্টনীর মধ্যে বসেই গোপীনাথ শুনতে পেল কত বড় সাংঘাতিক ভুল সে করেছে। টেগার্টের বদলে একজন নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে। অনুশোচনায় চোখে বুঝি জল আসে।

> 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ
> স্বর্গাদপি গরীয়সী ! আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী,
> আমাদের মা নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই,
> ঘর নাই, বাড়ি নাই। আমাদের কাছে কেবল সেই
> সুজলা সুফলা, মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্য শ্যামলা মা—'

একমাত্র অন্তর্যামী যিনি, যাঁর দু'টি চক্ষুর দৃষ্টিকে কোন কিছুই এড়িয়ে যায় না, একমাত্র তিনিই জানলেন কি যাতনায় উন্মাদ কিশোর আগুনের মধ্যে

ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল।

কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য, সমুদ্র মন্থনে উঠ্‌লো তীব্র কালকুট, কিশোর শূলী শম্ভু আঁজলা ভরে সেই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে হলো নীলকণ্ঠ।

১৪ই ১৯২৪ সনে মহানগরীর চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা শুরু হলো ঃ মিঃ ডে শ্বেতাঙ্গকে ইচ্ছাপূর্বক (?) হত্যা ও অপর তিনজন ভারতীয়কে হত্যার চেষ্টার অপরাধে কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কিশোর গোপীনাথকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হলো।

পাব্লিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু কুখ্যাত তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ সরকারের পক্ষে মামলার উদ্বোধন করলেন।

নির্বিকার নির্ভিক কিশোর, প্রশান্ত স্থির ধীর বদনমণ্ডল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের আইনের কুটজালকে ভেদ করে আসবার তারই অধীনস্থ পরাধীন দেশের এক কিশোর বালকের পক্ষে সম্ভব নয়।

যে আইনের রুজ্জুতে ইতিপূর্বে ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই প্রভৃতির দল প্রাণাঞ্জলি দিয়ে গিয়েছে তরুণ কিশোর গোপীনাথকেও সেই রজ্জুর বন্ধনেই আপনাকে সঁপে দিতে হবে এ তো জানা কথাই। তার জন্য কেনই বা এত আয়োজন।

স্বাধীনতার পথ তৈরী হচ্ছে। কত প্রাণ দান, কত রক্ত তর্পণ হলো আর একটি প্রাণ; আর এক অঞ্জলি রক্ত দান, এই তো!

রক্ত সমুদ্রের আর একবিন্দু রক্ত!

অভিযোগ গুরুতর (?), দেহ তল্লাসী করেও পাওয়া গিয়েছে একটা মশার পিস্তল, একটি পাঁচ চেম্বারের রিভলভার, কিছু কার্তুজ।

রডা কোম্পানীর যে মশার পিস্তলগুলি সহসা একদিন অত্যাশ্চর্য উপায়ে পথিমধ্যেই অপহৃত হয়েছিল এখনো সেগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে হাতে ফিরছে সংগোপনে, সরকারের শ্যেনচক্ষুতেও ধূলি নিক্ষেপ করে।

দীপের আলো সে তো নিভবার নয়। রক্ত মশাল ফিরছে হাতে হাতে। স্বাধীনতার দুর্গম পথে পথে। গোপীনাথের জননী তখনও জীবিতা। মায়ের চোখে কিন্তু জল ছিল। ছেলের কাছে তিনি আর তার জন্মভুমি তো পৃথক ছিল না।

বিদ্রোহী ভারতের বিদ্রোহী সন্তানের জননী তিনি।

গোপীনাথের বিবৃতি হলো যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনি অগ্নিক্ষরা।

বিবৃতি প্রদানকালে মিঃ টেগার্ট অদূরে আদালতের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে কটাক্ষ করে কিশোর বললে ঃ আমি ঐ কুখ্যাত মিঃ টেগার্টকে ভাল করেই চিনতাম ; তবে দুর্ভাগ্য, আমার মনের চাঞ্চল্যের জন্যই অবিকল মিঃ টেগার্টের মতই দূর থেকে মনে হওয়ায় একজন নিরপরাধ শ্বেতাঙ্গ আমার

গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। সত্যই আমি দুঃখিত সেজন্য। এবং এই আমার অতিবড় দুঃখ থেকে গেল দেশের এতবড় একজন শত্রুকে আমি শেষ করে যেতে পারলাম না কিন্তু এই আশা নিয়েই আমি যাবো যে, এখনো এদেশে দেশ-প্রেমিকের অভাব ঘটেনি, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আমার অসম্পূর্ণ কার্যটুকু সমাধা করতে এগিয়ে আসবে।

মামলা হাইকোর্টে দায়রায় প্রেরিত হলো যথাসময়ে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী একদল চিরাচরিত শিখণ্ডী জুরীদের সম্মুখে রেখে বিচার প্রহসনের উপরে বিচারপতি পিয়ার্সন যবনিকাপাত করল: মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ যা হবার তাই হলো! To be hanged till death!

১লা মার্চ ফিরিঙ্গী সরকারের ফাঁসীর রজ্জুতে হাসতে হাসতে নির্ভীক, স্বাধীনতার পূজারী, তার শেষ রক্তাঞ্জলিটুকু দেশমাতৃকার চরণতলে নিবেদন করে গেল এবং বলে গেলো: এই শেষ নয়। ডাক দিয়ে যাই।

ডাক দিয়ে গেল: আমার রক্তের প্রতি ফোঁটায় ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার মৃত্যুবীজ রোপিত হোক! ডাক দিয়ে গেলাম। ডাক দিয়ে গেলাম। শোন ভারতবাসী! শোন! কান পেতে শোন!

আকাশে বাতাসে শুভশঙ্খ নিনাদের মত সেই ডাক ছড়িয়ে গেল।

লৌহ ফাটকের বাইরে শ্রীসুভাষ প্রভৃতি কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু প্রবেশাধিকার তাঁদের দেওয়া হলো না ভিতরে।

বেলা আটটার পরে কয়েকজন আত্মীয়কে প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটুকু মাত্র শেষ করবার জন্য।

লোকচক্ষুর অন্তরালে চক্ষের উদ্গত অশ্রুকে চক্ষেই চেপে অতিবড় আপনার জনের শেষকৃত্যটুকু তারা শেষ করে নিঃশব্দে কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই শেষ স্মৃতিটুকু রেখে বের হয়ে এলো নিঃশব্দে। চিতাভস্মটুকু আনবারও তাদের অধিকার দিল না ফিরিঙ্গী কর্তৃপক্ষের দল।

তারা হয়ত ভেবেছিল এমনি করেই বিপ্লবের, বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তারা নিভিয়ে দিতে পারবে। মূর্খের দল এইটুকু বুঝলে না যে আগুন বিদ্রোহী ভারতের অন্ত্যপ্রত্যন্তে জ্বলে উঠেছে সর্বগ্রাসী লেলিহ শিখায় তাকে নিভিয়ে দেবার তখন আর তাদের সাধ্যও ছিল না। My martyr may perish at the stake, but the truth for he dies may gather new buster from his sacrifice.

* * গোপীনাথের ফাঁসীকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার ঝড় বহে গেল।

মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন গোপীনাথের কার্যের নিন্দা করলে বটে তবে তার উদ্দেশ্যের ভূয়সী প্রশংসাও করলে।

মহাত্মা কিন্তু করলেন তাঁর সমালোচনা।

এবং পরবর্তী ২৭—২৯শে জুন আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গোপীনাথের দেশপ্রেমের কথা স্বীকার করেও হত্যাকার্যের তীব্র নিন্দা করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর প্রস্তাবের এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে ঐ সব অকার্যের মূলেও যে গভীর দেশপ্রেম নিহিত আছে সে কথাটা স্পষ্ট করেই বললেন। মহাত্মা ঐ অধিবেশনেই অসহযোগের আরো পাঁচটি ধাপ এগিয়ে গেলেন—বিদেশী বস্ত্র, আইন আদালত, স্কুল কলেজ, উপাধি ও ব্যবস্থাপরিষদ বর্জন করতে হবে জানালেন।

ঠিক ঐ সময় নানা স্থানেই হিন্দু মুসলমানে মারাত্মক দাঙ্গা উপস্থিত হয়।

দাঙ্গার প্রতিরোধ কল্পে মহাত্মা দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলীর ভবনে ২২শে সেপ্টেম্বর দীর্ঘ একুশ দিন ব্যাপী উপবাস করলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর হতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এক ঐক্য সম্মেলন হয়ে গেল যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা যেন নির্বিবাদে যে যার ধর্মকর্ম সম্পন্ন করতে পারেন।

বলাই বাহুল্য মহাত্মাজীর উপবাস ও ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্য কার্যকরী হয়নি।

এ দিকে ফিরিঙ্গী সরকার বিপ্লবীদের পুনরুত্থানের আশঙ্কায় আবার তাদের দমননীতিতে উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

বহু লোককে বিপ্লবের অজুহাতে অক্টোবর মাসে অকস্মাৎ এক 'অর্ডিনান্স' জারী করে কারাগারে নিক্ষেপ করলো—সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত ফিরিঙ্গী সরকার ও তার চেলাচামুণ্ডারা।

১৯১৮ সনের 'তিন আইনে'র বলে স্বরাজ্যদলের নেতাদের—দেশবন্ধুর সহযোগী শ্রীসুভাষ, শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়কে বন্দী করে সুদূর মান্দালয় জেলে পাঠানো হলো।

১৯২৪ সালের শেষভাগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি জনসেবার জন্য এক অছি মণ্ডলীর হাতে তুলে দিলেন।

রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন, বিখ্যাত তেলীরবাগের দাশবংশের রক্তধারার মধ্যে যে দানের নেশা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সেই রক্তের ঋণ যেন শোধ করলেন।

কণ্ঠ খুলে দেশের জনসাধারণ সেদিন গেয়েছিল :

> দেশকা বন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশকা সহৃদ সওকাতালী।
> খোদাকি পিয়ারা মহম্মদ আলি দেশকা পিতা গান্ধীজী।

ঐ বৎসরই মে মাসে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন দেশবন্ধু। তিনি স্বরাজের মানে করলেন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন একটি রাষ্ট্র। এবং তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডের আন্তরিকতা মেনে নিয়ে মাত্র দুটি

সর্তসাপেক্ষে ডায়ার্কি চালু করতে সম্মতি জানালেন—(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দান, (২) ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার এবং স্বরাজ প্রাপ্তির পূর্বে এর যথাযোগ্য ভিত্তি অবিলম্বে নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠা।

দুঃখের বিষয় তার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবার পূর্বেই চিত্তরঞ্জনের শরীর ভেঙে পড়ল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক—বহুদিন হতেই নিরন্তর দুর্বিষহ সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় শরীরের মধ্যে ভাঙন ধরেছিল কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেই যেন সেদিকে দৃষ্টি দেননি।

কিন্তু আর এখন বিশ্রাম না নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় রইলো না।

দার্জিলিং শৈলে বিশ্রামের জন্য গেলেন স্টেপ্ অ্যাসাইডে কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য তাঁকে ফিরে পেল না আর তাদের মধ্যে।

১৬ই জুন রণক্লান্ত সৈনিকের দু'চোখের পাতায় চিরনিদ্রা নেমে এলো। দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বললেন —

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

১৯২৪ সালের মে মাসে দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামরাজুর নেতৃত্বে তহশীলদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। শ্রীরামরাজুর দল কয়েকটি ফিরিঙ্গীদের থানা আক্রমণ ও লুঠ করে নিয়ে সংগ্রাম চালাচ্ছিল—মে মাসে দুর্দান্ত ফিরিঙ্গী শক্তির কাছে তারা পরাভূত হয়।

রামরাজু নিরুদ্দিষ্ট হলো। দীর্ঘকাল আর তার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

কুখ্যাত চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভ্রমক্রমে মিঃ ডে'র হত্যার মধ্য দিয়ে বহুকাল পরে যে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভারতের আকাশে দেখা দিয়েছিল তারই আর এক বিরাট প্রস্তুতি অত্যন্ত গোপনে বাংলাদেশে চলছিল যাবজ্জীবন দণ্ডে দ্বীপান্তরিত ১৯১৫ সনের বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার বিপ্লবী সন্তান শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নেতৃত্বে, তার ১৯২০ সনে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার বলে কারাগার হতে মুক্তি প্রাপ্তির পর।

শুধু বাংলা দেশেই নয় কাশী ও লক্ষ্ণৌতেও শচীন সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, যতীন দাস ও যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বিরাট একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল।

এবং যার ফলে অকস্মাৎ একদিন—

১৯২৫ সনের ৯ই আগস্টের রাত্রিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল আকাশে।

প্রকৃতি সে রাত্রে উদ্দাম চঞ্চল, কালো কালির ন্যায় মেঘে মেঘে আকাশ

ঢেকে গিয়েছে।

উদ্দাম চঞ্চল হাওয়া সন্ সন্ করে বহে চলেছে। থেকে থেকে বিজলীর চমক, গুরু গুরু মেঘের ডাক আর অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

ঐ দুর্যোগের মধ্যেও লক্ষ্ণৌ-শাহারানপুর লাইনের যাত্রীবাহী ট্রেনটা কাকোরী স্টেশন হতে ছেড়ে পূর্ণবেগে আলমনগরের দিকে ছুটে চলেছে।

বাইরে ঘন দুর্যোগ। গাড়ির কামরায় কামরায় সব জানালাগুলো বন্ধ, যাত্রীরা নিশ্চিন্ত আরামে যে যার মত নিজেদের শয্যায় এলিয়ে পড়েছে।

লাইনের দুই পাশে ঘন জঙ্গল ক্ষ্যাপা হাওয়ায় ওলোটপালোট করছে।

সহসা গাড়িটা থেমে গেল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে।

নিশ্চয়ই কেউ অ্যালার্ম চেন টেনে চলন্ত গাড়ি থামিয়েছে নচেৎ হঠাৎ এমন করে গাড়ি থামবে কেন মধ্যপথে।

সত্যিই তাই, চলন্ত গাড়িকে চেন টেনেই থামানো হয়েছে এবং থামিয়েছে এক অসম সাহসী যুবক, শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কামরা থেকে দরজা খুলে দশজন যুবক ও কিশোর একের পর এক লাফ দিয়ে ঐ বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যেই নেমে পড়ল।

দু'একজন কৌতূহলী যাত্রী যারা জেগে ছিল ব্যাপারটা কি জানবার জন্য গাড়ির জানালার সার্সী তুলে উঁকিঝুঁকি দেয়, কেউ কেউ বা কৌতূহলের বশে গাড়ি থেকে নেমেও পড়ে।

ওদিকে সেই দশজনের মধ্যে জনাপাঁচেক যুবক ততক্ষণে গার্ডসাহেবের গাড়ির দিকে ছুটে যায় এবং বাকী যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রত্যেকেরই হস্তে ধৃত গুলিভর্তি পিস্তল নিয়ে পাহারা দেয়।

তাদেরই মধ্যে একজন কৌতূহলী যাত্রীদের সম্বোধন করে বলে ওঠে, 'আপনারা যে যার কামরায় গিয়ে উঠে বসুন। যাত্রীদের কোন ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এই ট্রেনে যে সরকারী অর্থ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই অর্থ নিয়েই চলে যাবো।'

যুবকের কণ্ঠের সেই কঠোর নির্দেশ ও হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র দেখে কৌতূহলী যাত্রীর দল যে যার গিয়ে আপন আপন কামরায় ঢুকে পড়ে।

গার্ড সাহেবও একটু ব্যস্ত হয়েই গাড়িটা হঠাৎ থেমে যেতে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য গার্ড ভ্যান থেকে নেমে অনুসন্ধানের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, সহসা তার পথরোধ করলে হস্তে ধৃত, উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র এক যুবক : 'আর এক পাও এগিয়েছো কি দেখতে পাচ্ছো আমার হাতে কি! শোন! তোমার আমরা কোন ক্ষতি করবো না। আমরা চাই মেলভ্যানে মেলব্যাগের মধ্যে যে টাকাগুলো আছে সেইগুলো। আর যদি বাধা দেবার চেষ্টা করো you know—'

আর বলতে হলো না।

গার্ড সাহেব ততক্ষণ কাঁপতে কাঁপতে হাটু ভেঙে মাটিতেই বসে পড়েছে।

শুধুমাত্র ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই দলপতির নির্দেশে মধ্যে মধ্যে দু'জন যুবক রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করছিল শূন্যের মধ্যে।

ফিরিঙ্গী ড্রাইভার ব্যাপার দেখে ইঞ্জিনের পাশেই লাইনের ধারে শুয়ে ভীত-গ্রস্ত তখন গাইতে শুরু করেছে, God save the king! Rule Britania.

ইতিমধ্যে অসমসাহসী যুবকের দল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মেলভ্যান থেকে লোহার সিন্দুক চাড় দিয়ে খুলে টাকার থলিগুলো হাতিয়ে দ্রুতপদে পাশের অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

দুর্যোগের তখনও বিরাম ছিল না।

সমগ্র ব্যাপারটাই যেন একটা ভোজবাজীর মত ঘটে গেল মুহূর্তে।

ট্রেনের যাত্রী, চালক ও গার্ড সকলে যখন ধাতস্থ হয়েছে যুবকদল তখন পেঁাছে গিয়েছে নির্বিঘ্নে লক্ষ্মৌ শহরে।

পরের দিন ইংরাজী, বাংলা, উর্দু, হিন্দি সমস্ত সংবাদপত্রে বড় বড় হেড্-লাইন দিয়ে প্রকাশিত হলো দুঃসাহসিক সেই অভিযানের কাহিনী।

স্টেট্‌সম্যান কাগজ তো স্পষ্টই বললে এ ধরনের দুঃসাহসিক ডাকাতি নির্ভুলভাবেই কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত।

ডাকাতি! ডাকাতিই বটে।

ফিরিঙ্গী সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। গোয়েন্দা বিভাগের বড় বড় কর্ম-চারীদের উপরে ন্যস্ত হলো ঐ ঘটনার অনুসন্ধানের ভারটা।

ডালকুত্তার দল ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে ফিরতে লাগল, দীর্ঘ এক মাস ধরে বাহাদুরের দল তদন্ত করে ধরপাকড় শুরু করে দিল বেপরোয়াভাবে। চুয়াল্লিশ-জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

অভিযুক্ত বন্দীদের লৌহকারাগারের অন্তরালে পৃথক পৃথক সেলে রেখে চিরাচরিত ফিরিঙ্গীর দমন, নির্যাতন ও প্রলোভনের দ্বারা প্রত্যেকের নিকট হতে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের অপচেষ্টা চলতে লাগল।

অধিকাংশ বন্দীই নির্যাতন ও প্রলোভনকে অতিক্রম করে গেল কিন্তু মীরজাফর উমিচাঁদের বংশধরদের অভাব এদেশে বড় একটা হয়নি—ক্লেদাক্ত দুটি কীট এগিয়ে এলো, শাহজাহানপুরের বানারসীলাল কাকোশ এবং ইন্দুভূষণ মিত্র।

রাজকীয় সসম্মানে ঐ দু'জন হীন জঘন্য চরিত্র বিশ্বাসঘাতককে রাজসাক্ষীর সম্মানে জেল হতে স্থানান্তরিত করা হলো।

কিন্তু হায় এত পরিশ্রম করেও শ্রীরামদত্ত, শ্রীশীতলা সহায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ, শ্রীকালিদাস বসু প্রভৃতি অভিযুক্ত পনেরজনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে না পারায় তাদের সরকার মুক্তি দিতে একপ্রকার বাধ্যই হলো! বাদ বাকী ২৯ জনের বিরুদ্ধে ১৯২৬ সনের ৪ঠা জানুয়ারী স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট

আইনুদ্দীন সাহেবের এজলাসে, রাজার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের জন্য, বে-আইনীভাবে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা এবং তদুদ্দেশ্যই চলন্ত রেলগাড়ি হতে সরকারী টাকা লুঠ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে নিয়ে বিচার প্রহসন শুরু হলো।

দীর্ঘ ৬৫দিন ধরে মামলার শুনানী চললো এবং ২৪৭ জন সরকার পক্ষীয় সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হলো।

লক্ষ্মৌ আদালতে স্পেশাল জজ হ্যামিল্টনের এজলাসে ১৯২৬-এর ৩রা মে আবার বিচার প্রহসন শুরু হলো। দীর্ঘদিন ধরে ঐ ২৯ জনকে নিয়ে ফিরিঙ্গী সরকার মামলার জাল পেতে দেশবাসীকে বোঝাতে চাইল: দেখো কি সুবিচার আমরা করি।

সুবিচারই বটে।

নিজের জন্মভূমির মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি বিদ্রোহী, হয়েছি ষড়যন্ত্রকারী, এ যে গুরুতর অপরাধ!

এদিকে আদালতে জনান্তিকে সুবিচারের প্রহসন আর অন্য দিকে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে হতভাগ্য বন্দীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও দুঃসহ পীড়ন চলতে লাগল।

বহু বন্দীর স্বাস্থ্য সেই অত্যাচারে ভেঙে পড়তে লাগল এবং অন্যতম বন্দী শেঠ দামোদর স্বরূপ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

এত দুঃখ ও নির্যাতনেও কিন্তু বন্দীদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের ফল্গুধারা নিরন্তর বহমান।

কোন খেদ নেই, কোন দুঃখ নেই।

জীবনের শেষ রক্তটুকু পণ করে যারা শৃংখলিতা দেশমাতৃকার চরণে আপনাদের উৎসর্গিত করেছে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে তারা জীবন নিংড়ে রস আকণ্ঠ পান করে।

মৃত্যুঞ্জয়ী নীলকণ্ঠের দল।

দুঃখে যাদের জীবন গড়া।

তাদের আবার দুঃখ কিরে!

সত্যিই তো! তাদের আবার দুঃখ কি!

আদালতে যখন সাক্ষীর পর সাক্ষী এসে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বোঝাকে আরো ভারী করে তুলছে দিনের পর দিন ওরা তখন খোস মেজাজে ছবি আঁকছে, কেউবা হাত পায়ের শিকল ঝুনঝুন করে বাজিয়ে গুণগুণ করে গান গাইছে: ও আমার দেশের মাটি।

কালো ভ্যানে পুরে বন্দীদের প্রত্যহ যখন আদালতে নিয়ে আসা হত রাজ-পথের উভয়পার্শ্বে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত—একবার তারা দেখতে চায় এরা কে গো! বিলাসভোগ ছেড়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে!

কেমন করে এরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও গান গায়ঃ চিৎকার করে প্রণতি জানায়ঃ বন্দেমাতরম্ !

যাক, শেষে ১৯২৭ সনের ৬ই এপ্রিল মামলার রায় বের হলো।

বেলা সাড়ে এগারটা সময় ঐ দিন সারবন্দী করে বন্দীদের আদালতে এসে দাঁড় করানো হলো।

প্রশান্ত নির্মল হ্যাস্যোস্ফুরিত বদনমণ্ডল সকলের।

রাজবন্দী ! রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিচার !

হায় কে বা মালিক কে বা রাজা !

সত্যিই পায় হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসী !

বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হলো রায়।

শ্রীরামপ্রসাদ বিস্মিল—প্রাণদণ্ড। শ্রীরোশেন সিং—প্রাণদণ্ড। বাকী বনওয়ারীলাল, ভুপেন্দ্র সান্যাল ও মন্মথনাথ গুপ্ত প্রভৃতি কারো চোদ্দ বৎসর, কারো দশ, কারো সাত, কারো বা পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো।

হরগোবিন্দ ও শচীন্দ্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় মুক্তি দেওয়া হলো।

সুবিচারের সমাপ্তি হলো।

মাননীয় জজ্‌সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা পাঠ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বন্দীদের মিলিত-কণ্ঠ আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিলঃ বন্দেমাতরম্ ! ভারত মাতাকি জয় !

ইতিমধ্যে ঐ মামলায় অভিযুক্ত অন্য দুইজন বিদ্রোহীও ধরা পড়ল—আসফাকউল্লা খান ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বকসী। একজন দিল্লীতে অপরজন ভাগলপুরে।

সরকারের নথিপত্রে ঐ দুইজন বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ সব তো মজুদই ছিল, সংক্ষেপে তারই সাহায্যে বিচার শেষ করে আসফাকউল্লার ফাঁসী ও শচীন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো।

আপীলও হলো কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রামপ্রসাদ বিস্মিল, আসফাকউল্লা ও রোশেন সিংয়ের ফাঁসীর হুকুম নাকচ তো হলোই না বরং যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর ও মুকুন্দলালের দণ্ড বৃদ্ধি করে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো। সুরেশ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুশরণের বৃদ্ধি হলো দণ্ডাদেশ, দশ বৎসর—রামনাথ পাণ্ডে ও প্রণবেশ চ্যাটার্জীর দণ্ডাদেশ কমে যথাক্রমে তিন ও চার বৎসর হলো।

দ্বিতীয় দফা ফিরিঙ্গী আদালতের সুবিচারপর্বও শেষ হলো।

পরে ঐ মামলার অজুহাতে আর একজন বিদ্রোহীরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়—নাম তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী। কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ঐ চারজন নির্ভীক তরুণ সেনানী কে ওরা। কি ওদের পরিচয়।

ভারতের বিপ্লব ইতিহাসের পাতায় আরো ঐ যে চার শহীদের নাম রক্তাক্ষরে লেখা হয়ে গেল কোথা হতে কবে কার কাছ হতে ওরা পেয়েছিল অমনি করে মৃত্যুমন্ত্রের দীক্ষা !

কবে কোন্ শুভলগ্নে ললাটে ওদের দেশজননীর অদৃশ্য হস্তে রক্তচন্দনের টিপ পরেছিল ! উৎসর্গিত হয়েছিল অবিনাশী মৃত্যুহীন আরো চারটি প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ !

রামপ্রসাদ বিস্মিল।

কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অন্যতম বিদ্রোহী সৈনিক !

মাসিক ১৪ টাকা বেতনভুক মিউনিসিপালিটির এক গরীব কেরানী শ্রীমুরলীধর বিস্মিলের ঘরেই ১৮৯৭ সালে রামপ্রসাদের জন্ম।

পুত্র যার অদূরে ভবিষ্যতে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নেবে তার পিতার পক্ষেও পরাধীনতার গ্লানি দীর্ঘ দিন ধরে সহ্য করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি তাই সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে মুরলীধর স্বাধীনভাবে আদালত প্রাঙ্গণে স্ট্যাম্প বিক্রয় করে তারই আয়ে কায়ক্লেশে দুঃখের সংসার টেনে চলেছিলেন।

মা ও দিদিমায়ের স্নেহ ও যত্নে ক্রমে বেড়ে উঠে শিশু।

সাত বৎসর বয়েসের সময় রামপ্রসাদকে স্কুলে দেওয়া হলো, কিন্তু লেখাপড়া ভাল লাগল না দুরন্তপ্রকৃতি বালকের। নানা দুষ্টুমি করেই ঘুরে বেড়ায় রামপ্রসাদ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুরন্তপ্রকৃতি কমা তো দূরে থাক আরো যেন বেড়েই চলে।

এই সময় রামপ্রসাদের মনের গতিকে ফিরিয়ে দেন স্থানীয় মন্দিরের এক পূজারী ব্রাহ্মণ !

কঠোর আত্মসংযম ও ন্যায়নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এক নতুন রাম-প্রসাদের জন্ম শুরু হলো।

রামপ্রসাদের জননীও পুত্রের চরিত্রগঠনে যথেষ্ট সহায় হয়েছিলেন।

শৃঙ্খলিতা দেশজননীর প্রতিও রামপ্রসাদের সমবেদনার দৃষ্টি গিয়ে পতিত হলো।

১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক রামপ্রসাদ একবার ভগ্নীর বিবাহে গোয়ালিয়র গিয়ে ৭৫ টাকা দিয়ে একটি রিভলভার ক্রয় করে তার সে কি আনন্দ।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদ রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নিষ্ঠা ও আগ্রহের পুরস্কার সে পেল—লক্ষ্মৌ শহরের বিপ্লবীদের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল।

সবলদেহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক কর্মঠ, রামপ্রসাদকে বিপ্লবীরা সানন্দেই

নিজেদের একজন করে নিল। নিষ্ঠা ও বুদ্ধির বলে অত্যল্পকাল মধ্যেই রামপ্রসাদ ঐ গুপ্ত বিপ্লবীদলের কার্যকরী সমিতির সভ্যপদে উন্নীত হয়। এবং ক্রমে স্থানীয় দলের প্রধান নেতার আসন অধিকার করে।

বিপ্লবীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে আসবার পর হতেই রামপ্রসাদ দেখতে পেল দলে অর্থাভাবটা খুব প্রকট। বিপ্লবী আন্দোলন লোকচক্ষুর অন্তরালে বাঁচিয়ে সক্রিয় রাখতে হলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন অথচ অর্থই তাদের তেমন হাতে নেই!

অর্থ চাই! অর্থ না হলে অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হবে কেমন করে।

দলের অনেকেই ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দেয়। প্রথমটায় কিন্তু রামপ্রসাদ অন্য সকলের প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেনি। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই রামপ্রসাদকে সমিতির প্রয়োজনে দু'একবার ডাকাতি করতে হয়েছিল। রামপ্রসাদ জননীর নিকট হতে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে পুস্তক ব্যবসার দ্বারাও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। এবারে সে শুরু করলে গোয়ালিয়র রাজ্য হতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ।

ঐ সময় মৈনপুরা নগরের একজন রামপ্রসাদের দলের সদস্য, দলের নেতা হবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এবং তারই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ও কাপুরুষোচিত কাজের জন্য দলের অনেকেই পুলিসের নজরে পড়লো। ধরপাকড় শুরু হলো। সরকার 'মৈনপুরী ষড়যন্ত্র' নাম দিয়ে বহু লোকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে এক মামলা ফেঁদে বসল।

উপায়ান্তর না দেখে রামপ্রসাদ গা ঢাকা দিতে বাধ্য হলো তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে।

শিকারী ডালকুত্তাদের চোখে ধুলো দেবার অদ্ভুত কৃতিত্ব ছিল রামপ্রসাদের —ফেরারী অবস্থাতেই রামপ্রসাদ শাহজাহানপুর সেবা-সমিতির য়্যাম্বুলেন্স বিভাগের একজন সেবক হয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে দিল্লীতে গিয়ে হাজির। টিকটিকি ও পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে রামপ্রসাদ চলে গিয়েছে, কেউ তাকে সন্দেহও করতে পারেনি।

ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা বিশ্বস্ত দলের সহকর্মীদের মধ্যেই একজন ঐ সময় রামপ্রসাদের জীবন নিতে তিন তিনবার পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে কিন্তু জন্মমুহূর্তেই স্বদেশজননী যার প্রশস্ত ললাটে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন, ফাঁসীর মঞ্চে যার কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হবে জীবনের জয়গান; বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের বংশধরের হাতে তার মৃত্যু হবে কেন? তাই ব্যর্থ হলো বিশ্বাসঘাতকের নিশানা বারবার তিনবার।

নিদারুণ আঘাত পেল বিপ্লবী তার অন্তরে, আক্রোশে জ্বলে উঠলো।

মায়ের কাছে তো রামপ্রসাদের কোন কিছুই গোপন ছিল না। অকপটে সব কিছুই সে বললে মায়ের কাছে: এর প্রতিশোধ আমি নেবো মা!

মা বললেন: ছিঃ বাবা তাই কি হয়। প্রতিহিংসার আগুন মনের মধ্যে জেবলে

দেশের সেবা তো করা যায় না। বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যর্থতাই তো এ পথের পুরস্কার। নৈরাশ্যই যদি না সহ্য করতে পারবে তো এপথে চলতে পারবে না।

'কিন্তু মা! এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যদি না হয়—'

'না! আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর রামপ্রসাদ, ওপথে তুমি যাবে না।'

'আশীর্বাদ কর মা তাই যেন পারি!' বিপ্লবীর দু'চক্ষে জল উপচিয়ে পড়ে।

দীর্ঘদিন ফেরারী জীবন যাপন করবার পর যুদ্ধশেষে রাজকীয় ঘোষণার বলে রামপ্রসাদ মুক্তি পেয়ে আবার শাহজাহানপুরে ফিরে এল।

কিন্তু কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। ডালকুত্তার দল রামপ্রসাদের পিছু পিছু ছায়ার মতই সর্বদা ফিরতে লাগল। চিহ্নিত বিপ্লবী যে!

আরো কিছুকাল পরে রামপ্রসাদ আবার বিপ্লবী দল গড়ে তোলায় মনোযোগ দেয়।

এবং ক্রমে উত্তরভারতীয় বিপ্লবীদল সংগঠনের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ল।

বিরাট একটি দল ঐসময় ভারতের বিভিন্নস্থানে সঙ্ঘ গঠন করে সর্বভারতীয় এক সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টির দ্বারা ভারতে গণতন্ত্রমূলক এক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে।

উক্ত দল প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় উপায়েই বিপ্লববাদ প্রচারে সচেষ্ট ছিল।

১৯২৪ অক্টোবর মাসে কানপুরে বিপ্লবীদের পুনর্সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক গুপ্ত অধিবেশন হয়। এবং ঐ সভাতেই সমগ্র যুক্ত-প্রদেশকে কাজের সুবিধার জন্য সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ কাশী, ঝান্সী, কানপুর, আলীগড়, মীরাট, শাহজাহানপুর ও ফৈজাবাদ।

সংখ্যায় তখন বিপ্লবীরা ঐ সময় একশতের অধিক।

সকলেই তরুণ কিশোর ও যুবা। বক্ষে তাদের দুর্দান্ত সংকল্প। আগে কেবা প্রাণ করে যাবে দান তারই জন্য এগিয়ে চলেছে সকলে।

হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু! যে কোন নিষ্ঠুর নির্যাতনও মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত। শাহজাহানপুরের ভার পড়লো রামপ্রসাদের উপর। সহকর্মী হলো রামপ্রসাদের কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী দুঃসাহসী আসফাকউল্লা।

ফিরিঙ্গী সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে 'প্রতাপদল' নামে এক সমিতি গড়ে রামপ্রসাদ তার বিপ্লবের কাজ করে যেতে লাগল নিঃশব্দে একাগ্রতায়।

বিশ্বাসঘাতক ইন্দুভূষণ মিত্র ঐ সময় দলে এসে যোগ দেয় এবং খুব শীঘ্রই রামপ্রসাদের বড় বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠে।

বড় বিশ্বাস করেছিল রামপ্রসাদ ইন্দুকে।

তার সেই বুকভরা বিশ্বাসের যোগ্য প্রতিদানই দিয়েছে ঐ পরউচ্ছিষ্টলোভী প্রাণভয়ে কাতর বিশ্বাসঘাতক ইন্দুঃ কাকোরী মামলায় শত্রুদলের পক্ষে সাক্ষী দাঁড়িয়ে।

বিপ্লবীদের বরাবরই অর্থের অভাব হয়েছে।

অতি সংগোপনে লুকিয়ে প্রতি মুহূর্তে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা দেশের স্বাধীনতা আনবার জন্য বিপ্লবী, বিদ্রোহী নাম নিয়ে সংগঠনের কাজ চালিয়ে গিয়েছে, করেছে দিনের পর দিন দুঃসহ সংগ্রাম। অর্থের জন্যই হয়ত তাদের এক-আধ সময় লুঠতরাজ করতে হয়েছে কিন্তু তার জন্যও যে তাদের কতখানি গ্লানি ও দুঃখ সইতে হয়েছে কজন তার সংবাদ রাখে বা রেখেছে।

কেনই বা তারা নিরন্তর দগ্ধ হয়েছে তারই বা কতটুকু সংবাদ কজন রেখেছে। সরকারী খেতাবের জন্য উপরওয়ালাদের ভেদ দিয়ে, নানাভাবে চোরা কারবার করে, জুয়া খেলে, রেস খেলে, মদ্যপান করে দেশের তথাকথিত ধনিক সম্প্রদায় কত টাকাই না নষ্ট করেছে আর দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যারা মৃত্যুপণ করে ঘর-সংসার, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, আনন্দবিলাস ও স্বচ্ছন্দ আরাম ত্যাগ করে বন্দুকের গুলিতে, ফাঁসীর দড়িতে নির্বাসনে প্রাণ দিল তাদের টাকাপয়সার অভাবে ডাকাতি করে জোর করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে এর চাইতে দুঃখের কথা, লজ্জার কথা আর কি থাকতে পারে।

অর্থের জন্যই শেষ পর্যন্ত রামপ্রসাদকে মাত্র দশজন সঙ্গী নিয়ে ট্রেনের সরকারী অর্থ জোর করে ছিনিয়ে নিতে হলো।

নিতে বাধ্য হতে হলো। অর্থের প্রয়োজন।

রামপ্রসাদ ফেরার হলো না কিন্তু এবার আর।

২২শে নভেম্বর পুলিস তাকে তার গৃহেই গ্রেপ্তার করলো।

১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে কাকোরী ষড়যন্ত্রের নেতা বলে ঘোষণা করে তার প্রতি চরম দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হলো।

১৯শে ডিসেম্বর: পূর্ব গগনে তখন ভোরের অরুণালোকের রক্তরাঙা আভাস জেগেছে মাত্র।

জল্লাদকে সঙ্গে নিয়ে জেলার সাহেব এসে রামপ্রসাদের সেলের সামনে দাঁড়াল।

সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ওরে যাত্রী।

আঁধার নিশা পোহায়েছে ঐ পূর্ব তোরণে দেখ জেগেছে রাঙা আভাষ। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফাঁসীর দড়িটি গলায় নিয়ে নির্ভীক বিপ্লবী বলে গেল: I wish the downfall of the British Empire!

প্রণাম জানাই তোমায় হে বীর। প্রণাম লহ।

* * *

মাস্টারদা—সুশিষ্বর স্যান্যাল সতীর একটা জরুরী চিঠি পেলেন পুরী থেকে।

দাদা,

তোমাকে খুব দরকার, একটিবার যদি তুমি আসো সত্যি বড় আনন্দ পাবো। আসবে নাকি, ছোট বোনটির আব্দারটুকু রাখবে না কি!

তোমার ছোট বোন সতী।

যেতে হবে। হাঁ, যেতে হবে বৈকি।

রাত্রের পুরী এক্সপ্রেসেই রওনা হয়ে পড়লো সৃষ্টিধর।

কয়েকদিন থেকেই যাবো যাবো করছিল কিন্তু কোথায়ও আজকাল আর যেতেই যেন ওর ইচ্ছা করে না। তবু যেতেই হবে। সতী ডেকেছে।

ভোরের আলো সবে তখন ফুটে উঠছে সাগর জলের কোল ঘেঁষে।

নীল সীমান্তে রক্তসিন্দুরের ছোপ। নীললোহিত।

সারাটা রাত একটিবারের জন্যও বিনয় দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। ছট্‌পট্‌ করেছে, কেবলই শয্যার উপরে এপাশ ওপাশ করেছে।

'ঘুমোবার চেষ্টা কর তো একটু—'

'ঘুম যে কিছুতেই আসছে না সতী!'

'আমি তোমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিই তুমি ঘুমোও!

'কর্তাদের তাড়া খেয়ে খেয়ে দুটো বছর বনে জঙ্গলে পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি ধরা পড়ে দ্বীপান্তরে যাওয়ার আগে। ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্ত হয়ে কোনদিন ঘুমোবারও ফুরসুৎ পাইনি, সেই সময় ভাবতাম এর চাইতে যদি ধরা পড়তাম তাহলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাঁচতাম। কিন্তু আশ্চর্য কি জান! যখন ধরা পড়ে জেলে গেলাম সাতদিন একটিবারের জন্যও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না—'

শেষ পর্যন্ত শেষ রাত্রির দিকে বিনয় বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নিঃশব্দে সতী বিনয়ের গায়ের উপর চাদরটা টেনে দিয়ে বাইরে বের হয়ে এলো।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় সতী বসলো। এবং বসে থাকতে থাকতেই বোধহয় দু'চোখের পাতায় ঘুমের ঢুলুনী নেমে এসেছিল ক্লান্তিতে।

সহসা তন্দ্রাটা ভেঙে গেল সৃষ্টিধরের ডাকে: সতী কোথায় দিদি!

সতী চোখ মেলে তাকাল: সামনেই দাঁড়িয়ে সৃষ্টিধর সান্যাল! পরিধানে মলিন খদ্দরের মোটা ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে একটা পুরু চামড়ার সোলের কাবুলী স্যাণ্ডেল। মাথার চুল এলোমেলো, কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলছে একটা ব্যাগ।

'দাদা এসেছো! সত্যি তুমি এসেছো দাদা!' সতী তাড়াতাড়ি উঠে সৃষ্টিধরের পায়ের উপরে নত হতেই ব্যগ্র হাত দুটি দিয়ে গভীর স্নেহে তুলে

নিল সতীকে নিজের বুকের কাছে : 'একি চেহারা হয়েছে দিদি! তুইও যদি অসুস্থ হয়ে পড়িস তবে বিনুর সেবা করবে কে ভাই!'

'বোস দাদা।'

হাত ধরে টেনে চেয়ারটার উপরে বসিয়ে দিল সৃষ্টিধরকে সতী।

'বিনু কেমন আছে দিদি!'

'আবার রক্ত পড়া শুরু হয়েছে গত তিন-চারদিন থেকে।'

'হুঁ।' সৃষ্টিধর চিন্তিত হয়ে ওঠে।

সত্যি দুঃখ হয় তার সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে। মেয়েটা কি কঠোর তপস্যাই না করছে।

সাবিত্রীও বোধ হয় তার স্বামীর জীবনকে ফিরিয়ে আনবার জন্য এত কঠোর ও একনিষ্ঠ তপস্যা করেনি। কিন্তু সাবিত্রীর যুগ আর নেই!

দেবতারা আর আশীর্বাদ দেন না।

হঠাৎ সতীর ডাকে সৃষ্টিধর চমকে মুখ তুলে তাকাল : 'কি রে?'

'একটা বিশেষ কাজে তোমাকে ডেকেছি দাদা! বল তুমি তোমার ছোট বোনটির অনুরোধটুকু রাখবে!'

সৃষ্টিধর সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সমস্ত মুখখানি ব্যেপে অদ্ভুত একটা বৈরাগ্যের বিভূতি যেন জ্বলজ্বল করছে।

দুটি চক্ষুর দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন দুটি আগুনের শিখা।

সতীর সমস্ত অন্তর যেন ঐ শিখার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরেছে।

'বল!'

'আগামী কাল রাসপূর্ণিমা। আমাদের বিবাহটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে।'

'বিবাহ!'

'হ্যাঁ! বুঝতে পারছি আর বেশি দেরী নেই। সময় থাকতে যদি কাজটুকু সেরে না রাখি—'

'কিন্তু—'

'শুধু তো মন্ত্রোচ্চারণটুকুই! যদিও জানি ওর কোন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু সমাজে থাকতে গেলেও যে সামাজিক স্বীকৃতির একটা প্রয়োজন আছে। আমাকে লোকে যা খুশি তাই বলুক ক্ষতি নেই কিন্তু ওর মৃত্যুর পর ওর নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে লোকে ওর স্মৃতির গায়ে কালি ছেটাবে এ আমি সহ্য করতে পারবো না!'

সৃষ্টিধর সতীর কথা ও যুক্তি শুনে সত্যিই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে বললে : 'বীরেশ্বরকে একটা সংবাদ দিলে হতো না ভাই।'

'কে, দাদা! না দাদা তাকে আর এর মধ্যে টানবো না। দাদা হয়ত সইতে

পারবে না।'

'কিন্তু আমিই যে পারবো এ সংবাদটাই বা কোথা থেকে কেমন করে পেলে সতী?'

'পাথরে যে দাগ বসে না এ সংবাদ কি কাউকে দিতে হয়, না আর কষ্ট করে জানতে হয়। ছোট্ট একটি শিশুও যে বুঝতে পারে।'

'তাই বুঝি পাথরকে সাক্ষী মেনে—'

সৃষ্টিধরের কথাটা শেষ হলো না।

সতী বললে: 'হ্যাঁ। নুড়ী পাথরের শালগ্রামশিলা নয়, তোমাকেই সামনে রেখে এবং তোমারই মুখোচ্চারিত মন্ত্রে হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদ্‌যাপন।'

'ক্ষমা কর ভাই! আমিও মানুষ! বিশ্বাস কর আমি পাথর নই! পাথর নই!'

সৃষ্টিধরের গলাটাও বুঝি তার অজ্ঞাতেই ধরে আসে।

যার চোখে অতিবড় বেদনাতেও কেউ কোনদিন জল দেখেনি তার চোখের কোণ দুটোও বুঝি ভিজে ওঠে।

সতী কিন্তু আর দাঁড়ায় না। দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করতে করতে বলে: 'বোস দাদা। চা তৈরী করে নিয়ে আসি।'

ভিজে চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে সতীর অপসৃয়মান দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে সৃষ্টিধর। ভগবান তোমার সৃষ্টির বুঝি তুলনা নেই।

কি দিয়ে যে ঐ সতীর মত মেয়েদের তুমি সৃষ্টি করেছো তা তুমিই জান।

প্রথম যৌবনের সৃষ্টিধর সান্যাল মরে গিয়েছে অনেক দিন আগে।

কিন্তু আশ্চর্য, স্মৃতির পাতাগুলো আজও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

এমনি আর একজনের কথাই কি সৃষ্টিধরের মনে পড়ে! অশ্রুসিক্ত চোখের পাতার উপরে বেদনার রামধনু রচনা করে।

কোথায় হারিয়ে গেল তারা আজ! সে নিজেই বা কোথায় হারিয়ে গেল!

মৃত নক্ষত্র। সত্যিই মৃত নক্ষত্র।

মৃত নক্ষত্রের বুকেও কি স্পন্দন জাগে আলোর!

না! কি এসব সে ভাবছে! এর চাইতে কাল সারাটা রাত ট্রেনে সে ঘুমোতে পারেনি, একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে কাজ হতো।

সৃষ্টিধর চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘুমিয়েও পড়েছিল, সতীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে সতী, হাতে তার এক কাপ ধূমায়িত চা।

'দাদা কি ঘুমোলে নাকি! তোমার চা এনেছি।'

'না ঘুমোইনি—' হাত বাড়িয়ে সতীর হাত থেকে সৃষ্টিধর চায়ের কাপটা নিল। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে: 'বিনু উঠেছে দিদি?'

'হাঁ।'

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুষ্টিধর: 'চল বিনুর সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।'

চোখ বুজে বিনয় শয্যার উপরেই পড়ে ছিল।

রোগশীর্ণ স্থির নিস্পন্দ বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সুষ্টিধরেরও বুকখানা সহসা কেঁপে ওঠে, মৃত্যুর নোটিশ সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।

এই সেই বিপ্লবী—দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক বিনয় বোস।

'বিনু!'

'কে!' চোখ মেলে তাকাল বিনয় বোস।

'এ কি, মাস্টারদা! সত্যিই তুমি মাস্টারদা!'

'হাঁ!' সুষ্টিধর বিনয়ের শয্যার আরো নিকটে এগিয়ে এলো।

'তুমি হঠাৎ দাদা! কোন খবর নেই কিছু নেই!'

'কেন আসতে নেই নাকি!'

'না, না—তা বলছি না, তবে—' তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে বলে: 'যাক্। ভালই হলো। বড় ইচ্ছা ছিল যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা হয়। কেমন আছো?'

'দেখতেই তো পাচ্ছিস!'

'যাক্ দাদা তুমি এসেছো। এবারে যাবার সময় সতীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আজ কদিন থেকে ওকে এত করে বলছি তুমি ফিরে যাও সতী কিন্তু কিছুতেই ও আমার কথা শুনবে না।'

সতী নিঃশব্দে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

বিনয়ের শিয়রের সামনে বসে তার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে সুষ্টিধর বললে: 'ও সব কথা এখন থাক বিনু।'

কিন্তু বিনয় সুষ্টিধরের কথায় কান দেয় না। বলেই চলে: 'কেন যে ওর এই মৃত্যুপণ নিয়ে আমাকে সেবা করা নিজের কাছেও এক এক সময় একান্ত হেঁয়ালী ও দুর্জ্ঞেয় ঠেকে মাস্টারদা, এক এক সময় নিজের উপরেই নিজের আমার রাগ ধরে। আর কতদিন এমনি করে বেঁচে থাকতে হবে বল তো?'

'ছিঃ ভাই, ও কথা বলতে নেই!'

'না, না—মাস্টারদা তুমি জান না! সতীকে মুক্তি দেবার জন্যও যে এখন আমার যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। ওর কষ্ট যে আর আমি দেখতে পারছি না।'

'তুই কি মনে করিস বিনয় তুই গেলেই সতীর নিষ্কৃতি মিলবে! আজও কি বুঝতে পারিসনি ওর সঙ্গে তুই জন্ম-জন্মান্তরে বাঁধা! এর থেকে মুক্তি ওর নেই তোরও নেই।'

সতীই কথাটা বিনয়ের কাছে ঐ দিন রাত্রে এক সময় বললে।

বিনয় কিন্তু প্রবল আপত্তি তুলল: 'না, না—এ সব কিছুতেই হতে পারে না! ছিঃ ছিঃ!'

'নতুন করে তো কিছু আর হচ্ছে না। আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা শুধু মাস্টারদার সামনে দু'জনের আমাদের তাঁরই শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে স্বীকার করে নেওয়া, তার চাইতে তো বেশী কিছুই নয়।'

'না না—তুমি বুঝতে পারছো না সতী!'

সহসা সতী বিনয়ের একখানা রোগশীর্ণ শিরাবহুল কঙ্কালসার হাত চেপে ধরে অশ্রুখিন্ন কণ্ঠে বলে: 'না না—আপত্তি করো না তুমি! আপত্তি করো না। তোমার কাছে তো মুখ ফুটে কোনদিন কিছু চাইনি। তোমার কাছে জীবনের আমার এই প্রথম ও শেষ প্রার্থনা। এটুকু হতে আমাকে আর সব জেনেশুনেও বঞ্চিত করো না!'

ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে সতীর দুই চক্ষুর কোণ বেয়ে।

বিনয় সহসা নিজেকে যেন কেমন বিব্রত ও অসহায় বোধ করে।

সতী বিনয়ের বুকের উপরে মাথা গুঁজে কান্নার দুরন্ত বেগটাকে রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে।

'সতী!'

সতী জবাব দেয় না।

বিনয় আবার ডাকে: 'সতী! কেঁদো না! উঠে বোস! তুমি তো জান একদিক থেকে তোমাকে অদেয় কিছুই আমার নেই।'

সৃষ্টিধরই মন্ত্রোচ্চারণ করলে। গাঢ় লাল রক্তের মত বেনারসী শাড়ি পরিহিতা সতীকে সত্যই অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

সর্বাঙ্গে যেন ওর লক্ষ কোটি আগুনের লেলিহান শিখা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জলছে।

ওং মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু।

নিজ হাতে রক্তচন্দন দিয়ে সতী সযতনে বিনয়কে সাজিয়েছে। নিজ হাতে মালা গেঁথে গলায় ওর পরিয়ে দিয়েছে।

বাইরে কুলপ্লাবী জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আশীর্বাদ।

সমস্ত ঘরটাই ফুলে ফুলে সাজিয়েছে সতী!

জীবনের মধুরাত্রি!

একবারই আসে, দুবার তো আসে না।

কেমন করে এই রাতটিকে সতী অমনিই যেতে দিতে পারে!

নিজহাতে শয্যা রচনা করেছে সতী!

সৃষ্টিধর কিন্তু থাকতে পারেনি। ছুটে বের হয়ে গিয়েছে।

সোজা একবারে সৃষ্টিধর সাগরের ধারে চলে যায়।

চাঁদের আলোয় সাগরেরও যেন আজ অভিসার।

উদভ্রান্তের মতই সৃষ্টিধর সাগরের বালুবেলার উপর দিয়ে হেঁটে চলে।

নিজ হাতে সতী জহরব্রতের অগ্নিকুণ্ড জেবলেছে আত্মদান করবে বলে।

নিঃশেষে নিজেকে পুড়িয়ে দিয়ে কি ও বিনয়ের প্রতি তার প্রেমকেই স্বীকৃতি

দিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু তাই যদি হয় কিইবা এর প্রয়োজন ছিল।

রাজেন্দ্রাণী বেশে সতী খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের দিকে তাকিয়ে।

ঘরে আজ একটি মাত্র মোমবাতি জেবলে দিয়েছে সতী।

মোমবাতির মৃদু নরম আলোর সঙ্গে খোলা জানালাপথে আগত চাঁদের আলো মিশে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে।

'মাস্টারদা এখনো ফিরল না সতী?'

বিনয়ের প্রশ্নে সতী চমকে ফিরে দাঁড়ায়: জবলজবল করছে সিঁদুর সিঁথিতে, কপালের ঠিক মধ্যখানে গোলাকার সিঁদুরের টিপটি।

'কই এখনো তো ফিরলো না!'

'রাত কত হলো সতী?'

এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপরে রক্ষিত টাইমপিসটা দেখলো সতী: রাত এগারটা।

'এগারটা বাজে—'

সতী এগিয়ে এসে বিনয়ের শয্যার উপরে বসলো। ধীরে ডান হাতখানি বিনয়ের কপালের উপরে রাখতেই বিনয় হাত বাড়িয়ে সতীর হাতটা মুঠো করে চেপে ধরলো।

'সতী?'

সতী স্নিগ্ধ মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়: 'বল।'

'সত্যি এ তুমি কি করলে সতী? নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় এমনি করে তুমি নিজের হাতে স্বাক্ষর দিলে কেন?'

'কে বললে তোমাকে আমি আমার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিয়েছি!'

'তাছাড়া আর কি বল? আমি তো মুঠো ভরেই পেলাম কিন্তু তুমি কি পেলে?'

'কেন তুমি বার বার ঐ কথা বলছো বল তো? বিশ্বাস করো তুমি আমি যা পেয়েছি যা পেলাম বহু সৌভাগ্যবতী নারীর ভাগ্যেও তা জোটে না!'

সতীর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বিনয় বলে, 'ভাগ্যই বটে! আজ আর অস্বীকার করবো না সতী! কত রাতের পর রাতই না এই আজকের রাত্রির এই মধুর স্বপ্নে কেটে গিয়েছে। কিন্তু সে স্বপ্ন যে সত্যি করেই এমনি একদিন চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে আমার জীবনে প্রকাশ পাবে এ স্বপ্নেও তো ভাবিনি!'

সহসা সতী উঠে দাঁড়াল।

এবং পাশের ঘরে গিয়ে বহুদিনের অব্যবহার্য খাপের মধ্যে রক্ষিত সেতারটা নিয়ে এলো।

'মনে পড়ে এক সময় তুমি আমার সেতার বাজনা শুনতে কি ভালবাসতে!

সেতার বাজাই শোন !'

সতীর অঙ্গুলীর পীড়নে সেতারের তারে সুরঝঙ্কার জাগল।

বসন্তবাহার সুর বাজায় সতী।

বিনয় শুনতে থাকে।

অনেক রাত্রে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সৃষ্টিধর যখন গৃহে ফিরে এলো, স্তব্ধ চন্দ্রালোকিত রাত্রে বারান্দায় পা দিতেই ওর কানে এসে বাজল সেতারের সুরঝঙ্কার।

দাঁড়িয়ে গেল সৃষ্টিধর।

চন্দ্রালোকিত নিশীথিনীর স্তব্ধ বুকখানাকে যেন সেতারের সুরঝঙ্কার ভরিয়ে তুলেছে।

বিনয় ও সতীর বাসর রাত্রি। মধুযামিনী আজকে ওদের!

কিন্তু মধুযামিনীতে এ কান্নার সুর কেন! কেন এ বুকভাঙা অশ্রুকাতর বেদনোচ্ছ্বাস!

সতী আর বিনয়! বিনয় আর সতী! মুক্তি হোমানলের দুটি উধর্বমুখী শিখা! শ্মশানে আজ ওরা রচনা করছে বাসর।

অদূরে দণ্ডায়মান নিষ্ঠুর মৃত্যু!

সাবিত্রী তোমার সত্যবানকে যে যম নিতে এসেছে!

হে নিষ্ঠুর! হে নির্মম আরো কত সাবিত্রীর সিঁথির সিঁদুর তুমি মুছে দেবে! কবে হবে এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি!

কবে এর শেষ!

শেষ! এখনো অনেক বাকী! আসফাকউল্লাও জানত বৈকি। জানত রাজেন্দ্র লাহিড়ীও। জানত ঠাকুর রোশেন সিং।

শাহজাহানপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে আসফাকউল্লার জন্ম। সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম হলেও আপন খেয়ালে যে ভাবে দিন কাটে আসফাকউল্লারও সেই ভাবে জীবনটা কেটে যেতে পারত কিন্তু তা তো কই হলো না।

পরবর্তীকালে ফাঁসীর দড়িতে যাকে জীবনের শেষ পরিচয়টুকু রেখে যেতে হবে, বিলাস বৈভব তার জীবন পরিক্রমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে কেন!

পরাধীন দেশে জন্মাবার গ্লানিই তাকে মুক্তিপথে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিল। রামপ্রসাদের দলে গিয়ে ভিড়ল আসফাকউল্লা।

রামপ্রসাদ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হলো কিন্তু আসফাকউল্লার কোন সংবাদই পেল না। কিছুদিন নানা ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে আত্মগোপন করে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষে আসফাকউল্লা স্থির করে আফগান রাজদূতের সাহায্যে ভারতের বাইরে কোনমতে পালিয়ে যাবে। দিল্লীতে এল আসফাকউল্লা। কিন্তু ঐ দিল্লীতে আগমনই তার কাল হলো, ১৯২৬—৮ই সেপ্টেম্বরে পুলিস আসফাককে গ্রেপ্তার করল। ঐ সময় কাকোরী মামলার অন্যতম অভিযোক্তা

শচীন্দ্রনাথ বক্সীও ভাগলপুরে গ্রেপ্তার হলো।

১৯২৭-এর ১৯শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে আসফাকউল্লাকে ফাঁসীর মঞ্চে এনে দাঁড় করানো হলো।

পবিত্র কোরাণ শরীফের কতকগুলি পংক্তি উচ্চারণ করতে করতে বীর সৈনিক গলায় টেনে নিল ফাঁসীর রজ্জু।

আসফাক ছিল কবি।

চিরবিদায়ের কয়েকদিন পূর্বে ক্ষুদ্র অন্ধকার সেলের মধ্যে বসে কবির মনকে যে কবিতাসুধা মন্থন করেছিল!—

ফণা হ্যায় সবকে লিয়ে
হাম প্যায় কুছ নাহি মোকুফ
বকা হ্যায় এক খাকত
জাতে কিব্রিয়াকে লিয়ে
ভঙ্গ আকর হামুড়ি
উনকে জুলুমসে বে-দাদাস
চল দিয়ে সুয়ে আদম
জিদানে ফয়জাবাদসে॥

মরণ! সে তো সকলের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। আজকে আমার মৃত্যুও তেমনি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে, তার ভয়ে আমি কাতর হয়ে পড়বো। এ দুনিয়ায় সব কিছুই তো নশ্বর, কালক্রমে সব কিছুই একদিন অবিনশ্বর ভগবানের মধ্যে লয় পাবে। ভগবানের এই অলংঘ্যাবিধান অনুসারে আমিও তেমনি ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করে অমরধামে যাত্রা করবো।

আর ঠাকুর রোশেন সিং।

শাহজাহানপুরের নাওয়াদা গ্রামে ঠাকুর রোশেন সিংয়ের জন্ম। জাতিতে রাজপুত। ভারত ইতিহাসের পাতায় পাতায় আজও যাদের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী অম্লান দীপ্তিতে স্বাক্ষর দিচ্ছে: দেশের জন্মভূমির জন্য যাদের প্রাণদান আজও চারণের কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে যায় সেই রাজপুতের রক্ত ছিল ঠাকুর রোশেন সিংয়ের শরীরে।

অসহযোগ আন্দোলনে সর্বপ্রথম ঠাকুর রোশেন সিং কারাবরণ করে।

কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তন করে রোশেন সিং দেখলো দেশের চারিদিকে একটা ক্লান্ত অবসাদের ঢেউ। অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়েছে ঠিক এমনি সময় সামনে এসে দাঁড়ালো বিপ্লবের পূর্ণ প্রতীক পাবক-শিখারূপী রামপ্রসাদ বিস্মিল।

সানন্দে ঠাকুর রোশেন সিং রামপ্রসাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

দলের মধ্যে সংগঠনের কাজের জন্যই নিযুক্ত ছিল ঠাকুর রোশেন সিং,

কাকোরী ডাকাতির মধ্যে রোশেন সিং ছিল না।

কিন্তু তাতে কি।

ফিরিঙ্গী রচিত আইনে অপরাধী যদি নাও জানে কি দোষ তার বিচারের তো কোন বাধাই হয় না।

এ ক্ষেত্রেও হলো না।

সব চাইতে বড় কথা নিরহঙ্কার বলিষ্ঠ ঠাকুর রোশেন সিংয়ের প্রাণ ছিল সূর্যের মত।

এবং গুপ্ত বিপ্লবী দলের সে ছিল অন্যতম সভ্য।

অতএব বিচারে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলো।

ফাঁসীর নির্দিষ্ট দিনে চিরসহচর গীতাটি বক্ষে আঁকড়ে ধরে হাস্যোৎফুল্ল মুখে এগিয়ে গিয়ে বললে: বন্দেমাতরম্।

জল্লাদ এগিয়ে এলো রজ্জুর ফাঁসিটি গলায় পরিয়ে দিতে।

সত্যিই কোন দুঃখই তার আর সেদিন ছিল না। ছিল না সামান্য এতটুকু খেদ। ফাঁসীর সপ্তাহ পূর্বে তার স্বলিখিত জীবনের শেষ পত্রখানি চিরদিনই তার সাক্ষ্য দেবে।

…আমার জন্য দুঃখ করো না বন্ধু! ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই তোমার প্রাণঢালা প্রেমের প্রতিদান যেন তুমি তাঁর কাছ থেকেই পাও। সানন্দেই মৃত্যুকে আমি বরণ করতে চলেছি।…

প্রায় দুই বৎসর হলো আমি ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দূরে বাস করছি তাই তো আসক্তির বন্ধনও আমার কেটে গিয়েছে, বাসনার আগুন আর এ হৃদয়ে জ্বলতে পারে না।

বন্ধু! আজ এক অভূতপূর্ব তৃপ্তিতে সমস্ত হৃদয় আমার ভরে উঠেছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে পরকালে নাকি অক্ষয় স্বর্গ-বাস হয়। ধর্মযোদ্ধা আর বনবাসী তাপসের মধ্যে তো কোন পার্থক্যই নেই।… তবে আজ আসি. আমার ভালবাসা নিও।

আরো একজন রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

১৯২৩ সনে কাকোরী মামলায় অভিযুক্ত অন্যতম বিদ্রোহী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী যুক্তপ্রদেশে গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘকে পুনরায় ভাল করে সংগঠন করবার জন্য সতীশচন্দ্র সিংহকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে যায়। শচীন্দ্রনাথ বক্সী এসে সঙ্গে যোগ দিল।

তিনজনে যোগেশ, শচীন্দ্র ও সতীশচন্দ্র তাদের কাজ শুরু করে।

১৯০১ খৃঃ জুন মাসে পাবনা জেলায় ভারেঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম।

পরে ১৯১৯ খৃঃ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে গিয়ে প্রবেশ করে, ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রের ছাত্র ছিল রাজেন্দ্রনাথ।

১৯২৪ খৃঃ কানপুরে যোগেশবাবুর সঙ্গে এপ্রিল মাসে রাজেন্দ্রনাথেরও সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এবং যোগেশবাবুর ইচ্ছাতেই রাজেন্দ্রনাথের উপরে প্রতাপগড়ের কর্মকেন্দ্রের ভার অর্পিত হয়। পরে রাজেন্দ্রনাথ শাহজাহানপুরে রামপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হয়।

অক্টোবর মাসে কানপুরে যে কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটা খসড়া প্রস্তুত করে যোগেশচন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথকে ঐখানকার নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করে কলকাতায় ফিরে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই Bengal ordinance-এর আইনে ইংরাজ সরকার যোগেশবাবুকে গ্রেপ্তার করায় যুক্তপ্রদেশের সমস্ত কার্যভার রাজেন্দ্রনাথের কাঁধেই এসে পড়ল।

নিজেকে সর্বদা আত্মগোপন করে বৈপ্লবিক কাজ চালিয়ে যাবার জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি কূটকৌশলী রাজেন্দ্রনাথকে বহু ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হতো এবং সেই কারণেই দলের মধ্যে তাকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নামে জানত।

রাজেন্দ্র, চারু, জহরলাল ও যুগলকিশোর—সবগুলিই ছিল রাজেন্দ্রনাথের নাম। রামপ্রসাদ বিস্মিলের নেতৃত্বে কাকোরীতে ট্রেনের মেল ভ্যান থেকে সরকারী অর্থ লুট হলেও উক্ত ব্যাপারের উদ্যোগ আয়োজন সব কিছুই রাজেন্দ্রর তত্ত্বাবধানেই সুসম্পন্ন হয়েছিল।

এবং স্বয়ং রাজেন্দ্রনাথই চলন্ত গাড়ির চেন টেনে গাড়িকে মধ্যপথে থামিয়ে দেয়।

৯ই আগস্ট কাকোরীতে ট্রেন থেকে সরকারী অর্থ লুণ্ঠিত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর যুক্তপ্রদেশের পুলিস যখন রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে তার কাশীর বাড়ি তচনচ করছে, রাজেন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণেশ্বরের এক পড়ো বাড়ির নিভৃত কক্ষে বসে একাগ্র চিত্তে এবং একান্ত নিঃসংকোচেই বোমা তৈরীর প্রণালী শিক্ষা করছে।

বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করবার জন্য যাওয়ার কথা ছিল রামপ্রসাদের কিন্তু ঘটনাচক্রে পূর্বেই বলা হয়েছে রামপ্রসাদের সমস্ত চিঠিপত্র ইন্দুভূষণের নামেই যেত এবং ঐ সময় পুজোর ছুটি উপলক্ষে স্কুল বন্ধ থাকায় রামপ্রসাদের হাতে চিঠির মারফৎ সংবাদ না পৌঁছানয় রামপ্রসাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এবং ঐ একই কারণেই রামপ্রসাদ ও রাজেন্দ্রনাথের নামে একই দিনে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয় ও উভয়ের বাটি খানাতল্লাসী হয়। কিন্তু ধরা পড়ে রামপ্রসাদ।

কিন্তু কোথায় গেল রাজেন্দ্রনাথ। পুলিসের কর্তৃপক্ষ হন্যে হয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগল।

কলকাতায় শোভাবাজার স্ট্রীটে ও দক্ষিণেশ্বরের এক পুরাতন বাগানবাড়িতে ঐসময় বাংলার অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রমুখ কয়েকটি অত্যুৎসাহী তরুণ বোমা তৈরীর গোপন আড্ডা করে বোমা তৈরী করে চলেছে।

১০ই নভেম্বর ১৯২৫ সহসা একদিন রাত্রে সরকারী প্রলিস বাহিনী দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িটা অতর্কিতে ঘেরাও করে ফেললে।

রাজেন্দ্রনাথ ও অনন্তহরি মিত্র প্রভৃতি নজন তর্ণ বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলো। শোভাবাজারের বাড়িও প্র্লিস ঘেরাও করে প্রমোদরঞ্জন চৌধ্রীকে তার একজন সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার করল।

বোমা তৈরীর সাজসরঞ্জাম, অ্যাসিড প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ ও বোমা, রিভলভার ইত্যাদি অনেক কিছ্ই পেল প্র্লিস কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা নাম দিয়ে অভিয্ক্ত ও ধৃত বিপ্লবীদের বির্দ্ধে সরকার চার্জসীট্ তৈরী করে মহাসমারোহে বিচার প্রহসন আবার শ্র্ করে দিল।

রাজেন্দ্রনাথের নামে প্র্বেই কাকোরী মামলায় আনীত অভিযোগ অন্সারে লক্ষ্মৌতে তাকে প্রেরণ করা হল, দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হবার অব্যবহিত পরেই।

বিচারের ফলাফলটা তো কি হবে তা প্র্বাহ্নেই জানা ছিল।

তথাপি প্রহসনটুকু নির্বিঘ্নে শেষ করা হলো এবং ফাঁসীর আদেশ জারী হলো রাজেন্দ্রনাথের প্রতি।

ফাঁসীর সপ্তাহ প্র্বে রাজেন্দ্রনাথ একখানি পত্র লেখে তার এক আত্মীয়ের নিকটে।

স্দীর্ঘ ছয় মাস কাল ফাঁসীর প্রতীক্ষায় বরাবাঙ্ক ও গোণ্ডা জেলে অতিবাহিত করবার পর ফাঁসীর নির্দিষ্ট দিনটি যখন সে জানতে পারলে।

প্রিয়বরেষ্,

……কাল খবর পাইয়াছি যে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফাঁসি হইয়া যাইবে। আমাদের সকলের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য আমাদের যে সমস্ত পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধ্ অর্থদান করে, অন্যান্য উপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা সকলে আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করিবেন।……ভারতে দেশপ্রেমিক যাহারা আছেন তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি। 'বন্দেমাতরম্'।

আপনার—রাজেন্দ্রনাথ

তারও পরে ১৭ই তারিখে আর একখানা পত্র পাওয়া যায় রাজেন্দ্রনাথের লেখা প্র্বোক্ত নির্দিষ্ট ফাঁসীর দিনটি পরিবর্তিত হবার পর।

বন্ধ্!

……মৃত্যু কি! জীবনের র্পান্তর মাত্র। জীবন কি! মৃত্যুর অপর র্প ভিন্ন কিছ্ নহে। স্তরাং মান্ষ মৃত্যুভয়ে ভীতই বা হইবে কেন, কেহ মরিলে দ্ঃখিতই বা হইবে কেন? প্রাতঃকালে স্র্যোদয় হওয়া যেমন স্বাভাবিক,

মৃত্যুও তেমনি এক স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। History repeats itself—একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমাদের মৃত্যু ব্যর্থ হইবে না। সকলকে আমার অন্তিম নমস্কার জানাইবেন।

আপনার—রাজেন্দ্র

আমাদের মৃত্যু ব্যর্থ হবে না!

ভয় নাই! সত্যই তোমাদের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি।

আপন আপন জীবন দিয়ে সর্বত্যাগী সৈনিকের দল তোমরা যে রক্তলিপি লিখে রেখে গিয়েছো আজও তা আগুনের শিখার মত কালের বুক জুড়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে! চিরদিনই জ্বলবে এমনি! এর তো নির্বাণ নেই!

অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী তোমাদের হত্যা করতে পারেনি। তোমরা চিরজীবী। তোমরা মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই তো তোমাদের স্মরণ করবো আমরা চিরদিন। প্রণাম গ্রহণ করো!

দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে ও শোভাবাজারের বাড়ি থেকে ধৃত বিপ্লবী এগারজনের মধ্যে রাজেন্দ্র বাদে বাকী দশজনকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বোমা ইয়ার্ডে এনে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

আদালতে মামলা চলেছে।

পুলিসের কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগে তখন ডেপুটি সুপার ছিল শ্বেতাঙ্গের অন্যতম খয়েরখাঁ রায়বাহাদুর খিতাবধারী কুখ্যাত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রায়বাহাদুরের অসীম ধৈর্য। আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই।

মধ্যে মধ্যে রায়বাহাদুর প্রায়ই বোমা ইয়ার্ডে গিয়ে ধৃত বন্দী ঐ দশজন দুঃসাহসী মরণপণে কৃতসংকল্প বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আসতো।

আশা যদি নতুন কিছু গোপন সংবাদ যোগাড় করা যায়।

আকাঙ্ক্ষাই হলো রায়বাহাদুরের কাল।

বিপ্লবীরা গোপনে গোপনে পরামর্শ করলে সরকারের ঐ ডালকুত্তাটিকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

১৯২৬-এর ২৮শে মে সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আবছা অন্ধকারে চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুর অন্যান্য দিনের মত ঐ দিনও বিপ্লবীদের কিছুক্ষণ বিরক্ত করে বোমা ইয়ার্ড থেকে যেমন স্টেট্ ইয়ার্ডের বাইরে এসেছে অতর্কিতে কয়েকজন বিপ্লবী জেলের ওয়ার্ডারের হাত থেকে জোর করে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খুলে ফেললে।

এবং একটা লৌহদণ্ডের সাহায্যে রায়বাহাদুরের মস্তকটি চূর্ণবিচূর্ণ করে তার পরলোকের রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিল।

জেলের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল।

বহুকাল পরে শহীদ কানাইলালের হাতে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী নরেন

গোসাইয়ের মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয়বার জেলের মধ্যে আর একজনকে হত্যা করা হল।

সরকার বাহাদুর তার প্রিয় রায়বাহাদুরের হত্যায় খাপ্পা হয়ে উঠলো।

৯ই জুন বসলো সাড়ম্বরে আলিপুরে ট্রাইবুন্যাল তিনজন বিচারককে নিয়ে। পুনরায় শুরু হলো নতুন করে দশজন বিপ্লবীর পুর্ণবিচার।

যথাসময়ে রায় দেওয়া হলো।

অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদ চৌধুরী ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি দণ্ডাদেশ হলো: ফাঁসী। অবশিষ্ট সাতজনের দ্বীপান্তর।

কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছিল।

পুনর্বিচারে হাইকোর্টে বীরেন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন নিরপরাধ বিবেচিত হওয়ায় মুক্তি পেল কিন্তু অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর রইলো ফাঁসীরই দণ্ডাদেশ এবং বাকী তিনজনের দ্বীপান্তর।

বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের বুঝি শেষ নেই।

রাজরক্ত দানের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় আখর পড়েছিল পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাতেও তার সমাপ্তি হলো না।

বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে, ফাসীর দড়িতে ঝুলিয়ে, কালাপানীর পাড়ে দ্বীপান্তরিত করে, শত লাঞ্ছনা, শত নির্যাতনেও শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে কোনদিন রোধ করতে সক্ষম হয়নি।

হত্যা করেছে, নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত করেছে তারা মানুষের দেহকে।

কিন্তু Idea বা 'ভাব' তো মানুষের দেহের মত নশ্বর নয়।

তাকে তো হত্যা করা যায় না, গুলি মেরে বা ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে।

অগ্নিতেও তাকে দগ্ধ করা যায় না।

তাই তারা মরেনি, দগ্ধ হয়নি, নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

রক্তবীজের বংশের মত একের মৃত্যুতে সহস্র আবার নতুন করে নিয়েছে জন্ম।

অত্যাচারের রথচক্র যত জোরে চলেছে আগুনের শিখা ততই লেলিহ হয়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায়।

হয়ে উঠেছে অপরাজেয় পশুশক্তিকে সদম্ভে অস্বীকার করে।

চতুর্দিকে ভয়াবহ বিদ্রোহের সূচনা শ্বেতাঙ্গ সরকারকে আরো ক্ষিপ্ত আরো পর্যুদস্ত করে তোলে। একদিকে বিপ্লবের বহ্নি অন্যদিকে দেশবন্ধু মতিলাল প্রভৃতির স্বরাজ্যদল গঠন। সুচতুর শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন অনুযায়ী উক্ত শাসন ব্যবস্থা চালু হবার দশ বৎসর উত্তীর্ণ হবার আগেই ভারতে এসে হাজির হলো ১৯২৮-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই নগরীতে—সুবিখ্যাত (?) সাইমন কমিশন।

ভারতের জনগণ চিৎকার করে জানাল: যাও ফিরে যাও সাইমন! চাই

না! চাই না! Go back Simon!

দিকে দিকে উড়তে লাগল কৃষ্ণ পতাকা। করা হলো হরতাল।

অদম্য উৎসাহ কিন্তু সাইমনের বোম্বাই নগরীতে প্রত্যাখ্যাত হলেও নবীন উদ্যমে এসে হাজির হলো লাহোরে। ৩০শে অক্টোবর।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লাজপৎ রায়, ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ আলমের নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা বের হলোঃ Go back Simon! Go back! ওয়াপস যাও!

ফিরিঙ্গীর প্রতিনিধিরা ক্ষেপে গেলঃ এত অপমান! চালাও লাঠি!

অকস্মাৎ কোথা হতে কি হয়ে গেল, প্রচণ্ড লাঠির আঘাতে লাজপৎ বিশেষভাবে আহত হলেন।

সাশ্রুনেত্রে মূক বেদনায় দেশবাসী তাদের প্রিয় নেতার অচেতন রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহটি বড় আদরে কাঁধে করে গৃহে ফিরে এলো।

লালাজী সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না।

১৯২৮—১৭ই নভেম্বর এক দিনশেষে শেষ নিঃশ্বাসটুকু তাঁর বায়ুস্তরে মিলিয়ে গেল।

ভারতবাসী কমিশনকে বর্জন করে নিজেদের মুক্তির পথ নিজেরাই বেছে নিল।

রাজধানী দিল্লী নগরীতে সর্বদল সম্মেলনে নেতা পণ্ডিত মতিলাল ঘোষণা করলেনঃ ডোমিনিয়ান স্টেটাস্!

স্বায়ত্ত শাসন।

হয় সরকার তাদের (কংগ্রেসের) দাবী মেনে নেবে ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্যথায় আবার শুরু করা হবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন—করদান বন্ধ। কংগ্রেসী নেতাদের ঐ আপোস নীতিতে চরম পন্থীর দল কিন্তু সন্তুষ্ট হলো না।

মিথ্যে কেন এ প্রহসন?

আর ভয় দেখিয়ে নয়, ছিনিয়ে নাও!

শত্রুর সাথে করি গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা!

সুভাষ ও জহরলাল তো স্পষ্ট ঘোষণা করলেনঃ স্বায়ত্তশাসন নয়—পূর্ণ স্বাধীনতা! পূর্ণ স্বাধীনতা!

কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে দিগ্‌দেশ হতে বহু বিপ্লবী এসে জড়ো হয়েছিল।

তারা কেউ কংগ্রেসের ডোমিনিয়ান স্টেটাসের দাবীতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। একে তো গোপীনাথ, রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রভৃতির ফাঁসীর পর হতেই বিপ্লবীদের অন্তরের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল ক্রমে সেটাই লেলিহ হয়ে উঠবার উপক্রম হলো।

পরবর্তী কালের কয়েকজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেতা কংগ্রেসের ঐ সম্মেলনে একত্রিত হবার এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবার সুযোগ পায়।

সূর্য সেন, ভগৎ সিং ও যতীন দাস প্রভৃতির পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের

যোগাযোগ ঘটে।

অত্যল্পকাল পরেই চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহের ব্যাপক আগুন লেলিহান হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তার বীজ হয়ত ঐখানেই সূর্য সেনের মনের মধ্যে প্রথম ব্যাপ্ত হয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে!

চট্টগ্রাম ন্যাশনাল স্কুলের একান্ত নিরীহ গণিতের শিক্ষকটি—তাকে দেখে বুঝবারও উপায় ছিল না যে কি প্রচণ্ড একটা আগ্নেয়গিরির সম্ভাবনা ঐ শান্ত নিরীহ ভালমানুষটির বক্ষের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

সহসা একদিন যেমন বিসুভিয়াসের অগ্নিজাগরণে সমগ্র ইতালি শহরটা একেবারে তপ্ত লাভার স্রোতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনই একদিন সূর্য সেনের পরিচিতি নিয়ে চট্টগ্রামের নিশীথ শান্ত কালো আকাশটা রক্তরাঙা হয়ে উঠলো।

ভগবান সাদরে তাঁর বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করেছিলেন, ধরিত্রী দেবীও বুঝি ততোধিক সাদরে ও স্নেহে তাঁর ঐ স্নেহের দুলালটিকে আপন বক্ষোপরি স্থাপন করেছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু বৈপ্লবিক আগ্নেয় অনুষ্ঠানের প্রধান হোতা, মহানায়ক ছিল সূর্য সেন।

সূর্যের মত দীপ্তি নিয়ে প্রখর জ্যোতিতে অকস্মাৎ জেগে উঠে মিলিয়ে গেল। বিপ্লব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে এক মহা বিচিত্র বিস্ময়।

পূর্বে কেউ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি চট্টগ্রামবাসীরা যে, তাদেরই পাশে রয়েছে সৃষ্টির চরম এক অভুতপূর্ব বিস্ময়।

ভাবতেও পারেনি যে কত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে নিরীহ গোবেচারী শান্তশিষ্ট ঐ মানুষটির বুকের পাঁজরাগুলোর তলায় নিঃশব্দে ফল্গু ধারার মত।

দুই

কিন্তু আরও আগে ঐ পথেই এগিয়ে গিয়েছিল যে কয়টি শহীদ তাদের কাহিনীকে স্মরণ না করলে, তাদের স্মৃতিকে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে বিদ্রোহের ঐ ইতিহাস যে থেকে যাবে অসম্পূর্ণ।

ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও বাংলা তথা ভারতের দধীচি যতীন দাস।

কুক্ষণে লাহোরের পুলিস সুপার মিঃ স্কট ও তার কুখ্যাত সহকারী সাণ্ডার্স তাদের দলবলসহ বেপরোয়াভাবে লালাজি, ডাঃ সত্যপাল প্রভৃতির পরিচালিত শোভাযাত্রার উপরে লাঠি চালনা করে।

কাকোরীতে ট্রেন ডাকাতিকে (?) কেন্দ্র করে রামপ্রসাদ, রোশেন সিং, আসফাকউল্লা ও রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির জীবনান্ত ঘটালেও নিষ্ঠুর দানবীয় ভাবে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে—বিরাট সে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার সমূলে বিনষ্ট করতে পারেনি। তাদের গঠিত বড় সাধের বড় কল্পনার হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন তখনও গোপনে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নেতৃত্ব ঘাড়ে পড়েছে তখন ঐ অ্যাসোসিয়েশনের চন্দ্রশেখর আজাদের উপরে।

আরো একটি বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল সরকারের শ্যেনদৃষ্টি ও সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে পাঞ্জাবে : নওজোয়ান সভা।

শেষোক্ত দলের নেতা ছিল বিখ্যাত বিপ্লবী অজিত সিংয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কিষেণ সিংয়ের পুত্র : ভগৎ সিং।

ভগৎ সিংয়ের বিচারে অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ সুপার মিঃ স্কট ও তার সহকারী সাণ্ডার্সের মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

গোপনে তার প্রস্তুতি চলতে লাগল।

১৯২৮ সনের ১৭ই নভেম্বর লালাজীর প্রয়াণের ঠিক এক মাস পরে ১৭ই ডিসেম্বরের অপরাহ্ণে লাহোরে জনতাবহুল কোর্ট স্ট্রীটের মোড়ে অজ্ঞাত (?) বিপ্লবীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র মৃত্যু গর্জন করে উঠলো : দুড়ুম !···দুড়ুম !···

সচকিত হতভম্ব জনতার চোখের সামনে সাণ্ডার্স ও তার সঙ্গী চম্পালাল রক্তাক্ত কলেবরে পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল।

অত্যাচারীর বক্ষরক্তশোণিতে এতদিনে বুঝি লালাজীর অমর আত্মার স্মৃতি তর্পণ হলো, পুলিসের দল সতর্ক হবার পূর্বেই বিপ্লবী হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক ! Long live revolution ! ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ্ !

১৯২৮ সনের শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিগ্‌দেশাগত বিপ্লবীদের যে মিলন ঘটে এবং কংগ্রেসের তোষণ নীতিতে যে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি এবং একান্ত বাধ্য হয়েই যে তাদের নিজেদের মনোমত পথকে বেছে নিয়ে তারা দেশকে স্বাধীন করবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে মৃত্যুপণে অগ্রসর হয়েছিল তারই প্রথম আত্মপ্রকাশ দেখা গেল ১৯২৯ সনের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর আইন-পরিষদ (অ্যাসেম্বুলি) ভবনে প্রচণ্ড বোমার বিস্ফোরণে। পরিষদ ভবনে পরিষদেরা তখন Public Safety Bill আলোচনায় ব্যস্ত, সহসা যেন তারই প্রতিবাদকল্পে প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হলো।

কারো প্রাণহানি হলো না বটে তবে কয়েকজন আহত হলেন সামান্য।

হত্যার প্রচেষ্টা ও বিস্ফোরক আইনের বলে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত শ্বেতাঙ্গ সরকারদের হাতে ধৃত হয়ে তাদের সুবিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো।

কেমন করে না জানি ডালকুত্তার দল ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে পরের দিনই অর্থাৎ ৯ই এপ্রিল লাহোরের কাশ্মিরী বিল্ডিং অকস্মাৎ ঘেরাও ও খানাতল্লাসী করে বহু পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য হস্তগত তো করলই এবং শুকদেব ও কিশোরীলাল প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তারও করল।

আবার ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে এক মীরজাফর এগিয়ে এলো তার পূর্বপুরুষের ঋণশোধ করতে—যার ফলে, তার স্বীকারোক্তিতে শ্বেতাঙ্গ সরকার আবার বিরাটভাবে খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় করে অসীম উদ্যমে আর এক নতুন মামলার পত্তন করলে : লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিংকে নতুন করে টেনে এনে আবার অদ্ভুত কারিৎকর্মা, চক্রী শ্বেতাঙ্গ সরকার উক্ত মামলার অন্যতম দোষী সাব্যস্তে আদালতে দাঁড় করাল।

নতুন করে সকলের সঙ্গে আবার ঐ দুজনেরও বিচার প্রহসন শুরু হলো ইংরাজের আইনে, ইংরাজের আদালতে, ইংরাজের পদাশ্রিত বিচারকদের নিয়ে। বাংলার দধীচি যতীন দাসও এসে দাঁড়াল ধৃত হয়ে ঐ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত।

হয়ত বা গল্পকথা বা নিছকই কল্পনা কাহিনী, কবে কোন অতীত যুগে অসুরতাড়িত স্বর্গভ্রষ্ট হৃতসর্বস্ব লাঞ্ছিত দেবতার দলকে মুক্তি-অস্ত্র বজ্র নির্মাণের জন্য দধীচি মুনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে তাঁর অস্থিদান করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র সেই মৃত্যু বজ্র হেনে অসুরকুলকে ধ্বংস করে স্বীয় জন্মভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার এক তরুণ যুবকও ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণে তিন তিল করে সুদীর্ঘ ৬৩তম দিন ধরে দেশের মুক্তিযজ্ঞে প্রাণনির্যাসটুকু নিংড়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। ভারতের ম্যাক্‌সুইনী, ভারতের দধীচি প্রণাম তোমায়।

১৯০৪ সালে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস বঙ্কিমবিহারী দাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করে।

স্কুলের ছাত্রজীবন উত্তীর্ণ হয়ে যখন যতীন দাস বৃহত্তর কলেজী জীবনের দ্বারদেশে উপনীত, সারা ভারতব্যাপী তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে মথিত হচ্ছে। যুবক যতীনের সমস্ত অন্তর ঐ সময় হতেই চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে ওঠে, শৃঙ্খলিতা স্বদেশ জননীর মুক্তির জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে, দ্বিধা বা কোনরূপ সংকোচ না করেই যুবক এগিয়ে গেল: স্বদেশ আমার, জননী আমার।

কাজ শুরু হলো প্রথমে কংগ্রেসের আওতায়।

পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে যতীন দাস যখন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, যোগাযোগ ঘটলো তার বিপ্লবী শচীন সান্যালের সঙ্গে।

অভ্যুত্থান হলো দক্ষিণ কলকাতা তরুণ সমিতির।

বিপ্লবীর মনে বিপ্লবের বীজ ব্যাপ্ত হল।

দেশেও তখন গণ-আন্দোলনের ঢেউ অনেকটা চাপা পড়ে বিপ্লববাদ তলে তলে গোপনে আবার নতুন করে প্রসার লাভ করছে।

যতীন্দ্রনাথ পুরোপুরিই অগ্নিক্ষরা পথটাই বেছে নিল।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

গোপনে ঘরে ঘরে চললো আবার নবোদ্যমে প্রস্তুতি; বোমা গোলাগুলি রিভলবার যোগাড় হতে লাগলো। সংগৃহীত হতে লাগলো।

১৯২৪-এর ৫ই নভেম্বর গ্রেপ্তার হয়ে কিছুকাল যতীন্দ্রনাথকে কারাগারেও কাটাতে হলো।

সেই সময়েই একবার যতীন দাস শ্বেতাঙ্গ সরকারের নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কুড়িদিন অনশন করে, পরে সরকার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অনশন ভঙ্গ করে।

১৯২৯-এর বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির রংপুরে অধিবেশনে বিপ্লবী নেতারা আবার অনেকেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়।

পরবর্তীকালে খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রথম পরিকল্পনা বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচিত হয় ঐ সাক্ষাতের সময়েই।

যতীন দাসের উপরেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতে বিপ্লবীদলগুলির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

শুধু তাই নয় হাতবোমা তৈরী করবার দক্ষতাও ছিল যতীন দাসের।

এদিকে দিবালোকে জনবহুল লাহোরের রাস্তায় কুখ্যাত সাণ্ডার্সকে হত্যা করবার পর গোপনে পলায়ন করে ভগৎ সিং কলকাতায় চলে যায় এবং সেইখানেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ ও নানা আলোচনা চালায় কয়েকদিন ধরে।

ঐ সময়েই ভগৎ সিং দিল্লীর পরিষদভবনে বোমা নিক্ষেপ করবে বলে জানায়। এবং যথা সময়েই যে বোমার অগ্ন্যুদ্গার শোনা গিয়েছিল দিল্লী পরিষদ ভবনে এবং যার ফলে ধৃত হয়ে ভগৎ সিংয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় সে তো আগেই বলা হয়েছে।

দিল্লী আইন পরিষদে বোমা নিক্ষিপ্ত হবার পরদিনই লাহোরে 'কাশ্মিরী হাউস' খানাতল্লাসী হলো ও ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল।

ভীতত্রস্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষ্যাপা কুত্তার মত দেশের যুবকদের ধরতে শুরু করলো, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে।

অনেকের সঙ্গে যতীন দাসও ধৃত হলো।

ফলাও করে সরকার বাহাদুরের 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'র হলো পত্তন।

নিরুপায় বন্দীদের প্রতি সরকারী পদলেহী, উচ্ছিষ্টভোগী বেতনভুকদের শুরু হলো দুর্ব্যবহার, নির্যাতন ও পীড়ন আবার।

বন্দীদের মধ্যে অনেকেই বললে : আমরা অনশন করবো।

যতীন দাস কিন্তু প্রতিবাদ জানাল : বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ও কার্যের সেটা হবে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। অহিংস সংগ্রাম আমাদের নয়। আমরা চিরদিন সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চলেছি। সেই আমাদের উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ সমর্থন জানাল—আবার কেউ কেউ সমর্থন করলে যতীন দাসের প্রস্তাব। অবশেষে প্রতিবাদকল্পে অনশনই শুরু করা হবে স্থিরীকৃত হলো।

দেশের লোক স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনলো লাহোর জেলে একদল বন্দী বিপ্লবী অনশন শুরু করেছে, এবং তাদেরই মধ্যে একজন যতীন দাস।

একটি দুটি করে দিন যায়। অগণিত দেশের নরনারী বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় শোনে যতীন দাসের শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে কিন্তু তথাপি প্রতিজ্ঞা তার ভঙ্গ হয়নি, সরকার পক্ষের অনশন ভঙ্গ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জোর করে নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে আহার্য ভরে দিতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো। খাদ্যবস্তু পাকস্থলীর বদলে ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয়ে দারুণ যন্ত্রণা

দেখা দিল।

জ্ঞান লুপ্ত হলো যতীনের।

দিন অতিবাহিত হয়ে চলেছে একটির পর একটি। দেহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে যায়।

মাংসপেশী শুকিয়ে লীন হয়ে যায়। নাড়ীর গতি ক্ষীণ, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ। ভাইয়ের শয্যার পাশে কিরণ দাস এসে বসল, তাও একটি সর্তে: জ্ঞান বা অজ্ঞান কোন অবস্থাতেই তাকে যেন খাদ্য ও পানীয় না দেওয়া হয়।

পাছে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কখন জল পান করবার কোন দুর্বল মুহূর্তে মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগে নিজহাতে তাই জলের কলসীটা পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছিল যতীন।

একটি দুটি করে বাহান্ন দিন গত হলো। বাঁচবার আর কোন আশাই নেই।

মৃত্যুর কালোছায়া নেমে এলো। তথাপি প্রতিজ্ঞায় ধীর স্থির!

মৃত্যুও বুঝি অসঙ্কোচে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে দুয়ারের কাছে। আরো দশটা দিন কেমন করে যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

বাষট্টিতম দিবস। দেশের অগণিত নরনারী বালক যুবা কিশোর উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে প্রতিমুহূর্তে কণ্টকিত হচ্ছে।

নাড়ীর গতি আরো ক্ষীণ। আরো দুর্বল। প্রাণ বুঝি আর বক্ষপিঞ্জরে থাকে না!

চৌষট্টিতম দিবস, ১৯২৯—১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

সকাল হতেই দেখা দেয় হিক্কা। অবয়ব ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। হৃৎপিণ্ডের গতি এই বুঝি থেমে যায় এত ক্ষীণ। দেখতে দেখতে শেষ সময়: মহাপ্রয়াণের লগ্ন কাছে ঘনিয়ে এলো।

মধ্যাহ্নসূর্য আকাশে এসে ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াল: স্বর্গের দেবদূতেরা এলো।

রথ প্রস্তুত।

ক্ষীণ কণ্ঠ একটিবার শুধু কম্পিত হলো: বন্দেমাতরম্।

শেষ! সব শেষ!

মৃত্যুহীন প্রাণটুকু নিঃশেষে দান হয়ে গেল।

সাশ্রুনেত্রে জেলের কর্তৃপক্ষ ক্ষীণ অস্থিচর্মসার মৃতদেহটি কিরণ দাসের হাতে তুলে দিল।

বিদ্যুৎ গতিতে সংবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল।

শোকে দেশবাসী মুহ্যমান হয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাল নবযুগের নব দধীচিকে।

লাহোরের কারাপ্রাচীরের বাইরে বিরাট জনতা তাদের প্রিয় যতীনকে দেখবার জন্য উদগ্রীব ব্যাকুল অশ্রুসজল চক্ষে অপেক্ষা করছে।

পাঞ্জাবের জননেতারাও এলেন।

শবদেহ বহন করে সকলে যখন জেলের ফটকের বাইরে চলেছে, দরজার উপরে

দাঁড়িয়ে পুলিস সুপার শ্বেতাঙ্গ হ্যামিল্টন হার্ডিং।

তারও চোখের পাতা দুটো সজল হয়ে ওঠে।

নিঃশব্দে মাথার টুপি খুলে মাথা নোয়ায় শ্বেতাঙ্গ।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বসেছে: লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার (?) করতে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলেই। বিচারই বটে!

চেয়ারম্যান কোল্ডস্ট্রিম শ্বেতাঙ্গ বিচারক।

শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত ভাবেই একদিন—১৯৩০-এর ১১ই সেপ্টেম্বর চরম নিষ্পত্তির কথা সগৌরবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হলো।

ভগৎ সিং, শুকদেও, রাজগুরু ও শিবরামের মৃত্যুদণ্ড।

সাতজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বাকী দুজনের একজনের সাত বৎসর ও একজনের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড।

কেউ কেউ আপীলের কথা তোলায় তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল ভগৎ সিং: আপীল আবার কি! আর কার কাছেই বা দয়া ভিক্ষা! আমরা কোন অন্যায়ই করিনি। তবু ওরা আমাদের দণ্ড দিয়েছে, নেবো মাথা পেতে সেই দণ্ড! অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই আমাদের প্রতিবাদ! অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই আমাদের জেহাদ!

শুধু তাই নয়, ভগৎ সিং বললে: ফাঁসী কেন! গুলি করে মারো আমাদের। মৃত্যুই দেবে যখন, অন্তত ইচ্ছামৃত্যু দাও! বুক পেতে দাঁড়াচ্ছি, কর গুলি!

কিন্তু সরকার রাজী হলো না!

বললে: না, ফাঁসী!

তবে ফাঁসীই হোক! হেসে হেসে পরবো ফাঁসী! দেখবে চেয়ে দেখো।

মৃত্যুকে মোরা জয় করেছি—তবে মৃত্যুরে কি দেখাও ভয়!

তথাপি দেশের জনগণ চেষ্টার কসুর করলে না।

মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টাও নিষ্ফল হলো।

১৯৩১—২৩শে মার্চ। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া চারিদিকে ঘন হয়ে এলো।

আসছে শান্ত কালো রাত্রি!

কালো আকাশপটে একটি দুটি করে নক্ষত্র সবে তাকাতে শুরু করেছে মিটিমিটি।

মৃত্যু সেলের লোহদ্বার উদ্ঘাটিত হলো।

'কে! ও তোমরা! প্রস্তুত, চলো!'

সবার অজ্ঞাতে অত্যাসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে নিঃশব্দে শ্বেতাঙ্গের দল লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের ফাঁসীর নিভৃত গোপন কক্ষে, নিষ্ঠুর পৈশাচিক জিঘাংসার ঘৃণ্যতম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলো।

ভগৎ সিং, শুকদেও ও রাজগুরুর শেষ নিঃশ্বাস কালো অন্ধকার কারাকক্ষ ভেদ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল, কালো আকাশে রক্তের ছোপ ধরিয়ে! লাল রক্ত!

ওরে পাষাণী! আরো কত বলিদান দিতে হবে! কত প্রাণ দান আরো বাকী! ছিন্নমস্তার রক্ততৃষা কি মিটবে না কোনদিন!

* * *

মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা সুষ্টিধর তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সেতারের সুরঝঙ্কারে।

সহসা ঝন্ ঝন্ করে একটা শব্দ তুলে সুর কেটে গেল।

সেতারের তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

সতীর সেতারের তার ছিঁড়ে গেল।

শোনা গেল ঐ মুহূর্তে একটা প্রাণান্তকর উচ্ছ্বসিত কাশির দুরন্ত বেগ। খঙ্ খঙ্ শব্দে বিনয় কাশছে।

বুকের পাঁজরাগুলো বুঝি দুরন্ত কাশির বেগে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

'সতী!'

হঠাৎ সেতারের তারটা ছিঁড়ে যাওয়ায় সতী কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

একটু আগের সুরের ঝঙ্কারটা যেন তখনও ঘরের বায়ুস্তরে একটা ভাষাহীন বেদনার অনুরণন তুলে চলেছে।

তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল বিনয়ের কাশির শব্দটা।

চমকে উঠলো সতী: কি হলো!

কাশতে কাশতে এক ঝলক তাজা লাল রক্ত বিনয় সতর্ক হবার পূর্বেই শুভ্র উপাধানের ওয়াড়টা রাঙা করে ভিজিয়ে দিল।

সতী এগিয়ে এসে বিনয়ের পাশটিতে একেবারে বসে পড়ে।

বিনয় ক্লান্ত মাথাটা এলিয়ে দেয় সতীর কাঁধের উপরে।

হাঁপাচ্ছে তখনও সে। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে।

সুষ্টিধরও সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

সতী দু হাতে বিনয়কে বুকের মধ্যে তখন নিবিড় করে টেনে নিয়েছে। চক্ষু দুটি তার ক্লান্তিতে নিমীলিত।

রক্তে সিক্ত লাল উপাধানটার প্রতি নজর পড়ে সুষ্টিধরের।

'আবার রক্ত পড়ছে বুঝি!'

সতী সুষ্টিধরের ব্যাকুল প্রশ্নের কোন জবাবই দেয় না। স্থির নির্বাক পাষাণের মত বিনয়ের মাথাটা বুকের উপরে নিবিড় করে আঁকড়ে যেমন বসেছিল তেমনিই বসে রইলো।

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সতীর সীমন্তের সিঁদুর।

শয্যার উপরে উপাধানটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে ভিজে।

সুষ্টিধর কিছুক্ষণ নির্বাক স্থাণুর মত ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে এক পা এক পা করে আরো কাছে এগিয়ে এলো।

'বিনয়কে শুইয়ে দাও সতী!' বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে সুষ্টিধর বলে।

তথাপি সতী নিরুত্তর। স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে সতী সামনের দিকে তাকিয়ে।

মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

কাঁপছে ভীরু আশঙ্কায় শিখাটি থেকে থেকে।

'সতী!'

সতী নিরুত্তর।

'সতী বিনয়কে শুইয়ে দাও!'

'তুমিই শুইয়ে দাও দাদা! তুমিই শুইয়ে দাও—'

ঝরঝর করে অশ্রু নেমে এলো সতীর চিবুক ও গণ্ডকে প্লাবিত করে।

চমকে উঠে সুষ্টিধর ঝুঁকে পড়ে বিনয়ের দেহটা স্পর্শ করতেই সমস্ত ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

সতীর বুকের উপর থেকে বিনয়ের দেহটা টেনে নেবার চেষ্টা করতেই শিথিল দেহটা সুষ্টিধরের হাতের উপরে এলিয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে অতি যত্নে, পরম স্নেহে সুষ্টিধর সেই লাল রক্তে ভিজে উপাধানটার উপরেই বিনয়কে শুইয়ে দিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সস্নেহে ডান হাতখানি সতীর পিঠের উপরে রাখতেই সতী মুখ তুলে তাকাল সুষ্টিধরের দিকে।

'সতী!'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ তুমি দাদা! কতবার খোঁজ করেছে!'

খোলা বাতায়ন পথে এক ঝলক নৈশ বায়ু এসে ঘরের ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো ফর্ ফর্ করে ওলোটপালোট করে দেয়।

সেই দিকে তাকাতেই সুষ্টিধরের চোখে পড়ল ১৫ই আগস্ট তারিখটায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগা বুলানো। আজ ২রা আগস্ট।

ফিরে তাকাল সুষ্টিধর আবার সতীর মুখের দিকে।

নিঃশব্দ অশ্রু নির্ঝর সতীর গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

'কাঁদিস না ভাই! কাঁদিস না—'

'না দাদা কাঁদিনি তো। কিন্তু ১৫ই আগস্টের যে এখনো তের দিন বাকী দাদা!'

'তের দিন নয় সতী! হয়ত এখনো একটা যুগ! রক্ত তপস্যার এও শেষ নয় বোন।'

এত অল্পেই তো এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। এ অজ্ঞতা, এ ভীরুতার ক্ষমা মিলবে না।

সতী যেন চীৎকার করে ওঠে: 'এখনো অল্পই তুমি বলবে দাদা!'

'হ্যাঁ! তাই! তাই বলবো! আমরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছি সে তো মাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে মুষ্টিমেয়র সুবিধা-যোগ নয়! সে যে সমস্ত ভারতবাসীর মুক্তির স্বপ্ন। সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচবার অধিকার। এত অল্পের জন্য সামান্য ঐ প্রাপ্তিটুকুর জন্যই কি বিনয়ের দল এমনি করে বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে গেল!

এখনো! এখনো যে অনেক বাকী! এই শেষ নয়! ১৫ই আগস্টই শেষ নয়!'

এই যদি শেষ নয় তবে শেষ কোথায় !

কোথায় কোন্ অন্ধকার তিমির গর্ভে সেই জ্যোতির্ময় ভানু !

চল ! চল এগিয়ে চল !

বিপ্লবীর বিশ্রাম নেই !

থামলে তাকে তো চলবে না—যতীন দাস, ভগৎ সিং, শুকদেও ও রাজগুরুর জীবন দানই বিদ্রোহী ভারতের শেষ পর্ব নয় !

ওদের রক্তদানই বিপ্লবের শেষ পৃষ্ঠা নয় !

তাদের যে শবভস্ম গঙ্গা ও শতদ্রু নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাটি তা শোষণ করে নিল। মাটিই আবার তা ফিরিয়ে দিল।

মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের কলাবাগান বস্তীর মধ্যে একটা নিভৃত বাড়ির কক্ষে নিঃশব্দে যে বিপ্লব প্রস্তুতি চলছিল, শ্বেতাঙ্গ সরকারের কাছে বেশি দিন আর সেটা গোপন থাকল না। দুঃসাহসী কয়েকজন বিপ্লবী নিভৃতে বস্তীর ঐ বাড়িটার মধ্যে সংগোপনে বিপ্লবের প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে বোমা তৈরী করছিল।

১৯২৯ সনের ১৮ই ডিসেম্বর শীতের এক রাত্রিশেষে তখনও ভোরের আলো ভাল করে প্রকাশ পায়নি।

কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের প্রান্তে ভোরের শুকতারা জ্বলছে।

সশস্ত্র পুলিসের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

গুপ্তচর মুখে পুলিসের কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্ণেই সমস্ত গোপন সংবাদ অবগত হয়েছিল।

সশস্ত্র পুলিস বাড়িটা চারপাশ হতে ঘেরাও করে ফেললে।

মচমচ শব্দে জুতো পায়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে পুলিস প্রবেশ করল।

নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী ও রমেন বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল, তারা তিনজন তখন ঐ ঘরের মধ্যেই ছিল।

সমস্ত বাড়িটা খানাতল্লাসী করে কতকগুলো লাল ইস্তাহার ও বোমা তৈরীর ফরমুলা সরকার বাহাদুরের প্রমাণ হিসাবে হস্তগত হলো।

পুলিসের দল ওদের তিনজনকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে ঠিক এমনি সময় সুধাংশু দাসগুপ্ত ঐ বাড়িতে এসে হাজির। বেচারী কিছুই জানত না এবং পূর্বাহ্ণে কোন কিছুই সন্দেহ করতে পারেনি।

সুধাংশু দাসগুপ্তর দেহ অনুসন্ধান করে একটা বোমা ও একটা গুলি ভর্তি রিভলভার পাওয়া গেল !

আশপাশের আরো কয়েকটি বাড়ি অনুসন্ধান করে পুলিস বোমা তৈরীর কিছু সরঞ্জামও আবিষ্কার করলে।

সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাস ও সুধাংশু দাশগুপ্ত ছাড়াও আরো শচীন কর, মুকুল সেন, জগদীশ চ্যাটার্জী ও নির্মল দাশ প্রভৃতি আরো বত্রিশজন যুবককে ধৃত করে শ্বেতাঙ্গ সরকার নতুন করে নবোদ্যমে আবার একটি

বিরাট মামলা খাড়া করলো। নাম দেওয়া হলো তার: মেছুয়াবাজার বোমার মামলা।

আলিপুরে স্পেশাল ট্রাইবুনালের হাতে ঐ সব অভিযুক্তদের বিচারের প্রহসনটা তুলে দিল সরকার বাহাদুর।

দীর্ঘদিন ধরে বিচার প্রহসন শেষ করা হলো।

নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশীর সাত বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড। সুধাংশু দাশগুপ্ত ও রমেন বিশ্বাসের পাঁচ বৎসর করে কারাদণ্ড হলো।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলার উপরে যবনিকাপাত হলো।

ঐ সময়েই—১৯২৯-এর ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরউইনের বিপ্লবীদের দ্বারা একবার প্রাণ নাশের চেষ্টা হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বিপ্লবীদের এবং সৌভাগ্য লর্ড বাহাদুর আরউইনের তিনি রক্ষা পান, কেবল মাত্র দুজন আর্দালী বোমা বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নয়া দিল্লীর মাইল খানেক দূরবর্তী ট্রেনের লাইনের নিচে বোমা স্থাপন করে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করে বিপ্লবীরা, কিন্তু বিস্ফোরণের ব্যাপারে ও হিসাবে সামান্য একটু গোলযোগ ঘটে গেল।

যার ফলে লাট বাহাদুর অক্ষতই রইলেন।

ভারতের আকাশে ইতিমধ্যে যে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল অনেকেই সে সংবাদ পায়নি।

বস্তুত সাইমন কমিশনের ব্যর্থতা ও তার প্রতি ভারতবাসীর তীব্র অনাস্থা ও অসন্তোষ, লাহোরে জনতার প্রতি বেপরোয়া লাঠি চালনা ও যার ফলে লালাজীর আহত হয়ে রোগশয্যা গ্রহণ ও মৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যে দুর্নিবার ঝড়ের কালো মেঘ আবার ভারতের আকাশে বাতাসে অত্যাসন্ন হয়ে আসছে লর্ড আরউইনের বুঝতে সেটা দেরী হয়নি। লর্ড আরউইন বুঝতেই পারছিলেন নানা কারণেই তলে তলে আবার বিপ্লবীদের হাতের খড়্গ কৃপাণ ঝলকে উঠছে।

যাহোক আপাততঃ একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে চারিদিকে সত্বর বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠবে।

বিলাতে ঐ সময় শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল এবং মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী ও মিঃ ওয়েজউড বেন ভারত সচিব অর্থাৎ বন্ধু।

পূর্বে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ভারতবাসীর প্রতি দরদে অভিভূত হয়ে 'অ্যাওয়েকনিং অফ ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ 'ভারত জাগরণ' সম্পর্কে একখানা কিতাবও রচনা করেছিলেন—সেই কারণেই ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যখন মন্ত্রীত্বের আসনে এসে উপবিষ্ট হলেন ভারতবাসীর তার প্রেমে বা তার সুবিচারের প্রতি আস্থা স্থাপন করা ও কিছুটা আশা পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক। এবং শুধু তাই

নয় বড় লাট বাহাদুর লর্ড আরউইন সাহেবও জুন মাসের শেষেই চার মাসের দীর্ঘ ছুটি নিয়ে বিলাত যাত্রা করলেন।

ইতিপূর্বে ১৯১৭ খৃঃ মহাত্মা গান্ধী আহমদাবাদে একটি শ্রমিক সংঘ গঠন করেছিলেন। কিন্তু প্রথমটায় বিশেষ কোন গঠনমূলক কার্য হয়ে ওঠেনি, অসহযোগ আন্দোলন কালে রাষ্ট্রীয় তদানীন্তন নেতারা নিজ নিজ অঞ্চলে তাদের —শ্রমিকদের সংঘবন্ধ করতে চেষ্টা করেন। ১৯২১ সনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং বোম্বাই নগরীতে হয় ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ঝরিয়ায় এবং তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে ১৯২০ সনে—সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ঐ সময়েই বোম্বাই, জামসেদপুর ও কলকাতার উপকণ্ঠের কারখানাগুলিতে কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এবং শ্রমিক নেতাদের মধ্যেও নরম ও চরমপন্থী দু দল দেখা দেয়। এক দল বললেন, শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অন্য দল বললেন, এক কথায় রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট তন্ত্র বা কম্যুনিজমই তাদের মন্ত্র—অর্থাৎ দল, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অন্যথায় শ্রমিক সমাজের উন্নতির কোন আশাই নেই। ফলে যা হবার তাই হলো, দ্বিতীয় পন্থিদের মধ্যে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ (?) দেখে সরকার বললে ঃ বেআইনী। ঐ নীতি চলবে না। বন্ধ কর।

শুরু হয়ে গেল আবার ধরপাকড়।

১৯২৯-এর ২০শে মার্চ সরকার বাহাদুর পাঞ্জাব, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের শত শত গৃহে ব্যাপক খানাতল্লাসী করে তদানীন্তন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আটজন সদস্যের সঙ্গে বিভিন্ন স্থান হতে ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে। এবং ১৯২৯ সনের ১৫ই মার্চ ইটনের প্রদত্ত রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে ভারত সরকার সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট বলশেভিক তন্ত্র প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্নে মনোগত এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়।

ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতে কম্যুনিজম প্রচার ও সোভিয়েৎ রাশিয়ার আদর্শে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবৈধ প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করে ১৯২৯ সালের ১১ই জুন মীরাটের অ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হোয়াইটের এজলাসে বিরাট এক ষড়যন্ত্র মামলার পত্তন করল।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

মীরাটেই নাকি ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি ছিল এই কারণেই ঐ মামলার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামকরণ করা হলো।

আরউইন সাহেব বিলাতে গিয়ে ভারতের সর্বত্র অসন্তোষের বহ্নি ও বিপ্লবান্দোলনের প্রসারের কথা কর্তৃপক্ষদের কর্ণগোচর করলেন এবং ভারতের ছদ্মবেশী হিতৈষীর দল স্থির করলেন একটা গোলাকার টেবিলের চারপাশে সকলে মিলে বসে অচিরাৎ ভারতের দুঃখ কষ্ট ও অভাব অভিযোগ নিরসনকল্পে একটি বৈঠকে উপবিষ্ট হবেন। সাধু ! সাধু !

গোলটেবিল বৈঠক!

২৬শে অক্টোবর আরউইন সাহেব বিলাত হতে ফিরে এলেন এবং ৩১শে অক্টোবর দরদস্তুরা গলায় এক ঘোষণা করলেন : ভারতবাসী মা ভৈষী! আর ভয় নাই! শুন্‌!...

ভারত শাসনের আদর্শ ডোমিনিয়ান স্টেটাস, ভাবী শাসনতন্ত্রে বৃটিশ ভারত ও রাজন্য ভারতের মধ্যে সংযোগ সাধনের আবশ্যকীয়তা এবং সেই সাধু উদ্দেশ্যেই ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে লণ্ডনে একটি মহা সম্মেলনের ব্যবস্থা আমরা করছি শীঘ্রই।

বিবৃতি প্রকাশের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লীতে উপস্থিত কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী নেতারা একত্রে মিলিত হয়ে আলোচনা করে লাট বাহাদুরকে তাঁর সদিচ্ছার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই জানালেন, সবই বুঝলাম তবে ব্যাপারটা অনুগ্রহ করে আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিন আমাদের। স্পষ্ট করে জানান আপনাদের ঐ মহতী সভার উদ্দেশ্য সত্য সত্যই ডোমিনিয়ান স্টেটাসের অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচনা করাই কিনা!

দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ।

ভারত সচিব ওয়েজ উড্‌বেনের বিবৃতিতেই সব স্পষ্ট হয়ে গেল : ভারত শাসন নীতির কোন পরিবর্তনই হয়নি এবং বর্তমানে হবেও না, বরং ১৯১৭ সনে যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল তাই রয়েছে এখনও বলবৎ।

ধীরে রজনী ধীরে।

এত দ্রুত নয়। ধাপে ধাপে—শনৈঃ শনৈঃ।

ঘাবড়াবার অবশ্য কোন কারণ নেই, শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দেওয়া হবে এবং সেই ধাপ অবশ্যই নির্ণীত হবে বিদ্বান, বিচক্ষণ ভারতের প্রকৃত সুহৃদ পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারাই।

এতএব—

সব গোলমাল হয়ে গেল। ভোজবাজীর আসল ফাঁকিটুকু আর কারো কাছেই অস্পষ্ট রইলো না।

শ্বেতাঙ্গীয় বুজরুকীতে ভুললে না দেশবাসী!

তোমার কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন আর নয়। আর নয়।

২৩শে ডিসেম্বর লর্ড আরউইনের যে প্রাণনাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয় ঐ দিনই তিনি ভারতের ভাবী শাসন ব্যাপার সম্পর্কে দেশের তদানীন্তন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য সফর থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

১৯৩০ সনের প্রারম্ভেই দেশের মুক্তিযজ্ঞের প্রতিনিধিবৃন্দ নববর্ষের শুভ-লগ্নে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন।

২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' সর্বত্র প্রতিপালন করা হবে সাব্যস্ত হলো।

১৯৩০ সনের ছাব্বিশে জানুয়ারী থেকেই প্রতি বৎসর জাতি স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসতে লাগল।

১৯২৫ সনে দেশী বস্ত্রের উপর থেকে সরকার ট্যাক্স তুলে দেয় ও বিদেশী বস্ত্রের উপরে ট্যাক্স-শুল্ক কিছু বৃদ্ধি পায়।

১৯২৭-এ বাট্টার হার যে ভাবে নিয়মিত হলো তাতে করে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য শতকরা সাড়ে বার টাকা কমে গেল।

ভারতবাসীর হলো ঐ ব্যাপারে সমূহ ক্ষতি কারণ বিলাত থেকেই বিদেশী বস্ত্র তখন ভারতে আমদানী হচ্ছিল।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে মিশর ও মার্কিনী তুলার উপরও শুল্ক ধার্য করা হলো।

অথচ ঐ তুলার দ্বারাই সুতো প্রস্তুত করে বিলাতের ল্যাংকাশায়ারের অনুরূপ বস্ত্র এখানে ভারতেই তৈরী করা যেতে পারত।

মালব্যজী এর প্রতিবাদে সদস্যপদ ত্যাগ করলেন।

২রা মার্চ লাট আরউইনকে মহাত্মা তাঁর সংকল্পের কথা জানিয়ে এক পত্র লিখলেন।

পরবর্তী ১২ই মার্চ ঊনআশী জন আশ্রমবাসীদের নিয়ে তাঁর আশ্রম সবরমতী থেকে দীর্ঘ দুই শত মাইল দূরবর্তী, সমুদ্র তীরস্থ গ্রাম ডাণ্ডিতে পদব্রজে গিয়ে সরকারের তদানীন্তন বলবৎ লবণ আইন ভঙ্গ করে তিনি আইন অমান্য ব্রত উদযাপন করতে মনস্থ করেছেন।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

দেশে লবণ তৈরী তখন আইনবিরুদ্ধ ছিল।

নিত্যকার দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নুন। সেই নুন বা লবণটুকু পর্যন্ত তৈরী করবার দেশবাসীর স্বাধীনতা ছিল না।

সরকার নিজ হাতে তৈরী করে নিমকটুকুও খেতে দেবে না পাছে নিমক-হারামীর পাপে লিপ্ত হই আমরা।

মহাত্মা বড়লাট বাহাদুরকে লিখিত তাঁর পত্রের কোন জবাবই পেলেন না।

দ্বিতীয়বার পত্র দিলেন—জবাব এলো হতাশাব্যঞ্জক।

তিনি জানালেন মহাত্মা যদি অন্যায় করবেন বলে মন স্থির করেই থাকেন তিনি দুঃখিত ছাড়া আর কি হতে পারেন।

আহা সত্যিই তো!

মহানুভব ব্যক্তি! দুঃখিত হবেন বৈকি!

কিন্তু সংকল্পে অচল অটল মুক্তিসাধক এবারে আর পত্র দিলেন না। কেবল প্রত্যুত্তরে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করলেন তাঁর জবাবটুকু :

On bended knees I askeı for bread and I received stone instead.

ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে মুষ্টিভিক্ষা চেয়েছিলাম কিন্তু প্রতিদানে তুমি

দিলে তণ্ডুল নয় একমুষ্টি পাথর।

কিন্তু তিনি এতে আশ্চর্য হননি। স্পষ্টই সে কথা তিনি জানালেন :

The viceregal reply does not surprise me. But I know that the Salt-tax has to go and many other things with it if my letter means what it says.

আরো লিখলেন :

I contemplate a course of action which is clearly bound to involve violation of law and danger to public peace. Inspite of the books containing rules and regulations the only law that the nation knows is the will of the British administrators. The only public peace the nation knows is the peace of the public prison. India is one vast prison house. I repudiate this law and regard it as my sacred duty to break the mournful monotony of compulsory peace that is chocking the heart of the nation for want of free vent.

দেশের মুক্তি-সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে মহাত্মার লবণ আইন ভঙ্গ পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও বিজয় ঘোষণার স্বাক্ষর হয়ে রইলো বুকভাঙা ঐ কথাগুলো।

কথাই নয় কেবল। কেবল কথার মাল্য রচনাই নয়।

পরাধীন দেশবাসীর মর্মভাঙা বেদনামথিত জমাট দীর্ঘশ্বাস।

তারপর এলো সেই পরম শুভক্ষণটি!

১৯৩৩-এর ১২ই মার্চ।

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন উম্মোচন করে প্রথম ভোরের রাঙা আলো প্রকাশ পেল।

দুয়ার ভেঙে আবির্ভূত হলেন রক্ত জ্যোতির্ময়!

মহাত্মা সবরমতী আশ্রমের দুয়ার খুলে পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন! কম্বুকণ্ঠে সত্যাগ্রহী সন্ন্যাসী দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন : চল। চল। সময় আগত ঐ। সরকার আমাদের প্রতি এতকাল ধরে বহুবিধ অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম করেছে। লবণ তৈরী করবার অধিকারটুকু হতে পর্যন্ত বঞ্চিত করে আমাদের বঞ্চনাই শুধু করেনি, করেছে অন্যায় জুলুম। প্রকৃতি সমুদ্রের জলে দিয়ে রেখেছেন প্রচুর লবণ, কেন তা থেকেও, প্রকৃতির অবারিত দান থেকেও বঞ্চিত হবো আমরা দেশবাসী কোন্ অধিকারে, কোন্ শাসনে!

২১শে মার্চ আহমদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হলো মহাত্মা কর্তৃক লবণ আইন ভঙ্গের পরই সর্বত্র দেশের

লবণ প্রস্তুত করবার আয়োজনের যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

দীর্ঘ দুইশত মাইল পথ।

অগ্রে অগ্রে চলেছেন এক অর্ধনগ্ন ফকির সন্ন্যাসী, হাতে একটি মোটা লাঠি। পশ্চাতে চলেছে তাঁর অগণিত জনতা।

চল! চলরে চল!

কিসের ভয়! কিসের শংকা! হবে। হবে জয় নাহি ভয়।

দেশে দেশে নগরে নগরে সাড়া পড়ে গেল। চারিদিকে লবণ প্রস্তুত করা যাতে সম্ভব হয় তারই আয়োজন চলতে লাগল।

সরকার দেখলো যতই অহিংসা অভিযান হোক তথাপি এই আয়োজনের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে প্রচণ্ড বহ্ন্যুৎসবের এক অবশ্যম্ভাবী স্ফুলিঙ্গ।

একবার যদি প্রকাশ পায় দিকে দিকে লেলিহানশিখার আগুন ছড়িয়ে পড়বে। - সরকারের দমননীতির খাকতি ইতিপূর্বেও ছিল না, আরো প্রচণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করল ঐ সঙ্গে।

মীরাট মামলার অভিযুক্তেরা মাত্র একজন বাদে, দায়রায় সোপর্দ হয়েছে। ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বসু এগারজন সহকর্মী সহ নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

নবোদ্যমে সরকারের গ্রেপ্তার পর্ব শুরু হলো ব্যাপক ভাবে সর্বত্র।

কলকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলাল ধৃত ও দণ্ডিত হলেন।

মহাত্মা সংকল্প করলেন ডাণ্ডিতে লবন আইন ভঙ্গ করে ধরশনার লবণ গোলা অধিকার করবেন।

ধূর্ত-চক্রী সরকার দেখলে এর পরও গান্ধীজীকে না গ্রেপ্তার করা মানেই বিদ্রোহের আগুনকে আরো ব্যাপক ভাবে ব্যাপ্ত হতে দেবার সুযোগ দেওয়া।

অতএব তাঁকে গ্রেপ্তার করাই স্থির হলো।

এদিকে ৫ই এপ্রিল মহাত্মা তাঁর দলবল সহ সাগরতীরে গিয়ে পেঁছালেন।

৬ই এপ্রিল রক্তসূর্য জলশয্যা ছেড়ে তখন উদয়ের পথে।

সেই রক্তমুহূর্তে নবারুণকে সাক্ষী রেখে মহাত্মা সমুদ্রস্নান সমাপ্ত করে সত্যাগ্রহী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বেলা ৮-৩০ মিঃ-এর সময় একটি ক্ষুদ্র স্তূপ হতে একতাল লবণ তুলে দিয়ে লবন আইন ভঙ্গ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলেন।

চারিদিকে দেশের সর্বত্র শুরু হয়ে গেল লবণ তৈরী।

শুরু হলো সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ উৎসব দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে। ক্ষেপা কুকুরের মত সরকারও তার দলবল নিয়ে, ধারালো দাঁত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনসাধারণের উপরে।

বেপরোয়া ভাবে চলতে লাগল বন্দুকের গুলি ও লাঠির আঘাত অহিংস সংগ্রামীদের উপরে।

সরকারের লৌহ কারাগার ভরে উঠতে লাগল।

দলে দলে দিতে লাগল প্রাণ বিসর্জন ও নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়ে করতে লাগল কারাবরণ।

নিষ্ঠুর দানবীয় পীড়ন চলতে লাগল জনসাধারণের উপরে।

আবার মহাত্মা জনসাধারণ, নিরীহ জনসাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে আরউইনের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন।

এখনও বন্ধ কর এ অত্যাচার। মানুষেরও সহ্যের একটা সীমা আছে।

মৃত্যুই শেষ নয়, কারাগারের বীভৎস নির্যাতনই শেষ নয়।

মহাত্মা প্রস্তুত হতে লাগলেন ধরশনার লবণের গোলা দখল করে নেবার জন্য তাঁর দলবল সহ।

সরকার বাহাদুর এবারে আর কালক্ষেপ না করে শৃঙ্খল নিয়ে এগিয়ে গেল মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করতে।

৫ই মের মধ্য রাত্রি।

মহাত্মাকে কারারুদ্ধ করা হলো।

মহাত্মার গ্রেপ্তারের সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে আগুনের শিখার মত দেশের সর্বত্র এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

সরকারের ঐ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হলো।

নেতার আসন কি শূন্য থাকে!

মহাত্মার অবর্তমানে বৃদ্ধ দেশনেতা আব্বাস তায়েবজী দৃঢ়পদবিক্ষেপে এগিয়ে এলেন ধরশনার লবণগোলা অধিকার অভিযানের পুরোভাগে।

কিন্তু সরকার তাঁকেও নিষ্কৃতি দিল না—১২ মে তাঁকেও কারারুদ্ধ করল।

এবার এলেন ভারতের এক মহিলা—সরোজিনী নাইডু!

তাঁরও গতিকে রোধ করা হলো, তিনিও গ্রেপ্তার হলেন।

এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হলো।

আরো ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনকে গ্রহণ করবার প্রতিজ্ঞা নিলেন সেই অধিবেশনে দেশনেতারা। বললেন তাঁরা নির্দেশ দিলেন: বন্ধ কর ভূমি কর দান, চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদানও কর বন্ধ!

ভঙ্গ কর বন আইন। সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন কর বিদেশী বস্ত্র।

প্রতিবাদ ঐ সঙ্গে জানান হলো সরকারের প্রেস অর্ডিনান্সকে, জরুরী মুদ্রাযন্ত্র আইনকে।

চারিদিকে শুরু হয়ে গেল পিকেটিং।

সরকার চীৎকার করে উঠলো: সাবধান, বন্ধ কর এসব! বেআইনী! এ সব বেআইনী!

ব্যাপক ধরপাকড় চলতে লাগল প্রত্যহ!

এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ভারতের বহু স্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণের হাস্যকর অজুহাতে নিরীহ, নিরস্ত্র, সত্যাগ্রহী সংগ্রামীদের উপরে পুলিস

যথেচ্ছভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করলে। পরে ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী বিবৃতি থেকে জানা যায়—সরকার বাহাদুর নাকি এক-আধবার নয় একান্ত দুঃখের সঙ্গেই বাধ্য হয়ে মূর্খ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৩ বার গোলাগুলি বর্ষণ করে !

১০৩ জন নিহত ও ৪০০ জন আহত হয়।

মহাত্মার মন্ত্রে—অহিংস মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে পেশোয়ারে দুর্ধর্ষ পাঠানরা পর্যন্ত নিশ্চুপ অহিংস হয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৩শে এপ্রিল যেদিন শান্তি স্থাপনের হাস্যকর অজুহাতে সরকার বাহাদুর সেখানে মুহুর্মুহু রাইফেলের অগ্ন্যুদ্গার করেছিল।

ত্রিশজন পাঠান নির্ভীক চিত্তে বুক পেতে গুলি নিল।

বুকের রক্তের মহাত্মার অহিংস সংগ্রামকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেল !

বোম্বাই প্রদেশে ও শোলাপুরে ছবার গোলাগুলি বর্ষিত হলো।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নিরীহ শান্ত নিরপরাধ জনগণের উপরে শান্তির অজুহাতে নিজেদের তাঁবেদার একদল গাড়োয়ালী সৈন্যকে গুলি বর্ষণের হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও তারা দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল : নেহি। হামলোগ গোলি নেহি চালায় গা।

কোর্ট মার্শাল করে সেই বিদ্রোহী সেনাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো অবিলম্বে।

দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে তখন মুক্তির নেশা জাগতে শুরু করেছে।

যাক প্রাণ থাক মান ! হান তীর ! যত তব তূণে আছে।

ভয় করি না মোরা। ডরাই না তোমার অস্ত্রকে, তোমার কারাগারকে, ভীত নই মোরা মৃত্যুভয়ে।

গুজরাটের হাজার হাজার অধিবাসী 'করবন্ধ' প্রতিজ্ঞা পালনে আপন আপন বাসভূমি ত্যাগ করে নিকটবর্তী বরোদারাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে অশেষ যাতনা ও হাসিমুখে দুঃখ ভোগ করতে লাগল।

মেদিনীপুর কাঁথির লোকেরা চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করে অশেষ লাঞ্ছনা হাসিমুখে মাথা পেতে গ্রহণ করলো।

শাসন-সংস্কার কার্য ও দমননীতির অনুসরণ লর্ড মিণ্টোর সময় থেকেই প্রথম শুরু হয়, এবারেও তার ব্যাতিক্রম হলো না।

সর্বত্র মর্মান্তিক উৎপীড়নের দৃশ্যে ইংরাজ সাংবাদিকও বিচলিত হলো।

২১শে মে ২৫,০০০ সত্যাগ্রহী বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর হলো গান্ধীজীর অসমাপ্ত কার্য ধরশনা লবণ গোলা অধিকার করবার জন্য।

নিরস্ত্র, অহিংস সত্যাগ্রহীর উপরে সরকার দানবীয় উল্লাসে লাঠি চালিয়ে ভারতের মাটিকে লালে লাল করে দিল।

New Freeman পত্রিকায় মিঃ ওয়েব মিলার লিখলেন :

I have never witnessed such harrowing scenes us at Dharsana. Sometimes the scenes were so painful that I had

to turn away momentorily. One surprising feature was the discipline of the Volenteers. It seemed they were imbubed with Gandhi's non-violence creed.

সারাভারতব্যাপী ঐ বিরাট আন্দোলনে ক্ষিপ্ত সরকার ৫৪,০৪৯ জনকে দণ্ডদান করে।

অহিংস সংগ্রামীদের মুক্তিযজ্ঞ শেষ হতে না হতেই বিপ্লবীদের হাতের মারণঅস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করে উঠলো।

এত অত্যাচার এ কি বৃথাই যাবে! এত রক্তপাত এর কি কোন মূল্যই ধার্য হবে না!

সবাই তো অহিংস নয়! মহাত্মার মত মহাত্মা নয়!

দাঁতের বদলী দাঁত ও চোখের বদলী চোখ নিতে এদেশের ছেলেরা কোনদিন পশ্চাৎপদ হয়নি!

এবারে তাদের পালা!

ঘুমন্ত বিসুভিয়াসের জাগরণের লগ্ন প্রায় উপস্থিত। আবার সে জাগবে।

চট্টলার পাহাড় জঙ্গল বেষ্টিত তীর্থভূমি ঃ মহামানবের তীর্থভূমি!

কেউ জানতে পারেনি সেদিন পূর্ববাংলার শান্ত একটি গৃহমধ্যে অনাগত এক অগ্নিসূর্যের তামস-তপস্যার সমাপ্তির দিন ঘনিয়ে আসছে।

ঘনিয়ে আসছে রুদ্রের আবির্ভাবের অগ্নিক্ষণটি!

সূর্য সেন!

হে সূর্য! বিদ্রোহআকাশের হে রক্তজ্যোতির্ময়, অগ্নিবরণ প্রকাশ তোমায় নমস্কার!

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, বাঘাযতীন, গোপীনাথ, ভগৎ সিং, রামপ্রসাদ, আসফাকউল্লা, রাজেন্দ্রনাথ এবং আরো ভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর দল মৃত্যুর মধ্য দিয়েও যারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যাদের চিতাভস্ম ভারতের আকাশে দিক হতে দিগন্তে উড়ে গিয়েছে বার্তা বহন করে অবিনাশী প্রতিজ্ঞার।

সেই প্রতিজ্ঞার অগ্ন্যুৎসবই ভারতের আকাশকে রক্তরঞ্জিত করে তুললো।

আগুনের ফুলকি লেলিহান শিখায় দেখা দিল চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, কলকাতা ও ঢাকায়।

সরকার। সুচতুর সরকার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বুঝলে তারা সবাই অহিংস নয়।

সবাই নিঃশব্দে মাথা পেতে লাঠির আঘাত নেয় না। বুক পেতে গুলি নেয় না।

ভিন্ন ধাতুতে এরা গড়া! রক্তের বদলে এরা রক্তই চায়! বাংলার দামাল ছেলে এরা!

বিদ্রোহী ভারতের সে এক নব পর্ব।

নব অধ্যায়।

সে পরম পরিপূর্ণ
প্রভাতের লাগি
হে ভারত! সর্বদুঃখে
রহ তুমি জাগি।

সেদিন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ঃ

পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

মুক্তি যজ্ঞের শত শত অগ্নিমুখে আগুনের শিখা ঝলকে উঠলো।

তিন

সেদিন চট্টলার কয়েকটি বীর সৈনিকের কল্পনার স্বর্গে অদূর ভবিষ্যতের ১৫ই আগস্টের স্বপ্নই মূর্ত হয়ে উঠেছিল কি না জানি না।

গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে যে দুরাশায় তারা আগুনের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল হয়ত পরবর্তী ১৫ই আগস্টের মধ্যেই তার সমাপ্তি ছিল না। তারা হয়ত তাদের অগ্রগামীদের মতই সর্বজনের, সর্বঅধিকারে আপন করে তাদের জন্মভূমিকে চেয়েছিল।

চেয়েছিল তাদের কল্পনার সোনার ভারতকে।

১৮৫৭র সশস্ত্র সেপাইদের সমস্ত ভারত ব্যাপী প্রায় অভ্যুত্থানের পরে এবং ১৯২২-২৩ সনের আরো একবার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার পর ঠিক ঐ শ্রেণীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা তেমন আর হয়নি যেমনটি হয়েছিল ১৯৩০ সনে চট্টগ্রামের মাটিতে।

১৯২২ হতে আবার নবোদ্যমে সরকারে নিষ্ঠুর দমননীতি দেশের রক্ষার্থে ও সশস্ত্র সংগ্রামীদের সহ্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হতে লাগল।

জর্জরিত নিষ্পেষিত মানবাত্মা মুক্তির বেদনায় মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

এবং তারাই একদিন আবার ধূলিশয্যা ছেড়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়াল।

১৯২৪-২৮ সনে লর্ড লিটনের কুখ্যাত বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বলে বাংলার বিদ্রোহী সন্তানদের কারাগারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয়েছিল।

সেইখানেই—ইংরাজের সেই কারাগারের মধ্যে বসে বসেই সময় ও সামর্থ্যানুযায়ী একটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনার বাস্তবরূপ চিন্তা কয়েকটি দুর্ধর্ষ মরণ-বিপ্লবীর মস্তিষ্কে জেগে ওঠে।

এতকাল ধরে বিপ্লবীদের বহুবার রাজনৈতিক কারণে ব্যক্তিবিশেষের হত্যা

ব্যাপারে লিপ্ত হতে হওয়ায় অনেক দুঃসাহসী বিপ্লবীকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

এবং ঐ ব্যক্তিবিশেষ প্রায়ই তাদের মধ্যে ভারতীয় অফিসার!

অনন্ত সিংহের উক্তি হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়ঃ ভারতবাসী হয়ে উক্ত মনোভাব আমরা বুঝতেই চাইতাম না যে মুষ্টিমেয় একদল ইংরাজ উপরে বসে তাদের স্বার্থে ভারতবাসীকে দিয়ে ভারতবাসীকে শোষণ ও শাসন করে।

হয়ত অনন্ত সিংহের কথাটা একেবারে মিথ্যা না হলেও কিছুটা আংশিকভাবে সত্যি। আংশিকভাবে হয়ত একটা দুরন্ত অভিমানও বিপ্লবীরা মনে মনে পোষণ করেছে ঐ সব ভারতীয় ক্ষমতাপন্ন অফিসারদের প্রতি, যে অভিমান পরে রূপান্তরিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে দুরন্ত আক্রোশে এবং গর্জে উঠেছে মারণাস্ত্র যার প্রতিবাদে তাদের দৃঢ় মুষ্টিমধ্যে।

সরকারের সকল প্রকার সতর্কতা সত্ত্বেও আইরিশ প্রজাতন্ত্র বাহিনীর ইস্টার বিদ্রোহের রক্ত-রাঙা ইতিকথা তরুণ বিপ্লবীদের অন্তরে অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে নব উদ্দীপনা।

মুক্তির লাগি দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা!

১৯২৮ সনে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীসুভাষের নেতৃত্বে ইউনিফর্ম পরিহিত বিরাট ভলানটিয়ার বাহিনী ও তাদের সুসংবদ্ধ কুচকাওয়াজই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে চট্টগ্রামের দুরন্ত বিপ্লবীদের প্রানে সৈনিক বাহিনী সৃষ্টি করে শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল। স্বপ্ন এনেছিল সশস্ত্র ব্যাপক যুব জাগরণের।

কিন্তু সশস্ত্র জাগরণ কেমন করে সম্ভব হবে যদি না হাতে থাকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র!

অর্থ চাই বটে তবে পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এবারে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সতর্ক হয়ে গেল: চুরি বা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ নয়।

স্থির হলো দলের প্রত্যেকেই আপন আপন আত্মীয়স্বজনদের নিকট হতে যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে।

এবং সেই সঙ্গে শুরু হবে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী ও বোমা পিস্তল রিভলভার গুলি প্রভৃতি সংগ্রহ।

শুরু হতেই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নেতার দায়িত্ব অবিসংবাদী ভাবে এসে পড়েছিল মাস্টারদা, ইতিহাসবিশ্রুত বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের স্কন্ধে।

সূর্যের মত প্রখর তেজ নিয়ে জন্মেছিলেন সূর্য সেন, মাথায় নিয়ে যিশুর মতই কণ্টক মুকুট চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমণি সেনের গৃহে।

বহরমপুরে কলেজে বি. এ. পড়বার সময়ই তার মন বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয় তদানীন্তন বিপ্লবী সংঘ যুগান্তর দলের সংস্পর্শে এসে।

কেউ জানল না কি প্রচণ্ড অগ্নির সম্ভাবনা বক্ষের মধ্যে সংগোপনে ধারণ করে সূর্য সেন চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে, ন্যাশন্যাল হাইস্কুলে গণিতের শিক্ষকতার ভার নিয়ে সাধারণ—অতি সাধারণ একজন স্কুল মাস্টারের পরিচয়ে

অদূরে ভবিষ্যতে এক রক্তসংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসলেন।

অতি সাধারণ স্বল্প ও খর্বাকৃতি ছোটখাটো চেহারা—মাথার সম্মুখে অনেকটা জুড়ে বিস্তীর্ণ একটি টাক।

সাধারণের আকৃতিতে কতই না অসাধারণ ছিলে হে তুমি সূর্য সেন!

অসহযোগ আন্দোলনে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন ও লোকনাথ বল প্রভৃতি চট্টগ্রামের দেশকর্মীরা, যুব নেতারা, দীর্ঘদিন ধরে রাজবন্দী থাকবার পর মুক্তি পাবার অব্যবহিত পরেই ১৯২৩ সনে আসাম বেঙ্গল কোম্পানীর ১৭০০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

কিন্তু তারা টাকাটা নিয়ে পালাতে পারল না।

অচিরেই পুলিস তাদের অনুসরণ করে এবং চট্টগ্রামের নাগারখানা পাহাড়ে দুই দলে গোলাগুলির বিনিময়ে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেল।

প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে বিদ্রোহী যুবকদের সেই প্রথম সংগ্রাম।

একে একে সকলেই সরকারের হাতে বন্দী হলো, বিচারে সকলেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনের কূট সওয়ালে মুক্তি পেয়েও সরকারের অর্ডিনান্সের জোরে রাজবন্দী হয়ে কারাগারে প্রেরিত হলো।

১৯২৮ সনে সকলে মুক্তি পেয়ে আবার চট্টগ্রামে ফিরে এলো।

নতুন করে তখন থেকে আবার সূর্য সেনের নেতৃত্বে নব পরিকল্পনায় সশস্ত্র জাগরণের প্রস্তুতি চলতে লাগল গোপনে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

কিছুদিন পরে নিরঞ্জন সেন, প্রতুল ভট্টাচার্য ও বিনয় রায় চট্টগ্রামে এসে সেখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে একটা ব্যাপক কার্যপন্থা নির্ধারণ করে।

ব্যাপক, সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি।

বলাই বাহুল্য ১৯২৯ সালে পূর্ববর্ণিত মেছুয়াবাজারের বাড়িকে কেন্দ্র করে নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদের গ্রেপ্তারে বিপ্লবীদের পূর্ব পরিকল্পনা সফল হতে পারেনি।

ঐ সঙ্গে চট্টগ্রামে বোমা তৈরী করবার সময় কয়েকটি দুর্ঘটনায় পুলিসের তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল।

অগত্যা চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আর বৃথা কালক্ষয় না করে তাদের যতটুকু শক্তি সংগঠিত হয়েছে তারই সাহায্যে শ্বেতাঙ্গ সরকারকে আঘাত হেনে অন্ততপক্ষে চট্টগ্রামে স্থানীয় ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াসী হলো।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে দলের অন্যান্য শক্তিশালী কর্মীদের নিয়ে গোপনে বৈঠক বসল এবং স্থিরীকৃত হলো সর্বসম্মতিক্রমে, বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রাম শহরের ইংরাজের অস্ত্রাগার ও অন্যান্য সরকারী কেন্দ্রগুলোকে দখল করে নিতে হবে। অন্তত চট্টগ্রামের বুকে প্রথম স্বাধীন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করতে হবে।

তারা জানত প্রবল প্রতাপাম্বিত অস্ত্রবলে শ্বেতাঙ্গ শক্তির সঙ্গে সশস্ত্র ঐ সম্মুখ অভিযানের ফলাফলটা কি হবে : মৃত্যু ! ফাঁসী না হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর !

কিন্তু সেও তো ব্যর্থ হবে না ! মিথ্যা হবে না !

চরম অভিযানের মাত্র দিন পনের আগে অনন্ত সিংহের সঙ্গে মাস্টারদার অভিযান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল।

অনন্ত সিংহ প্রশ্ন করে : সবই তো ঠিক হয়ে গেল মাস্টারদা ! আপনার কি রকম মনে হচ্ছে ?

মাস্টারদা জবাব দিলেন : এত শীগগিরী সব শেষ হয়ে যাবে ভাবতে সত্যি যেন কেমন লাগছে...তারপর একটু থেমে আবার বললেন : আমি ঠিক আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারছি না। চিরকালের জন্য আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো, আমাদের পরে ভবিষ্যতে দেশের কি হবে তা দেখবার বা জানবার কোন উপায় আমাদের থাকবে না।...হ্যাঁ জীবন মধুর সন্দেহ নেই কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আরো মধুর।

তুমি থাকবে না এমন কথা কেন তোমার মনে হয়েছিল মাস্টারদা ! তোমাকে তো আমরা হারাইনি। সরকারের ফাঁসীর রজ্জুই তো তোমার শেষ নয় !

বাসাংসি জীর্ণানী !

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে তুমি যে নবরূপে আমাদের কোটি কোটি জনগণের প্রাণের আসনে এসে বসেছো ! তোমার শেষ তো নেই !

ভারতের রক্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় হে শহীদ ! হে বরেণ্য তুমি যে স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান ! স্মৃতির মণিকোঠায় তুমি যে অক্ষয় অব্যয় চির-অনির্বাণ ! চিরভাস্বর !

ভারতীয় রিপাবলিক্যান ফৌজের চরম অভিযানের দিন স্থিরীকৃত হলো ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল রাত্রি দশটায়।

ঐ দিনটি ছিল শ্বেতাঙ্গদের গুড্‌ফ্রাইডে।

তাছাড়া একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ছিল ঐ শুভ দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে, আইরিশ প্রজাতন্ত্রবাহিনীর ইস্টার বিদ্রোহের রক্তরাঙা স্মৃতি বিপ্লবীদের তরুণ প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিল অভূতপূর্ব একটা উম্মাদনা।

বিলি হলো ভারতীয় রিপাবলিক্যান ফৌজের ইস্তাহার চট্টগ্রামের যুবা কিশোরদের হাতে হাতে।

The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemly declares its intention to stand against the age-long repression by the British people and their Government which they followed as a cruel policy to keep the three hundred million Indian people subjugated for unlimited time and to cradicate the slightest trace of nationalism and national

originality amongst them. The right of ownership of India and the Control of her destinies belongs to the people of India only and the long usurpation of the right by a foreign people and their Government has not extinguished that right nor it ever can. The Indian Republican Army proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress; and hereby pledges the life of everyone of its members to the course of Freedom, to the welfare and exaltation of the Motherland amongst all other nations!

এই সঙ্গে আরো স্মরণ কর বন্ধু! কত বড় অমানুষিক নির্যাতন ও অপমান ভারতের মাটিতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজত্বে ও তাদের গভর্মেণ্টের হাতে ভারতবাসী আমাদের সইতে হয়েছে। নির্বিচারে এরা আমাদের মা ভগ্নীকে জালিয়ানওয়ালাবাগে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে, ফাঁসীর রজ্জুতে কতশত দেশপ্রেমিককে আমাদের ওরা নির্বিকার চিত্তে হত্যা করেছে, বুটজুতোর নীচে কত শিশুকে মাড়িয়ে পিষে হত্যা করেছে। মনে কর। ভুল না। স্মরণ কর একবার কি ভাবে ওরা আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস করেছে ছল ও চাতুরী দিয়ে। আজ আমাদের সেই যুগব্যাপী অত্যাচারের রক্ত প্রতিশোধ নেবার দিন আগত! মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

In this supreme hour the Chittagong people must by their valour and patriotism and by the readiness of her Children to sacrifice themselves for the Common good, prove themselves worthy of the august destiny to which they are called —

By order
President in Council
Indian Republican Army
Chittagong Branch.

চলতে লাগলো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি।

বিপ্লবী বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকের জন্য খাকি সামরিক পোশাক তৈরী করা হলো।

বিভিন্ন স্কোয়াডে বিভক্ত করে দেওয়া হলো নেতার আদেশে সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে। মোট ছয়টি স্কোয়াড গঠন করা হলো মোট ৬৫ জন সৈনিককে নিয়ে। শতকরা ৭৫ ভাগ তাদের মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন।

প্রথম স্কোয়াডটি গঠিত হলো ৩২ জন সৈনিককে নিয়ে—পুলিস লাইন আক্রমণের সকল দায়িত্ব তাদের উপরে দেওয়া হলো—নেতৃত্বের ভার পড়ল অনন্তলাল সিংহ ও গণেশ ঘোষের উপরে।

দ্বিতীয় স্কোয়াড গঠিত হলো ছয়জনকে নিয়ে, এদের কর্মসূচী হলো চট্টগ্রামের অকসিলিয়ারী অস্ত্রাগারটি আক্রমণ ও দখল করা!

তৃতীয় স্কোয়াডে—৬ জন সৈনিক—তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হলো টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসটি ধ্বংস করা।

চতুর্থ স্কোয়াডে ছয়জন সৈনিকের উপরে অর্পিত হলো ইউরোপীয়ান ক্লাবটির আক্রমণের সকল দায়িত্ব। বাকী সৈনিকদের নিয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কোয়াড গঠিত হলো। এদের দায়িত্ব ছিল রেল ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ধ্বংস করে বহির্জগৎ হতে চট্টগ্রামকে ছিন্ন করা।

পূর্বোক্ত পরিকল্পনা মত ১৮ই এপ্রিল রাত্রি দশটায় চট্টগ্রামের দুঃসাহসী মরণপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ৬৫ জন যুবা ও কিশোর ঐতিহাসিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অভিযানে অবতীর্ণ হলো!

তাদের সম্বল—বন্দুকের বারুদে ঠাসা কতকগুলো বোমা। কয়েকটি লোহার যন্ত্রপাতি। আর! আর বুক ভরা তাদের দুর্জয় দুর্মদ সাহস!

আর সমস্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে জাগ্রত ছিল সেদিন ঐ দুঃসাহসিকদের নিজস্ব সত্য নীতি!

শ্বেতাঙ্গের নির্মম নিষ্ঠুর আক্রমণে তাদের মধ্যে কতজনা প্রাণ দিয়েছে তারপর, গুলির মুখে ও ফাঁসীর রজ্জুতে।

কিন্তু সেটাই তো তাদের শেষ কথা ছিল না!

একটা নীতির—একটা আদর্শের যূপকাষ্ঠেই তাদের জীবনকে তারা বলি দিয়ে গিয়েছে—এর চাইতে বড় সান্ত্বনা আর তাদের কি থাকতে পারে।

তাদের অমর অবিনাশী আত্মা সহস্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের আরব্ধ ব্রতকে একদিন না একদিন হয়ত সম্পূর্ণ করে তুলবে—এর চাইতে বড় সান্ত্বনা মানুষ হিসাবে আর তাদের কি থাকতে পারে সেদিন।

আমার বাণী পর্বতে প্রান্তরে, স্বদেশের চতুঃসীমা পেরিয়ে দূর দেশ-দেশান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে—এর চাইতে বড় পুরস্কার মানবের আর কি থাকতে পারে।

আদর্শের বেদীমূলে অকুতোভয়ে আত্মাঞ্জলি অপেক্ষা জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা আর কিই বা থাকতে পারে।

জীবন দিয়ে জীবনের প্রাপ্তি, মূল্য নির্ধারণ!

১৮ই এপ্রিল!

পূর্বাহ্ণেই লোকনাথ বল ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গিয়ে একটি ট্যাক্সি চালককে ট্যাক্সির জন্য বলে এসেছিল।

সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া ধরিত্রীর উপরে ঘন হয়ে এসেছে।

শহরে সর্বত্র জীবনপ্রবাহের মধ্যে কোন উদ্বেগ কোন চাঞ্চল্য নেই, মাত্র আর ঘণ্টা কয়েক বাদে যে ভয়াবহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চট্টলার শান্ত আকাশকে রক্তাভ করে তুলবে একথা স্বপ্নেও তখনও কেউ ভাবতে পারেনি।

নিঃশব্দে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এগিয়ে আসছে।

এগিয়ে আসছে সশস্ত্র অভিযানের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তটি!

নির্মল সেন, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী ও লোকনাথ বল মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন পথের দিকে তাকাচ্ছে অধীর ব্যাকুল আগ্রহে।

রাত্রি আটটার সময় ট্যাক্সি এলো, মুহূর্তে সকলে ট্যাক্সীতে উঠে বসে বললে —চালাও পাহাড়তলী!

চট্টগ্রাম শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত পাহাড়তলী স্টেশনটি।

স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই লোকনাথ বলের নির্দেশে ট্যাক্সি থামল। তারপরের ব্যাপারটুকু সংক্ষিপ্ত!

অস্ত্রমুখে ড্রাইভারকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে—এবং ক্লোরফরমের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে পথের মধ্যে ফেলে রেখে বিপ্লবীর দল ট্যাক্সি নিয়ে সোজা একেবারে রেলওয়ে অস্ত্রাগারের Side gateয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো।

গাড়ির মধ্যে ছিল ছজন। বাকী ছয়জন সঙ্গী অস্ত্রাগারের গেটের আশে-পাশেই অপেক্ষা করছিল।

তাদেরই একজন গেট ঠেলে খুলে দিল—গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করল।

Halt ! Who comes there ? প্রহরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

প্রত্যুত্তর এলো : Friends !

গাড়ি এসে সোজা অস্ত্রাগারের সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। লোকনাথ বল গাড়ি থেকে নেমে সোজা অস্ত্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠলো।

সেন্ট্রী ইধার আও!

সেন্ট্রী এগিয়ে এসে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট জানাতেই মুহূর্তে লোকনাথ বাঁ হাতে সেন্ট্রীর হাত চেপে ধরে দক্ষিণ হাতে উঁচিয়ে ধরল লোডেড্ পিস্তল : শোন! আমরা স্বদেশী। আমরা অস্ত্রাগার দখল করতে এসেছি। তুমি পালিয়ে যাও।

মূর্খ প্রহরী লোকনাথের হাত থেকে তার রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রতি-রোধের চেষ্টা করতেই আগ্নেয়াস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করলে।

প্রহরী ধরাশায়ী হলো।

আরো তিনজন রক্ষী এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে—তাদেরও লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করলে।

অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মচারী সার্জেণ্ট ফ্যারেল গুলির শব্দ শুনে বাইরে এসে ব্যাপার দেখেই তৎক্ষণাৎ ভিতরে ছুটে গিয়ে লোডেড্ রিভলভার হাতে বের হয়ে এল কিন্তু বিপ্লবীদের গুলিতে তাকে ঐখানেই মাটি নিতে হলো।

চেঁচাতে চেঁচাতে ঃ That's cruel ; that's cruel !

একজন জবাব দিল ঃ Not even one hundredth part of cruelty with which you Britisher have made us suffer.

শেষ পর্যন্ত দু'একটা ছোট-খাটো বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বিপ্লবী স্কোয়াডটি লোহার হাতুড়ীর ঘা মেরে ও সঙ্গের গাড়িটার সাহায্যে অস্ত্রাগারের দরজা খুলে ম্যাগাজিন, রাইফেল, লুইসগান ও রিভলবার যা কিছু নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল গুছিয়ে নিয়ে, পেট্রোলের সাহায্যে অস্ত্রাগার ভবনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সকলে চললো পুলিস লাইনের দিকে।

এ দিকে যথানির্দিষ্ট সময়ে রাত ১০টা ১৫ মিঃ অনন্তলাল সিংহ, গণেশ প্রভৃতি একটি স্কোয়াড পুলিস লাইন অস্ত্রাগার প্রাঙ্গণে এসে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করল।

এবং এখানেও যথারীতি প্রশ্ন এলো ঃ Halt, who comes there !

Friends ! এবারেও সেই জবাব।

গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র প্রহরীদের দিকে লক্ষ্য করে অগ্নুদ্গার শুরু করে দিল।

সম্মুখের সেপাইয়ের নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাকী সব যে যেদিক পারল চম্পট দিল। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

ভাঙ্ ! ভাঙ্—ভাঙ্রে কপাট !

ব্রিটিশের অস্ত্রাগারের সুরক্ষিত লৌহকপাট হাতুড়ীর ঘায়ে ভেঙে পড়ল।

অস্ত্র-শস্ত্র, অনেকগুলো মাস্কেট পাওয়া গেল অস্ত্রাগারের মধ্যে।

মাস্কেট, রিভলভার ও কার্তুজ সকলকে ভাগ করে দেওয়া হলো।

গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ সকলকে মাস্কেট কেমন করে ব্যবহার করতে হয় চট্‌পট্ শিখিয়ে দিল।

ব্রিটিশ প্রহরী বিতাড়িত, 'ভারতীয় রিপাবলিক্যান ফৌজে'র প্রহরী চারপাশে মোতায়েন করা হলো।

হিন্দুস্থান হামারা ! স্বদেশ আমার জননী আমার !

যতই স্বল্প সময়ের জন্য হোক, যতই ক্ষণস্থায়ী হোক—১৮৫৭র সেই ইতিহাসবিশ্রুত ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করার মত সেদিন রাত্রেও চট্টলার মাটিতে আবার সুদীর্ঘ তিয়াত্তর বৎসর পরে ১৯৩০—১৮ই এপ্রিল বিপ্লবীদের মরণপণে দ্বিতীয়বার স্বাধীন, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো।

ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা আজও !

সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক সকলের প্রিয় মাস্টারদাকে সেরাত্রের সেই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সর্বাধিনায়ক—প্রেসিডেণ্ট্ বলে সম্মান জানানো হলো।

সাক্ষী ছিল সেদিন নিশীথ রাতের অগণিত তারার দল মাথার উপরে কালো আকাশপটে, আর প্রবহমান কাল।

এবং পায়ের নীচে শৃংখলিতা জননী জম্মভূমি !

মিলিত কণ্ঠে প্রণতি জানাল সবাই : বন্দেমাতরম্ !

Loug live Revolution !

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক !

স্বাধীন ভারত কি জয় !

মধ্যে মধ্যে নিশীথের কালো আকাশের বুকখানাকে আলোকিত করে ওদের হাতের রাইফেলের গুলি আনন্দ সংকেত জানাচ্ছে: আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত !

সেদিন চট্টগ্রামের অধিবাসীরা কি ঘুমোতে পেরেছিল !

নিশ্চিন্ত শয্যায় ঘুম কি তাদের ভেঙে যায়নি ! পৌঁছায়নি কি তাদের কানে সেই বিপ্লবীদের ক্ষণ স্বাধীনতার বিজয় উল্লাস !

উদ্বেলিত হয়নি কি হৃদয় তাদের ! রোমাঞ্চ কি জাগেনি প্রাণে প্রাণে !

যথানির্দিষ্ট সময়ে যে স্কোয়াডের উপরে টেলিফোন টেলিগ্রাফ অফিসটি নষ্ট করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তারাও—অফিস আক্রমণ করে যন্ত্রপাতি সব নষ্ট করে পুলিস লাইনের দিকে চলে গেল।

সেখানে এসে ওরা যখন পৌঁছাল আকাশ বাতাস তখন মথিত হচ্ছে মিলিত কণ্ঠে :

Long live Revolution !

বন্দেমাতরম্ ।

ভারত মাতা কি জয় !

রাত্রি প্রায় দুটো। ঐতিহাসিক রাত্রির মধ্যপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়।

এমন সময় সোঁ সাট্ সাট্ শব্দে উপর্যুপরি কয়েকটা বুলেট এসে পুলিস লাইনের দেওয়ালে লাগতে শুরু করল।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো বিপ্লবীর দল। কোথা হতে গুলি আসছে !

গুলি তখনও আসছে : সোঁ ! সাট্ সাট্ !

সর্বনাশ ! এ যে মেসিনগানের গুলি !

কমাণ্ডার অনন্তলালের নির্দেশ শোনা গেল : Lie down ! Quick ! Lie down !

বুঝতে পেরেছে ওরা তখন অদূরবর্তী জলকলের ছাদের উপর থেকে মেসিনগানের গুলি আসছে অবিশ্রাম।

পুলিস লাইনের কাছেই ঐ জলকল—চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশের প্রধান পথটির পাশেই অবস্থিত। ডবল মুরিং নামক স্থানে ছোট একটি যে অস্ত্রাগার ছিল বিপ্লবীর দল অপ্রয়োজন মনে করায় সেটা দখল করেনি। এবং তাদের সেই ছোট্ট প্রমাদের সুযোগ নিয়েই শত্রুপক্ষ সেখানকার মেসিনগানটি নিয়ে প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছে।

কমাণ্ডারের নির্দেশ শোনা গেল : Fire !

এ-পক্ষও চালাল গুলি। দুম্! দুম্! সোঁ! সাট্ সাট্!

নেতার দল দেখলে এভাবে ওদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম চালানো নিবুর্দ্ধিতার কাজ। অতএব স্থিরীকৃত হলো গেরিলা যুদ্ধের নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয় আর শক্তি ক্ষয় বৃথা না করে।

স্থানত্যাগ করবার পূর্বে পুলিস লাইনে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়ে হিমাংশু সেন গুরুতর ভাবে পুড়ে গেল।

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত আহত, অগ্নিদগ্ধ, যন্ত্রণাকাতর হিমাংশু সেনকে নিয়ে আনন্দদের বাসায় রেখে আসতে গেল।

বাকি সকলে অপেক্ষা করতে লাগল ঐ জায়গায়।

আনন্দ গুপ্তর ওখানে হিমাংশুকে রেখে ফিরে এসে পূর্বের দলটিকে কিন্তু ওরা ঐ জায়গায় দেখতে পেল না।

দু'টি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

২০শে এপ্রিল ধৃত অবস্থায় হাসপাতালে চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থানের বীর সৈনিক অগ্নিদগ্ধ হিমাংশু সেন কালের কপোলতলে প্রথম এঁকে দিলেন যেন রক্তসিঁদুরের টিপ দিয়ে, রক্তলেখায় দলের মধ্যে আপন প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রথম শহীদ লিপিখানি

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

চুপ্! ধীরে! আস্তে চল!

এসো এগিয়ে কে যেতে চাও নিঃশব্দ পায়ে!

চেয়ে দেখো সম্মুখে তোমার ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ ঐ যে শ্যামল পাহাড়টি, চট্টগ্রাম হতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত!

হ্যাঁ! ঐ! ঐ—পুণ্যতীর্থে এইবারে আমরা চলেছি!

চক্ষু অশ্রু সংবরণ কর!

হৃদয় প্রণাম জানাও! আপনাকে লুণ্ঠিত করে দাও শ্যামল ঐ তীর্থের ধূলিতে, আপন বক্ষে মেখে নাও ঐ তীর্থরেণু!

কিন্তু দেখো যেন কারো ওদের ঘুম না ভাঙে!

ওদের ঘুম ভাঙিয়ো না!

কারা ঘুমিয়ে আছে ওখানে?

হরিগোপাল (টেগ্‌রা), নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, জিতেন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, নির্মল লালা ও মতিলাল কানুনগো।

বাংলা তথা ভারতের একাদশ বীর সন্তান। বিপ্লবী বাংলার উদ্দীপ্ত যৌবনের চিরস্মরণীয় চিরঞ্জীবী একাদশটি মৃত্যুহীন প্রাণ!

ভাঙিয়ো না ওদের ঘুম!

পরবর্তীকালে শ্বেতাঙ্গ আদালতে যখন বীর সৈনিকদের বিচার প্রহসন চলেছে একদিন শ্বেতাঙ্গ সরকারের উকিল রায়বাহাদুর নগেন বাঁড়ুয্যে মশাই ওদের দিকে তাকিয়ে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় বলেছিলেন : আমি চট্টগ্রামের তীর্থস্থান দেখতে গিয়েছিলাম।

ওদের মধ্যে কে একজন বলে উঠলো : আপনি সীতাকুণ্ডু তীর্থে গিয়েছিলেন বুঝি ?

নগেন বাঁড়ুয্যে প্রত্যুত্তর দিলেন : চট্টগ্রামের তীর্থস্থান আজ আর সীতাকুণ্ডু তো নয় !

চট্টগ্রামের তীর্থস্থান জালালাবাদ !!

জালালাবাদ !

হাঁ আমরা এবারে সেই জালালাবাদের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছি।

স্মৃতির যবনিকাখানি উত্তোলিত হচ্ছে ধীরে, অতি ধীরে !

১৯শে এপ্রিলের চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে বিদ্রোহী যুবক ও কিশোরের দল পুলিস লাইন ত্যাগ করে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

২০শে এপ্রিলের দিন ও রাত্রি পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যেই ওদের কেটে গেল।

পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত।

চারিদিকে পাহাড়ের বন জঙ্গল, মাথার উপরে নিরালম্ব খোলা আকাশ।

অনেক অনুসন্ধান করে অল্পদূরবর্তী একটা ক্ষেত থেকে কয়েকটি তরমুজ সংগ্রহ করে এনে তাই সকলের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রশমনের চেষ্টা হলো। দলের মধ্যে একজন ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝর্ণার সন্ধান পেয়ে সকলকে জানাল, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়েও সকলে তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগল।

৫০ জন বিদ্রোহীর চোখের সামনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তি ভয়াবহ হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল।

অবশেষে গভীর রাত্রে দলের সকলের কাছে সামান্য যার যা অর্থ ছিল সংগ্রহ করে মোট হলো ১৭টি টাকা।

সেই টাকা নিয়ে পাঁচজনে গিয়ে পাহাড়ের অনতিদূরে একটি দোকান ছিল, সেই দোকান হতে এক ঝুড়ি রুটি ও বিস্কুট কিনে নিয়ে এলো।

পুলিসের লোকেরা সর্বত্র তখন চট্টগ্রামের অন্ত্যপ্রত্যন্তে ছড়িয়ে পড়েছে ওদের সন্ধানে। ঘুরছে হন্যে কুকুরের মত।

এদিকে উড়ো উড়ো কয়েকটি সংবাদ পেয়ে পুলিসের কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হতে থাকে আক্রমণ চালাবার জন্য ঐ পাহাড়ের দিকে।

২২শে এপ্রিল বিদ্রোহীরা সারাটা দ্বিপ্রহর মার্চ করে এসে পৌঁছায় জালালাবাদ পাহাড়ে।

ক্লান্ত বিদ্রোহীর দল সবেমাত্র জালালাবাদ পাহাড়ের একটি শ্যামল নিরালা স্থান বেছে নিয়ে শ্যামল শয্যার উপরে গা এলিয়ে দিয়েছে বিশ্রামের আশায়—দলের দূর প্রহরারত সতর্ক রক্ষীর সতর্কবাণী শোনা গেল : দূরে মিলিটারী ফোর্স দেখা যাচ্ছে।

আরো একজন জানাল : ওরা এদিকেই এগিয়ে আসছে—এই পাহাড়ের দিকেই।

যে যেখানে ছিল মুহূর্তে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

Attention !

যে যার আর্মস্ নিয়ে দাঁড়াল প্রস্তুত হয়ে। **Shoulder to Shoulder.**

তারপর !

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলে নিল অংসোপরে
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।—

শত্রুর বিরাট বাহিনী যখনই নিম্নভূমিতে ওদের রাইফেলের গুলির পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল লোকনাথ বলের আদেশ ধ্বনিত হলো : Fire !

একসঙ্গে বিপ্লবীদের পঞ্চাশটি আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করলে।

সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে শোনা গেল : বন্দেমাতরম্ ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক ! Long live Revolution !

শত্রুপক্ষের হাজার আগ্নেয়াস্ত্র এক সঙ্গে ভীম গর্জন করে উঠলো : দুম্-দুম ! গুড়ুম ! গুড়ুম !…

একদিকে মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাকামী পঞ্চাশটি মাত্র যুবা ও কিশোর, অন্যদিকে সরকারের অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত বিরাট সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী।

সেদিনকার হারজিতের মীমাংসায় পৌঁছান তো এমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। একদিকে কয়েকটি মৃত্যুপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অস্ত্রশিক্ষায় অপটু অসম্পূর্ণ কিশোর ও যুবা অন্যদিকে সরকারের বিরাট সুশিক্ষিত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী।

তথাপি !

তথাপি ১৯৩০-এর ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রামের জালালাবাদের শ্যামল শিখরে তরুণ মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের অগ্নিনালিকায় তাদের শোণিত তরঙ্গে স্বাধীনতার যে অমর দুর্বার স্পৃহা মুখরিত, উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল শৃঙ্খলিতা স্বদেশ জননীর মুক্তির লাগি সেই পুঞ্জীভূত অন্তরবেদনা, সেই আত্মদান জালালাবাদের প্রতি ধূলিকণায় ধূলিকণায় চিরদিন রক্তের অক্ষরেই লেখা থাকবে।

ভারতবাসী ভুলবে না কোন দিন সেই চট্টগ্রামের হলদিঘাটকে।

চিরদিন অবিমিশ্র গৌরবে ও শ্রদ্ধায় বার বার প্রণতি জানাবে।

উভয়পক্ষ থেকেই অবিশ্রাম গোলাগুলি বর্ষিত হচ্ছে।

দেখতে দেখতে বিপ্লবীদের মধ্যে কয়েকজন শত্রুপক্ষের গুলিতে আহত হলো এবং সহসা একটি গুলি এসে টেগ্‌রার পেটে প্রবেশ করল।

চতুর্দশবর্ষীয় নবীন কিশোর। নির্ভীক সৈনিক রক্তাক্ত আহত হয়ে ভূশয্যা নিল : সোনা ভাই আমি চললাম—তোমরা চালিয়ে যাও! বন্দেমাতরম্‌!

ঋষি বঙ্কিম!

তোমার ঐ মন্ত্র এমনি করে কয়জনা তার শেষ মুহূর্তেও কণ্ঠে নিয়ে গিয়েছে।

ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মন্ত্র!

ধন্য টেগ্‌রা! ধন্য তোমার উচ্চারিত বন্দেমাতরম্‌!

এরপর একে একে বাংলার সেই একাদশ শহীদ দিয়ে গেল প্রাণ! নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, প্রভাস, শশাঙ্ক, জিতেন, মধু, পুলিন, নির্মল, মতিলাল।

দিনমণি অস্তগমনোম্মুখ!

কোথা যাও, ফিরে যাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব! করিলে গমন,
আসিবে···ভাগ্যে বিষাদ রজনী!
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্মম অন্তরে,
ডুবারে···রাজ্য যেও না তপন

রক্তাক্ত জালালাবাদের শিখরকে রক্তরাঙা নতি জানিয়ে সত্যসত্যই দিনমণি অস্তাচল মুখ লুকাল।

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে?
যাও তবে, যাও দেব! কি বলিব আর?

আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার;

নেমে এলো সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার পক্ষ বিস্তার করে।

ক্রমে দুই পক্ষেরই গুলির আওয়াজ সেদিনকার মত থেমে এলো।

যুদ্ধ বিরতি।

ধূসর অন্ধকারেই মিলিটারী ফৌজ পরাজিত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গেল রাতের মত।

এই অবসর!

বিপ্লবীরাও জালালাবাদ পরিত্যাগ করে কাছেই একটি গ্রামের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

পশ্চাতে দ্বাদশ সঙ্গী তাদের পরম নিশ্চিন্তে শষ্প শয্যার উপরে নিদ্রিত হয়ে রইলো।

ভ্রমক্রমে মৃতবোধে অজ্ঞান রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত অর্ধেন্দু দাস্তিদার, অম্বিকা চক্রবর্তীকে ওরা জালালাবাদ পাহাড়ের উপরেই অন্যান্য মৃতদের মধ্যে ফেলে চলে এসেছিল।

গভীর রাত্রে অম্বিকা চক্রবর্তীর জ্ঞান ফিরে এলো।

দেখলে চারিপাশে সঙ্গীদের মৃত দেহগুলো পড়ে আছে। নিকটবর্তী গ্রামে ধীরে ধীরে কোনক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে এক সহৃদয় মুসলমান চাষীর গৃহে আশ্রয় পায় সে।

অম্বিকা চক্রবর্তী তাকে স্পষ্টই বললে: আমি একজন পলাতক বিপ্লবী। দেশের জন্য, তোমাদের সবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছি—আহত অবস্থায় তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে ধরিয়েও দিতে পার।

নিশ্চয় আশ্রয় দেবো। আমার যতটুকু সাধ্য আছে তাই দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমরা দেশের জন্য এত বিপদ মাথা পেতে নিয়েছো আর আমি তোমার জন্য সামান্য এইটুকু করতে পারবো না!

পরের দিন আবার নতুন উদ্যমে শ্বেতাঙ্গের মিলিটারী বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে আক্রমণ চালাতে এসে অন্য পক্ষের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পাহাড়ের উপরে গিয়ে শহীদদের মৃতদেহগুলি মাত্র দেখতে পেল।

অর্ধেন্দুর ও মতিলালের তখনও প্রাণবায়ু নির্গত হয়নি—হাসপাতালে বহে নিয়ে যাওয়া হলো অর্ধেন্দুকে কিন্তু মতিলাল সেইখানেই নিঃশ্বাস নিল।

বেলা ১-৫০ মিঃ অর্ধেন্দু শেষ নিঃশ্বাস নেয়।

নরেশ রায়—চট্টগ্রাম ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিল—বয়স তার ছিল মাত্র ২০ বৎসর মৃত্যুর সময়। ময়মনসিংয়ের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য—কুমিল্লার এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। নরেশের সমবয়সী ও সহপাঠী।

ত্রিপুরা সেন—বয়স মাত্র ছিল ষোল বৎসর। পিতৃভূমি ঢাকায়—চট্টগ্রামে মামার বাসায় থেকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে অধ্যয়নরত ছিল।

অর্ধেন্দু দস্তিদার—ঊনবিংশ বৎসর বয়স্ক যুবক। চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ঘরছাড়া বিপ্লবী। অভিযানের কয়েক মাস আগে পিকরিক্-অ্যাসিড্ দিয়ে বোমা তৈরী করবার সময় বিস্ফোরণের ফলে সাংঘাতিক ভাবে তার দেহ পুড়ে গিয়ে সমস্ত দেহে ঘা হয়ে গিয়েছিল। অভিযানের দিনও সে

সুস্থ ছিল না কিন্তু তথাপি তাকে নিবৃত্ত করা যায়নি। স্বেচ্ছায় অসুস্থ দেহেই সে মুক্তিযজ্ঞে আপনাকে নিবেদন করেছিল।

মধুসূদন দত্ত—২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক। চট্টগ্রামের পল্লীর এক মধ্যবিত্ত ঘরে তার জন্ম হয়েছিল।

হরিগোপাল বল (টেগরা)—১৪ বৎসর বয়স্ক কিশোর। কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

প্রভাস বল—মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল—প্রয়াণের সময় বয়স ছিল তার মাত্র ষোল বৎসর।

নির্মল লালা—কক্সবাজার হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র—অভিযানের সময় তার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। বিচিত্র ছিল ঐ চোদ্দ বৎসর বয়স্ক কিশোর। মাস্টারদার কথা সে কক্সবাজারে বসেই শুনেছিল।

তাঁকে দেখবার লোভ সে সম্বরণ করতে না পেরে চট্টগ্রামে হাজির হয় অভিযানের অল্প কিছু দিন আগে।

অত্যাসন্ন অগ্নিযজ্ঞের বার্তা তার কাছে চাপা থাকেনি—সে অনুমান করেছিল এবং সোজা একদিন মাস্টারদার কাছে গিয়ে হাজির।

'মাস্টারদা—আমি বুঝতে পারছি শীঘ্রই আপনারা একটা কিছু করবেন, আমাকেও কিন্তু আপনাদের সঙ্গে নিতে হবে।'

কৌতুক বোধ করেন সূর্য সেন। মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করেন: 'কতদিন হলো পার্টিতে এসেছো?'

'প্রায় দুমাস হবে!'

'হুঁ! কোন্ ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস এইট্।'

'বয়স?'

'চোদ্দ!'

'এইটুকু বয়সে কেমন করে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে নির্মল?'

মাস্টারদাকে রাজী করাতে না পেরে বেচারী ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরে গেল কক্সবাজারে।

সেখানে গিয়েই বিধু সেনকে বললে: 'বিধুদা মাস্টারদাকে রাজী করবার কি কোন উপায়ই নেই?'

'তুমিই আবার গিয়ে তাঁকে ধর। এছাড়া তো আর কোন উপায়ই দেখি না ভাই!'

ফিরে এলো নির্মল আবার চট্টগ্রামে।

যেমন করে যে উপায়ে হোক মাস্টারদাকে রাজী সে করাবেই।

ছিন্নমস্তা দেশজননী যার বক্ষরক্ত পান করবার জন্য স্বয়ং লালায়িতা হয়ে উঠেছেন তার গতিরোধ করে কে!

আপন বক্ষ চিরে তাই সে রক্ত দিয়ে গেল তৃষিতা জননীকে।

পুলিন ঘোষ—১৭ বৎসর বয়স্ক-যুবক, চট্টগ্রাম জে. এম. সেন স্কুলের প্রথর

ধীমান মেধাবী ছাত্র ছিল দশম শ্রেণীর। দুঃস্থ পরিবারের সন্তান। কায়ক্লেশে পড়াশুনা চালাতো।

শশাংক দত্ত—চট্টগ্রাম কলেজের ইনটারমিডিয়েটের ছাত্র—বয়স ছিল মাত্র ১৮ বৎসর।

মতিলাল কানুনগো—চট্টগ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান, কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র—বয়স ১৭ বৎসর।

জিতেন্দ্র দাস—১৭ বৎসর বয়স্ক যুবক। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম।

এদিকে বিদ্রোহীদের যে খণ্ড দলটি জালালাবাদগামী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—গণেশ ঘোষ, অনন্তলাল সিংহ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে নিয়ে, ঐ কয়জন উপায়ান্তর আর না দেখে ২২শে এপ্রিল চারিদিককার সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ প্রহরীদের খর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক যখন ছায়াছন্ন হয়ে উঠেছে, কুমিল্লার পথে বের হয়ে পড়ল ছদ্মবেশ ধারণ করে।

চারজনেরই চুল ছোট করে ছাঁটা, পোশাক-পরিচ্ছদে গ্রাম্য ধোপার পরিচয়।

অন্ধকারে দীর্ঘ আট মাইল পথ অতিক্রম করে এসে সকলে ভাটিয়ারী স্টেশনে পৌছাল গভীর রাত্রে।

কুমিল্লার চারখানা টিকিট ওরা চাইলে কিন্তু স্টেশন মাস্টার ওদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় বললে কুমিল্লার টিকিট ফুরিয়ে গিয়েছে, লাকসামের টিকিট পাওয়া যেতে পারে।

ওরা আর কালবিলম্ব না করে ট্রেন যেমন প্লাটফরমে এসে প্রবেশ করেছে, চারখানা লাকসামেরই টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসল।

সরকারের উচ্ছিষ্টলোভী বাঙালী স্টেশন মাস্টার অশ্বিনী ঘোষ পুরস্কার ও বাহবা প্রাপ্তির লোভে তারই দেশের মুক্তিসংগ্রামরত কয়েকটি তরুণ সৈনিককে ধরিয়ে দেবার জন্য টিকিটের নম্বর দিয়ে অবিলম্বে সেই লাইনের সমস্ত স্টেশনে স্টেশনে তার করে সংবাদ তো দিলই—ট্রেনের গার্ডকেও সব সংবাদ দিয়ে দিল।

ফলে ট্রেনটা ফেণী স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই একদল সশস্ত্র পুলিস ওদের কামরার মধ্যে এসে হানা দিল।

টিকিট পরীক্ষান্তে বললে পুলিস ইনেসপেকটার: তোমাদের নামতে হবে।

কোন যুক্তিতর্কই তারা মানল না, ওদের নামতে হলো স্টেশনে পুলিস পরিবৃত হয়ে।

সকলকে এনে পুলিস আর. এম. এস. অফিস ঘরে ঢোকাল।

তারপর বডি সার্চ করতে ওদের উদ্যত হতেই চক্ষের পলকে নিরীহ ধোপার পরিচয় ভয়াবহ বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হলো।

গর্জে উঠলো আগ্নেয়াস্ত্র।

গুলির শব্দে ও ধোঁয়ায় মুহূর্তে চারিদিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করে বিপ্লবীরা অন্তর্হিত হলো বাইরের অন্ধকারে যে যেদিকে সুবিধা পেল।

অন্ধকারে অপরিচিত আঘাটা দিয়ে কিছুক্ষণ দিগবিদিগহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল দেখলে, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের কোন চিহ্নই নেই আশেপাশে।

এদিকে পুলিসের চিৎকারও দূরে শোনা যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয় জেনে ওরা আবার অন্ধকারে ছুটলো।

দৌড়াতে দৌড়াতে ওরা দু'জনে এসে ট্রাঙ্ক রোডের উপরে উঠলো এবং ট্রাঙ্ক রোড ধরে এবারে হাঁটতে শুরু করল।

এমনি করে ট্রাঙ্ক রোড ধরে আরো কিছুক্ষণ হাঁটবার পর হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল অন্ধকারে গাছতলায় কে একজন কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে।

হয়তো কোন গোয়েন্দা—ব্রিটিশের গুপ্তচর ভেবে মুহূর্তে ওরা দুজনে রিভলভার বের করে বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলে: Hands up!

লোকটি কোন প্রতিবাদ না করেই নীরবে দু'টি হাত মাথার উপরে তুলে ধরল।

'নাম কি?'

'আমার নাম শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ।'

হাসি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে অতঃপর ওরা দু'জনে একজন হারানো সাথীকে ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু চতুর্থ—অনন্ত সিংহ কোথায়!

ঐভাবে দুর্গম রাস্তা ধরে বন জঙ্গল পাহাড় ডিঙিয়ে পদব্রজে বহু ক্লেশ ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে রেল স্টেশনে এসে ওরা পৌঁছায় সেখান থেকে মুসলমানের ছদ্মবেশে টিকিট কেটে শ্রীহট্ট।

এবং শ্রীহট্ট থেকে তিনজন কলকাতায় এসে পৌঁছালো।

কলকাতার তদানীন্তন যুগান্তর দল ঐ তিনটি পলাতক বিপ্লবীকে দিলেন আশ্বাস ও প্রীতি।

তাদেরই চেষ্টায় ওরা পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে আত্মগোপন করে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে অনন্ত সিংহও কলকাতায় এসে পৌঁচেছে।

এবং লোকনাথ বলও দলে এসে ভিড়ল চট্টগ্রাম থেকে।

যুগান্তর দলের সহযোগিতায় ওরা কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে নানা স্থানে আত্মগোপন করে থেকে অবশেষে এসে উঠলো সকলে গৃহীর পরিচয়ে যুগান্তর দলেরই চেষ্টায় ফরাসী চন্দননগরের গোঁদল পাড়ায় একটি গৃহে।

গৃহস্বামীর পরিচয় নিলেন যুগান্তর দলের কর্মী শশধর আচার্য আর গৃহ-স্বামিনীর পরিচয় নিলেন সুহাসিনী দেবী—পাতানো স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়।

আপাততঃ চন্দননগরের উপরে ক্ষণিক বিশ্রাম দিয়ে আমরা আবার ফিরে যাই সেই শহীদ ভূমি চট্টগ্রামে।

জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপন করে থাকাকালীন সময়ে মাস্টারদার নির্দেশে দলের অমরেন্দ্র নন্দীকে শহরে পাঠানো হয়—সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু বীর সৈনিক জালালাবাদে আর ফিরে যেতে পারেনি।

২৪শে এপ্রিল সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে সে প্রাণ দিল।

অমরেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম কলেজের ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্র। বয়স তার ছিল মাত্র ১৭ বৎসর, সশস্ত্র অভিযানের ত্রয়োদশ শহীদ।

জালালাবাদ পাহাড় থেকে শহরে ফিরে এসে মাস্টাদার নির্দেশক্রমে আপাততঃ সকলে আত্মগোপন করে পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলো।

হালদা নদী ও কর্ণফুলীর সঙ্গমস্থল থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে নোয়াপাড়ায় নিজের বাড়িতে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থেকে সূর্য সেন নোয়াপাড়া বিনয় সেনের বাটীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এদিকে দগ্ধাবস্থায় সুখেন্দু দস্তিদারের জিম্মায় থাকাকালীন সময়ে সে ও সুখেন্দু সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হয় ও হিমাংশু হাসপাতালে নীত হয়—সেইখানেই ঐ বীরের শেষ নিঃশ্বাস বায়ুস্তরে মিলিয়ে যায়—চতুর্দশ শহীদ।

মহানায়ক মাস্টারদার বিপ্লব পরিকল্পনার তখনও সমাপ্তি ঘটেনি।

অস্ত্রাগার অধিকার অভিযান শেষের দিকে ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীর সঙ্কল্পকে দমাতে পারেনি।

নবোদ্যমে তিনি তখন নতুন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

৬ই মে আবার বজ্রাগ্নি আকাশে অগ্নি শিখায় দেখা দিল।

ইউরোপীয়ান ক্লাবটি আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে মাস্টারদার নির্দেশে স্বদেশ রায়, রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী রওনা হলো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে। কিন্তু শহরের অবস্থা অনুকূল নয় বুঝে বিপ্লবীরা যখন ফিরে চলেছে ঘাঁটিতে—শ্বেতাঙ্গের অনুচর খান বাহাদুর আসানুল্লা ও আবদুল আজিম গুপ্তচর মুখে বিপ্লবীদের সন্ধান পেয়ে তাদের পিছু নিল সশস্ত্র পুলিস সঙ্গে নিয়ে।

সংবাদ পেয়ে ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় ডি. আই জি মিঃ ফারমার ইনেসপেকটার ম্যাকডোনালড্, সাব-ইনেসপেকটার হোম গুপ্ত ও ইস্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলসয়ের আটজন সৈন্য।

বহুক্ষণ ধরে উভয় দলের মধ্যে ধাবমান সংঘর্ষ হলো—ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী ধরা পড়ল। বাকী চারজন গুরুতররূপে আহত হয়েও ছুটতে ছুটতে গিয়ে সামর্থ্যহীন অবস্থায় সামনের এক বাঁশবন দেখতে পেয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় নিল।

উভয়পক্ষে শুরু হলো এবারে সম্মুখ যুদ্ধ।

কয়েক মিনিট ধরে উভয় পক্ষে অবিশ্রাম গুলি বিনিময় হলো।

তারপর সব নিঃশব্দ।

বিপ্লবীদের কোন সাড়া আর পাওয়া যায় না।

ডি. আই জি. ও অন্যান্য সকলে এবারে বীরদর্পে বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়।

রজত সেন, স্বদেশ রায় ও দেবপ্রসাদ গুপ্তর গুলিবিধ্বস্ত বিগত প্রাণ দেহ শুধু বাঁশঝাড়ের মধ্যে রক্তসাগরে ভাসছে।

কালারপোলের ধূলিতে আবার রক্ত-আলিম্পনে মুক্তিযজ্ঞের আর একটি পৃষ্ঠা চিরস্মরণীয় হয়ে গেল।

সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থানের পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ শহীদ।

স্বদেশ রায়—অবস্থাপন্ন পরিবারের দুলাল। সৌখীন পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত।

১৮ই এপ্রিল যখন চট্টলার আকাশ গুলির শব্দে মুখরিত স্বদেশ তখন নিজের ঘরে বসে সেতারে সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন ছিল।

সহসা তার কানে এলো গুলির শব্দ ও বন্দেমাতরম ধ্বনি। Long live Revolutionএর দিক ছাড়া ডাক।

ধনীর দুলাল আর ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারল না, দরজা খুলে ছুটে বাইরে বের হয়ে গেল।

এবং নিঃসংকোচে ঝাঁপ দিল অগ্নিতে।

মা তাকে ডেকে নিয়েছিলেন, মা-ই তাকে তার রক্তাক্ত কোলটি পেতে সস্নেহে টেনে নিলেন।

মাত্র ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক।

আর রজত সেন—১৭ বৎসর বয়স্ক তরুণ। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান।

শহীদ মনোরঞ্জন সেন—এক অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সের সময় সে দেশের জন্য হাসিমুখে শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়ে গেল।

দেবপ্রসাদ গুপ্ত—কলেজের একজন কৃতী বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল কিন্তু আর চাইতেও বেশী ছিল সে জন্মবিপ্লবী।

মরিয়া হয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার ঘোষণা করলে ১৬ই মে—১৯৩০। কেউ যদি নিম্নলিখিত পলাতকদের সন্ধান দিতে পারে নিম্নলিখিত পুরস্কার পাবে।

সূর্য সেন—৫০০০, অনন্ত সিং—৫০০০, নির্মল সেন—৫০০০, গণেশ ঘোষ—৫০০০, অম্বিকা চক্রবর্তী—৫০০০, লোকনাথ বল—৫০০০ টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর ঐ সঙ্গে মহাসমারোহে ইতিপূর্বে দুর্ভাগ্যক্রমে যে সব বিপ্লবীরা ধরা পড়েছিল সরাকর বাহাদুর তাদের নিয়েই 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাম দিয়ে আদালতে শুরু করে দিয়েছে মামলা। এক স্পেসাল ট্রাইবুন্যাল গঠন করে ১৯৩০—২৪শে জুলাই।

ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেণ্ট শ্বেতাঙ্গ বিচারক—তদানীন্তন চট্টগ্রামের জেলা জজ—মিঃ ইউনি।

আর তার সহকারী বিচারক ট্রাইব্যুনালে—খান বাহাদুর মৌলভী আব্দুল ও রায় বাহাদুর নরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী।

বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন—দেশের তদানীন্তন বিখ্যাত আইনজীবীর দল, শরৎচন্দ্র বসু, সন্তোষ বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, অখিলচন্দ্র দত্ত ও কামিনী-কুমার দত্ত প্রভৃতিরা।

বিপ্লবের পথ চিরদিনই কণ্টকাকীর্ণ, শত দুঃখ, লাঞ্ছনা, পীড়ন, রক্তক্ষয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার গতি।

তাই তো, বিপ্লবীর ধর্ম! সন্ন্যাসীর ধর্ম! মান অভিমান প্রেম ভালবাসা তার জন্য তো নয়। বেদনা, হতাশা ও অশ্রুমোচন তো তার ধর্ম নয়।

বাহাদুরী বা নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখাই তার পক্ষে বিপ্লবীর ধর্ম হতে চ্যুত হওয়া।

সেইখানেই তার মৃত্যু! সেই তার শেষ!

তাই মনে হয় ১৯৩০—২৮শে জুন ইনসপেক্টার জেনারেল লোম্যানকে পূর্বাহ্নে পত্র দিয়ে অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণ—আর যাই হোক বিপ্লবীর নিষ্ঠার ও ধর্মের অপমৃত্যু ভিন্ন বোধ হয় আর কিছুই নয়।

কথার ফুলঝুরী গেঁথে নিজেকেই সমর্থন করা যায় কিন্তু বিপ্লবীর ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

বিপ্লবীর ধর্মের কষ্টিপাথরে তাই লোম্যানকে লিখিত অনন্ত সিংহের পত্রখানা তার সত্যকারের মূল্যটুকুই হয়ত যাচাই করে দিয়েছে।

তাই বলছিলাম ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানের যে রক্তক্ষরা স্মৃতি বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের পাতায় যে অনন্তলাল সিংহের পরিচয় নিয়ে ভারতের অগণিত জনগণকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল তা স্মৃতির মণিকোঠাতেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক।

১৯৩০এর ২৮শে জুন তাকে আর স্মরণ করতে চাই না!

১৯৩০এর ২৮শে জুন ১৩ নং ইলিশিয়াম রো'তে গিয়ে পূর্বাহ্নে বাংলার তদানীন্তন আই. জি. মিঃ লোম্যানকে এক পত্র লিখে অনন্ত সিংহ আত্মসমর্পণ করল।

এবং বলাই বাহুল্য অতঃপর সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত করে বিপ্লবী অনন্তলাল সিংহকে শ্বেতাঙ্গের দল চট্টগ্রামে নিয়ে এসে কারাগারে রাখল।

অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তারও অপরাধের (?) বিচার শুরু হলো।

মামলার সাড়ম্বর প্রহসন শ্বেতাঙ্গের আদালতে চলুক, আমরা ক্ষণেকের জন্য ফিরে যাই ফরাসী চন্দননগরে।

১৯৩০—১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিশেষে।

তখনো নেভেনি আকাশপটে তারকার দল।

কিসের প্রতীক্ষায় তারা এখনো জেগে আছে আকাশের বুকে!

শুধু দূর আকাশের তারার দলই নয়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন কিসের প্রতীক্ষায় কান পেতে আছে !

আসছে ঘনিয়ে একটি মুহূর্ত।

শেষরাত্রির আবছা অন্ধকারে কুখ্যাত পুলিস কমিশনার টেগার্ট সশস্ত্র একটি পুলিস বাহিনী নিয়ে গাড়িতে চেপে চলেছে চন্দননগরের পথে।

আবছা আলো-আঁধারে গাড়ির হেড্‌লাইট্‌গুলো ধ্বকধ্বক করে যেন শয়তানের চোখের মত জ্বলছে। শয়তান প্যানথার, রক্তচোষা শয়তান রক্তের সন্ধানে ছুটে চলেছে।

সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিপ্লবীদের একজন প্রহরী সজাগ ছিল। শয়তানের দল এসে গোন্দলপাড়ায় তাদের বাড়িটার চারপাশ ঘেরাও করে ফেলতেই অন্যান্য বিপ্লবীদের কাছে মুহূর্তে সে সংবাদ পেঁছে গেল।

চারিদিকে শয়তানের সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। বিপ্লবীরা আর কালবিলম্ব না করে খিড়কীর দুয়ার-পথে সরে পড়বার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলে না।

সুতীব্র টর্চের আলো ও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে ওদের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে পথ রোধ করল।

আর উপায়ান্তার না দেখে বিপ্লবীরাও প্রস্তুত হয়ে নিয়ে শক্ত মুষ্টিতে যে যার আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরল।

অগ্নুদ্গারে দিল জবাব।

একদিকে সুশিক্ষিত সরকারের বিরাট সশস্ত্র পুলিসবাহিনী অন্যদিকে মাত্র চারজন বিপ্লবী।

গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল।

দেখতে দেখতে শয়তানের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রুধিরাপ্লুত দেহে বিগতপ্রাণ জীবন ঘোষাল শরশয্যা নিল ঃ বিদায় জন্মভুমি ! বিদায় ! Adieu my Native land !

শৃঙ্খলিত হলো বিপ্লবীর।

সেইখানেই একদফা অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়ন চললো ওদের প্রত্যেকের উপরে ! সুহাসিনী দেবীও বাদ গেলেন না বর্বরোচিত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কবল থেকে।

ব্যাটনের ঘা, বুটের লাথি, চড় কিল ঘুষি একটি নারীর দেহের উপরে অবিরাম বর্ষণ করতে তথাকথিত সুসভ্য শ্বেতাঙ্গদের রুচি বা শিক্ষায়-সেদিন বাধেনি।

বীভৎস চীৎকার শ্বেতাঙ্গদের ঃ Answer our question···answer you must—otherwise we shall make you feel what is what !

কিন্তু একটি মাত্র জবাব শোনা যেতে লাগল বার বার ঃ I have nothing to say—Nothing ! Nothing ! Nothing !

শৃঙ্খলিত বিপ্লবীদের তারপর নিয়ে আসা হলো কলকাতায় এবং সেখান থেকে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত করে চট্টগ্রামে।

পথে পথে পথে তারা শুনলো অভিনন্দন—বন্দে মাতরম্! Long live Revolution!

জীবন ঘোষাল—ধনীর দুলাল। ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। অভিভাবকদের কত আশা ছিল ঐ সুকুমার কিশোরকে ধরে। কিন্তু শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী ধরিত্রীর মোহিনী আকর্ষণ কই তাকে তো ধরে রাখতে পারল না! রূপ-রস-গন্ধভরা ধরিত্রী, যেখানে সেদিন ছিল পরাধীনতার মর্মন্তুদ জ্বালা, অত্যাচারী শোষকের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন শোষণ—তাই তাকে ঘরের আরাম বিলাস ছেড়ে মৃত্যুর কণ্টকাকীর্ণ পথে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেল। মাত্র ১৭ বৎসর বয়স্ক তরুণ কিশোর। চট্টলার সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থানের সপ্তদশ শহীদ।

সেদিন বিপ্লবীদের চন্দননগর থেকে কলকাতায় ধরে আনবার পর কিশোর আনন্দ গুপ্তকে দেখিয়ে গণেশ ঘোষের পূর্ব-পরিচিত জেলারবাবু যখন গণেশ ঘোষকে প্রশ্ন করে: এই সব কচি ছেলেদেরও মার কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছেন গণেশবাবু?

গণেশ ঘোষ বলেছিল: কি করি বলুন—আপনারা বড়রা যখন পিছপাও হয়ে ইংরাজদের পোষ মেনে গিয়েছেন, তখন দেশের কাজে এমনি 'কচি ছেলে'দের বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কোন উপায় রেখেছেন কি?

পথে একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী আনন্দ গুপ্তকে তার পরিণতির কথা সে ভেবেছে কিনা প্রশ্ন করায় মৃদু হেসে তরুণ কিশোর জবাব দিয়েছিল: পরিণতির জন্য আমরা তো প্রস্তুত হয়েই এ পথে পা বাড়িয়েছি!

আর এক গাড়োয়ালী মিলিটারি পুলিসের হাবিলদার আনন্দ গুপ্তর সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতে করতে এক সময় হঠাৎ বলেছিল: বাবুজী, আপ্ ঠিক্ই কহেথে! তোমরা আমাদের মত নও। নিজেদের ঘর বাড়ি, মা বাপ, সুখ দুঃখ সব কিছুকেই পিছনে ফেলে এসেছো দেশের জন্য, আমাদেরই সবার জন্য। বুঝি কি না বাবুজী! সবই বুঝি! সাধারণ মানুষ আমরা, পেটের দায়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গোলামী করছি। কিন্তু এখনো মন আমাদের মরে যায়নি—যখনই সুযোগ আসবে দেখে নিও আমরাও এসে দাঁড়াব তোমাদের পাশে—

বাকী কথাগুলো সরকারের গোলাম বৃদ্ধ হাবিলদার শেষ করতে পারেনি, উদ্গত অশ্রু কোনমতে রোধ করে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর ভয়ে কেবিন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

তাই তো বলি:

সেদিন গোপনে যারা—
দু পায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে—
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে।

তাদের জন্য জনসাধারণও অন্তত একটিবারও অশ্রুমোচন না করে পারে নি।

এবারে আবার নতুন করে শ্বেতাঙ্গের মামলা শুরু হলো পূর্বে আত্মসমর্পিত অনন্ত সিংহ ও ধৃত সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ রায়, সহায়রাম দাস, সুখেন্দু দস্তিদার, নন্দলাল সিং, লালমোহন সেন, ফকীর সেন, শান্তি নাগ, সুবোধচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন গুহ, নিতাই ঘোষ, মণি ঘোষ, ননীগোপাল দেব, ধীরেন দস্তিদার, অনিল দাস, সৌরীন দত্তচৌধুরী, অশ্বিনী চৌধুরী, সুবোধ বিশ্বাস, সুকুমার ভৌমিক, আশু ভট্টাচার্য ও হেরম্ব বলের সঙ্গে চন্দননগরে ধৃত গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্তর। এবং বিচারপর্ব চলতে লাগল চিরাচরিত আইনকে অবজ্ঞা করে শ্বেতাঙ্গের ইচ্ছা ও খুশীতে জেলের মধ্যেই কয়েদীদের থাকবার একটি ব্যারাকে দোতলার ঘরে।

বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন তদানীন্তন দেশের অন্যতম বিখ্যাত কয়েকজন আইনজীবী : শরৎচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, অখিল দত্ত, কামিনী দত্ত ও সন্তোষ বসু মহাশয়।

শীঘ্রই দলের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার সঙ্গে সুরক্ষিত কারাগারের অন্তরালে গোপন যোগাযোগ ঘটলো। এবং গণেশ ঘোষ ও অন্যান্য বন্দীদের উদ্যোগে বন্দীদের জেল ভেঙে পালাবার এক অতি দুঃসাহসিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলতে লাগল গোপনে, নিঃশব্দে।

দেখতে দেখতে জেল ভেঙে পালাবার জন্য যাবতীয় দ্রব্য বাইরে থেকে সতর্ক প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কারাগারের মধ্যে আমদানী হতে লাগল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! কয়েকজন পাকা কয়েদীর বিশ্বাসঘাতকতায় সব ভেস্তে গেল।

তারা কিছু না দেখে আক্রোশের বশেই মিথ্যে করে বলেছিল বিপ্লবীদের একজনের কাছে নাকি সে বোমা দেখেছে।

কথাটা শুনেই তখন কর্তৃপক্ষ সশঙ্কিত হয়ে জেলের সর্বত্র তচনচ করে সব আবিষ্কার করে ফেলল।

বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিপ্লবীদের বিশ্রাম ছিল না, সরকারের পাশবিক চণ্ডনীতি ও সদাসতর্ক প্রহরা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মামলা চলাকালীন বারবার বিপ্লবীদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করে জানিয়ে দিতে লাগল : আমরা মরি নি! সাবধান!

এবং চট্টগ্রাম থেকে বিপ্লবের অগ্নিশিখা অনুকূল বায়ুতে বাংলাদেশের বহুস্থানে প্রসারিত হয়ে মধ্যে মধ্যে রক্তিম ঝলকে জানান দিতে লাগল : মেদিনীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও কলকাতায় : বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

মেদিনীপুর জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ তখনও প্রশমিত হয় নি।

দাসপুর থানার অধীনে চেতুয়াহাটের সংগ্রামীরা বিলাতী বস্ত্র নিয়ে অগ্নি-সংকারে মেতে উঠেছে, ঐ সময় ১৯৩০—৩রা জুন দারোগা ভোলানাথ ঘোষ চেতুয়াহাটে গিয়ে সত্যাগ্রহী সংগ্রামীদের গ্রেপ্তার করে সামান্য বচসার জন্য জনৈক স্বেচ্ছাসেবক শীতল ভট্টাচার্যকে নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জরিত করে অপমানিত করল।

জনতা গেল ক্ষেপে এবং সেই ক্ষিপ্ত জনতার হস্তে শ্বেতাঙ্গ-অনুচর দারোগা ভোলানাথ মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হলো।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাকিম ফজলুল করিম জনাব বাহাদুর একদল সশস্ত্র পুলিস নিয়ে এসে সমবেত জনতার উপরে বেপরোয়া গুলি চালাল।

চৌদ্দজনের প্রাণ গেল গুলিতে।

তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করে চেতুয়াহাটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু লোককে গ্রেপ্তার করে মামলা শুরু করল। এবং মহাসমারোহে বিচার করে বারজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও পাঁচজনের দুই বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডের আদেশ দিল।

১৬নং গোপ লেনে কলকাতায় বোমা তৈরীর অপরাধে ৮ই আগস্ট জগন্নাথগঞ্জ ষ্টীমারঘাটে ষ্টীমার থেকে মনোরমা ঘোষ, শিশিরকুমার ও তারক করকে গ্রেপ্তার করল শ্বেতাঙ্গ সরকারের দল এবং সুরু করলে সরিষাবাড়ী ষড়যন্ত্র মকদ্দমা।

মিঃ গার্লিককে প্রেসিডেণ্ট করে স্পেশাল ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হলো ১৯৩০এর ২রা নভেম্বর।

বিচারে তিনজনকে—সুনির্মল, অবনী ও ক্ষিতীশকে পাঁচ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তারক ও শিশিরের হয় তিন বৎসর করে কারাদণ্ড।

কলকাতায়—

২৫শে আগস্ট আবার বিপ্লবীদের টেগার্টের প্রতি তাদের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে প্রকাশ পেল।

বেলা এগারটা কি সাড়ে এগারটা হবে, জনবহুল কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে দেখা গেল একটি মোটর গাড়ি রাস্তার একপাশে নিঃশব্দে পার্ক করা আছে। সেই গাড়ির মধ্যে দীনেশ মজুমদার, অনুজ সেনগুপ্ত ও অন্য একজন বিপ্লবী বোমা ও গুলিভর্তি রিভলভার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা পূর্বাহ্নেই সংবাদ পেয়েছিল ঐ সময়েই টেগার্টের গাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে যাবে।

টেগার্টের গাড়ি আসতেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হল কিন্তু শ্বেতাঙ্গের অশেষ সৌভাগ্য—এবারেও সে বেঁচে গেল।

মুহূর্তে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল—পুলিশ ছুটে এলো।

বিপ্লবীরা বেগতিক দেখে যে যেদিকে পারলো পালাল, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো না দীনেশ—ধরা পড়লো।

অনুজ নিজের রিভলভার চালিয়ে মৃত্যু বরণ করে নিল। তৃতীয় জনকে আর ধরা গেল না। দীনেশের কাছ থেকে ও অনুজের মৃতদেহ তল্লাসী করে যে বোমা ও রিভলভার সরকার পেল বুঝতে পারল সেটা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হতেই লুণ্ঠিত অস্ত্র। আবার স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল—১৭ই সেপ্টেম্বর দীনেশের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ সগৌরবে ঘোষিত হলো।

পুলিসের ডালকুত্তারা পূর্ব হতেই বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ঐ দিনই কৈলাস বসু স্ট্রীটের ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাড়ি তল্লাসী করে ও সুরেন দত্তর বাড়িও তল্লাসী করল। সেখানে কিছু গানকটন্, বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও অ্যালুমিনিয়ানের সেল পাওয়া গেল।

আবার বসল স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল—ডাঃ নারায়ণ রায়, সুরেন দত্ত, অম্বিকা রায় প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করে সরকারের ডাইহাউসি স্কোয়ার বোমা ষড়যন্ত্র মামলার প্রহসন চললো নবোদ্যমে।

১৯৩১—২৭শে জুলাই হাইকোর্ট কর্তৃক ঐ মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘোষিত হয়ঃ ডাঃ নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসুর ১৫ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর। সুরেন দত্তর ১২ বৎসর কারাদণ্ড। রোহিণী অধিকারী ও যতীশ ভৌমিকের যথাক্রমে ৫ ও ১ বৎসর কারাদণ্ডাদেশ হলো। বাকী তিনজন পেল মুক্তি।

ঢাকা ১৯৩০—২৯শে আগস্ট তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ আই. জি মিঃ এফ্. জে. লোম্যান এবং ঢাকার এস. পি. মিঃ ই. হড্‌সন্ নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিসের এস্. পি. অসুস্থ মিঃ এইচ. এ. এস বার্টকে দেখতে ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে গিয়েছিল।

মিঃ বার্টকে দেখে দুজনে যখন রোগীর ঘর হতে বের হয়ে বাইরে এসেছে, অতর্কিতে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তরুণ বিপ্লবী বিনয় বসু রিভলবার হস্তে সাক্ষাৎ যমের মত সামনে এসে দাঁড়াল এবং বিনয়ের হস্তধৃত রিভলভার অগ্ন্যুদ্গার করল।

গুলি খেয়ে লোম্যান ও হড্‌সন উভয়েই রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হলো।

পুলিস প্রচুর খানাতল্লাসী করেও বিনয় বসুকে ধরতে পারল না।

১লা সেপ্টেম্বর হাসপাতালেই লোম্যান মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

জামসেদপুরের শ্রীরেবতীমোহন বসুর পুত্র বিনয় বসু!

কিন্তু সতর্ক প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় গেল বিপ্লবী বিনয়!

মাত্র চার মাস পরেই আবার ১৯৩০এর ৮ই ডিসেম্বর কলকাতায় ডালহাউসি স্কোয়ারে দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর সূর্যালোকে জনবহুল কর্মব্যস্ত নগরীর বিখ্যাত সরকারী দপ্তরখানা রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ে তার পুনঃ আবির্ভাব ঘট্‌লো সঙ্গে নিয়ে আরো দুজন বিপ্লবী সহচর—দীনেশ গুপ্ত ও বাদল (সুধীর) গুপ্তকে।

বাংলার তদানীন্তন ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস্ কর্ণেল সিমসন, ঐ সময় রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ে তার নিজস্ব অফিসকক্ষে কর্মে ব্যস্ত—সাক্ষাৎ শমন

বিপ্লবীরা গুলি ভর্তি রিভলবার হাতে সেই কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

মুহুর্মুহু কয়েকটি গুলির আঘাতে শ্বেতাঙ্গ সিমসনের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ চেয়ারের উপরেই লুটিয়ে পড়ল।

সিমসন নিধন যজ্ঞ সমাপ্ত করে বিপ্লবীরা এবারে বাইরে বারান্দায় এসে অগ্নিবর্ষণ সুরু করল তাদের হস্তধৃত অগ্নিনালিকা মুখে।

গোলমাল ও গুলির শব্দে হতচকিত কর্মচারীর দল যে দিকে পারল প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার্থে ছুটলো। আই. জি. মিঃ ক্রেগ, সহকারী আই. জি. মিঃ জোনস্ ও অপর একজন ইংরাজ মিঃ ফোর্ড সকলে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে গুলি বর্ষণ শুরু করল। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলির মুখে দাঁড়াতে পারল না তারা।

এদিকে টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে টেগার্ট ততক্ষণে দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়েছে রাইটার্স বিল্ডিংসে।

কিন্তু সকলের মিলিত প্রতিরোধ-চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায় বুঝি বা!

সত্যপ্রিয়, নিরঞ্জন ও বাঘা যতীনের অমর আত্মা বুঝি বিনয় দীনেশ বাদলের ওপর এসে ভর করেছে।

রাইটার্স বিল্ডিংস্ দ্বিতীয় বুড়ি বালামের তীরে হয়েছে পরিণত।

ঘন ঘন অগ্ন্যুদগারে রাইটার্স বিল্ডিংস্ প্রকম্পিত হচ্ছে।

ভারতের মুক্তিযজ্ঞের সে এক অনিভব দৃশ্য !

*** শেষ পর্যন্ত তুণের বাণ বিপ্লবীদের ফুরিয়ে এলো। শহীদ বাদল বা সুধীর গুপ্ত তীব্র বিষ পটাসিয়াম সায়ানাইড্ ভক্ষণ করে শেষ নিঃশ্বাস নিল।

দীনেশ ও বিনয় আত্মহত্যার চেষ্টা করে গুরুতর আহতাবস্থায় ধৃত হয়ে হাসপাতালে নীত হলো।

শ্বেতাঙ্গ পত্রিকা স্টেটস্‌ম্যান পরের দিন লিখল : Battle Veranda !

বিনয়ের জ্ঞান আর ফিরে এলো না, হাসপাতালে থাকাকালীন ১৩ই ডিসেম্বর তার মহাপ্রয়াণ হলো।

আর দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠবার পর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে তার অপরাধের (?) বিচার হলো।

এবং চিরাচরিত ভাবে ১৯৩১—৭ই জুলাই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তার ফাঁসী হয়ে গেল।

সে এক যুগ। সেই এক মাহেন্দ্রক্ষণ! বাংলার নাড়ীতে নাড়ীতে এসেছে যেন জীবনযজ্ঞের এক জোয়ার। ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ প্রস্রবণ!

কিশোর তরুণ যুবার দল দেখছে আবার নতুন করে মুক্তির স্বপ্ন!

চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থান কি বৃথাই যাবে!

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।

শূন্য ব্যোমে অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ, ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহ বাসে।

প্রাণের আবেগ যেন তারা আর রোধ করতে পারছে না।

আর ওদিকে নতুন করে নবীন উদ্যমে মহানায়ক মাস্টারদার সুচতুর পরিচালনায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে নিঃশব্দে—ব্যাপক গেরিলা সংগ্রামের জন্য।

সরকারের পুলিস ও মিলিটারীর তাণ্ডবলীলাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সহসা আবার ১৯৩০এর ১লা ডিসেম্বর শীতের রাত্রিশেষে চাঁদপুর স্টেশনে বিপ্লবীদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করলে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তীর উপরে নির্দেশ হলো পুলিসের আই. জি. র জীবন নিতে হবে—বিপ্লবী-চক্রে স্থির হয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, তারা ভুলক্রমে আই. জি.' র বদলে গোয়েন্দা ইনস্পেকটার তারিণী মুখার্জীকে গুলি করে হত্যা করলে।

ওরা দুজন পালাতে পারল না নির্বিঘ্নে। দুজনেই ধৃত হলো চাঁদপুর থেকে পনের মাইল দূরে। পরে বিচারে রামকৃষ্ণর হলো প্রাণদণ্ড আর কালী চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড—বয়সে সে বালক বলে।

রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। চট্টগ্রামের শরোয়াতলী গ্রামের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী, কলেজের ইণ্টারমিডিয়েটের একজন কৃতী ছাত্র। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র হওয়ায় তার উপরে বিস্ফোরক তৈরীর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। এবং বিস্ফোরক তৈরী করতে করতেই একদিন বিস্ফোরণের ফলে দেহের অনেক জায়গা তার পুড়ে যায়। নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও রামকৃষ্ণর সে সময়কার হাসিমুখে সহ্যশক্তি সত্যিই সকলকে বিস্মিত করেছে দিনের পর দিন।

* * *

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ যখন ফাঁসীর সেলে, হঠাৎ একদিন এক তরুণী ভগ্নীর ছদ্মবেশে এসে রামকৃষ্ণর দর্শনপ্রার্থী হলো।

'রামকৃষ্ণ আমার ভাই। আমি তার বোন।'

অনুমতি পাওয়া গেল।

সেলের মধ্যে প্রবেশ করতেই বিস্মিত রামকৃষ্ণ আগন্তুক তরুণীর দিকে মুখ তুলে তাকাল : আপনি ?

তরুণীর মুখে মৃদু হাসি : আপনার বোন রাণী।

বোন!

রামকৃষ্ণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল এক বাঙালী তরুণীর দুর্জয় সাহসের পরিচয় পেয়ে।

পরিচয় পেল তরুণীর নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দার।

এরপর হতে প্রায়ই প্রীতি সেলে এসে রামকৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করতে লাগল।

প্রীতি রামকৃষ্ণের কাছেই বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিতা হয়ে ওঠে সেদিন এবং যার ফলে পরবর্তী জীবনে হাসতে হাসতে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নিঃশেষে নিজেকে সে আহুতি দিয়ে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের একটি পৃষ্ঠা চিরোজ্জ্বল, চিরভাস্বর করে রেখে গিয়েছে ভারতের বীরাঙ্গণা রাণী ঝান্সী ও দুর্গাবতীর মত।

ফাঁসীর দিন এগিয়ে এলো।

রামকৃষ্ণ অসুস্থ—১০৩° জ্বর।

তথাপি নির্ভীক সৈনিক দৃঢ় পদবিক্ষেপে উঠে দাঁড়াল যে মুহূর্তে সেলের দরজার সামনে প্রহরীরা এসে দাঁড়াল।

প্রস্তুত!

হ্যাঁ। চল!

কিছু গোপন ছিল না সেদিন অন্যান্য বন্দীদের কাছে এবং নির্দিষ্ট ক্ষণটি বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আলিপুর জেলের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বন্দীদের মিলিত কণ্ঠে সরকারের কারাকক্ষের দেয়াল ও প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

বন্দেমাতরম্!

শহীদ রামকৃষ্ণ কি জয়!

আবার রেখা পড়লো রক্তের আঁচড়ে বিদ্রোহী ভারতের বিদ্রোহের ইতিবৃত্তের পাতায়।

কলকাতায় কালিঘাট—১৯৩০—১২ই ডিসেম্বর ৪১ নং ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে—তরুণ বিপ্লবী চুণীলাল মুখার্জীকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ সরকার গ্রেপ্তার করলো, এবং ঐ সঙ্গে পরে মণীন্দ্রলাল সেন ও সুবোধ দাশগুপ্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়। চুণীলাল ছিল তরুণ সঙ্ঘের সম্পাদক। বিচারপতি গার্লিককে প্রেসিডেন্ট করে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে ওদের বিচার হলো; বিচারে প্রত্যেককে এক বৎসর করে কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হলো।

আবার! আবার বিপ্লবের আগুন!

কোথায়? পাঞ্জাবে—

২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সভাপতি পাঞ্জাবের শ্বেতাঙ্গ গভর্ণর জি. ডি. মনেটরেন্সিকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠলো।

কিন্তু গভর্ণর সামান্য আহত হলো, নিহত হলো সরকারী দারোগা চন্নন

সিং গুলির আঘাতে।

বিপ্লবীকেই ঘটনাস্থলেই ধৃত করা হলো।

বাইশ বৎসর বয়স্ক পেশোয়ারবাসী এক তরুণ যুবক—হরকিষণ।

বিচার শুরু হলো—হরকিষণের সঙ্গে পাঞ্জাবের 'মিলাপ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক চমনলাল ও রণবীর সিংও ধৃত হয়ে কারারুদ্ধ হলো।

বিচারে দণ্ডাদেশ হলো—তিনজনেরই মৃত্যুদণ্ড। অপূর্ব নাটক!

১৯৩১—২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবসে যখন ভারতের সর্বত্র নীরব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ চলেছে সেইদিন প্রত্যুষে স্বাধীনতার বিজয়-তিলক কপালে এঁকে হাসতে হাসতে হরকিষণ ইংরাজের ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিয়ে গেল।

ভারতে ১৯৩০ সালটি যেন বিশেষ ভাবেই চিহ্নিত।

মুক্তিযজ্ঞের লাল সাল যেন।

মহাত্মার অসহযোগ ডাণ্ডি অভিযান, লবণ আইন ভঙ্গ থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থান, কলিকাতা, ঢাকা, চন্দননগর, মেদিনীপুর ও কুমিল্লায় বিপ্লবের অগ্নিক্ষরণ, বিদেশী দ্রব্যসমূহ বয়কট—বা বর্জন, শ্রমিকদের ধর্মঘট, সরকারের বেপরোয়াভাবে শান্তির অজুহাতে নিরস্ত্র জনসাধারণের প্রতি গুলি বর্ষণ—ব্যাপক ধরপাকড় এবং ২৩শে এপ্রিল তারিখে এক অর্ডিনান্স জারী করে আইন অমান্য ঘটিত সংবাদটুকু পর্যন্ত পত্রস্থ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৩১ খানা সংবাদপত্রের নিকট হতে ২৪০৪০০০ টাকা জামিন আদায় করল সরকার।

চৌকীদারী ট্যাকস বন্ধ করা, বা আইন ভঙ্গ করা বহুবিধ ব্যাপার একের পর এক ঘটে যায়।

সারাটা বৎসর ধরেই যেন এক ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য চলে ভারতের বুকে—স্বৈরাচার ও নিষ্ঠুর দুর্ধর্ষ দমননীতির।

১৯৩০—১২ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক নাম দিয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকারের আপন খেয়াল-খুশি মত যত সব তাঁবেদার ভারতীয় ও ব্রিটিশ নেতৃবর্গকে নিয়ে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র স্থির করবার জন্য এক সম্মেলন শুরু করা হয়।

রাজন্যবর্গের তরফ থেকে ১৬জন, ব্রিটিশ ভারত থেকে ৫৬ জন ও বিলাতের ১৩জন প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল।

যথাসময়ে সাড়ম্বরে তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ কল্পিত গোলটেবিল বৈঠকের বুজরুকী পর্ব শুরু হলো। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সরকার বুঝতে পেরেছিল বৈঠকে কংগ্রেসী নেতারা আসন না গ্রহণ করলে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম।

অতঃপর বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর কতকগুলো প্রতিশ্রুতি আদায় করে মহাত্মা ১৯৩০—২৯শে আগস্ট লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলেন শ্বেতাঙ্গের গোলটেবিল প্রহসনে যোগদান করতে। পূর্ব বৈঠকেই সাধারণ আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। এবারের বৈঠক পৃথক পৃথক কমিটিতে বিভক্ত হয়ে শাসন সম্পর্কীয় আলোচনা

শুরু করলো।

প্রত্যেক কমিটিতেই মহাত্মা ভারত শাসন সমস্যা সম্পর্কে সুন্দর, প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষায় কংগ্রেসের অভিমত ব্যক্ত করলেন।

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী, দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, রাজস্ব, বাণিজ্য, জাতীয় ঋণ প্রভৃতি নানা বিষয় তাঁর বক্তৃতার বিষয় হলো।

কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।

কোন প্রকার প্রতিশ্রুতিই পাওয়া গেল না, কেবল মৌখিক অর্থহীন আশ্বাস।

১লা ডিসেম্বর গোলটেবিল পর্ব শেষ হলো।

যা হবার এবার আবার তাই হলো।

তথাকথিত গোলটেবিল পর্ব সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সরকারের দমননীতি পুনরায় ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ৫ই ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস নিলেন।

লোকমান্য তিলককেও দেশবাসী ঐ সংকট মধ্যেই হারায়।

কাল এগিয়ে চলেছে তার পরিক্রমার পথে।

শোণিতসিক্ত পদে এগিয়ে চলেছে বিপ্লবীর দল: ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের ইতিহাসের পাতাগুলো একের পর এক ভরে উঠছে।

১৯৩০ সাল পার হয়ে গেল পশ্চাতে আগুনের দেদীপ্য শিখার স্মৃতি রেখে—সম্মুখে ১৯৩১ সাল।

গোলটেবিল প্রহসনের শেষ দিন মহাত্মার বক্তৃতার কথাগুলো ভোলা যায় না। যার সারমর্ম এই:

তাঁর বক্তৃতা বা তাঁর প্রচেষ্টা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এ দুরাশায় তিনি কোন কিছু বলেন নি। কারণ শাসক ও শোষিতের সম্পর্কটা তাঁর কাছে তো অবিদিত ছিল না।

বহু ব্যক্তিই দুশ্চিন্তা বোধ করেছেন ও প্রকাশ করছিলেন ভারতে ঐ সময় যে ভাবে সন্ত্রাসবাদ (?) আন্দোলন (বিপ্লব আন্দোলন) ও আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল তার গতি দেখে। তার উত্তরে মহাত্মা বলেছিলেন: আমি একজন ঐতিহাসিক না হলেও একথা বলতে পারি যে, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গিয়েছেন, তাঁদের রক্তে ইতিহাসের পাতা রাঙা হয়ে আছে। দুঃখকে বরণ না করে কোনও জাতির স্বাধীন হওয়ার কোন নজির আমার জানা নেই। (তথাকথিত) সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে ওকালতি না করেও একথা বলা যায় যে, গুপ্তঘাতকের অস্ত্র, বিষ, রাইফেলের কার্তুজ বা বর্শা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র—স্বাধীনতার অন্ধ-পূজারীরা আজ পর্যন্ত যা ব্যবহার করেছেন—তার জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁদের অপরাধী বলে গণ্য করেন নি।

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি' বিক্ষুব্ধ ধূলায়
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ,
মানুষের মহালোভ—বাঁচিবার লোভ যারা ত্যাজিল হেলায়

নিশ্চিন্তে জীবন যাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জন।
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহু লক্ষ পরাধীন আশাহীন জনে
পথ-কুকুরের মত পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরে দীর্ঘ দিন,
কেহবা বরিল কারা—কেহ মৃত্যু, মহোল্লাসে প্রেম-আলিঙ্গনে—
জীবনের সর্ব আশা স্বেচ্ছাবৃতে অপঘাতে করিল বিলীন।
ক্লেদপঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোকবার্তাবহ—
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার—
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদের স্মরণ করি মৃত্যু দীক্ষা লহ,
নবাগত হে সাধক, বিগত সাধকদলে কর নমস্কার॥

হাঁ নমস্কার করি! নমস্কার করি! প্রণাম জানাই!

চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানের বহু সংগ্রামী তখনও ব্রিটিশের শ্যেন চক্ষুর প্রহরাকে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত করে পলাতক জীবন যাপন করছে। তাদের মধ্যে দুইজন—চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজার নিবাসী শরৎচন্দ্র দস্তিদারের পুত্র তারকেশ্বর দস্তিদারকে ও চট্টগ্রামের বরমা ও ফিরিঙ্গিবাজার নিবাসী চন্দ্রকান্ত দের পুত্র বীরেন্দ্র দেকে ধরিয়ে দিতে পারলে শ্বেতাঙ্গ সরকার ৫০০ টাকা পুরস্কার দেবে ঘোষণা করেছিল। তারা জরুরী প্রয়োজনে বরমা গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ১৬ই মার্চ হঠাৎ একদল পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আকর্ষিত হল।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের দারোগা দেশের শত্রু শশাঙ্ক ভট্টাচার্য ওদের চ্যালেঞ্জ জানাল: দাঁড়াও, তোমরা কে!

পরিচয় দিল তারা তাদের দেহের অভ্যন্তরে সংগুপ্ত লোডেড রিভলভার বের করে অগ্নিঝলকে।

এদিকে তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

দুই পক্ষেই গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

শশাঙ্ক গুলিতে আহত হয়ে ধরাশায়ী হলো, ঐ ফাঁকে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তারক ও বীরেন গা-ঢাকা দিল।

সরকার বুঝতে পারল গুপ্ত বিপ্লবীর দল তাদের ভয়ে চুপ করে বসে নেই।

তারা তাদের কাজ করে চলেছে।

মেদিনীপুরেও ঐ সময় পুলিসের জুলুম পুরো মাত্রাতেই চলছিল।

দাসপুর থানাকে কেন্দ্র করে যে অসন্তোষের বহ্নি আত্মপ্রকাশ করে ও পুলিসের অগ্নিনালিকার মুখে রক্তক্ষয় হয় তার জের তখনও থেমে যায় নি।

মেদিনীপুরে ঐ সময় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ পেডি—এক শ্বেতাঙ্গ।

শ্বেতাঙ্গ হলেও লোকটি তত খারাপ ছিল না। তবে তারই শাসনকালে মেদিনীপুরে নানা অত্যাচার জনসাধারণের প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও তার কোন প্রতিকার করতে সক্ষম না হওয়ায় বিপ্লবী দলের আক্রোশ তাকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করে আত্মপ্রকাশ করলো।

পেডির মৃত্যুপরোয়ানা তার অজ্ঞাতেই রক্তাক্ষরে স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

মেদিনীপুরে ঐ সময় কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে এক শিল্পপ্রদর্শনী চলছে।

৭ই এপ্রিল : পেডি ঐ প্রদর্শনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে এলো।

সভার কার্য চলছে, চারিদিকে অগণিত নরনারী বালক বৃদ্ধ যুবা শিশু—সহসা বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্র মুখে বজ্রবিদ্যুতের হুংকার জেগে উঠলো শান্ত পরিবেশকে ছিন্নভিন্ন করে।

শ্বেতাঙ্গের রক্তে মাটি আবার লাল হয়ে গেল।

মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে এলো।

ঐ ঘটনা উপলক্ষ্যে বিমল দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে বিচারে প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় তাকে।

চট্টগ্রামের আদালতে ১৯৩১এর জুন—তখন প্রথম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা মহাসমারোহে চলছে।

শহরের চারিদিকে সশস্ত্র মিলিটারির সতর্ক প্রহরা। পথে ঘাটে সর্বত্র সঙ্গীনের চোখ রাঙানি। মহানায়ক মাস্টারদা মনে মনে সংকল্প করলেন : প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরকের সাহায্যে তিনি ল্যাণ্ড মাইন তৈরী করবেন এবং যে সব রাস্তা দিয়ে ট্রাইব্যুন্যালের বিচারপতিরা ও কর্তৃস্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা যাতায়াত করে বেছে বেছে সেই সব পথে মাইন বসিয়ে সুযোগ ও সুবিধামত ঐ সব দুর্বৃত্তদের প্রাণনাশ ঘটানো হবে মাইন বিস্ফোরণের সাহায্যে।

কল্পনামত প্রস্তুতি চলতে লাগল।

চট্টগ্রামের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে সোরা, গন্ধক প্রভৃতি বারুদের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রায় পাঁচ মণ বারুদ তৈরী হলো।

কল্পনা দত্ত ও মনোরঞ্জন রায়ের প্রচেষ্টায় কলকাতা থেকে প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড্, নাইট্রিক অ্যাসিড ও গান কটনও আমদানি করা হলো এবং বিস্ফোরকও তৈরী হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই—শ্বেতাঙ্গ সরকার বিশ্বাসঘাতক স্পাইয়ের মুখে গোপনে সংবাদ পেয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং ২৬শে মার্চ দ্বিপ্রহরে একটি বালককে সন্দিগ্ধ-ভাবে একটি বাণ্ডিল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করল। বালকের নিকট প্রাপ্ত বাণ্ডিলটার মধ্যে একটি ক্যানেস্তারা (Canister) পাওয়া গেল। পরে আরো ঐ ধরনের এগারটি ক্যানেস্তারা পুলিস আবিষ্কার করে। সরকারের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ইন্সপেক্টার মিঃ মৈত্র ঐ ক্যানেস্তারাগুলো পরীক্ষা করে মত দিল, ঐগুলিকে বৈদ্যুতিক তারযোগে দূর হতে জ্বালাবার ব্যবস্থা উহার মধ্যেই আছে এবং কোন ঘর উড়িয়ে দেবার জন্য ঐরূপ মাইন খুব সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হলো ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড়।

এবং এগারজনকে গ্রেপ্তার করে সরকার ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা রুজু

করলো ফলাও করে।

অভিযুক্ত করা হলো ১৬-১৭ বৎসর বয়স্ক একদল তরুণ কিশোর ও একজন কিশোরীকে।

কল্পনা দত্ত, অর্ধেন্দু গুহ, কালী দে, নিবারণ ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক, রবি সেন, সুশীল সেন, অপূর্ব সেন, অনিল রক্ষিত, প্রভাত দত্ত ও শচীন সেন।

বিচারে দণ্ডাদেশ হলো আটজনের প্রতি—অর্ধেন্দু, নিবারণ, প্রফুল্ল, রবি, সুশীল, অনিল, হৃদয় ও প্রভাত!

আবার বিপ্লবীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করলো—২৩শে জুলাই সুদূর পুণা শহরে। পুণার ফার্গুসন কলেজে বোম্বাইয়ের শ্বেতাঙ্গ গভর্ণর স্যার আর্নেস্ট হট্‌সন উপস্থিত কলেজের লাইব্রেরী ঘরে বক্তৃতা দিতে।

গরম গরম বক্তৃতা চলেছে, এমন সময় অতর্কিতে উনিশ বৎসরের এক বিপ্লবী মহারাষ্ট্রীয় যুবক বলবন্ত গোগটির হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করলো। গভর্ণর কিন্তু অক্ষত দেহে বেঁচে গেল—কারণ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল—দুর্ভাগ্য!

ঘটনার পরে সেই নির্ভীক যুবককে গভর্ণর বাহাদুর দয়াপরবশ হয়ে বোধ হয় বলেছিল: A foolish thing to do my boy, what made you to do it!

নির্বোধ সে ছিল না, তোমার প্রশ্নই ছিল নির্বুদ্ধিতার চরম। কেমন করে তুমি বুঝবে কি যাতনায় সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিল!

এদিকে ঠিক চারদিন বাদেই আবার বিপ্লবীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র শহীদ দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রতি বিচারে প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ বিচারপতি শ্বেতাঙ্গ গার্লিকের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে মৃত্যুগর্জন করে উঠলো।

মিঃ আর. আর. গার্লিক. আই. সি. এস. আলিপুরের তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ।

রামকৃষ্ণ ও দীনেশের বিচারের জন্য যে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়—গার্লিক ছিল তার প্রেসিডেন্ট। প্রকৃতপক্ষে তারই কলমে দীনেশ ও রামকৃষ্ণের মৃত্যুপরোয়ানা লিখিত হয়—কিন্তু সে বুঝতেও পারে নি প্রায় ঐ সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকে তার নিজেরও মৃত্যুপরোয়ানা স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে।

শহীদ দীনেশ গুপ্তর ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দানের মাত্র কুড়ি দিন পরেই ২৭শে জুলাই বিচারপতি গার্লিক যখন তার এজলাসে বসে বিচারে নিযুক্ত, জামার মধ্যে গুলি ভরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এক বিপ্লবী যুবক ধীর শান্ত নির্ভীক পদে এজলাস কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

দুড়ুম!

বিপ্লবীর হাতের অব্যর্থ নিশানা ব্যর্থ হলো না।

বুলেট গিয়ে গার্লিকের বক্ষ বিদ্ধ করলো ঃ রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ বিচারপতি মুহূর্তে এলিয়ে পড়লো বিচারাসনের উপরেই।

একটা হৈ চৈ গোলমাল শুরু হয়ে যায়, ঘটনাস্থলে ঐ সময় একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট, একজন কনস্টেবল ও একজন গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা উপস্থিত ছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে বিপ্লবীকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু জীবন্ত বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো না ওরা, পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খেয়ে নিমেষে যুবক স্বেচ্ছায় প্রাণ দিল!

মৃত বিপ্লবীর দেহ সার্চ করে জামার পকেটে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল ঃ

তুমি ধ্বংস হও, দীনেশকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছো, তাহার এই শাস্তি!

বিমল গুপ্ত

গার্লিকের বক্ষরক্তে দীনেশ ও রামকৃষ্ণের হত্যা-তর্পণ এতদিনে বুঝি অনুষ্ঠিত হলো।

২১শে আগস্ট ঢাকার কমিশনার মিঃ এ. ক্যাসেলের উপরে টাঙ্গাইলের কো-অপারেটিভ কার্যালয়ে একজন বিপ্লবী গুলি চালায়। কিন্তু কমিশনার বাহাদুর দৈবগতিকে অক্ষত থেকে যায়।

বিপ্লবী যুবকটি উধাও হয়ে যায়।

উক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক দিবস বাদে ৩০শে আগস্ট আবার চট্টগ্রাম শহরে অগ্ন্যুদ্গার দেখা দিল বিপ্লবীর দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র মুখে।

উন্মুক্ত খেলার মাঠে ফুটবল ফাইনাল ম্যাচ খেলা চলেছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা হবে।

বহু দর্শক আজ এসেছে খেলার মাঠে এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও অনেকে এসেছে খেলা দেখতে। তাদের মধ্যে এসে বসেছে কুখ্যাত, অত্যাচারী শয়তান পুলিশ ইনস্পেক্টর এবং ঐ সময়কার ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্মচারী বহু দুষ্কৃতির হোতা জনাব আসানুল্লা।

জনাব আসানুল্লা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তার বহু অত্যাচার ও দানবীয় কুকীর্তির জবাবদিহির সময়টি ঘনিয়ে এসেছে ঐদিন ঐখানেই। তার মৃত্যুলিপি স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে অদূরে জনসমুদ্রের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে গুলি ভর্তি পিস্তল নিয়ে এক কিশোর বালক ঃ শ্রীমান হরিপদ ভট্টাচার্য।

দুম্! দুম্!...

সহসা অগণিত দর্শকজনকে সচকিত ও বিমূঢ় করে হরিপদর হস্তধৃত আগ্নেয়াস্ত্র মৃত্যুগর্জন করে উঠলো। শয়তানের রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহ মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কিন্তু সতর্ক পুলিস প্রহরীদের ও জনতার ভিড়ের মধ্যে বালক হরিপদ

পালাবার পথ করে নিতে পারল না। আগ্নেয়াস্ত্র সহ হরিপদ সরকারের করতলগত হলো।

গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস দানবীয় উল্লাসে বালক হরিপদর দেহের উপরে একদফা তাণ্ডব নৃত্য করল। তারপর জেলের মধ্যেও হাত পা বেঁধে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো কয়েক দফা চালানো হয় নিষ্ঠুর হৃদয়বিদারক অত্যাচার বালকের সুকুমার দেহের উপর।

কিন্তু একটি কথাও, একটি প্রতিবাদও এত অত্যাচারে উচ্চারিত হয়নি সেদিন নির্ভীক সেই বালকের কণ্ঠ হতে।

মাস্টারদার নির্দেশ যে সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

আর তো তার কোন খেদ নেই, কোন দুঃখ নেই।

সে তো জানতই :

প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে !

অত্যাচারে অত্যাচারে, চরম পাশবিক নিষ্ঠুরতম পীড়নে বালকের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ হতে রুধির নির্গত হয়ে সর্ব দেহ তার সিক্ত করে দিল।

তবু নিশ্চুপ !

ধন্য তুমি মাস্টারদা ! ধন্য সূর্য সেন !

কি মন্ত্র তুমি দিয়েছিলে ঐ সুকুমারমতি বালকের শ্রবণবিবরে তা তুমিই জান !

দুর্ধর্ষ পুলিসও সেদিন চমকিত হয়েছিল বৈকি এক কিশোর বালকের দেশপ্রেম ও দেশপ্রীতির নিষ্ঠার চরম ও অভূতপূর্ব বিকাশ দর্শনে।

ভারতের লৌহশিশু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

যথাসময়ে বিচার প্রহসন শুরু হলো : বিচারে হলো হরিপদর প্রাণদণ্ডাদেশ।

পরে হাইকোর্টে আপীলে—পুনরাদেশ হলো যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

শ্বেতাঙ্গদের ভারত শাসনের ইতিবৃত্তের পাতায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও হিজলীর হত্যাকাণ্ড চিরদিন তাদের শ্বেতাঙ্গীয় বর্বর নীতির স্বাক্ষর দেবে।

১৬ই সেপ্টেম্বর—১৯৩১ সনের লাল তারিখটি দেশবাসী কোন দিনও ভুলবে না।

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর স্টেশন হতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত হিজলী নামক স্থানকে এক সময় শ্বেতাঙ্গ সরকার জেলার সদর করবে বলে মনস্থ করায় অনেকগুলো বাড়ি নির্মাণ করে।

পরে সদরের স্বপ্ন নিয়ে তৈরী সেই বাড়িগুলোই পরিণত হয় বন্দীশালায়।

কর্মকুশল, ন্যায়নিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সরকার গায়ের জোরে বিনা বিচারেই ছয়শত ভারতবাসীকে হিজলী বন্দী নিবাসে অন্তরীণাবদ্ধ করে রেখেছিল।

১৯৩১-এ যখন এক অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে হিজলীর মাটি রক্তরাঙা হয়ে উঠেছিল তখন প্রায় আড়াইশত বন্দী ঐখানে অন্তরীণ ছিল।

ভদ্র সন্তান তারা। শিক্ষিত মার্জিতরুচি প্রত্যেকে।

চোর ডাকাত নয় তারা—তাদের অপরাধ ছিল দেশপ্রেম! দেশকে তারা অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে এই অপরাধেই তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল বিনা বিচারে কেবল মাত্র তাদেরই মনের বিকৃত সন্দেহে।

বন্দীদের দৈনিক খোরাকীর ব্যবস্থা ছিল সর্বসাকুল্যে এক টাকা দশ আনা। অবশ্য কাপড়-চোপড়ের জন্য তাদের আলাদা করে কিছু টাকা দেওয়া হতো।

সাধারণ মানুষই তারা, সাধু বা যোগী নয় যে দিনের পর দিন আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে একটা চতুষ্কোণ বাড়ির মধ্যে বন্দীজীবন আনন্দের সঙ্গে যাপন করবে।

মিঃ বেকার সিভিলিয়ান হলেও সে কথাটা বুঝতেন, সেই কারণেই প্রথম দিকে কিছুকাল বন্দীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় ছিল। কিন্তু কয়েকটি ঘটনায় ঐ সদ্ভাবটুকু আর বজায় রইলো না।

বন্দীনিবাসের নিয়ম ছিল, বন্দীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলে ডবল অর্থাৎ সোয়া তিন টাকা খোরাকী পেত। ঐ কারণেই ও হাসপাতালের কিছুটা শুদ্ধ আবহাওয়ার ও সুব্যবস্থার জন্য বোধহয় বন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হলেই হাসপাতালে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতো।

কর্তৃপক্ষ ভাবলেন বন্দীদের ওটা একটা অন্যায় অজুহাত সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়; বন্দী যারা তাদের আবার অসুখ কি! কি অন্যায়, সত্যিই তো!

কর্তৃপক্ষ এরপর হতে শুরু করলো বন্দীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলেও সহজে হাসপাতালে পাঠাতে অনিচ্ছা ও জিদ প্রকাশ।

এই হলো উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো বন্দীদের মাসিক খরচা কর্তৃপক্ষ কমিয়ে দেওয়ায়।

বন্দীদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। ভিতরে ভিতরে তারা গুমরাতে লাগল।

আরো একটি স্ফুলিঙ্গ সংযোজিত হলো—আলিপুরের জজ মিঃ গার্লিক নিহত হবার পর হিজলী বন্দী-নিবাসকে বন্দীগণ কর্তৃক আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে।

কর্তৃপক্ষ কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন তুললো: এ সবের অর্থ কি! What do you mean!

বন্দীরা জবাব দিল: ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় হাইকোর্টের আপীলে অনেকে মুক্তি পেয়েছে, তাদেরই সম্মানার্থে এই আলোকসজ্জা!

কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝলো, সত্য তা নয়।

মনের ভিতরের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো।

১৫ই সেপ্টেম্বর বন্দী দীনেশ সেনকে হিজলী বন্দী-নিবাস থেকে বক্সা বন্দী-নিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়—বিদায়ের সময় রাত্রে সব বন্দীরা দীনেশ সেনকে বন্দী-নিবাসের মেন গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যায়।

প্রহরীরা দিল বাধা, কিন্তু ওরা বাধায় কর্ণপাত করলে না। কিছু বচসা

হলো পরস্পরের মধ্যে। স্পষ্টই চাঞ্চল্য দেখা গেল প্রহরীদের মধ্যে।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রে কয়েকজন বন্দী বাইরের কম্পাউণ্ডের মধ্যে পায়চারি করছিল। তাদের সঙ্গে আবার প্রহরীদের ঐ সময় কিছু বচসা হলো।

প্রহরীদের আক্রোশ-বহ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো।

এতদিনকার চাপা আগুন সহসা দপ করে শত শিখায় লেলিহ হয়ে উঠলো।

পূর্বাহ্ণেই তারা ঐ মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। ময়মনসিংবাসী একজন মুসলমান হেড কনস্টেবল সহসা তার হস্তধৃত রাইফেলটা উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো: হুকুম মিল গিয়া। শালালোক্‌কো মার ডালো।

দেখতে দেখতে চারপাশ থেকে সেপাইদের হাতের অগ্নিনালিকা অগ্ন্যুদ্গার শুরু করে দিল।

দুম্! দুম্!…দুম্! দুম্!…

বীভৎস, তাণ্ডব, নারকীয় সে দৃশ্য!

নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় মুহূর্তে বন্দীনিবাসটি বন্দুকের শব্দে, ধোঁয়া-বারুদের গন্ধে, নিরীহ নিরস্ত্র বন্দীদের রক্তে ও আর্তকাতর শব্দে যেন নরকখানায় পরিণত হলো।

নৃশংস বেপরোয়া গুলি চালনার ফলে শতাধিক নিরীহ, নিরস্ত্র বন্দী আহত হলো।

শহীদ সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত আপন আপন বক্ষরক্তে হিজলীর মাটি রাঙা করে সেইখানেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লো।

হৈ হৈ পড়ে গেল চারদিকে।

মেদিনীপুর থেকে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেব, খড়্গপুর থেকে কমাণ্ডাণ্ট্ মিঃ বেকার, পুলিস সুপার, ইন্‌স্‌পেকটার প্রভৃতি অবিলম্বে এসে হিজলী বন্দীনিবাসে হাজির হলো।

শ্বেতাঙ্গ ডগলাস মহাপ্রভু তো এসেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চেয়ারের উপরে উপবেশন করলো এবং সোজা টেবিলের ওপরে পা তুলে দিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললে, বেকার, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, এদের অত্যধিক আদর দিয়েছো।

বাহবা নন্দলাল! সাবাস!

আশ্চর্য কিছুই নয়।

কারণ, কথিত আছে, দয়ার অবতার কোন এক দেশবিশ্রুত শ্বেতাঙ্গ একজন পথের ভিক্ষুককে শ্রীচরণের আঘাত হেনে বলেছিলেন: These street dogs, do you think they have got any life!

অতএব ডগলাস সাহেবের মুখে সন্দেহক্রমে ধৃত ও বন্দী ভারতীয়দের রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ হতে দেখে অমন স্বর্গীয় উক্তি উচ্চারিত হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

বেকার বোধহয় একটু বুদ্ধিমান ছিল, বললে, Exchange our posts, you will see!

বেশী দিন নয়, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গ ডগলাসকে বক্ষরক্ত দিয়ে

ভারতের সে রক্তঋণ শোধ করতে হয়েছিল। Tooth for a tooth! Eye for an Eye!

এদিকে কলকাতা থেকে শ্রীসুভাষ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হিজলীতে গিয়ে চাক্ষুষ সব ব্যাপারটা দেখবার জন্য হাজির হলেন।

শ্বেতাঙ্গ সরকার আহত ঐ অন্তরীণ দেশপ্রেমিকদের বিপক্ষেই তোড়জোড় করে একটি মামলা শুরু করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টর আলতাফ্‌ আলী ও আলিপুরের পাব্‌লিক প্রসিকিউটর নগেন বাঁড়ুয্যের অসমর্থনের জন্য একপ্রকার বাধ্য হয়েই সরকারকে চুপ করে যেতে হলো।

অতঃপর একটি বিভাগীয় তদন্ত হলো। তদন্ত করলেন জাস্টিস সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ড্রামণ্ড।

তদন্তে স্থির হলো—আসামীদের ব্যবহার সময় সময় উত্যক্তজনক ছিল বটে, তবে বেপরোয়া গুলি চালানো খুবই অন্যায় হয়েছে।

আহা! সাধু! সাধু! তোমার মহিমা বর্ণিতে অপার!

১৭ই দ্বিপ্রহরে হাওড়া স্টেশনে দুই শহীদ তারকেশ্বর ও সন্তোষের মৃতদেহ নিয়ে আসা হলো। কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে তাদের শেষকৃত্য করা হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতার গড়ের মাঠে লক্ষাধিক লোকের জনসভায় হিজলী বন্দীনিবাসের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেশের হয়ে।

কবি বললেন :

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই; আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষের কৃত অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের ওপরে সেই সব শাসনকর্তার এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বের শ্রেয়ো বুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

*　　*　　*

প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্‌ শক্তি?

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন

করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের সম্পূর্ণ অবসান হলেও সকল দেশবাসীর ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূল্যে পুণ্য শিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি প্রদান করবে।

ওদিকে তখন—

কাকোরী মামলার অভিযুক্তের দল যারা হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে দেশের মুক্তি-সাধনায় এগিয়ে চলেছিল—রামপ্রসাদ, আসফাকউল্লা ও ঠাকুর রোশেন সিং প্রভৃতির ফাঁসিতে সেই দলের নেতৃত্ব নতুন করে এসে চন্দ্রশেখর আজাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়।

কাকোরী মামলা থেকেই চন্দ্রশেখর আজাদ সরকারের অভিযুক্তের তালিকায় স্থান পেয়েছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সরকার চন্দ্রশেখরকে ধরতে সক্ষম হয়নি। ফেরার অবস্থাতেই চন্দ্রশেখর কিছুকাল ভগৎ সিং প্রভৃতিকে নিয়ে নতুন ভাবে দল গঠন করে মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।

ঐ দলেরই পরিচালনায় কয়েকটি লুণ্ঠন ও ১৭ই ডিসেম্বর স্যাণ্ডার্স হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

ডালকুত্তার দল দ্বিগুণ উৎসাহে চন্দ্রশেখরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এর পর।

অবশেষে ১৯৩১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ নগরীর অ্যালফ্রেড্ পার্কে গুপ্তচর-মুখে পূর্বাহ্ণেই সংবাদ পেয়ে চন্দ্রশেখরকে ধরবার চেষ্টায় চারিদিক থেকে পার্কটি ঘিরে ফেলল লাল পাগড়ির দল।

শুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষে অগ্নিনালিকা মুখে গুলি-বিনিময়।

একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিস কর্মচারী গুরুতররূপে আহত হলো।

কিন্তু বিপ্লবী চন্দ্রশেখরকে ধরতে পারল না শ্বেতাঙ্গের অনুচর।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।

চিরমুক্ত চিরস্বাধীন বিদ্রোহী আপন আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বক্ষ পেতে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে দেশজননীর পায়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে গেল।

আবার কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি:

ওরে হতভাগ্য দেশ, তাঁদের স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ,
নবাগত হে সাধক, বিগত সাধকদলে কর নমস্কার॥

নমস্কার!

ওগো মহাপ্রাণ
সার্থক হউক তব
এ মহাপ্রয়াণ···

এদের স্মরণ করে মনে হয় চিরদিন যেন বলতে পারি:

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে—

কুমিল্লার তদানীন্তন কুখ্যাত অত্যাচারী পুলিস সুপার শ্বেতাঙ্গ মিঃ এলিসনেরও আসানুল্লার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মৃত্যু-পরোয়ানা স্বাক্ষরিত হয় বিপ্লবী চক্রের সিদ্ধান্তে।

জালালাবাদ সমরাঙ্গণের অন্যতম দুঃসাহসী সৈনিক বিনোদ দত্ত মহানায়ক সূর্য সেন—মাস্টারদার নির্দেশে গোপনে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে কুমিল্লায় গিয়ে সেখানকার দলটিকে পুনরুজ্জীবনের ভার নেয়।

কুমিল্লার বিপ্লবী সংঘের নেতারূপে বিনোদ দত্ত সংঘের অন্যতম কর্মী শৈলেশ রায়ের উপরে এলিসন নিধনের ভার দিল তুলে।

একটা গুলি ভর্তি পিস্তল শৈলেশের হাতে তুলে দিয়ে বিনোদ দত্ত বললে: এই পিস্তল! এলিসনের বক্ষরক্ত চাই!

নিঃশব্দে আজ্ঞা প্রতিপালনে অগ্রসর হলো শৈলেশ।

শৈলেশকে পূর্বাহ্ণেই এলিসনের গতিবিধি সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবী চক্র হতে।

পথের বাঁকে রিভলভার হাতে শৈলেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠিক সময়েই দেখা গেল, এলিসন সাইকেলে চেপে ঐ পথেই আসছে।

গুলির সীমানার মধ্যে এলিসন সাইকেলে এসে পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীর হস্তধৃত পিস্তল অগ্নিঝলকে মুখর হয়ে উঠলো।

মুহূর্তে এলিসনের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত হয়ে সাইকেল থেকে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

অনেক অনুসন্ধান করেও ডালকুত্তার দল এলিসনের প্রাণদণ্ডকারীর সন্ধান করতে পারে নি। এবং উক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক দিবস পরেই—

ঢাকায় আবার অগ্নিঝলক দেখা দিল বিপ্লবী সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের মুষ্টিবদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র মুখে।

সরোজ গুহ চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানের একজন পলাতক সৈনিক। চট্টগ্রাম শহরের উকীল শ্রী নন্দলাল গুহর পুত্র।

ঐ সময় পলাতক নিরুদ্দিষ্ট সরোজ গুহ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা ছিল ৫০০ টাকা পুরস্কার।

চট্টগ্রাম থেকে সরোজ গোপনে পলায়ন করে একেবারে ঢাকায় চলে যায়।

সেখানে গিয়ে নোয়াখালির বিপ্লবী রমেন ভৌমিককে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নোর নিধনকল্পে প্রস্তুত হয়।

ডুর্নোকে ওরা দুজনে ছায়ার মত সর্বত্র আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় অনুসরণ করে ফিরতে থাকে।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এক অপরাহ্নবেলায়।

শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব ডুর্নো এক মদের দোকান থেকে যখন বগলে মদের বোতল নিয়ে খোশ মেজাজে নির্গত হয়ে পথের উপরে এসে তার নিজের অপেক্ষমান গাড়ির পাদানিতে পা দিয়েছে দুম দুম শব্দে গুলি ছুটে এলো।

আহত রক্তাক্ত ডুর্নো মাটিতে পড়ে গেল—বিপ্লবীরা ডুর্নোকে মৃত জেনে চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ডুর্নোর কই-মাছের প্রাণ, বুলেটও সে হজম করে বেঁচে উঠলো।

পুলিস আততায়ীর কোন সন্ধানই করতে পারল না এবং সেই আক্রোশে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা শহরবাসীর উপরে যে নির্মম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় ভাষায় তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। একমাত্র শ্বেতাঙ্গের অভিধানেই পৃথিবীতে তার নজির পাই—

* * *

নিজহাতে সৃষ্টিধর সাগরের কিনারে স্বর্গদ্বারে বিনয়ের চিতাশয্যা প্রস্তুত করে দিল।

একে একে সকলেই চলে যাচ্ছে।

প্রথম যৌবনে হাত ধরাধরি করে সকলে পথে এসে নেমেছিল : কণ্টকাকীর্ণ পথে পথে দীর্ঘদিন ধরে সেই চলা। কত লাঞ্ছনা, ক্লেশ, অপমান ; দুঃসহ দুঃখের হোমানলে প্রতিটি দিন ও রাত্রির সেই দীর্ঘ দুস্তর অসমাপ্ত সাধনার ইতিবৃত্তের পাতাগুলো যেন স্মৃতির আকাশপটে উড়ে উড়ে চলেছে।

সন্তোষ, নীলাঞ্জন, বিনয়, দিদি—হিরণ্ময়ী!

দিদি আর তার বড় আদরের মা-হারা ছোট ভাইটি—নীলাঞ্জন।

আজ কেন যেন বার বার ঐ নীলাঞ্জনের কথাই মনে পড়ছে।

হিরণ্ময়ী, নীলাঞ্জন, সন্তোষ আর মৃণাল!

জীবনের সেই দীর্ঘ পরিচ্ছেদটা ওদের চারজনকে নিয়ে যেন ভরে আছে।

আজই রাত্রের ট্রেনে সতীকে সঙ্গে করে সৃষ্টিধর কলকাতায় ফিরে যাবে।

আশ্চর্য মেয়ে ঐ সতী! কাল থেকে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি।

মেয়েটা যদি একটু প্রাণ খুলে কাঁদতও, বুকের ভিতরের নিরুদ্ধ বেদনার বোঝাটা হয়ত একটু হালকা হতো।

পিয়ন এসে দাঁড়াল বারান্দায়, বাবু, চিঠি।

চিঠি!

বিস্মিত সৃষ্টিধর পিয়নের হাত থেকে চিঠিটা নিল।

বহু ডাকঘরের ছাপে কণ্টকিত হয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে চিঠিটা এসেছে।

শেষ রিডাইরেকটেড হয়ে এসেছে কলকাতার মেস থেকে।

চিঠিটা খুলে ফেললে সৃষ্টিধর।

মৃণাল! মৃণাল চিঠি লিখেছে!

তোমার মনে আছে কিনা আজও আমাকে জানি না। তবে তুমি বলেছিলে যদি কোন দিন শোন যে স্বামী পুত্র নিয়ে আমি সুখের সংসার গড়েছি তখন

একদিন আসবে। দেখতে আসবে। অন্তরের শুভেচ্ছা জানাতে আসবে।

কতদিন তোমার ঠিকানা খুঁজেছি কিন্তু জানতে পারিনি। কেউ বলতে পারেনি।

কাল হঠাৎ আমার স্বামীর মুখে তোমার সংবাদ পেয়ে দেশের বাড়ির ঠিকানায় তোমাকে এই চিঠি লিখছি। একবার এসো।

আমার স্বামীকে হয়ত তুমি চিনতে পারবে। বর্তমানে তিনি কৃষ্ণনগরে ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ—এ. এন্. মুখার্জী। ইতি—

মৃণাল

জজ এ. এন. মুখার্জী! রায় অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী বাহাদুর!

নামটা অত্যন্ত চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে কেন?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে। ঠিক।

বহরমপুরে একদা ঐ ভদ্রলোকটিই জজ সাহেব ছিলেন।

এবং ও'রই এজলাসে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেণ্ট্রির রাইফেলের গুলিতে আহত হয়ে ধরা পড়ে নীলাঞ্জনের পুনর্বিচার হয়।

অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর বিচারে নীলাঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হলো ও যথাসময়ে বহরমপুর জেলেই তার ফাঁসি হয়ে গেল।

আপীল করা হয়েছিল, কিন্তু জাস্টিস মুখার্জীর সুসংবদ্ধ জোরালো রায়ের স্বপক্ষেই হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় রায় দেন।

আশ্চর্য!

মৃণাল! আজ নিরুদ্দিষ্ট বিপ্লবী সন্তোষের বোন মৃণাল রায়বাহাদুর জাস্টিস মুখার্জীর স্ত্রী!

কেমন করে সম্ভব হলো?

সুষ্টিধর সে কাহিনীটুকু জানত না।

সরকার কর্তৃক ধৃত হয়ে সন্তোষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়ার কিছুদিন পরেই সন্তোষ সেই যে জেল থেকে পালায় আজও সে নিরুদ্দিষ্ট এবং সেই ঘটনার পরই সন্তোষের বিধবা জননী গাঁয়ে আর টিকতে পারলেন না।

বাধ্য হয়েই তাঁকে মেদিনীপুরে তাঁর ভাইয়ের বাসায় অনূঢ়া কন্যাটির হাত ধরে এসে উঠতে হলো।

মৃণালের মামা অবিনাশ চৌধুরী তখন মেদিনীপুরের গভর্নমেণ্ট প্লিডার।

প্রথমটায় অবিনাশবাবু তো বোনকে গৃহে স্থান দিতে কিছুতেই রাজী হন নিঃ পুত্র যার সন্ত্রাসবাদী, বিপ্লবী—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হবার পর জেল থেকে পলাতক—তার মা নিজের মায়ের পেটের বোন হলেও তাকে বাড়িতে স্থান দেওয়া মুশকিল বৈকি।

বিশেষ করে সরকারের পৃষ্ঠপোষক ও খয়ের খাঁ হয়ে।

কিন্তু বাদ সাধলেন অবিনাশবাবুর মা, কারণ বৃদ্ধা তখনও জীবিতা ছিলেন।

কোন অজুহাতেই তিনি নিজের গর্ভজাত কন্যাটিকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না।

এবং অবিনাশবাবুর স্ত্রীও মৃণাল ও তার বিধবা মাতাকে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী থাকায় শেষ পর্যন্ত এক প্রকার অনিচ্ছার সঙ্গেই অবিনাশবাবু বোন ও ভাগ্নীকে নিজের গৃহে স্থান দিলেন।

অমর মুখার্জী ঐ সময় ঐখানকার জেলাম্যাজিস্ট্রেট এবং তখনও অবিবাহিত।

অনূঢ়া মৃণালের রূপের খ্যাতি শীঘ্রই অমর-জননীর কর্ণে গিয়ে প্রবেশ করল এবং তাঁরই চেষ্টায় ও ইচ্ছায় মৃণালের সঙ্গে একদিন অমর মুখার্জীর বিবাহও হয়ে গেল।

এতদিনে অবিনাশবাবুও যেন আরামের নিঃশ্বাস নিতে পারলেন।

মৃণালের জননী কন্যার সুষ্টিধর সান্যালের প্রতি দুর্বলতার কথাটা জানতেন। তাই প্রথমটায় তাঁর বিশেষ ভয় ছিল হয়ত কন্যা এই বিবাহে মত নাও দিতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য! একান্ত শান্ত ভাবেই মৃণাল সমস্ত আয়োজন ও অনুষ্ঠানকে যেন মাথা পেতে নিল। এবং আরো আশ্চর্য স্বামীগৃহে যাবার প্রাক্কালে বেশ হাসতে হাসতেই সে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল।

মা—মৃণালের মা কিন্তু ঐ দিনই যেন একটু ভীত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছুই নিঃশব্দে সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

মৃণাল স্বামীর গৃহে চলে গেল।

এবং সেই যে মৃণাল স্বামীর গৃহে গেল, আর দ্বিতীয়বার সে আজ পর্যন্ত মা'র কাছে ফিরে আসে নি।

মৃণালের মা বহুবার চেষ্টা করেও একটি ঘণ্টার জন্যও কখনো মেয়েকে নিজের ঘরে নিজের কাছে আর আনতে পারেন নি।

অথচ একমাত্র পুত্র সন্তোষ ও একটি মাত্র কন্যা মৃণাল যে তাঁর কত বড় স্নেহের ধন ও আদরের বস্তু ছিল তা তিনিই জানতেন।

কৃষ্ণনগর থেকেই মৃণাল চিঠিটা লিখেছে মাসখানেক আগের তারিখে।

সতীর পাশাপাশি সুষ্টিধরের আজ মৃণালকে যেন নতুন করে মনে পড়ছে।

মৃণাল আর সতী। বাংলা দেশেরই দুটি মেয়ে।

সতীর সর্বাঙ্গে আজ বিধবার বেশ। একটি রাত্রের সিঁথির সিঁদুর তার রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই মুছে দিয়েছে নির্মম ভাগ্যবিধাতা। সমাজের নিষ্ঠুর হাত মুছে দিয়েছে বটে সীমন্তের সিঁদুরটুকু কিন্তু তার সীমন্ত জুড়ে যে অদৃশ্য রক্তরাগ স্বয়ং প্রেমের দেবতা এঁকে দিয়েছেন, এখনো তা রক্তের মতই রাঙা হয়ে আছে। এবং চিরদিন থাকবেও। কারো সাধ্য নেই তা মুছে দেয়। সে দাগ, সে রক্তচিহ্ন তো মুছবার নয়। সূর্যাস্তের পরও পশ্চিমাকাশে অস্তরাগের মতই সে চিরসত্য ও চিরভাস্বর।

আর মৃণাল। মৃণাল অনেক দিনই তো সুষ্টিধরের জীবনাকাশ থেকে অস্ত গিয়েছে।

যৌবনবসন্তের সে পুষ্পোৎসব কবে কোন যুগে ফুরিয়ে গিয়েছে, তবে কেন আজ শীতের হাওয়ার ঝরা পাতার রিক্ততায় সে অতীত বসন্তের সকরুণ স্মৃতি নিয়ে অশ্রুমোচন ?

যাক ! অবশিষ্টটুকুও মুছে যাক ।

তবু—হ্যাঁ, তবু একটিবার যেতে হবে সৃষ্টিধরকে মৃণালের ওখানে ।

কথা দিয়েছিল যে সে ! কথা তার রাখতে হবে বৈকি !

প্রত্যয়ের পাপে কেন সে লিপ্ত হবে ?

সতীকে বীরুর ওখানে পেঁাছে দিয়েই সৃষ্টিধর কৃষ্ণনগরে যাবে ।

সতীর আখ্যায়িকা শেষ হয়েছে, এইবার মৃণালের আখ্যায়িকাও শেষ হোক ।

কত দেরি আর পনেরই আগস্টের ?

বছর আষ্টেকের একটি সুন্দর ফুট্‌ফুটে ছেলে জজসাহেবের কম্পাউণ্ডে একটা খেলার এয়ারগান নিয়ে অদূরে একটা শিশুগাছের মোটা গঁুড়িতে টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করছিল ।

বেলা তখন সাড়ে নটা হবে ।

একটি হিন্দুস্থানী আয়া কাচের গ্লাসে দুধ নিয়ে বালকটির পশ্চাতে দাঁড়িয়ে বারংবার অনুরোধ জানাচ্ছে ঃ খোকাবাবু, দুধ পি লেও !

বালকের সেদিকে কিন্তু খেয়ালই নেই, সে টার্গেট প্র্যাক্‌টিস নিয়েই ব্যস্ত ।

সৃষ্টিধর গেটের মধ্যে এসে প্রবেশ করল ।

বালকটির হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী চেহারা সৃষ্টিধরকে আকর্ষণ করেছিল ।

খোকাবাবু !

দেখ্ জানকীয়ার মা ! বীর বালক, এয়ারগান হাতে ফিরে দাঁড়াল ঃ ফের তুই আমাকে বিরক্ত করবি তো তোকে এক গুলিতে খতম করে দেবো !

বাস্—বাস্ । গোলি করো, লেকেন দুধ তো পি লেও !

জানিস আমার হাতের aim কখনো miss করে না ! মরতে তোর ভয় করে না ! আমি বিপ্লবী সৃষ্টিধর সান্যালের শিষ্য—

হাঁ ! আরে বাপ, মরণে কো কোই নেই ডরাতা !

খোকা !

সৃষ্টিধরের ডাকে চকিতে বালক ফিরে দাঁড়াল এবং গম্ভীর মুখ করে বললে ঃ আমার নাম খোকা নয়, সত্যপ্রিয় মুখার্জী !

সত্যপ্রিয় মুখার্জী ! সৃষ্টিধর ততক্ষণে বালকের একেবারে নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ সুন্দর নাম ! তোমার বাবার নাম কি, সত্যপ্রিয় ?

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ।

তোমার বাবা বাড়িতে আছেন ?

হ্যাঁ । এখুনি তো অফিস যাবেন ! কিন্তু আপনি কে ?

তুমি তো আমাকে চিনবে না সত্যপ্রিয় ! তোমার মা আমাকে চেনেন ।

মাকে আপনি চেনেন ? আমার মাকে—

হ্যাঁ। তোমার মাকে বলোগে সৃষ্টিধর সান্ন্যাল—

সৃষ্টিধরের কথাটা শেষ হলো না, হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে সত্যপ্রিয় বলে ওঠে : আপনি! আপনিই মাস্টারদা! যাই, আমি মাকে বলি গে—

বালক সত্যপ্রিয় একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

একটু পরেই সুন্দরমত একজন ভদ্রলোক সত্যপ্রিয়র সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত বাইরে।

কি আশ্চর্য! আপনি বাইরে এখনো দাঁড়িয়ে কেন সৃষ্টিধরবাবু? আসুন, আসুন—ভিতরে আসুন।

এসে হাত ধরে সাদরে টেনে ভদ্রলোক সৃষ্টিধরকে সোজা একেবারে অন্দরের দিকে নিয়ে চললেন।

কোথায় গেলে মৃণাল? দেখো এসে, এই যে, তোমার মাস্টারদাকে ধরে এনেছি।

পাশের ঘর থেকে স্বামীর ডাকে মৃণাল বের হয়ে এলো।

অবাক বিস্ময়ে সৃষ্টিধর মৃণালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লাল চাওড়া-পাড় একটি মিলের শাড়ি পরিধানে। প্রত্যুষে বোধ হয় স্নান সারা হয়ে গিয়েছে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ভিজে চুলের গোছা বক্ষের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে।

কপালে রক্ত-সিঁদুরের টিপ। সীমন্তে সিঁদুর।

নিঃসংকোচে ধীর শান্ত পদে এগিয়ে এসে মৃণাল সৃষ্টিধরের পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করতে করতে বললে : ভাল আছেন মাস্টারদা!

তুমি ভাল আছো তো মৃণাল?

হ্যাঁ।

আবার মৃণালের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সৃষ্টিধর।

মৃণাল যেন আরো অনেকটা লম্বা হয়েছে এই কয় বৎসরে! রোগা কৃশ চেহারা। কিশোরী সে মৃণাল কই!

নিরুদ্ধযৌবনা এই মৃণালই কি অতীতের সেই তন্বী কিশোরী মৃণাল!

উঃ মশাই, কম কষ্টে কি আপনার পাত্তা যোগাড় করেছিলাম!—ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, তাছাড়া যত ওকে বলি আমি হচ্ছি সে যুগের এক কুখ্যাত বিচারক, তোমার সৃষ্টিধরবাবুর মত একজন বরেণ্য পূজ্য বিপ্লবী আমার ঘরে ডাকলেই বা আসতে চাইবেন কেন? তা সে শোনে কি আমার কথা! কিন্তু নাঃ, এখন দেখছি ওরই জিত হয়েছে, আমারই হার!

যাও তো তুমি তোমার কাজে! তরল অনুযোগ জানায় মৃণাল স্বামীকে।

ও, এখন বুঝি মনের মানুষকে পেয়ে এই চির-অনুগত লোকটার কথা একেবারে ভুলে গেলে!

আঃ, থাম তো তুমি! চলুন, আমার ঘরে চলুন—

অভিভূতের মতই সৃষ্টিধর মৃণালের পিছু পিছু তার শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ

করল।

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ মার আঁচল ধরে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছিল, মৃণালের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, এখন ঘরে প্রবেশ করে পুত্রকে স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে সৃষ্টিধরকে ইঙ্গিত করে বললে, খোকন! ইনিই তোমার সেই মামা! যাকে তুমি ঘুমোবার আগে রোজ রাত্রে স্মরণ করে প্রণাম জানাও!

চিনেছি মামণি।—ছেলে সকৌতুকে বলে।

হ্যাঁ বাবা, প্রণাম করেছ?

সত্যপ্রিয় এগিয়ে এসে নীচু হয়ে সৃষ্টিধরকে প্রণাম করতে যেতেই সৃষ্টিধর সস্নেহে মৃণালের ছেলেকে বুকের উপরে তুলে নিয়ে নিবিড়ভাবে চেপে ধরলো: থাক বাবা!

নামিয়ে দিন! মামণি আমাকে খোকন বলে ডাকলেও আমি তো আর ছোটটি নই!…

সত্যি। হাসতে হাসতে সৃষ্টিধর সত্যপ্রিয়কে নামিয়ে দিল।

মামণি বলেন, আপনার হাতের গুলি নাকি কখনো miss করে না! আপনি বুঝি খুব ভাল গুলি চালাতে জানেন? কিন্তু কই, আপনার পিস্তল কই?—দেখান না পিস্তলটা!

পাগল ছেলে, পিস্তল আমি কোথায় পাবো! পিস্তল তো আমার নেই।

বাঃ, আপনি আমাকে দেখাবেন না তাই। সত্যি বলছি, দেখান না আপনার পিস্তলটা!—আমি জানি, মামণি সব কিছু আমাকে বলেছেন, ইংরেজ জেলেও আপনাকে ধরে রাখতে পারেনি। ধরতে পারলে আপনার ফাঁসি হবে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে তাই ভগবানকে ডেকেছি কেউ যেন কোনদিন না আপনাকে ধরতে পারে—

সৃষ্টিধরের চোখেও বুঝি জল এসে যায়!

ভারতের ভবিষ্যৎ কি আজ এমনি করেই সত্যপ্রিয়র মত ঘরে ঘরে জন্ম নিয়েছে!

কানাই, সত্যেন, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং, রামপ্রসাদ, সূর্য সেন এরা কি মরেনি!

এই সব সত্যপ্রিয় হয়েই কি তারা আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে!

বিদ্রোহী ভারতের তপস্যা আজও শেষ হয়নি সত্য, কিন্তু শেষ হবে যদি এমনি সব সত্যপ্রিয়র দল ঘরে ঘরে জন্ম নেয়।

> ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদের স্মরণ করি মৃত্যু-দীক্ষা লহ,
> নবাগত হে সাধক, বিগত সাধকদলে কর নমস্কার।

সত্যিই সৃষ্টিধর যেন চোখের জল রোধ করতে পারে না।

ইচ্ছা করে যেন চেঁচিয়ে বলতে এই মুহূর্তটিকে, মৃণাল! মৃণাল, সত্যিই তুমি বেঁচে আছো আজও এই সৃষ্টিধরের পাষাণ বুকখানার মধ্যে।

হঠাৎ সত্যপ্রিয়র কথায় আবার সৃষ্টিধর চমকে ওঠে: বাবা কোথায় গেল মামণি! বাবাকে এ ঘরে আসতে দিও না। বাবা হয়ত মামুকে ধরিয়ে দেবে

ইংরেজের হাতে—

মৃণালের দুচোখের কোণেও জল ভরে আসে।

না সত্যপ্রিয়, আর তোমার বাবা আমাদের ধরাবেন না!—সুষ্টিধর বলে ওঠে।

ফাঁসি দেবে না?

না।

ও, ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে সেই জন্য বুঝি?

হ্যাঁ।

এবারে তুমি বাইরে যাও খোকন, খেলা করগে! মৃণাল ছেলেকে বলে।

না মামণি, আমি যাব না।

থাক না ও এখানে মৃণাল!

না, আপনি ক্লান্ত। ঐ দেখ, আপনাকে এখনো চা পর্যন্ত এনে দিলাম না এক কাপ—দ্রুতপদে মৃণাল কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুষ্টিধর মৃণালের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মৃণাল!

মনে পড়ছে সকলকে আবার—দিদি, হিরণ্ময়ী, নীলাঞ্জন, বিনয়, বীরু, সতী, সন্তোষ, মৃণাল!

বিদ্রোহী ভারতের মাটিতে এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন। অমৃত-সন্ধানীর দল! এদের শেষ নেই, এদের মৃত্যু নেই! সংগ্রামেরও এদের সমাপ্তি নেই!

সত্যিই এদের শেষ নেই।

আরো আছে। আরো অনেক পৃষ্ঠা বাকী বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের। ১৯৩১এর ২রা অক্টোবর উল্টাডিঙ্গি ক্যানেল ওয়েস্ট রোডে একদল বিপ্লবী কৈলাশ-চন্দ্র সনাতন পালের গদি থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে, সিন্দুক থেকে ৩০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। কিন্তু পলায়নের সময় তাদের গাড়ি গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় বিপ্লবীরা ধৃত হয়।

উক্ত ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সরকার মামলা শুরু করে—অভিযুক্ত করা হয় শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, ধীরেন চৌধুরী, কালিপদ রায় ও নরহরি সেনকে।

১৯৩১—১৪ই ডিসেম্বর রায় দেওয়া হয়, ধীরেন চৌধুরীর ও কালিপদর পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাস, নরহরি সেনের তিন বৎসর, বাকী দুজন মুক্তি পান।

২৮শে অক্টোবর আবার ইউরোপীয়ান সভার সভাপতিকে বিপ্লবীরা গুলি করে হত্যা করলো।

স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ যে আগুন ভারতের মাটিতে অত্যাচারে ও পীড়নে জেলেছিল তারই মুহুর্মুহু অগ্নিঝলকে ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে পুড়ে যেতে লাগল।

ব্রিটিশ সিংহ তার সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে যেন কোন মতেই রোধ করতে সক্ষম হয় না।

পোনে দুইশত বৎসরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের হিসাব-নিকাশ একের পর এক চলতে লাগল অব্যাহত।

১৫ই ডিসেম্বর আবার কুমিল্লায় বিদ্রোহীর হাতের পিস্তল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্ন্যুদ্গার করল।

এবারে এগিয়ে এলো দুটি কিশোরী। রাণী দুর্গাবতী, রাণী ঝান্সীর দেশের দুটি মেয়ে। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী।

কুমিল্লা কমরুন্নেশা গার্লস স্কুলের শান্তি ও সুনীতি ছিল ছাত্রী।

তাদেরই দেশের সোনা ভাইয়েরা একের পর এক প্রাণ দিচ্ছে, বোন তারাই বা কেমন করে ঘরে বসে থাকে!

দুরাশার ডাক তাদের কানেও এসে পেঁছাল।

নির্জন শান্ত গৃহকোণ ছেড়ে তারাও বের হয়ে এলো : ঝলকে উঠ্‌লো হাতের আগ্নেয়াস্ত্র : জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্বেতাঙ্গ স্টিভেন্সয়ের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বিচারে শান্তি ও সুনীতির হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বিপ্লব ও সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা পাল্লা দিয়েই যেন সরকারের দমন-নীতি ও স্বৈরাচার বেড়ে চলেছিল। ২৯শে অক্টোবর একটি ও ৩০শে নভেম্বর আর একটি অর্ডিনান্স সরকার দেশে জারী করে।

এদিকে দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগল।

তথাপি সরকারী চাপে পড়ে প্রাণের দায়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের পর হতে দেশের হতভাগ্য কৃষকের দল তাদের সাধ্যমত খাজনা দিয়েই আসছিল।

শেষ সম্বলটি দিয়েও শেষ পর্যন্ত হতভাগ্যের দল যখন সরকারী রাঘব-বোয়ালের হাঁ-কে ভরাট করতে পারলে না তখন উপায়ান্তর আর না দেখে সরকারের দয়াপ্রার্থী হলো তারা বাকী অবশিষ্ট খাজনা মকুবের জন্য।

অত্যাচারী সরকার কিন্তু ভিজল না তাতে, কর বন্ধ হবার আশঙ্কায় কৃষক-সমিতি ও কৃষক-সম্মেলন দমনে তারা হলো বদ্ধপরিকর।

পণ্ডিত জওহরলাল ও মিঃ সেরওয়ানীকে কারারুদ্ধ করল সরকার এবং ১৪ই ডিসেম্বর আর একটি অর্ডিনান্স পাস করে কৃষক-আন্দোলন ও করবন্ধ-প্রচেষ্টা বে-আইনী বলে ঘোষণা করে দিল।

জওহরলাল ও সেরওয়ানী মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বোম্বাই অভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই সরকার ঐ দুই দেশনেতাকে গ্রেপ্তার করে যথাক্রমে দু বৎসর ও ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ করলো। লাল জামা বা কোর্তা পরিধান করবার জন্য সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফুর খাঁর খোদাই খিদমতগার বাহিনীকে লালকোর্তা বাহিনী বলেও অভিহিত করা হতো। ওয়ার্কিং কমিটি ১৩ই আগস্টের অধিবেশনে উক্ত খোদাই খিদমতগার বাহিনীকে কংগ্রেসের

অঙ্গীভূত করে নেয়।

ঐ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল গফুর খাঁ ও তদীয় ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেবকেও সরকার ঐ বৎসরেই কারাগারে প্রেরণ করল।

২৮শে ডিসেম্বর শূন্য রিক্ত হস্তে মহাত্মা গোলটেবিল প্রহসন হতে ভারতে বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করলেন।

চার

বিদ্রোহী ভারতের রক্তাক্ষরে লিখিত ইতিবৃত্তের, বিদগ্ধ—অগ্নিদগ্ধ আর একটি সাল পার হয়ে গেল।

১৯৩১ সাল।

সপ্তকোটি পরাধীন ভারতবাসীর আরো একটি বেদনাবিক্ষুব্ধ বৎসর—তিনশত পঁয়ষট্টি দিন রক্ত-ঢালা সংগ্রামের স্বাক্ষর হয়ে রইলো।

এগিয়ে এলো নতুন বর্ষের নতুন দিন—১৯৩২ সাল।

পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে উঠুক কোটি কোটি বক্ষের বেদনাবিক্ষুব্ধ আশা আর আকাঙ্ক্ষা।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি…
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি॥

১৯৩১এর ২৯শে অক্টোবর সরকার বাহাদুরের অন্যতম অর্থহীন দমন-নীতির নতুন আইন বেঙ্গল অর্ডিনান্স্ পাস হয় অর্থাৎ প্রয়োগ শুরু হয়।

সে অর্ডিনান্সের বলে জজ ও জুরীর সহায়তা ছাড়াও ডাকাতি, হত্যাপ্রচেষ্টা প্রভৃতি অপরাধ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার করবার অধিকার বা ক্ষমতা (power) দেওয়া হয়; যে কোন মুহূর্তে, যে কোন স্থানে, যে কাউকে মাত্র সন্দেহের জন্য অন্তরীণে আবদ্ধ করবার ক্ষমতাও ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রাপ্ত হলো, এবং যে কোন স্থানে পাইকারী জরিমানা আদায় করবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়।

এক কথায় ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুররা জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের হর্তা-কর্তা হয়ে দাঁড়াল।

এক রামে রক্ষা নাই তায় সুগ্রীব দোসর।

বেঙ্গল অর্ডিনান্স যখন পাস হয় মহাত্মা তখন লণ্ডনে ছিলেন।

অর্ডিনান্সের সংবাদ পেয়ে মহাত্মা লিখে পাঠালেন ব্যথিত কাতর চিত্তে:

The Bengal Ordinance of 1931 is more ghastly than that of 1925. It reminds us of the Sepoy Mutiny and the Amritsar Massacre of 1919.

একমাত্র সিপাহী বিদ্রোহের পর শ্বেতাঙ্গ প্রভু ও তস্য প্রতিনিধিদের বেপরোয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ১৯১৯এর পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস ব্যাপক ও নিষ্ঠুর হত্যালীলার সঙ্গে সরকারের নতুন ঐ আইনটির তুলনা করা চলতে পার।

আরো তিনি বলেছিলেনঃ কি সর্বনাশ! হত্যা করা হয় নাই, কেবল চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, তারও দণ্ড মৃত্যু!…ইহাতে যে কেবল মূল্যবান জীবনই নষ্ট হইবে তাহা নহে, সমগ্র জাতিটাকেই পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে অর্ডিনান্সের ধারাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাত্মাজী দেশে প্রত্যাবর্তন করে বেঙ্গল অর্ডিনান্স এবং যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবর্তিত কয়েকটি অর্ডিনান্সও প্রত্যাহার করবার জন্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উলিংডন বাহাদুরকে বিনীত অনুরোধ জানালেন।

যা হবার তাই হলোঃ কোন সুরাহাই হলো না।

অতঃপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে পুনরায় সত্যাগ্রহ করাই স্থিরীকৃত হলো।

সরকারও নবোদ্যমে বেপরোয়া লাঠি চালনা ও ব্যাপক খানাতল্লাসী এবং যথেচ্ছ ধরপাকড় শুরু করে দিল অত্যুৎসাহে।

দলে দলে সত্যাগ্রহী ও সংগ্রামীরা ফিরিঙ্গীর আইনে কারারুদ্ধ হতে লাগল।

মাত্র বারো দিনের মধ্যে ভীতত্রস্ত সরকার ২২৭টি সমিতিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলে। অত্যাচার ও পীড়ন এত অধিক হতে লাগল যে সুদূর সাগরপার হতে মনীষী রোমা র‍্যলাঁ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের জন্য সকলকে উৎসাহিত করলেন।

১৯৩২এর গোড়া হতেই এক প্রকার কংগ্রেসের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ শক্তির পুরোপুরি সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল—কিন্তু প্রস্তুত ছিল না কংগ্রেস মহল। তাই অতর্কিতে ঐ শ্বেতাঙ্গের তাণ্ডবনৃত্য শুরু হওয়ায় তারা যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু দেশের অন্য মুক্তি-সংগ্রামীর দল—কণ্টকক্ষত রক্তাক্ত পথে যাদের চলাচল সেই দুর্ধর্ষ বিপ্লবীর দল—শঠ প্রতারক সরকারকে তারা পুরোপুরিই চিনেছিল। তাই তারা একটি মুহূর্তের জন্য তাদের সংগ্রামকে থামায় নি।

তাদের হাতের রক্ত-মশালের আলোয় ভারতের দিগন্ত আবার রক্তরাঙা হয়ে উঠলো।

অগ্নিনালিকা মুখে বজ্রাগ্নি ঝলক দিতে লাগল পূর্বের মত। এবং অগ্নি-বালক বাংলার মাটিতে দেখা দিল।

১৯৩২এর ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের মধ্যেই

বিপ্লবী এক দুঃসাহসিকা ২১ বৎসর বয়স্কা তরুণীর হস্তধৃত আগ্নেয়াস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করল।

সমাবর্তন উৎসবে সভাপতি ছিল বাংলার তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ গভর্নর স্যার স্ট্যানলে জ্যাকসন।

ছাত্রী বীণা দাসই সেই দুঃসাহসিক কার্যের নায়িকা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বীণার লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, গভর্নর অক্ষতই রইলো এবং বীণা দাস অকুস্থানেই ধৃত হলো। দেহ তল্লাস করে পিস্তল ও কিছু কার্তুজ আবিষ্কৃত হলো।

বিচার শুরু হলো বীণা দাসের ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করে, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জী, চারুচন্দ্র ঘোষ ও মহিমচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে।

সরকারের ৩০৭ ধারা দণ্ডবিধি ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারায় বিচারে বীণা দাসের প্রতি নয় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হলো।

ঐ দিকে তখন চট্টগ্রামে সরকারের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাও প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে।

দীর্ঘ দিন ধরে বিচারপ্রহসন চালাবার পর ১৯৩২এর ১লা মার্চ প্রহসনের সমাপ্তি ঘোষিত হলো। সকাল ৯টায় একজন সার্জেন্ট এসে গম্ভীরভাবে বন্দী বিদ্রোহীদের সম্বোধন করে বললে : তোমাদের এখুনি ৩নং কয়েদী-ব্যারাকের দোতলায় যেতে হবে।

ওরা তো প্রস্তুত হয়েই ছিল। বললে : চল।

জোড়ায় জোড়ায় বিদ্রোহীদের হাতকড়াবন্ধাবস্থায় দোতলার ব্যারাকে এনে জড়ো করা হলো।

অতঃপর বিচারক ইউনি ঘোষণা করল গম্ভীর কণ্ঠে সকলের প্রতি দণ্ডাদেশের বিস্তৃত বিবরণ।

গণেশ ঘোষ, অনন্তলাল সিংহ, লোকনাথ বল, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ রায়, সহায়রাম দাস, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার ও আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত—প্রত্যেকের প্রতি দণ্ডাদেশ হলো যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড (২৫ বৎসর)।

নন্দলাল সিংহ—দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

অনিলবন্ধু দাস—১৬ বৎসর বয়স হওয়ায় ৩ বৎসর বোরস্টার জেলে কারাদণ্ড।

এবং বাকী বন্দীদের প্রমাণাভাবে মুক্তি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার কুখ্যাত সরকারের নতুন অর্ডিনান্সের কবলে ফেলে ডেটিনিউ করা হলো।

বন্দীদের মিলিত কণ্ঠে বিচারালয় মথিত হয়ে উঠলো : বন্দেমাতরম! বন্দেমাতরম্!

বাইরে বসে নায়ক সূর্য সেন সবই শুনলেন এবং বুকখানা কাঁপিয়ে বোধ হয়

তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হলো।

এবং সেই দীর্ঘশ্বাসের আগুনে খুব শীঘ্রই চটুলার আকাশকে আবার রক্তাক্ত করে তুলল।

কিন্তু তারও আগে ৩০শে এপ্রিল আবার মেদিনীপুরে এক তরুণ কিশোর বিপ্লবীর হাতে অগ্নিনালিকা অগ্নিগর্জনে হিজলীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারী ও ১৯৩২ সনের কংগ্রেসের আন্দোলনে সর্বতোভাবে দমনবিশারদ সদস্য, অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর. কে. ডগলাসের বক্ষ রক্তে প্রতিবাদ জানানো হলো।

যে তরুণ কিশোরের প্রচেষ্টায় বিপ্লবীর হাতে ৩০শে এপ্রিল আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠেছিল বিদ্রোহী ভারতের রক্তরাঙা পৃষ্ঠায় তার স্মৃতি চিরদিন রক্তাক্ষরেই লেখা থাকবে।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য।

মেদিনীপুরে আলিগঞ্জে রেভিনু এজেন্ট ভবতারণ ভট্টাচার্যের চতুর্থ সন্তান প্রদ্যোৎঃ দাসপুর থানার অন্তর্গত কংসাবতী নদীতটে অবস্থিত গোপলনগরে ১৯১৩—৩রা নভেম্বর শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমারের জন্ম। প্রদ্যোৎয়ের মাতা ছিলেন পঙ্কজিনী দেবী। রত্নাগর্ভা জননী।

১৯৩১ সালে হিন্দু স্কুল থেকে সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেদিনীপুর কলেজে অধ্যয়নরত ছিল প্রদ্যোৎ।

বড় চমৎকার চেহারা ছিল প্রদ্যোতের।

রূপ ও স্বাস্থ্য নিয়ে যেন ভগবান তাকে মাটির পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন কোন একটি মহৎ কার্যের উদ্দেশ্যেই।

মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, চিহ্নিত জন্মবিপ্লবী!

সহপাঠী অমর চট্টোপাধ্যায়ই প্রদ্যোৎকে বিপ্লবী দলের মধ্যে নিয়ে যায় এবং ক্রমে প্রদ্যোতের মেদিনীপুরের তৎকালীন বিপ্লবী নেতা দীনেশ গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য হয়।

১৯৩২ সনে সরকার আবার নতুন করে ভারতবাসীর উপরে দমননীতির প্রয়োগ শুরু করল। হতভাগ্য ডগলাস্ ছিল মেদিনীপুর শহরের তখন একজন চণ্ডনীতি ও অপকীর্তির কংস।

কিন্তু কংস জানতে পারে নি যে, তাহাদের বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

বধের দিনটি ঘনিয়ে এলো।

১৯৩২—৩০শে এপ্রিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভার কাজ চলছে, চেয়ারে আসীন বোডের চেয়ারম্যান ডগলাস্!

অতর্কিতে মৃত্যুদণ্ড কক্ষে এসে প্রবেশ করল: প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু দুইজন বিপ্লবী। প্রদ্যোতের রিভলভার থেকে গুলি নির্গত হলো না বার বার ট্রিগার টেপা সত্ত্বেও। তখন প্রভাংশুর পিস্তল সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গর্জে উঠলো অগ্নিঝলকে আগ্নেয়াস্ত্র: দুড়ুম!

রক্তাক্ত বিগতপ্রাণ ডগলাসের দেহ চেয়ারের উপরেই ঢলে পড়লো, প্রদ্যোৎ দৌড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে সকলে প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশুকে তাড়া করে। নিমেষে প্রদ্যোৎ তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ে রুখে দাঁড়াল উদ্যত পিস্তল হাতে অনুসরণকারীদের ; সেই ফাঁকে প্রভাংশু সকলের নাগালের বাইরে চলে গেল এবং ধরা পড়লো প্রদ্যোৎ।

খানাতল্লাসী করে প্রদ্যোতের পকেটে একটা কাগজের টুকরো পাওয়া গেল ! তাতে লেখা ছিল :

ইহাদের মরণেতে বৃটিশরা বুঝুক।
আমাদের আহুতিতে ভারত জাগুক ॥

সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত প্রদ্যোৎকে থানায় নিয়ে আসা হলো।

বড় পরিশ্রান্ত বোধ করছিল প্রদ্যোৎ—বললে সে স্নান করতে চায়।

স্নানের পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘটনার সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন করায় বললে : কেন মিথ্যে এখন বিরক্ত করছেন। পরে আপনারা সবই জানতে পারবেন, আমার কাছে কোন কথা পাবেন না।

অনেক চেষ্টা ও অত্যাচার করেও প্রদ্যোতের নিকট হতে একটি কথাও সরকার জানতে পারল না।

অতঃপর খুনের ষড়যন্ত্র করা ও সহায়তা করার অভিযোগে দণ্ডবিধি ৩০২, ১২০ বি ও ৩০২-৩৪ ধারায় ট্রাইবুন্যাল গঠন করে প্রদ্যোতের বিচার-প্রহসন শুরু হলো।

ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেণ্ট হলো কে. সি নাগ, মিঃ ভুজগেন্দ্র মুস্তাফি ও জ্ঞানাঙ্কুর দে, আই. সি. এস.। বিচারে জ্ঞানাঙ্কুর দে প্রদ্যোতের প্রাণদণ্ড দেওয়ার সপক্ষে না থাকলেও বাকী দুজনের ইচ্ছায় ২৬শে জুন প্রদ্যোতের প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হলো।

পরে হাইকোর্টে আপীল হলে, বিচারপতি মিঃ জ্যাক ও চারুচন্দ্র ঘোষ উভয়ে একমত হওয়ায় প্রাণদণ্ডাদেশই প্রদ্যোতের বহাল রইলো।

প্রদ্যোৎ-জননী সরকার বাহাদুরের নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাইলেন কিন্তু ফল হলো না।

কিন্তু প্রদ্যোতের মনের মধ্যে কোথায়ও এতটুকু ভীতি বা আক্ষেপ ছিল না।

সদাহাস্য প্রশান্তচিত্ত কিশোর তরুণ সে যে জানত গীতার সেই বাণী :

বাসাংসি জীর্ণানি—

কেবল তার যা একটু দুঃখ ছিল মায়ের কথা ভেবে।

ক্রমে এগিয়ে এলো সেই যাত্রার লগ্ন।

শূন্য আকাশ-পথে চির-বিদায়ের ডাক এসে পৌঁছল : এসো। এসো

মৃত্যুহীন প্রাণ।

১৯৩৩—১২ই জানুয়ারী প্রত্যুষে ছয় ঘটিকার সময় নির্ভীক প্রশান্ত চিত্তে বিপ্লবী সৈনিক ফাঁসির মঞ্চে দৃঢ় পদবিক্ষেপে এসে দাঁড়াল।

ডগলাস সাহেবের শূন্য সিংহাসনে তখন শ্বেতাঙ্গ জে. ই. জে. বার্জ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসে বসেছে। বার্জ উপস্থিত ছিল ঐ সময়টিতে।

সে প্রশ্ন করলো : Are you ready, Prodyot ?

প্রদ্যোৎ তুমি প্রস্তুত ?

জবাব এলো সকলকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করে : One minute please, Mr. Burge, I have something to say.

Yes, Speak out.

We are determined, Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapore. Yours the next turn, get yourself ready.

প্রতিজ্ঞা কঠোর মোদের
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি দিব মোরা
হেথা কোন শ্বেতাঙ্গেরে।
ঐ হের আসিতেছে রক্ত কৃপাণ হস্তে
মৃত্যুর আমোঘ দূত—

একটি শ্বেতাঙ্গকেও আমরা থাকতে দেবো না এই মেদিনীপুরে। অতএব প্রস্তুত হও, এবারে তোমার পালা।

I am not afraid of death. Each drop of my blood will give birth to hundreds of Prodyots in all houses of Bengal.

বাংলার ঘরে ঘরে প্রদ্যোতের প্রতি রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে আবার নতুন করে প্রদ্যোতের দল জন্ম নেবে। কিসের শংকা ! কিসের ভয় !

আমরা মরবো না ভাই, মরবো না।

Yes, Do your work please !

কই এবারে নিয়ে এসো তোমার রজ্জুর ফাঁস। কণ্ঠ আমার এগিয়ে দিলাম।

আর এক ফোঁটা রক্ত রক্ত-সমুদ্রে মিশিয়ে গেল।

পর পর দুটি লুণ্ঠন হলো বিপ্লবীদের দ্বারা।

প্রথমটি ১৩ই মে তেজগাঁও ও ঢাকার মধ্যবর্তী স্টেশনে। টাকার পরিমাণ ছিল মোট ৩৮৬৫০ টাকা। এবং দ্বিতীয়টি ঘটলো ২৯শে মে ময়মনসিংহের কমলপুরে কিশোরমোহন বণিকের গৃহে—টাকার পরিমাণ ৪০০০ টাকা। প্রথমটির জন্য বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর সুধীরকুমার আচার্যের স্বীকারোক্তিতে বিচারে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হলো।

অন্যজন ধীরেন্দ্রচন্দ্র দে মামলায় মুক্তি পেলেও অর্ডিনান্সের বলে অন্তরীণ

বন্ধ হলো।

দ্বিতীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণীন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র লাহিড়ী ও সুধাংশুকিরণ লাহিড়ীর দশ বৎসর করে কারাদণ্ডাদেশ ও ভুবনমোহন চন্দ্র, জানকী দাস, হরিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি ১৪ জনের সাত বৎসরের মেয়াদে কারাদণ্ডাদেশ হলো।

থেকে থেকে ভারতের আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এমনি করেই দেখা দিতে লাগল।

গভর্নমেণ্টের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত করে আবার চট্টলার আকাশে রক্তমেঘ দেখা দিল।

১৯৩২এর ১৩ই জুন।

সরকারের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবী-সূর্য—সূর্য সেন—মাস্টারদা, তার সহকারী নির্মল সেন, অপূর্ব সেন তখন ধলঘাটে নবীন চক্রবর্তীর বাড়িতে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে।

১৩ই জুনের সেই স্মরণীয় রাতে প্রীতিলতাও এসে ঐ বাড়িতে গোপন পরামর্শের জন্য জুটেছে।

দোতলার কোঠাঘরে বসেছে বিপ্লবীদের গোপন চক্র।

সহসা এমন সময় ক্যাঃ ক্যামেরন, পটিয়ার দারোগা মনোরঞ্জন বসু, এস. আই. শৈলেন, একজন হাবিলদার, দুজন কনস্টেবল ও সাতজন সেপাহী সশস্ত্র হয়ে গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেয়ে ধলঘাটে বিপ্লবীদের আড্ডাটা ঘেরাও করে ফেললে।

চরম একটি মুহূর্ত রাত্রির অন্ধকারে ঘনিয়ে এলো।

কুত্তাগুলোর আগমন-সংবাদে মুহূর্তে বিপ্লবীর দল পায়ে পায়ে উঠে দাঁড়ায়।

যে যার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত।

ঘেরাওকারীদের একদল ততক্ষণ নীচের কামরায় যেখানে নবীন তার স্ত্রী—পুত্র রামকৃষ্ণ ও কন্যা হেমলতা ছিল সেখানে গিয়ে প্রবেশ করল।

সকলে পুলিস দেখে প্রমাদ গণে।

আর ওদিকে শ্বেতাঙ্গ ক্যাঃ ক্যামেরন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে তখন।

সিঁড়িতে পদশব্দ বিপ্লবীদের কানে আসে।

শেষ ধাপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ভীমগর্জন করে উঠলো।

দুম! দুম—দুড়ুম! দুম!…ক্যাঃ ক্যামেরনের যুদ্ধ-সাধ মুহূর্তে মিটে গেল। রক্তাক্ত বিগতপ্রাণ দেহটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গেল।

শুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বেগে গুলি বর্ষণ!

নির্মল সেন একাকীই সম্মুখ সমর চালিয়ে যায়।

ঐ ফাঁকে দোতলা থেকে একটা মই ঝুলিয়ে মাস্টারদা ও প্রীতি—চতুর্দিকে অবিশ্রাম গুলি বর্ষণের মধ্যেই—নীচের অন্ধকারে গিয়ে আত্মগোপন করে।

কিছুক্ষণ অবিশ্রাম গুলি বর্ষণের পর পুলিসের দল হটে আসতে বাধ্য হয় এবং আরো অস্ত্র ও সৈন্য আনবার জন্য পটিয়ার দিকে একজনকে দ্রুত পাঠিয়ে

দেওয়া হয়।

গুলিবর্ষণের বিরতি।

অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে তখনও মাস্টারদা ও প্রীতিলতা অপেক্ষা করছে।

একটা করুণ গোঙানির শব্দ প্রীতির কানে ভেসে এলো।

কার! কার যন্ত্রণাকাতর শব্দ!

নির্মলের! হ্যাঁ, নির্মল সেনের!

প্রীতি ছটফট করে ওঠে: আমি উপরে যাই, দেখে আসি—নির্মলদা—

বাকী কথাটা প্রীতির শেষ না, মাস্টারদা প্রীতির একখানা হাত চেপে ধরেন: না! তুমি কি ক্ষেপে গেলে রাণী! চল, আর একটি মুহূর্তও এখানে নয়।

মাস্টারদা—

না! না! ছিঃ রাণী! তুমি না বিপ্লবী! পশ্চাতের দিকে ফিরে তাকাবার তোমার কোন অধিকার নেই। বিপ্লবীর চোখে তো শোকাশ্রু সাজে না। যে গেল তাকে যেতে দাও।

এগিয়ে চল! এগিয়ে চল! সম্মুখে তোমার ঐ কণ্টকাকীর্ণ পথ, মৃত্যুর ঝঞ্ঝা!…বজ্রের হুংকার!

ঐ! ঐ তোমার পথ!

পরের দিন সকালে দ্বিগুণ এক বাহিনী নিয়ে এসে সরকারের দল দেখলো: সিঁড়ির নীচে ক্যাঃ ক্যামেরনের রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ, উপরের কক্ষে শহীদ নির্মল সেনের গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ, এবং বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণায় শহীদ অপূর্ব সেনের মৃতদেহ গত রাত্রের খণ্ড প্রলয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মাস্টারদা ও প্রীতির কোন সংবাদই কেউ পেল না।

নির্মল সেন—চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা। অসহযোগ-আন্দোলনে কারাবাসের পর থেকেই তার বিদ্রোহী জীবনের সূত্রপাত।

সরকারের তালিকায় ঐ সময় তার মাথার দাম ধার্য হয়েছিল পাঁচ হাজার মুদ্রা।

গণেশ, লোকনাথ প্রভৃতি সহকারীর দল যখন সরকারের কারাগারে বন্ধ, সেই সময় নির্মল সেনই ছিল মাস্টারদার একমাত্র যোগ্য সহচর ও বন্ধু।

প্রীতির জীবনে নির্মল সেনের রেখাপাত প্রীতির নিজেরই স্বীকারোক্তিতে সুস্পষ্ট হয়েছিল: নির্মলদার মর্মান্তিক মৃত্যু আমায় গভীর ভাবে নাড়া দেয়—এরপর আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

মৃত্যুর সময় নির্মল সেনের বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বৎসর।

আর শহীদ অপূর্ব সেন—মৃত্যুর সময় বয়স ছিল তার মাত্র ১৫ বৎসর। এক নবীন কিশোর।

স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকতে পারলো না শান্ত নির্জন গৃহকোনে, স্বদেশের মুক্তির জন্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল, বাংলার কিশোর মৃত্যুহীন।

এমনি করেই ধলঘাটের বুকে বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসের আর একটি পৃষ্ঠা রক্তরাঙন হয়ে রইলো চিরকালের জন্য, চিরদিনের জন্য।

১৩ই জুন পার হয়ে গেল, এলো এবারে ২৬শে জুন।

বিশ্রাম নেই! বিপ্লবীর বিশ্রাম তো নেই!

এবারে খুব কাছেই, চট্টগ্রামের কাছাকাছি আবার ঢাকা শহরের বুকে। আর এবারে বিপ্লবীর হাতের মৃত্যুদণ্ড নেমে এলো এক অত্যাচারী—দেশের শত্রু বাঙালী সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—পরউচ্ছিষ্টলোভী কামাখ্যা সেনের মাথায় বজ্র-গর্জনে।

দুরাচার কামাখ্যার গুণের অন্ত ছিল না,—একেবারে সাক্ষাৎ গুণমণি!

সরকার বাহাদুরের সরননীপুষ্ট আদুরে নীলমণি!

পাপের বোঝা হতভাগ্যের অনেক দিনের সঞ্চিত পাপেই ভারী হয়ে উঠেছিল।

এই দেশেরই একজন হয়ে দেশের লোকদের উপর অনেক অত্যাচারই সে অকুণ্ঠে চালিয়েছিল।

প্রহার, লাঠিবাজী, এমন কি নিজের দেশের মা-বোনকেও কুৎসিত অপমান করতে পশ্চাৎপদ হয় নি।

এমন কি দৈত্যকুলের ঐ হিরণ্যকশিপু সম্পর্কে তার প্রভুরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত সশঙ্কিত হয়ে উঠলো।

তাড়াতাড়ি তাকে তারা ছুটি দিয়ে দিল।

কিন্তু বিপ্লবীচক্রের বিচারে তখন তার চরম দণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে।

মৃত্যুই যেন তাকে হাত ধরে ২৩শে জুন ঢাকায় টেনে নিয়ে এলো।

কামাখ্যা সেন ঢাকায় এসে সদর মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট শচীন্দ্র চ্যাটার্জীর বাড়িতে আতিথ্য নিল।

২৬শে জুনের রাত্রি।

নিশ্চিন্ত আরামে কামাখ্যা শয্যায় নিদ্রিত।

খোলা জানালাপথে পা টিপে টিপে এলো মৃত্যু! অমোঘ অবধারিত।

গর্জে উঠলো আগ্নেয়াস্ত্র।

গুলির শব্দে বাড়ির সকলে ঘরে এসে দেখলো কামাখ্যার মৃত রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহটা শয্যার উপরে তার শত অত্যাচারের ঋণশোধের শেষ সাক্ষ্য দিচ্ছে।

চারিদিকে সশস্ত্র পুলিস সক্রিয় হয়ে উঠলো।

হতভাগ্য বিপ্লবী তার নিজের ভুলের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লো—পোস্ট-অফিসে একটা টেলিগ্রাম করতে গিয়ে।

Kamaksha's operation successful. No anxiety !

মনোরঞ্জন তারটা পাঠাছিল ইচ্ছাপুরের "সারদা মেডিকেল হলে"র সুরেশ গাঙ্গুলীর নামে।

পোস্ট-অফিসের পর্তুগীজ কেরানী রোজারিওর সন্দেহ হওয়ায় মনোরঞ্জনকে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত থানায় সংবাদ পাঠিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এসে মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করল।

মনোরঞ্জনকে নিয়ে পুলিস নানা স্থানে হানা দিয়ে অবশেষে ১৯ বৎসর বয়স্ক বিপ্লবী কালিপদ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করল।

কালিপদ স্বীকারোক্তি দিল ঃ আমার দেশের স্বার্থেই আমি কামাখ্যা সেনকে গুলি মেরে হত্যা করেছি। সে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করত, এতে আমি বড় ব্যথা পাই। এই খুনের জন্য কেউ দায়ী নয়—একমাত্র আমিই দায়ী। কেবল সন্দেহের উপরে নির্দোষী ব্যক্তিদের অকারণে ধরে অত্যাচার করা হচ্ছে বলে আমি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করলাম। কেউ আমাকে শিখিয়ে দেয়নি।

কালিপদর বিচার করলে শ্বেতাঙ্গ আদালত এবং দণ্ডাদেশ হলো ফাঁসি।

মৃত্যু ! To be hangged till death !

নির্দিষ্ট দিনে কালিপদর অমর আত্মা বায়ুস্তরে মিলিয়ে গেল, রক্তসাগরে আর একবিন্দু রক্ত দান করে।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে লাগল এমনি করেই থেকে থেকে। কোথায় এর শেষ ! কোথায় এর সমাপ্তি !

তারপর এলো ৫ই আগস্ট ঃ ফিরিঙ্গীদের পত্রিকা স্টেটস্‌ম্যানের কুখ্যাত সম্পাদক ওয়াটসনের উপরে এক তরুণ বিপ্লবী গুলিবর্ষণ করে কিন্তু অল্পের জন্য ওয়াটসন বেঁচে যায়। বিপ্লবীকে ধরেও ধরতে পারা যায় না—স্বেচ্ছায় কালকূট গ্রহণ করে সে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

আগস্টের শেষাশেষি ২৮শে তারিখে আবার বিপ্লবীর হাতের অগ্নিনালিকা এক কুখ্যাত শ্বেতাঙ্গ পুলিস সুপারকে লক্ষ্য করে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে। কিন্তু ওয়াটসনের ন্যায় ঐ শ্বেতাঙ্গ সুপারও আহত হয়েও প্রাণে বেঁচে যায়। এবং বিপ্লবী বিনয়ভুষণ রায় ধৃত হয়।

শ্বেতাঙ্গর নাম মিঃ সি. এম্‌. গ্রাসবি।

গ্রাসবি ছিল ঢাকার অতিরিক্ত পুলিস সুপার।

বিচারে বিনয়ভূষণের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়।

আবার চট্টলা। ২৪শে সেপ্টেম্বর—১৯৩২।

চট্টলার বিদ্রোহীদের যেন বিশ্রাম নেই !

মহানায়ক মাস্টারদার নির্দেশক্রমে আবার এক বিরাট অগ্নিযজ্ঞ দেখা দিল।

এবারকার স্থান চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থিত শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের অন্যতম

প্রমোদশালা—ক্লাব।

চারিদিকে চট্টগ্রামে তখন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অবর্ণনীয় নগ্ন বর্বর অত্যাচার চলেছে অবাধে।

পাহাড়তলীর বিপ্লবীদের দুরন্ত মৃত্যু-অভিযান যেন তারই প্রত্যুত্তর। তারই জবাব।

১৭ই সেপ্টেম্বর পুরুষের বেশভূষায় তিনজন লোককে ট্যাক্সিযোগে পাহাড়-তলীর দিকে যেতে দেখা যায়। দেওয়ানহাটের নিকটে তাদের কথাবার্তা শুনে সরকারের এক উচ্ছিষ্টলোভীর মনে কেমন সন্দেহের উদ্রেক করে এবং আরো তার মনে হয় ওদের মধ্যে তিনজনই পুরুষ নয়, একজন নারী।

সত্যিই একজন নারী ছিল—চট্টগ্রামের অন্যতম দুঃসাহসিনী বিপ্লবী নায়িকা কল্পনা দত্ত।

সেই নরাধম ওদের অনুসরণ করল এবং তারই চেষ্টায় ওরা ধরা পড়ে। এবং কল্পনা জামিনে মুক্ত হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল সরকারের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে।

সে অভিযানের আসল উদ্দেশ্যটা বেশী দিন আর গোপন রইলো না—মাত্র সাত দিনের মধ্যেই ২৪শে চট্টগ্রামের চিরস্মরণীয়া বিপ্লবী নায়িকা সেই প্রীতিলতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ও ঘন ঘন বিপ্লবীদের হাতের অগ্নিনালিকার অগ্নিগর্জনে বিদ্রোহী ভারতের ১৯৩২এর ২৪শে আগস্টের রাত্রি চিরোজ্জ্বল হয়ে রইলো।

বিদ্রোহী বাংলার প্রথম নারী শহীদ প্রীতি-রাণী ছিল তদানীন্তন বিপ্লব-আন্দোলনের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের অবিস্মরণীয় অগ্রদূতী।

মাস্টারদার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি শিষ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্যা।

আশ্চর্য মাস্টারদা—সূর্য সেন।

বেছে বেছে পাহাড়তলী অভিযানের পুরোভাগে নেতৃত্ব তুলে দিলেন এক তরুণীর স্কন্ধে নিশ্চিন্ত স্থির বিশ্বাসে।

প্রীতির নেতৃত্বে আটজন তরুণ বিপ্লবী—২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দশ ঘটিকায় যখন চল্লিশজন শ্বেতাঙ্গ নরনারী পাহাড়তলীর প্রমোদশালায় নৃত্য-গীত-পান ও ক্রীড়া-উৎসবে মাতোয়ারা—সহসা তাদের উপরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দ, ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ ও আহতের আর্তনাদে মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গের প্রমোদশালাটি যেন রক্তাক্ত এক রণক্ষেত্রে হলো পরিণত।

শ্বেতাঙ্গের দলও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালাল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই পতাতক—আর এদিকে মিসেস্ সলিভান নিহত ও এগারো জন সভ্য আহত।

আর! আর দেখতে পাওয়া গেল প্রমোদশালা হতে প্রায় একশত গজ দূরে মাটিতে পড়ে আছে পুরুষবেশে সজ্জিতা এক বাঙালী তরুণীর গুলিবিদ্ধ ও রক্তাক্ত দেহ। তদন্তে আরো প্রকাশ পেল, এবং তরুণী তীব্র হলাহল পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে জীবন দিয়েছে। কে ঐ তরুণী? আমাদের প্রীতিলতা। নির্মল সেনের

শিষ্যা—রাণী। মাস্টারদার প্রিয় শিষ্যা—প্রীতিলতা।

উভয়-পক্ষের গুলিবর্ষণের ফলে প্রীতি আহত—গুরুতররূপে আহত হয়ে টলতে টলতে কিছুদূরে গিয়েই মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু প্রাণ থাকতে শ্বেতাঙ্গের হাতে ধরা দেওয়া চলবে না। এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

সঙ্গে ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড। নীলকণ্ঠের ন্যায় সেই বিষ সে কণ্ঠে তুলে নিল।

চট্টগ্রামেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রীতির জন্ম।

বাড়ির অবস্থা কোনদিনই খারাপ ছিল না, ধনী না হলেও বেশ সাচ্ছল্যই ছিল সংসারে।

চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রীতি ঢাকায় ইডেন কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো।

সেখান হতে আই. এ. কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে কলকাতায় গেল বেথুন কলেজে বি. এ. পড়তে।

ঢাকায় অধ্যয়নকালেই প্রীতি দীপালী সঙ্ঘের সংস্পর্শে এসে মনের মধ্যে বিপ্লবের দীক্ষা পায়।

১৯৩১ সনে মে মাস থেকে জুলাই পর্যন্ত শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস যখন আলীপুর জেলের সেলে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে সেই সময় প্রীতি রামকৃষ্ণের ভগ্নীর পরিচয়ে সেখানে বহুবার যাতায়াত করে এবং রামকৃষ্ণর নিকট হতেই রাণী মৃত্যুমন্ত্রের প্রথম দীক্ষা নেয়।

তারপর রাণী আসে ১৯৩২এর মে মাসে শহীদ নির্মল সেন ও বিপ্লবী-সূর্য মাস্টারদার সংস্পর্শে।

অন্তরের অন্তস্তলে যে অগ্নিমন্ত্র এতদিন ধিকি ধিকি জ্বলছিল শত রক্তরাঙন শিখায় তার দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

নির্মল সেনের মৃত্যু সেই অগ্নিকে আরো লেলিহ করে তুলল। এবং শেষ আহুতি হলো ২৪শে সেপ্টেম্বরের সেই দুর্যোগময়ী রাত্রির অন্ধকারে।

বাংলার জোয়ান অফ আর্ক—বিপ্লবী নায়িকা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ভারতের বিদ্রোহের ইতিবৃত্তের পাতায় একটি অবিস্মরণীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ!

ভারতের বিদ্রোহাকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। ১৯৩২এর ২৯শে অক্টোবর। কলকাতা শহরের উপরে।

কলকাতা শহরে ৮০নং ক্লাইভ স্ট্রীটে গিলেণ্ডার্স হাউসের উপরের তলায় বেলা সাড়ে এগারোটার সময় শ্বেতাঙ্গ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ ই. ভিলিয়ার্স্ মেসার্স লকহার্ট, মেলেণ্ডান ও মুলকের সঙ্গে যখন আলাপে রত, অতর্কিতে—পরিধানে কোর্ট, ট্রাউজার ও মাথায় ফেজক্যাপ এক যুবকের আবির্ভাব ঘটলো ওদের সামনে। এবং অকস্মাৎ সেই যুবকের হাতে পিস্তল অগ্ন্যুদ্গার করলো।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।

যুবক ধৃত হলো আগ্নেয়াস্ত্র সমেত।

কে ঐ দুঃসাহসী যুবক?

বিমল দাশগুপ্ত—ইতিপূর্বে যে মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট পেডি হত্যার অভিযোগে ধৃত হয়ে পরে প্রমাণাভাবে মুক্তি পায়। বিমল বরিশাল জেলার বাসণ্ডা ঝালকাঠির অক্ষয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র।

৩১শে অক্টোবর ধৃত বিমলকে নিয়ে মামলা শুরু হলো ট্রাইবুনাল গঠন করে।

১২ই নভেম্বর রায় দেওয়া হলো: দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ।

ঐ নভেম্বর মাসেই এক বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর—ফণী ঘোষকে বিপ্লবীরা হত্যা করে।

বিশ্বাসঘাতক ফণী একদা বিপ্লবীদের দলেই ছিল।

ফণীর অনেক কীর্তি। কীর্তিমান পুরুষ সে।

১৯৩০এ দ্বিতীয় বার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের হয়ে সে সাক্ষী দেয়।

মৌলনীতে দ্বিতীয় বারের ডাকাতি মোকদ্দমায়ও সে রাজসাক্ষী হয়।

এবং মতিহারী ষড়যন্ত্র মামলা ও পাটনা ষড়যন্ত্র মামলায়ও কীর্তিধ্বজ রাজার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তৃতীয় দফায়।

বেতিয়াতে ঐ ফণীর একটা দোকান ছিল।

১৯৩২য়ের নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় ফণী, গণেশপ্রসাদ ও অন্য এক ব্যক্তি যখন ফণীর দোকানে বসে খোসগল্পে মেতে আছে সহসা দুইজন বিপ্লবী ধারাল একটা ভোজালি হাতে সাক্ষাৎ যমের মত ফণীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিপ্লবীর হাতের ধারালো ভোজালি-মুখেই দেশদ্রোহী ফণী তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

গণেশপ্রসাদকেও বিপ্লবীরা বাদ দেয় নি।

রক্তাক্ত আহত ফণী ও গণেশপ্রসাদ হাসপাতালে নীত হয়।

২০শে নভেম্বর গণেশপ্রসাদের ও ১৭ই নভেম্বব ফণীর মৃত্যু হয়।

দেশের জাতীয় কলঙ্ক এমনি করে ভোজালি মুখে সরানো হলো।

উক্ত ঘটনার এক বৎসর পরে বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রমা সিংহকে ঐ মামলায় জড়িত করে সরকার বাহাদুর উভয়কেই চালান দেয় এবং ১৯৩৪—২৩শে ফেব্রুয়ারী T. Luby চন্দ্রমা সিংহকে মুক্তি দেয় ও বৈকুণ্ঠ সুকুলের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হয়।

কিছুদিন গত না হতেই, ১৯৩২—২৮শে নভেম্বর রাজশাহীতে অগ্নিঝলক দেখা দিল আবার, রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের জেলার চার্লস লুক যখন জেলের কম্পাউণ্ড থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে সবে মাত্র নেমেছে, অতর্কিতে গুলির শব্দ শোনা গেল।

আহত রক্তাক্ত অবস্থায় চার্লস সাহেব পড়ে গেল।

আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য চার্লসকে কলকাতায় প্রেরণ করা হলো।

সরকার বাহাদুর সুকঠোর দমননীতির রজ্জুতে ফেলে, কারাবাস, গুলিবর্ষণ, বর্বরোচিতভাবে প্রাণনাশ করেও বিদ্রোহী ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আগুনের মতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জনগণের বুকে দিবানিশি জ্বলতে থাকে।

১৯৩৩এর ২রা ফেব্রুয়ারী স্যার হেনরী হেইগ যে বিবৃতি দেয় তা থেকে জানা যায়ঃ

Bengal Criminal Law Amendment Act অনুযায়ী ১৯৩২এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা দেশে ১৩৪৮ জন ধৃত হয়।

দেউলীতে ৯৮ জন ও পাঞ্জাবে একজন বন্দী ছিল। ৩৫ জন রাজবন্দী।

সরকার বাহাদুর তৃতীয় গোলটেবিল প্রহসনও শেষ করল।

সাল তামাম।

রক্তক্ষরা ১৯৩২ সালও পার হয়ে গেল।

এলো ভৈরব হরষে ১৯৩৩ সাল।

বিদ্রোহী ভারতের রক্ত-ইতিহাসের আরো একটি রক্তক্ষরা বৎসর।

পাঁচ

১৯৩৩।

১৯৩৩এর ১৬ই ফেব্রুয়ারীর পর ১৮ই এপ্রিল ১৯৩৩এর খুব দীর্ঘ দিন নয়। তথাপি অবিস্মরণীয় দুটি দিন।

সিরাজ, কাশেমআলী, মহারাজ নন্দকুমার, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, প্রফুল্ল অনেকে অনেক রক্তদান করেছে।

১৮৫৭ থেকে শুরু করে ১৯৩৩ পর্যন্ত অনেক রক্তই বর্ষিত হয়েছে ভারতের মাটিতে।

ইতিহাস তা ভোলে নি, ভুলবেও না। ভুলবার নয়।

ভোলে নি, ভারত ভোলে নি সে কথা।

সূর্য সেন!

দুঃখ করো না হে মহান্! হে জ্যোতির্ময় মুক্ত পুরুষ!

মীরজাফর, উমিচাঁদ, ভবানন্দ, নরেশ, ফণী, ইন্দু—এদের পাপের গুরুভারে আজও আমরা পদে পদে লাঞ্ছনা ও গ্লানির পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছি।

মুক্তি পাই নি, মুক্তি পাই নি।

বুকের পাঁজরের তলায় আজও যে জ্বলছে তাই অনির্বাণ অগ্নিশিখা!

সূর্য সেন!

সূর্যের ন্যায় প্রখর উদ্দীপ্ত জ্যোতির্ময়, জ্বলন্ত তলোয়ারের মতই ধারালো মহাবিপ্লবের মহানায়ক সূর্য সেন—ভারতের মাস্টারদা!

বালাশোরে বুড়ীবালামের তীরে বাঘা যতীন আর চট্টলার গৈরালা গ্রামে সূর্য সেন চিরদিন চিরকাল জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে অগ্নির অক্ষরে জ্বলজ্বল করে জ্বলবে।

অনেক খুঁজেছে সরকার তন্ন তন্ন করে চট্টগ্রাম শহর ও তার অন্ত্য প্রত্যন্ত, কিন্তু তথাপি কোন সংবাদই পায়নি সূর্য সেনের। পুরস্কারের পরিমাণ ৫000 থেকে ১0000 টাকায় গিয়ে উঠলো।

অবশেষে এক দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের বংশধর নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় সব শেষ হয়ে গেল।

শেষ আশার আলোক-বিন্দুটি নির্বাপিত হলো।

এখানে ওখানে দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে সরকারের শ্যেন চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে অবশেষে সূর্য সেন গৈরালা গ্রামে ঐ বিশ্বাসহন্তা নেত্র সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন সেনের গৃহে তখন আত্মগোপন করে আছেন।

নেত্র সেন যখন দেখলো সূর্য সেন—মাস্টারদা—তারই ভ্রাতার গৃহে আত্মগোপন করে আছেন, তখন সেই দুরাত্মা ১0000 টাকার লোভ আর সামলে উঠতে পারল না।

গোপনে সে পুলিসের কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল।

১৯৩৩এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে সুসজ্জিত পুলিস ও মিলিটারীর এক বিরাট বাহিনী এসে অকস্মাৎ ব্রজেন সেনের বাড়িটা ঘিরে ফেলল।

তীব্র অনুসন্ধানী আলো ফেলে ও ইলিউমিনেশন রকেট ছুঁড়ে রাতের আকাশকে আলোয় আলোয় যেন ঝলসে দিল।

তারপর ঐ সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো চারিদিক থেকে অবিশ্রাম মেশিনগান, রাইফেল ও রিভলভারের মুখে মুহুর্মুহু অগ্ন্যুদ্গার।

মাস্টারদাও নিশ্চুপ থাকলেন না। বিরাট বাহিনীর মুখে অকম্পিত দাঁড়িয়ে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করলেন।

এক দিকে মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও মণিদত্ত চারজন বিপ্লবী—অন্য দিকে সরকার বাহাদুরের বিরাট সশস্ত্র বাহিনী।

এক দিকে মাত্র চারটি রিভলভার, অন্য পক্ষে মেশিনগান, রাইফেল ও রিভলভার।

কতক্ষণ চালানো যেতে পারে ঐ ভাবে যুদ্ধ?

তথাপি ঐ চক্রব্যূহ ভেদ করেই কোনমতে মাস্টারদা ও কল্পনা দত্ত ও অন্য সকলে সশস্ত্র বাহিনীকে অতিক্রম করে বাড়ির বাইরে গেলেন।

সামনেই একটা বাঁশের বেড়া—বেড়া ডিঙিয়ে যে যেদিকে পারল পালাল।

সূর্য সেন সে রাত্রে অসুস্থ ছিলেন—বড় ক্লান্ত, পালাতে পারলেন না। সহসা সামনের অন্ধকার থেকে মর্নবিহারী ক্ষেত্রী গুর্খা প্রহরী লাফ দিয়ে এসে তাঁকে দু হাতে সবলে জাপটে ধরে চিৎকার শুরু করে দিল।

ব্রজেন সেনও ধরা পড়ল।

এত আলো আকাশে, তথাপি যেন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ; রাহুকবলিত হলেন সূর্য সেন। কল্পনা দত্ত পালাল।

এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা, সে কি তার যোগ্য পুরস্কার পাবে না ? এত বড় দেশদ্রোহিতার কি শাস্তি হবে না ? বৃথাই যাবে ?

দেশে কানাইলালের কি অভাব হয়েছে ?

না।

চার দিনের মধ্যেই বিশ্বাসহন্তা—দেশের শত্রু নেত্র সেন যখন দিবা দ্বিপ্রহরে আহারে বসেছে, স্ত্রী তার পরিবেশন করতে করতে রন্ধনশালার দিকে গিয়েছে, সহসা শাণিত কৃপাণ ঝলকে উঠলো।

স্ত্রী ফিরে এসে দেখলো নেত্র সেনের দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড।

১0000 টাকা পুরস্কার মিলেছে তার স্বামীর।

সূর্য সেনকে শৃঙ্খলগত করে মহাবীরকে যখন চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হলো সশস্ত্র পুলিস ও মিলিটারীর দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায়, পুলিসের ছোট-বড় সব কর্তারা-উপকর্তারা ছুটে এলো।

সূর্য সেন ধরা পড়েছে।

বিপ্লবী সূর্যকে শৃঙ্খলিত করে আনা হয়েছে !

কোথায় ? কোথায় সে ? কেমন সে দেখতে ? কটা তার হাত, কটা তার পা ? কটা তার মাথা, কটা তার চোখ ?

দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে এত বড় বিরাট বাহিনীকে যে ঘোল পান করিয়ে ছাড়ছে সে কে !

Who is that Surya Sen !

অবাক হয়ে গেল সকলে—এই খর্বাকৃতি বিরলকেশ ছোট্টখাট্ট মানুষটিই সূর্য সেন ! বিরাট বিপ্লবের মহানায়ক !

এ কি বিশ্বাসযোগ্য !

অভিনন্দন জানাতে শুরু করলো সব সরকারী ভৃত্যেরা—কেউ চড়, কেউ কিল, কেউ একটা লাথি—অনেক দিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ !

নৃশংস বর্বরতায় শতমুখী হয়ে উঠলো শ্বেতাঙ্গীয় সভ্যতা ও শিক্ষা।

সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে সূর্য সেনকে লৌহ কারাগারে নিয়ে গিয়ে ঢোকানো হলো।

বন্দী সূর্য ! মেঘাবৃত অশনি !

তারকেশ্বর দস্তিদারের স্কন্ধে এলো নেতৃত্ব।

আবার বিপ্লবীচক্রের গোপন অনুষ্ঠান হলো—মাস্টারদাকে যে উপায়েই হোক কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

আয়োজন চলতে লাগল গোপনে গোপনে, অতি সন্তর্পণে।

কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! হায়রে হতভাগ্য দেশ!

আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই ২০শে মার্চ একটি বালক চট্টগ্রাম কারাগারের আশেপাশে যখন ঘুরছে, একজন লোক নিঃশব্দে জেলখানা হতে বের হয়ে এসে লালদীঘির পাড়ে বসল।

ছেলেটি ঐ লোকটির সামনে এলো, তারপর শুরু হলো উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা।

ছেলেটির নাম শৈলেশ রায়। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র।

দুজনকে কথা বলতে দেখে দূর থেকে এক সরকারী অনুচরের সন্দেহ হয়; সে তক্ষুনি কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল।

দুজনেই গ্রেপ্তার হলো।

সমস্ত ষড়যন্ত্র সরকারের গোচরীভূত হয়ে গেল। পরিকল্পনা হলো ব্যর্থ।

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন বাদেই পটিয়া থানার দারোগা মাখন দীক্ষিত বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দেয়।

এদিকে তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, মনোরঞ্জন দাস মে মাসে এসে আনোয়ারা থানার অন্তর্গত গাহিরা গ্রামে পূর্ণ তালুকদারের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে গোপনে।

সহসা অতর্কিতে ১৯শে মে রাত্রির অন্ধকার শেষ না হতেই মেজর কীনের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিস এসে পূর্ণ তালুকদারের বাটি ঘেরাও করে ফেলল।

পলায়নের আর কোন পথই নেই দেখে বিপ্লবীর দল সম্মুখ-সমরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শুরু হলো উভয় দলের মধ্যে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ!

প্রতিপক্ষের গুলিতে গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার ও মনোরঞ্জন দাস নিহত হলো। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হলো।

উভয়কে সশস্ত্র প্রহরাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম কারাগারে নিয়ে আসা হলো।

এইবার সরকার বাহাদুর মহোৎসাহে সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে কেন্দ্র করে তৃতীয় দফায় নবোদ্যমে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলা শুরু করলো—২৬শে জুন ১৯৩৩ সনে।

অতি সতর্কতার সঙ্গে, অতি গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে জেলখানার নিকটবর্তী গোয়েন্দা-কার্যালয়ের একটি নিভৃত কক্ষে, Mr. W. Macsharpe, রজনী ঘোষ ও খন্দকার আলি তায়েফকে নিয়ে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার-প্রহসন শুরু করল।

সরকার পক্ষে দাঁড়াল—পাবলিক প্রসিকিউটার নগেন বাঁড়ুয্যে ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

আর বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়ালেন—কৌঁসলি জে. ঘোষাল, বিনোদলাল সেন

ও শ্রীরজনী বিশ্বাস মহাশয়।

মামলা চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে আমরা বর্ণনা করবো তদানীন্তন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার কাহিনী। সেও এক অভিনব অধ্যায় বিদ্রোহী ভারতের।

সরকারের সদা-সতর্ক প্রহরীদের শ্যেন চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সরকারের হিজলী, দেউলী ও বক্সা বন্দী-নিবাস থেকে পলায়ন করে এবং গোপনে তারা অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এক বিরাট ও ব্যাপক বিপ্লব-অভ্যুত্থানের সাধনায় নিযুক্ত হয়। বিরাট ছিল তাদের পরিকল্পনা—বাংলা দেশ হতে শুরু করে পাঞ্জাব, বোম্বাই, মদ্রদেশ, গুজরাট, দিল্লী, বিহার, উড়িষ্যা, এমন কি সুদূর বর্মা মুলুক পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

সরকারের গুপ্তচরেরা অনেকদিন থেকেই ঐ বিপ্লব-অভ্যুত্থানের ঘ্রাণ পেয়েছিল এবং তারা সর্বত্র অনুসন্ধানে ফিরতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে সামান্যতম সন্দেহ হলেই ধরপাকড় করতে থাকে। অবশেষে ১৯৩২এর ২৮শে ডিসেম্বর সরকার পলাতক বন্দী জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তকে গ্রেপ্তার করল।

জিতেন্দ্রনাথ ১৯৩৩এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী বক্সা বন্দী-নিবাস থেকে পলায়ন করেছিল।

এর পর ক্রমে ক্রমে সরকার প্রভাত চক্রবর্তী, কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত, বিমল ঠাকুর, সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী ও জ্যোতিষ মজুমদার প্রভৃতি অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে। অতঃপর ১৯৩৩এর ৭ই আগস্ট জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করে সুচতুর শ্বেতাঙ্গ সরকার ঐ আটত্রিশজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ক (ষড়যন্ত্র) খুন ও ডাকাতির ষড়যন্ত্র ৩০২, ৩৯৫।১২০ বি, অস্ত্র আইন (Arms Act 19 and 20), বিস্ফোরক আইন (Explosive Substances Act) প্রভৃতি বহুবিধ ধারায় অভিযোগ এনে আলিপুরে এক মামলা শুরু করল : আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা।

প্রভাত চক্রবর্তীই ছিল ঐ প্রচেষ্টার নেতা।

বক্সা বন্দী-নিবাস থেকে আসানসোলের অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামে স্থানান্তরিত হবার সময় প্রভাত চক্রবর্তী ১৯৩২এর ১০ই জানুয়ারী পালিয়ে যায়।

একটি সাঙ্কেতিক চিহ্নযুক্ত কাগজ থেকে ঐ দলের অবনী ভট্টাচার্য, ইন্দু মজুমদার, সুধীর ভট্টাচার্য, সঞ্জীব মুখার্জী প্রভৃতিও গ্রেপ্তার হয়।

সুদীর্ঘ দুই বৎসর ধরে বিচার-প্রহসন চালিয়ে—১৯৩৫এর ১লা মে মামলার রায় দেওয়া হয়। দণ্ডাদেশ হলো—প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে ও নরেন্দ্রনাথ ঘোষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও সীতানাথ দে রায় ঘোষিত হবার সময় পলাতক—

পূর্বেই তারা জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

অন্যান্যদের—দশ, সাত, পাঁচ ও ছয় বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়।

১৯৩৩এর মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের এক বাড়িতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দীনেশ মজুমদার—মেদিনীপুর জেল হতে পালিয়ে যখন হিজলী বন্দী-নিবাস হতে পলাতক আরো দুজন বিপ্লবী—নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আত্মগোপন করে আছে, সরকার গোপনে সংবাদ পেয়ে সহসা অতর্কিতে একদিন এসে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা উপায়ান্তর না দেখে যুদ্ধং দেহি বলে সম্মুখ-সমরে গর্জনমুখর অগ্নিনালিকা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুলিসবাহিনীও প্রত্যুত্তর দিল।

মহানগরীর পথে শুরু হয়ে গেল এক অগ্নিযুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত দীনেশ, নলিনী ও জগদানন্দ তিনজন ধৃত হয়।

আবার ওদের নিয়ে নতুন করে বিচার হলো।

এবারে দীনেশের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ ও অন্য দুজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো।

১৯৩৩ সনেই হিলি স্টেশনে সরকারী ডাক বিপ্লবীরা লুঠ করে নেয়।

এবং সরকার বাহাদুর ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনকে বন্দী করে এনে হিলির মামলা শুরু করে।

মামলার বিচারে—হৃষীকেশ ও প্রাণকৃষ্ণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ জারী হয়।

বিপ্লবের অগ্নিশিখা আবার ভারতের আকাশকে রক্তাক্ত করে তুললো ২রা সেপ্টেম্বর—১৯৩৪ সনে।

শহীদ প্রদ্যোতের সে সতর্কবাণী! মৃত্যুর মতই কঠোর অমোঘ সেই অনুশাসন, **We are determined Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapore. Yours is the next turn!**

এইবার তোমার পালা। তোমারে বাঁধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

হতভাগ্য বার্জ ভুললেও বিপ্লবীরা ভোলে নি।

২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণকালে এলো সেই মৃত্যুপথযাত্রীর ভবিষ্যৎ সাবধান-বাণীর পারণ-লগ্ন।

অপরাহ্ণবেলায় সেদিন মাঠে টাউন ক্লাবের সঙ্গে মহামেডান ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ।

শ্বেতাঙ্গ মিঃ বার্জ সেদিন টাউন ক্লাবের তরফে খেলবে।

দর্শকদের ভিড়ে মাঠে তিল ধারণেরও স্থান নেই।

বহু সহস্র পুলিস ও সরকারী কর্মচারীও দর্শকদের মধ্যে সেদিন ছিল।

খেলা শুরু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই, শ্বেতাঙ্গ বার্জ তার গাড়িতে করে মাঠের সামনে এসে নামল।

উৎফুল্ল চিত্তে অগ্রহর হয়ে চলেছে ময়দানের দিকে, সহসা নীলাকাশ হতে যেন বজ্রবিদ্যুতের হুংকার শোনা গেল।

দুম···দুম! দুড়ুম!

প্রদ্যোতের সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হলো, রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহে বিগতপ্রাণ বার্জ মাটিতে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বার্জের দেহরক্ষীরাও তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করল।

বিপ্লবীদের মধ্যে দুজন—অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিপক্ষের গুলিতে ঐখানেই চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লো তাদের কর্তব্য সমাপনান্তে। অন্যান্য বিপ্লবীদের ধরা গেল না, তারা সরে পড়ল।

শুরু হলো এবারে মেদিনীপুর শহরে সরকারের দানবীয় দমননীতি ও বর্বর অত্যাচারের ব্যাপক কুৎসিত দৌরাত্ম্য।

মিলিটারী মার্কা পুলিস সুপার মিঃ ইভান্স তার চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে যেন উন্মাদ নৃত্য শুরু করে দিল।

খানাতল্লাসী, মারপিট, গ্রেপ্তার—জনসাধারণের উপর দিয়ে যেন ঝড়ের গতিতে চলতে লাগল।

এত করেও সুদক্ষ সরকার ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে—বিপ্লবীচক্রের কাউকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো না।

পীড়নে আতঙ্কে জর্জরিত জনসাধারণ শহর ছেড়ে পালাতে লাগল।

অপরাধীদের ধরিয়ে দেবার জন্য ৫০০০—১০০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হলো। তথাপি কোন ফল হলো না।

জনহীন শহর শ্মশানের মত স্তব্ধ খাঁ-খাঁ করছে। রাস্তায় একটি লোক নেই, জন নেই।

মধ্যে মধ্যে মিলিটারী প্রহরী ও সশস্ত্র পুলিশ প্রহরীর লোহার নাল-বসানো ভারী অ্যামুনিশন বুটের মচ্ মচ্ শব্দ।

শ্বেতাঙ্গ কর্তা ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন ব্যর্থকাম হলো, ডাক পড়লো এবারে বাঙালী ডেঃ সুপারের। চারিদিকে গোয়েন্দা কুত্তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

অর্থের বিনিময়ে এবারে শুরু হলো সত্য ও মিথ্যা সংবাদের বেচাকেনা।

দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার জুয়াখেলা চলতে লাগল এবারে অবাধে।

মেদিনীপুরের উকিল, ১৯০৮এ মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত যোগজীবন ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর—যামিনীবাবুর দুই পুত্রকে সরকার গ্রেপ্তার করে আরো অন্যান্য কয়েকটি যুবকের—নির্মলজীবন ঘোষ,

ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, সনাতন রায়, রামকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির সঙ্গে। আবার দেশের মুখে কলঙ্ক-কালিমা ছিটিয়ে দিয়ে যামিনীবাবুর এক পুত্র মীরজাফরের পদানুসরণ করল।

জজ মিঃ ওয়েইটুকে নিয়ে ট্রাইবুন্যাল বসল। নিয়মিত প্রথায় সম্পূর্ণ ভাবেই এক সজ্জিত ও সুপরিকল্পিত মামলা সাজিয়ে বিচার-প্রহসন সমাপ্ত করা হলো।

রায় হলো : ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের প্রতি to be hanged till death—ফাঁসি ও সনাতন রায় প্রভৃতি পাঁচটি যুবকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সরকার-পক্ষ ঘুষ দিয়ে সাক্ষ্য যোগাড় করে তাদের আক্রোশবহ্নি প্রশমিত করল।

পুলিস যেমন করেই হোক জানতে পেরেছিল মেদিনীপুরের পূর্বতন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট ডগ্‌লাস নিধনে প্রদ্যোৎ প্রভৃতির সহযোগী ছিল বিপ্লবী প্রভাংশু-শেখর পাল।

বার্জ নিধনের দশ-বারো দিন পরেই কলকাতায় প্রভাংশু সরকার কর্তৃক ধৃত হয়।

কিন্তু বহু চেষ্টা ও পীড়নেও প্রভাংশুশেখরের দ্বারা ডগ্‌লাস নিধন সম্পর্কে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে এবং কোন মামলাও তার বিরুদ্ধে আনতে সক্ষম না হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে বিনা বিচারেই কারাগারে তাদের অপূর্ব অর্ডিনান্স বলে বন্দী করে রাখল সরকার।

১৯২৮ সাল থেকেই নানাভাবে প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতের মুষ্টিমেয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের রুশ জাগরণের ইতিকথা ও তাদের সুপরিকল্পনার অপূর্ব কর্মপন্থা এক নতুন আশার বাণী বহন করে আনে। একমাত্র রুশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড জুড়েই আবহমান কাল হতে যে সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর পীড়ন ও অত্যাচার চলে আসছিল গত মহাযুদ্ধের পর লেনিনের নেতৃত্বে ও মনীষী কার্ল মার্কসের বুদ্ধিমত্তার আলোয় রুশের জনগণ এক নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

রুশের নাড়ীতে নাড়ীতে স্পন্দিত হতে শুরু করে এক নতুন স্পন্দন।

জারের পতন ও সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে রুশের নব অভ্যুত্থান।

সাম্যের কল্যাণশ্রীতে সমগ্র রুশ দেশ যেন রঙিন সতেজ হয়ে উঠলো।

সে আলো ভারতের মাটিতেও এসে পড়ল।

মীরাট মামলার গোড়ার কথাটাই তাই।

সশঙ্ক তদানীন্তন ভারত সরকার তারই সঠিক সংবাদটুকু খুঁজে বের করবার জন্য ১৯৩৮এর সেপ্টেম্বরে মিঃ ইটন নামক এক কর্মচারীর উপরে তদন্তভার দেয়।

১৯৩৯এর পনেরোই মার্চ ইটন এক রিপোর্ট দাখিল করল। যার ফলে ঐ

বৎসরেই ভারতব্যাপী ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল।

৩১ জনকে বিভিন্ন স্থান হতে গ্রেপ্তার করা হয়।

পূর্বেই বলেছি ১৯২৯—১২ই জুন মীরাট মামলার পত্তন হয়। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সরকার মামলা পরিচালনা করে।

ওদিকে মামলা পরিচালনার জন্য অভিযুক্তদের তরফে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার চাহিদা মিটাবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি সেণ্ট্রাল ডিফেন্স্ ফণ্ড গঠিত হয়।

১৯৩০এর জানুয়ারী মাসে মীরাটের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হোয়াইটের এজলাস থেকে মীরাটের সেসন জজ মিঃ আর. এম. ইয়র্কের এজলাসে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হয়।

ভারতের বুক থেকে চিরতরে ইংরাজ শাসন বিলোপ—স্বাধীনতা ও জনগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার অপরাধের অপরাধী ঐ ৩১ জন?

বিচার-প্রহসন এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলল।

মামলায় ৩০০রও অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কাগজপত্র ছিল সাত হাজার।

১৯৩২এর ১৬ই আগস্ট এসেসারদের মতামতের উপরে—অবশেষে—১৯৩৩এর —১৬ই জানুয়ারী রায় দান পর্ব সমাপ্ত হলো।

দণ্ডাদেশ জারী হলো—মুজাফ্ফর আহমেদ—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ডাঙ্গে, স্প্রাট, ঘাটে, জোগলেকার ও নিম্বাকার প্রভৃতির—দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর।

দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরের আদেশ হলো ব্রাড্লি, মীরাজকর ও ওসমানির প্রতি।

সাত বৎসর দ্বীপান্তরাদেশ হলো—শ্যাম সিং, যোশী, মাজিদ ও গোস্বামীর ওপরে।

অযোধ্যাপ্রসাদ, পি. সি. জোশী, অধিকারী ও দেশাইয়ের হলো পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তর।

চক্রবর্তী, বসাক, হাচিনসন, মিত্র, বজাবিওলা ও সাইগলের প্রতি আদেশ হলো চার বৎসর কঠোর কারাদণ্ড।

তিন বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডাদেশ হলো - সামসুল হুদা, আলভা, কাস্লে, গৌরীশঙ্কর ও কাদামের প্রতি।

নরেন ভট্টাচার্যও (মানবেন্দ্র রায়) ঐ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তার জাহাজে ভারত ত্যাগের জন্য কোন দণ্ডাদেশ তার প্রতি আরোপিত করা যায় নি। পরে মানবেন্দ্র রায় প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯৩১এর ২১শে জুলাই ওয়াইন হাউসে আকস্মিক ভাবে সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। এবং পরে বিচারে তার প্রতি ১২ বৎসরের জন্য সশ্রম কারা-দণ্ডাদেশ হয়।

শ্বেতাঙ্গ সরকারের অভিনব অস্ত্র-অর্ডিনান্সের জোরে ওদিকে প্রকাশ্যে সর্ব-প্রকার জাতীয় আন্দোলনই বন্ধ করবার পাশবিক চেষ্টা পুরো দমেই চলতে থাকে সর্বত্র, সারা ভারত জুড়ে।

কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, জেলা, মহকুমা, তালুক, থানা ও গ্রামের কমিটি, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হলো।

যেখানে যেখানে কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্র ছিল সমুদয় কেন্দ্রই সরকার জোর করে কুক্ষিগত করল। কংগ্রেসের টাকাকড়ি ফণ্ড্ সব সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলো।

পাইকারী জরিমানা, পিটুনী ট্যাক্স ও শান্তিরক্ষার নির্লজ্জ অজুহাতে দেশের সর্বত্র পরোক্ষভাবে অব্যাহত পীড়ন ও অত্যাচার চালাবার জন্য যে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন তাদের যাবতীয় খরচ-খরচাদি হতভাগ্য দেশবাসীর বক্ষ-রক্ত শোষণ করে আদায়ের সুব্যবস্থা হলো। সরকার নির্লজ্জভাবে শান্তিরক্ষার অভিনয়ে নিরীহ আবালবৃদ্ধবনিতাকে দায়ী করবার ক্ষমতা হাতে তুলে নিল।

এমন কি কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের পরে গৃহের বাইরে যেতে হলেও বিভিন্ন রঙের identity card বা পরিচয়পত্রের ব্যবস্থাও সরকার বাহাদুর করলো।

শয়নে স্বপনে জাগরণে আতঙ্কগ্রস্ত সরকার যেন অত্যাচারী দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুর মত বিষ্ণু-চক্রের ভীতি দেখছে তখন।

এত অত্যাচার এত পীড়ন, তথাপি জাতি এগিয়ে চলেছে। বিদ্রোহী বিপ্লবীর দল মরণপণে দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যেন ঘরে ঘরে প্রস্তুত হতে লাগল।

শত অত্যাচার—শত লাঞ্ছনা সহ্য করে, কালাপানির পারে ও ফাঁসির মঞ্চে নির্ভীক কণ্ঠে বার বার তারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেল—

আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান ?

বলিদান !

বলিদানের শেষ তো হয় নি আজও মুক্তির মন্দির সোপান তলে।

ছিন্নমস্তার রক্ত তৃষা তো আজও মেটে নি।

রুধিরে রুধিরে মাটি লাল হয়ে গেল, সেই লাল মাটির বুকে বীজ শুধু ছড়িয়ে গেল, এখনো হয় নি অঙ্কুরোদ্গম ! তাই তো ১৯৩৩কে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে এলো নতুন আশার স্বপ্ন বহন করে, নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে—১৯৩৪ সাল।

১৯৩৪ সাল। সূর্ব উঠলো লাল। রক্তের মত লাল।

জানুয়ারী ১লা থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত উঠেছিল, কিন্তু উঠলো না ১৩ই জানুয়ারীর সকালে।

মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে রইলো।

মধ্যে মধ্যে মেঘাবৃত আকাশের বুকখানার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত চিরে দিয়ে রুদ্রের ভয়াবহ চকিত ইশারা অগ্নিজ্যোতিতে জেগে উঠতে লাগল।

কেন ? কেন ১২ই জানুয়ারী এলো ?

প্রয়োজন ছিল তাই এসেছিল।

সূর্য সেন—মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের বক্ষরক্তে ১২ই জানুয়ারীর রাত্রির ইতিহাস লাল হয়ে রইলো।

সূর্য সেন—মাস্টারদা !

কল্পনার তুলি দিয়ে, হে মহান, হে বিপ্লবের অক্ষয় অনির্বাণ পাবকশিখা, তোমার মূর্তি গড়ে তোমাকে স্মরণ করি।

চট্টগ্রামের মাটিতেই এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মাস্টারদার জন্ম।

রাজনৈতিক জীবন শুরু প্রকৃতপক্ষে ১৯১৬ সাল থেকে।

বহরমপুর কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে মাস্টারদা যখন ফিরে এলেন চট্টগ্রামে, সমস্ত বুকখানা জুড়ে তখন বিপ্লবের অগ্নিপ্রবাহ বহে চলেছে।

পরাধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে ফেলে জাতির মুক্তির জন্য রক্ত-সংগ্রামের মৃত্যু-তিলক কপালে ধারণ করেছেন।

চট্টেশ্বরীর মন্দিরের দুয়ারে মাথা নত করে শপথ নিল বিপ্লবী : হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু !

বাইরের কর্মজীবনে স্কুলে গণিতের একজন নিরীহ শিক্ষক। সাংসারিক জীবনে বিবাহও তাঁকে করতে হলো।

কিন্তু বিপ্লবীর ব্রত আর সাংসারিকের ব্রত তো এক নয়। পরস্পরের মধ্যে যে কোন সংস্পর্শ নেই।

দেবীর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ—প্রত্যবায়ের পাপে লিপ্ত তো হতে পারেন না, তাই সংসারী হয়েও সংসারী নন। সহস্র বন্ধন মাঝেও বন্ধনহীন।

স্ত্রী থেকেও স্ত্রী নেই। মীনকেতুর প্রবেশাধিকার নেই।

স্ত্রী পুষ্পকুন্তলারও হয়ত কোন দুঃখ ছিল না। আদর্শ স্বামীর আদর্শ স্ত্রীই ছিলেন তিনি।

অসহযোগ-আন্দোলনে দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মাস্টারদা যখন চট্টলায় আবার ফিরে এলেন, নতুন উপলব্ধি তাঁর অন্তরে।

এবারে আর অসহযোগ নয়। দাঁতের বদলে দাঁত। চোখের বদলে চোখ।

কণ্টকাকীর্ণ পথে পথে ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এবারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দুর্জয় সংকল্প মনে।

অসহযোগ-আন্দোলনের উগ্রতা তখন চৌরিচৌরার নির্বাপিত অগ্নির মধ্যেই যেন অকাল-সমাধি পেয়েছে।

যে চৌরিচৌরার ঘটনার মধ্যে জেগেছিল ভয়ংকর এক ঝটিকা-সংকেত, দুর্নিবার সেই অগ্নিযজ্ঞের সম্ভাবনা অকস্মাৎ মহাত্মাজীর নির্লিপ্ততায় যেন ফুৎকারে নির্বাপিত করা হলো।

যে বিপ্লবীর দল সেদিন নতুন আশায় মহাত্মাজীর অহিংস সংগ্রামের মধ্যে

মৃত্যুপণ করে ঝাঁপ দিতে এগিয়ে এসেছিল, তারা হলো মর্মাহত।

বুটের লাথি খেয়ে তারা প্রেমের বাণী আওড়াতে পারল না। বলতে পারল না তারা, মেরেছো কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না!

মহাত্মাকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে গেল তাদের সংঘর্ষের পথে।

মাস্টারদা নবোদ্যমে তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

চাই অর্থ পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ সফল করতে হলে!

চট্টগ্রামের পরৈকোরা গ্রামে প্রথম লুণ্ঠনোৎসব পালন করা হলো।

পরৈকোরা গ্রামের সেই দুঃসাহসিক লুণ্ঠনের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

পুলিস বহু চেষ্টা করেও কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারল না।

তারপর ১৯২৩ সনে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর ১৭০০০ টাকা আবার চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা লুঠ করে নিল। কিন্তু টাকা লুঠ করেও বিপ্লবীরা সেটা কাজে লাগাতে পারল না, কারণ লুঠ করে ফিরবার পথে পুলিস ও জনসাধারণ তাদের অনুসরণ করল।

নাগারখানা পাহাড়ে দুই দলে হলো সম্মুখ-সংঘর্ষ। প্রচণ্ড এক খণ্ড অগ্নি-সংগ্রাম।

গুরুতরভাবে আহত হলেন মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও রাজেন দাস।

ঐ অবস্থায় শত্রু হস্তে পড়ে নিপীড়িত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর নেই দেখে তিনজনেই তীব্র বিষ পটাশিয়াম সায়ানাইড ভক্ষণ করলেন।

কিন্তু যাদের জন্য পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে অদূর ভবিষ্যতে, তাদের ওভাবে মৃত্যু হবে কেন? সকলেই অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু কারোরই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় না। কারণ পরে জানা যায় সেই বিষের রাসায়নিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল না।

দেশের সৌভাগ্য! জাতির সৌভাগ্য!

যাহোক পুলিস এসে পাহাড়ের উপরে অচেতন দেহগুলো আবিষ্কার করল এবং বয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে আসবার পর গ্রেপ্তার করে সকলকে নিয়ে সরকার মামলা রুজু করল।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অগ্নিক্ষরা সওয়ালে সকলে মুক্তি পায়।

কিন্তু সরকার ঐ মুক্তির ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হয়ে ওদের মধ্যে দুজনকে আরো অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে অর্ডিনান্স বলে বন্দী করে নিশ্চিন্ত হলো।

কেবল সূর্য সেনের পাত্তা পাওয়া গেল না—সরকারের মতলব আগে থাকতেই বুঝতে পেরে তিনি আত্মগোপন করলেন।

আত্মগোপন করে দুটি বৎসর সূর্য সেন বিপ্লবী কর্মজীবনের গোপন তৎপরতায় ব্যস্ত হয়ে ছিলেন। অবশেষে ১৯২৬ সনে সরকার সূর্য সেনকে

আবার বন্দী করল।

বন্দী জীবনে বিভিন্ন জেলে জেলে নানা কর্মতৎপরতায় ভরে ছিল মাস্টারদার সময়।

ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ঐ সময়েই তাঁর মনের মধ্যে স্থান পায়।

১৯২৮ সালে সূর্য সেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা দেবী বিশেষ পীড়িত হয়ে পড়েন।

একটি দিনের তরেও বিবাহিত জীবনে তিনি আরো দশটি বিবাহিতা নারীর মত স্বামীকে আপনার করে কাছে পান নি।

বসন্তের পুষ্পোৎসব বিপ্লবের অগ্নিস্পর্শে ঝলসে গিয়েছে।

মালা ঝরে গিয়েছে, ছিন্ন পাপড়ীর দীর্ঘশ্বাসে রাত্রির পর রাত্রি পুইয়ে গিয়েছে। নিশিদিন পাড়াপড়শীর কাছ হতে কত অভিযোগ লাঞ্ছনা নারীত্বকে তাঁর পীড়িত করে তুলেছে, বুকের মধ্যে তুষের আগুন নিয়ে পুষ্পকুন্তলা জ্বলে জ্বলে শেষ পর্যন্ত শয্যা নিলেন।

পীড়িতা স্ত্রীর সংকটাপন্ন শেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করে সরকার বন্দী মাস্টারদাকে কয়েকদিনের জন্য ছুটি দিল।

সূর্য সেন এলেন গৃহে।

শয্যায় কে শুয়ে ঐ! শয্যায় একেবারে লীন হয়ে গিয়েছে। জ্বলে জ্বলে অগ্নি আজ নির্বাপিত-প্রায়।

ভীরু প্রদীপ-শিখার ন্যায় দুটি কম্পিত সজল আঁখির দৃষ্টি তুলে পুষ্প তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে।

নিষ্ঠুর বিপ্লবী! পাষাণে বেঁধেছো তুমি বুক? স্নেহ প্রেম দয়া মায়া ভালবাসা তোমার অভিধানে নেই? নির্মম কুলীশকঠোর!

সতী নারী স্বামীর কোলে মাথা রেখেই চোখ বুজলেন।

কিন্তু পাষাণের চোখে এক বিন্দু জলও ঝরল না।

ছুটি ফুরিয়ে গেল, সরকার বাহাদুর এবারে দয়াপরবশ হয়ে মাস্টারদাকে জেলে না রেখে তাঁর গ্রামের গৃহেই অন্তরীণ করে রাখল।

তারপর ১৯২৮এর শেষাশেষি বিনা সর্তে সরকার যখন তাঁকে মুক্তি দিল, মাস্টারদা আবার চট্টগ্রামে ফিরে এলেন।

একে একে চট্টগ্রামের কারামুক্ত বিপ্লবীরাও মাস্টারদার চারপাশে এসে দাঁড়াতে লাগল।

এবারে আর অসহযোগ নয়। তরবারি-মুখে ছিনিয়ে নিতে হবে জননী জন্মভূমি।

দেশকে যারা এতকাল জোর করে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শোষণে শোষণে জর্জরিত করে ফেলেছে, সেই অত্যাচারীর বক্ষরক্তে এবারে সমাপন হবে বিপ্লবীর মাতৃপূজা!

নেতৃত্বভার মাথায় তুলে নিয়ে মাস্টারদার যাত্রা শুরু হলো।

চট্টলার যুবক-কিশোরের দল ঘরে ঘরে তৈরী হতে লাগল মাস্টারদার নির্দেশে।

ঘরে ঘরে প্রস্তুতি চললো। দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করে যারা প্রাণ দেবে প্রস্তুত হতে লাগল তারা।

পুরোভাগে তাদের বিপ্লবী-সূর্য—সূর্য সেন। মাস্টারদা।

স্থানীয় কংগ্রেস-নির্বাচনের সময় ছুরিকাঘাতে শহীদ সুখেন্দু দত্তর মর্মান্তিক মৃত্যু—অন্যান্য কর্মীদের মনে নিদারুণ আক্রোশ জাগল।

রক্তের বদলে রক্ত চাই। Tooth for a tooth ; Eye for an eye ;

কিন্তু মাস্টারদা শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, সুখেন্দুর মৃত্যু আমি কারো চাইতে কম অনুভব করি নি।

কিন্তু আমরা কি শুধু দলাদলির আত্মঘাতী সংঘর্ষে নিজেদের শক্তিক্ষয়ই করবো ? ভুলো না, ইংরেজ তাই চায়।

আসল সংগ্রাম এ নয়। শক্তি ক্ষয় করবার এ তো সময় নয়। আসছে সে শুভক্ষণ !

রক্তদানের শুভক্ষণ তো এখনো আসেনি। দিন আগত ঐ !

সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো !

দীপ্ত সূর্যের মতই বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সূর্য সেনের দীপ্তিতে ১৮ই এপ্রিল চট্টলার আকাশ রক্তরাঙা হয়ে উঠলো, তারপর দীর্ঘদিন ধরে পলাতক অবস্থাতেই চললো ইংরাজের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড জীবনক্ষয়ী সংগ্রাম। এবং শেষ পর্যন্ত নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকায় চট্টগ্রামের বুক থেকে শেষ আশার আলোক-বিন্দুটুকুও গেল নিভে।

বিশ্বাসঘাতকতার একটি বিষ-ফুৎকারে নিভে গেল সেই চির-অম্লান অগ্নিশিখা।

গ্রেপ্তারের পর বীরসিংহকে অকথিত অত্যাচার করতে করতে এনে সুরক্ষিত কারাগারে পুরল শ্বেতাঙ্গ-তাঁবেদার ও পদলেহীর দল।

শুরু হলো আবার তৃতীয় দফায় সরকারের তথাকথিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলাপর্ব ১৯৩৩এর ২৬শে জুন।

সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত তিনজনের বিচার শুরু হলো।

ভীতত্রস্ত সরকার সূর্য সেনের বিচার প্রকাশ্য আদালতে করবার সাহস পেল না। জেলখানার নিকটবর্তী গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি সুরক্ষিত গোপন কক্ষে বসলো বিচার-প্রহসন।

বিচারের নামে যে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হলো তার মধ্যে বিচারক রইল শ্বেতাঙ্গ মিঃ W. Mascharpe. সরকারের উচ্ছিষ্টলোভী খয়ের-খাঁ, রজনী ঘোষ ও খন্দকার আলি তায়েফ।

আলিপুর কোর্টের তদানীন্তন পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী সরকার পক্ষে মামলা পরিচালিত করতে লাগল।

মাস্টারদাদের পক্ষে দাঁড়ালেন, কৌঁসিলি জে. ঘোষাল, বিনোদলাল সেন ও রজনী বিশ্বাস মহাশয়।

ফলাফল যে কি হবে তা তো জানা ছিলই, তথাপি ঘটা করে সরকার তাদের পক্ষে ১২৫ জনকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াল।

সাক্ষীরা একের পর এক এসে বলে যেতে লাগল ১৯৩১—১৯শে মার্চ ইন্‌স্‌পেক্টর শশাংক ভট্টাচার্যকে নাকি তারকেশ্বরই হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

অতএব, আর কি! চরম দণ্ডাদেশ হলো তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতি।

আর মাস্টারদা? তার অপরাধের কি অন্ত আছে?

এত বড় রক্ত-বিপ্লবের সে প্রধান হোতা। রক্ত-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

তার প্রতি একমাত্র আদেশ হতে পারে চরম দণ্ড।

সরকারকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করেছে, এমন করে অপমানিত লাঞ্ছিত করেছে একথা কি তারা ভুলতে পারে! কোন দিনই যে তারা ভুলতে পারবে না।

তাই আদেশ হলো মৃত্যুদণ্ডের।

আর কল্পনা দত্তের প্রতি আদেশ হলো, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। Transportation for life.

তারপর এলো সেই জাতির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসের চিরস্মরণীয় সেই রাতটি!

১৯৩৪ সনের—১২ই জানুয়ারী।

সরকার পক্ষের দমনবিশারদ পাণ্ডারা ঐ দিনটিকে সবার কাছ থেকে গোপন করে রাখবার অনেক চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু গোপন থাকল না। পারলে না গোপন করে রাখতে।

কেমন করে না জানি বুঝি বাতাসে বাতাসেই জনে জনে জেলের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল তাদের পরমপ্রিয় নেতার চিরবিদায়ের দিনটি।

অন্তরের বুক-ঢালা প্রীতি ও শ্রদ্ধায় যাঁকে তারা আপনার করে পেয়েছিল, সে চলে যাবে অথচ তারা জানবে না—এও কি কখনো হয়, না তাই কিছু সম্ভব!

রাত্রি বারোটার ঘণ্টাধ্বনি শুরু হলো জেলখানার পেটা ঘড়িতে—ঢং… ঢং…ঢং…

মৃত্যুপথযাত্রী মহাবিপ্লবী পরম নির্বিকার নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন লৌহ-কারাগারের ছোট্ট নিভৃত সেলের মধ্যে।

ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে খুলে গেল লৌহদ্বার।

শ্বেতাঙ্গ রক্ষী ও জেল-কর্তৃপক্ষের দল তাদের শেষ আক্রোশ মেটাতে নির্লজ্জের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত মানুষটির উপরে।

এবং শুরু করে দিল কিল, চড়, লাথি—নির্মম প্রহার।

পাশের সেলের মধ্যেই ছিল মৃত্যুপথযাত্রী আর এক বিপ্লবী—তারকেশ্বর দস্তিদার।

ঐ অমানুষিক অত্যাচারের শব্দে তারও ঘুম ভেঙে গেল।

সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার শুরু করে দিল তীব্র প্রতিবাদে।

কিন্তু কার কাছেই বা প্রতিবাদ আর কার বিরুদ্ধেই বা সে প্রতিবাদ!

তারকেশ্বরের চিৎকারে বর্বর শ্বেতাঙ্গরা পাশের সেলে ঢুকে তারকেশ্বরের দেহের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করে দেয় নির্মম প্রহার।

শ্বেতাঙ্গ পশুদের নির্মম নিষ্ঠুর প্রহারের ফলে শীঘ্রই মাস্টারদা ও তারকেশ্বর অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

চোখ, মুখ ও সর্বদেহ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে।

ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত অচৈতন্য দুজনকে টানতে টানতে এনে উন্মত্ত পশুর দল নিষ্ঠুর জিঘাংসায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিল।

এমনি করেই লোকচক্ষুর অন্তরালে, গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে অনুষ্ঠিত হলো বর্বর পৈশাচিক ঘৃণ্যতম অত্যাচারের একটি ক্লেদাক্ত পর্ব।

একমাত্র জেলের বন্দীরা ব্যতীত কেউ জানলে না।

চট্টগ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা নিশীথের নিশ্চিন্ত আরামে শয্যায় শুয়ে যখন, সেই শান্ত মুহূর্তে অন্ধকারে গোপনে ভয়াবহ হত্যালীলা সমাপ্ত হলো তার—যে একদা তাদেরই সুখের জন্য তাদেরই হাতে তুলে দিতে 'স্বাধীনতা—হাসিমুখে সংসার আত্মীয় স্বজন সকল সুখের সম্ভাবনাকে অবহেলে পশ্চাতে ফেলে কণ্টক-মৃত্যুক্ষত পথে যাত্রা শুরু করেছিল।

তার প্রতিজ্ঞা সে পালন করে গেল—হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু!

কিন্তু দেশবাসী আজ কি করে সে কথা ভুলেছে? কি করে তারা ভোলে নির্ভীক ঐ মরণজয়ী অমৃতের পুত্রদের?

প্রভাত হলো।

রাত্রির অবসান হলো, কিন্তু চট্টলার আকাশে সেদিন সত্যিই সূর্যোদয় হলো না।

সূর্যহীন চট্টলার আকাশ শোকে মুহ্যমান হয়ে রইলো।

কসাই শ্বেতাঙ্গ—বর্বর শ্বেতাঙ্গ কেবল পরম নিশ্চিন্তে সেদিন নিঃশ্বাস নিয়েছিল অগণিতজনের বুকভাঙা হাহাকারের মধ্যে।

মাস্টারদা! হে বিপ্লবী-সূর্য! সূর্য সেন! তোমায় প্রণাম!

তোমার অতৃপ্ত আত্মার বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা আজ সমস্ত নিপীড়িত বঞ্চিত ভারতবাসীর বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়ে তোমাকে স্মরণ করবে কি!

জানাবে না কি তোমায় প্রণাম!

তারপর চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থান ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষ অধ্যায়টি রচিত

হয়েছিল ১৯৩৪এর ২রা জানুয়ারী, চট্টগ্রমের ক্রিকেট খেলার মাঠে, এক রক্তাক্ত অপরাহ্ণে।

১২ই জানুয়ারীর মাত্র দশটি দিন আগে।

সংগঠনের যোগাযোগ সব বিচ্ছিন্ন, কারারুদ্ধ সব নেতারা।

বাইরে যারা তখনও ছিল, তাদের মধ্যে হিমাংশু চক্রবর্তী, নিত্য সেন, হরেন চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী অন্তর্জ্বালায় তারা যেন তখন নিজেদের আর ধরে রাখতে পারছে না।

বোমা ও গুলিভর্তি পিস্তল নিয়ে চারজনে ছুটে এলো খেলার মাটে সেদিন।

এবং মাঠের মধ্যে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ দর্শকবৃন্দকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করল ও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, উত্তেজনার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করায় ও গুলি ছোঁড়ায় কেউই হতাহত হয় নি।

ইতিমধ্যে চার দিক থেকে পুলিস, মিলিটারীরা ও যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা প্রতিআক্রমণ চালায়।

হিমাংসু চক্রবর্তী কৃষ্ণ চৌধুরী দুজনে ধৃত হলো।

বিচারে দুজনের প্রতিই ফাঁসীর হুকুম হয়।

চট্টগ্রাম বিপ্লবের উপরে কালো যবনিকা নেমে এলো।

শুধু যে অমূল্য মৃত্যুহীন প্রাণগুলি রক্ত দিয়ে তাদের শেষ লিপিখানি লিখে রেখে গেল কালো যবনিকা অন্তরালে তা হয়ে রইলো চিরস্মরণীয়।

সে মুছে তো ফেলবার নয়। ভুলবারও নয়।

তাই তো প্রশ্ন আজো জেগে রইলো, জেগে রইলো সেই বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা—

> ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
> আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?

প্রশ্ন আজো তাই শুনি।

হে ভারতবাসী কি দিয়েছো তার প্রতিদানে ? কি দিলে !

তারা যে অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যে, ঝঞ্জাসঙ্কুল পথে পথে দুঃসহ বজ্রানলে আপন বক্ষের পাঁজর জ্বালিয়ে নিজেরা জ্বলে গেল—তার প্রতিদান কি নেই !

না তারা ভেবেছিল

> মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনবো বরাভয়,
> মোরা ফাঁসি পরে আনবো হাসি মৃত্যুজয়ের ফল
> মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে
> আবার বজ্রানল।

এগিয়ে গিয়েছে তারা জ্যোতির্ময়ের দূত, অমৃতের পুত্র,—কণ্ঠে নিয়ে তাদের কবির সেই গান

> চলরে নওজোয়ান, শোনরে পাতিয়া কান,
> মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান
> ভাঙরে ভাঙ্ আগল, চলরে চলরে চল্।

ছয়

বহুকাল ধরে পদদলিত ভারতবাসী তাদের স্কুল-কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যে ইতিহাস মুখস্ত করে এসেছে তারা তার মধ্যে পড়েছে—ভারতবর্ষের দুইটি অংশ।

বৃটিশ ভারত। ভারতীয় ভারত।

ব্যাপারটা প্রণিধানসাপেক্ষ।

বৃটিশ ভারত কথাটার মানে তবুও কিছুটা বোঝা যায়, কিন্তু 'ভারতীয় ভারত' কথাটার আসল তাৎপর্য যে কি ভাবতে গেলে মস্তিষ্ক সত্যিই গুলিয়ে যায়।

কাশ্মীরের মহারাজাকে Son of the soil এই দেশেরই ছেলে বলে 'ভারতীয় ভারতে'র সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যদি আবার বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই প্রভৃতি কীর্তিধ্বজ মীরজাফরদের Son of the soil বলা হয় কেউ হয়ত ক্ষমা করবে না।

বস্তুত ঐখানেই বেশির ভাগ ভারতবাসীর 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে অজ্ঞতা।

ভারতীয় ভারতের হর্তাকর্তা বিধাতা বা মুকুটমণি অর্থাৎ রাজা মহারাজার দল তাদের কথা বাদ দিলে এবং তাদের রাজত্বে (?) যে সব গণ-আন্দোলন হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে তারও মূল্য তো কম নয়।

অথচ তারা দেশের ঐ স্বাধীনতার সংগ্রামকে যদি সুচক্ষে দেখত জনবল ও অর্থবল দিয়ে ১৮৫৭র সংগ্রামে সংগ্রামীদের পাশে এসে যদি দাঁড়াত তাহলে পরবর্তী পৌনে একশত বৎসরের কলঙ্কিত রক্তাক্ত অধ্যায়টি হয়ত ভারতে রচিত হতো না।

শ্বেতাঙ্গদের উক্তি থেকেই ঐ ব্যাপারের সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিহাসের বুকে লিখিত হয়ে আছে। ১৮৬০ সনে ৩০শে এপ্রিল ক্যানিং লিখেছিল, স্যার জন "ম্যালকম বহু পূর্বেই বলে গেছেন যে, যদি আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত করতাম, তাহলে আমাদের সাম্রাজ্য ৫০ বৎসরও টিকত না। কিন্তু আমরা যদি কতকগুলো দেশীয় রাজ্যের সৃষ্টি করি, যাদের রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা নেই, আমাদের সাম্রাজ্যেরই যারা কেবল হাতিয়ার,—তাহলে আমাদের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন ভারতেও আমরা টিকতে পারবো।

এই অভিমতের যথার্থতা সম্বন্ধে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বরং সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে এই সত্য সম্পর্কে আমাদের অধিকতর অবহিত হতে হবে।"

সিপাহী অভ্যুত্থানের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গ ক্যানিংয়ের ঐ মহা মূল্যবান উক্তিটি তা থেকেই জন্মলাভ করেছিল।

এবং সুচতুর শ্বেতাঙ্গরা ভারতের মাটিতে তাদের সত্ত্বাকে কায়েমী করবার জন্য ও নির্বিবাদে ভারতকে শোষণের জন্য যে বহুবিধ চাতুরী ও বর্বর নীতির বাঁধন এঁটেছিল ; দেশীয় রাজন্যবর্গকে কয়েক মুষ্টি ঘৃত তণ্ডুল তাদের সামনে ফেলে

দিয়ে ও G. B. E., G. C. I. E., G. C. S. I., K. C. S. I. প্রভৃতি ইংরাজী বর্ণমালার হার তৈরী করে তাদের গলায় দুলিয়ে দিয়ে তাদের কুক্ষিগত করে রাখাটাও তার মধ্যে বিশিষ্ট ও অন্যতম। ফলে যা হবার তাই হলো।

হতভাগ্য পদাশ্রিত ঘৃত-তণ্ডুল-ভুক্ত তথাকথিত দেশীয় স্বাধীন (?) রাজন্যবর্গ প্রজাদের রক্ত শুষে অর্থ ব্যয় করে নিশ্চিন্ত অখণ্ড অবসর আলস্যে, বিলাসে ও কামচর্চায়, ঘোড়দৌড় ও খেলাধুলায় বৎসরের পর বৎসর কাটিয়ে মেদবাহুল্যে হাঁসফাস করে একদিন হঠাৎ মারা যেত।

এতে তারাও সুখী (?) ছিল, শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাও নিশ্চিন্ত ছিল।

১৯৩০-এ মে মাসে অধ্যাপক উইলিয়ামসয়ের মন্তব্যটি ওদের সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

দেশীয় রাজ্যের শাসকেরা ব্রিটিশ সরকারের অত্যন্ত বশংবদ। এদের অনেকেরই অস্তিত্ব ব্রিটিশ আদালতে এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর উপরে নির্ভর করে। আঠার শতকের শেষাংশে ও উনিশ শতকের প্রথমাংশের সংগ্রামে যদি ব্রিটিশ শক্তি তাদের সাহায্য না করত, তাহলে এদের অনেকেরই অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত টিকত না। এই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলি সারা ভারতে ছড়িয়ে থেকে বাধার সৃষ্টি করেছে; ব্রিটিশ সরকারের রক্ষাকবচ এরা। শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত এই সকল দেশীয় রাজ্য ভারতময় ছড়িয়ে থাকায় ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশকে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ করে হটিয়ে দেওয়া কষ্টকর হবে।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ উইলিয়ামস্ যে কঠোর সত্য কথাটি শেষ পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেছেন, ১৮৫৩ সালে মনীষী কার্ল মার্কস স্পষ্টই সে কথাটা বলে গিয়েছেন।

The Native Princess are the stronghold of the present abominable English System and the greatest obstacle to Indian progress.

ভারতীয় ভারত আর ব্রিটিশ ভারত ভারতকে কেটেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে করা হয়েছিল—ভারতবর্ষের রাজনীতির পথে স্থায়ী বাধা দানের জন্য ১৮৫৭র সেপাহী আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ও ঐ সময় বিশ্বাসহন্তা নিজাম প্রভৃতির সাহায্য দানের কথা ভেবে। এর ফলে চিরদিনের জন্য গালভরা ইংরাজী কথার মালা গলায় দুলিয়ে ও চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খেয়ে মেদবাহুল্যে ডগমগ হয়ে শ্বেতাঙ্গের রক্ষিতার দল তাদের উপপতির পদসেবা করেছে!

এবং ঐ ভাবেই ভারতীয় ভারতকে শ্বেতাঙ্গ সরকার ব্রিটিশ ভারতবাসীর কাছে বিদেশী করে রেখেছে।

তথাপি এতে করেও সেখানকার জনগণের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রাখা যায় নি।

শোষণের জগদ্দল পাথরকে তারা অনিবার্য বলে মেনে নেয় নি।

মেনে নেয় নি তারা চিরদাসত্বকেই ভাগ্যের দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ বলে।

যদিচ ১৮৫৭র অগ্নি-বিপ্লবে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই ঘৃণ্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে দেশের ও জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তথাপি

দেশীয় রাজ্যের কিয়দংশ সেদিনকার সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিদ্রোহীদের পাশে এসেও দাঁড়িয়েছিল। এবং ১৮৫৭র রক্ত-বিদ্রোহের পাতায় তাঁতিয়া টোপি, টিকেন্দ্রজিৎ ও ঝান্সীর রাণী প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের নেতারা তাদেরই সাক্ষ্য দেবে চিরকাল।

তাদের আমরা ভুলিনি। ভুলতে পারি না।

উনিশ শতক সাম্রাজ্যবাদের মহালগ্ন বা চরম বিকাশ মুহূর্ত।

কিন্তু ভাঙন ধরতেও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দেরী হয় নি সেদিন, কারণ বিংশ শতকের আরম্ভ থেকেই জগৎব্যাপী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যে নিষ্ঠুর অভিশাপ অর্থাৎ আভ্যন্তরিক বিরোধিতা, তারই স্পষ্ট বিকাশ দেখা দিতে শুরু করলো।

যার ভয়াবহ স্বাক্ষর রক্তাক্ষরে লিখিত হয়েছে ১৯১৪ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের মাত্র কুড়ি বৎসরের ব্যবধানেই, ১৯৩৯এর দ্বিতীয় জগৎব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ নামক নৃশংস বর্বরতা ও বিভীষিকায়।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আপাত বিরোধিতাই তো সব নয়—ও পথের প্রতিশ্রুতি একমাত্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই।

১৯০৮ সালে ত্রিবাঙ্কুরে হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজারাই যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে—দেশীয় রাজ্যের জনগণ তখনও ঐক্য ও সুসংবদ্ধ হতে শেখে নি।

তাই ১৯০৮ সালের বিদ্রোহী নেতা ভেলু থাম্পি সশস্ত্র কৃষাণের অভিযান চালিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপ্রাসাদ অধিকার করেও ধরে রাখতে পারলে না।

তাদের ব্রিটিশ শক্তি দমন করে এবং শহীদ ভেলু থাম্পিকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

ইতিহাসে দেখা যায় ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গ্রহণ করেছে ১৮৮৫ খৃঃ থেকে এবং স্টেট কংগ্রেসের জন্ম ১৯২৯ সালে।

১৯২৯ সালে স্টেট কংগ্রেস গঠনের অব্যবহিত পরেই এলো ১৯৩০ সাল।

এলো আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ভারতের গণ-অভ্যুত্থান মহাত্মার আহ্বানে।

সে ঝড়ের ঝাপটা গিয়ে দেশীয় রাজ্যের মধ্যেও জাগাল চঞ্চলতা।

এবং টেরী গাড়োয়াল থেকে শুরু করে সুদূর দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও ঐ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু ১৯৩০এর আন্দোলন সর্বভারতীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশীয় রাজ্যের নয়। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের নিজস্ব অভাব-অভিযোগের উপরে ঐ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি সেদিন।

কারণ সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা বলতে যা বোঝায় দেশীয় রাজ্যের জনগণের মধ্যে তখনও সেটা জাগে নি।

কিন্তু সে অবশ্যম্ভাবী চেতনাকেও বেশীদিন দেশীয় রাজ্যের শাসকেরা চাপা দিয়ে রাখতে পারলে না। কারণ যে ভাবে তারা তাদের শোষণকে অব্যাহত রাখতে গিয়ে নিজেদের অধীনে রাজা, মহারাজা ও তালুকদার সৃষ্টি করতে শুরু

করেছিল, সংকট তাতেই অত্যাসন্ন হয়ে এলো ক্রমে—করালমূর্তিতে।

শুধু রাজা মহারাজা সৃষ্টিই নয়, রাজ্যের রাজস্বের সর্বাপেক্ষা বড় অংশ যে ভাবে নিজেদের বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করার জন্য তারা যে অত্যাচার শুরু করলো তাতেই দেখা দিল অসন্তোষের আগুন।

এলো চেতনা।

এবং পীড়নে পীড়নে প্রজাদের অবস্থা যতই শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল ততই জনগণের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ব্যাপক হয়ে দেখা দিতে লাগল।

এক দিকে অত্যাচার, শোষণ ও নিজেদের দুঃসহ অবস্থা, অন্য দিকে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তঃস্তম্ভ হাওয়া বিদ্রোহের বীজ রোপণ করতে শুরু করলো তথাকথিত ভারতীয় জনগণের মনে।

ইতিপূর্বে বিংশ শতকের প্রারম্ভে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে দেওয়ানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা বিদ্রোহ জানায়।

স্টেট কংগ্রেস সক্রিয় হয়ে উঠল।

আন্দোলনকে কণ্ঠ টিপে মারবার জন্য শ্বেতাঙ্গের চিরাচরিত দমননীতির প্রয়োগ শুরু হলো।

লাঠি চার্জ আর গুলি বর্ষণ! রক্তে লাল হয়ে উঠলো ত্রিবাঙ্কুরের মাটি।

শেষ পর্যন্ত সরকার সমস্ত "অপরাধী"কে ক্ষমা করতে রাজী হলো।

দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে গেলেন। এবং তাঁরই নির্দেশে নেতারা তাঁদের প্রস্তাবগুলি নিয়ে তদানীন্তন দেওয়ান স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ারের কাছে দাখিল করল।

কিন্তু সরকারের চিরদিনের শঠতা যাবে কোথায়!

দায়িত্বশীল সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ পেল বর্বর নিষ্ঠুর দমননীতি।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে দুজন ফাঁসির মঞ্চে দিল প্রাণ—শত শত ব্যক্তির দীর্ঘ দিনের জন্য হলো সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ।

বহু বীর যোদ্ধার সম্পত্তি কুৎসিত ভাবে সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল।

১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রে ভারতের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

বোধ হয় ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে 'ব্রিটিশ ভারত' এবং 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে ঐক্যমূলক ধারণা ঐ প্রথম।

অবশ্য বলাই বাহুল্য যে কোন সদভিপ্রায়ের বশবর্তী হয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত তথা দেশীয় রাজ্যগুলিকে একসঙ্গে যুক্ত করতে চায় নি।

কারণ সকলেই তো জানেন সরকারের কুখ্যাত মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে সর্বপ্রথমে দেশীয় রাজ্যগুলির Paramountcy গৌণভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল।

এবং ১৯২১ সালের ঐ প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখন শ্বেতাঙ্গ শোষিত ভারতে

"উদারনীতিক" রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরে নেমে এল যবনিকা এবং ভারত দাঁড়িয়েছে এসে নতুন যুগের এক সন্ধিক্ষণের মুখে তখন।

ভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় সে এক রক্তরাঙা ইঙ্গিত।

১৯৩৮ সনে ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণ যখন স্বাধিকারের জন্য লড়াই করছে, ঠিক সেই সময়েই হায়দ্রাবাদে বিরাট 'ওমু' আন্দোলন হয়েছে শুরু।

হায়দ্রাবাদের 'ওমু' বা প্রজা আন্দোলনের পশ্চাতে অবশ্য বেশী ছিল সাম্প্রদায়িক যুক্তি।

বিচিত্র হায়দ্রাবাদের ইতিহাস।

জনসংখ্যা—১৯,৬৩৬,১৫৭। রাজস্ব বাৎসরিক আদায় হয়, ১৫৮২,৪৩ লক্ষ টাকা।

মুঘল শাসনের ভাঙনের মুখে চারিদিকে যখন বিশৃংখলা ও স্বৈরাচার চলেছে সেই সময় প্রথম আসফ ঝাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হায়দ্রাবাদে এবং ভারতে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব বিস্তারের প্রথম যুগ থেকেই আসফ ঝাঁ শ্বেতাঙ্গ পদাশ্রয়ী হয়ে তাদের কৃপালাভ করে ধন্য হয় এবং নিজেকে কায়েমী করে।

পরে লর্ড ওয়েলেসলির মিষ্টভাষী নীতি "Subsidiary alliance" গ্রহণ করে পরম নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদেই রাজত্ব করে আসতে থাকে।

ঐ সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কিছুকাল পরেই স্টেট কংগ্রেস হায়দ্রাবাদের রাজনীতিতে এসে মাথা গলাল।

কিন্তু চিরধূর্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার সঙ্গে সঙ্গে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে দিল।

এবং ১৯৪৬ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর ঐ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে।

এদিকে আবার ১৯৩৮এ তালচের প্রভৃতি উড়িষ্যার কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে।

ঐ সব আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে বাজী রাউৎ, বৈষ্ণব পট্টনায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিরা।

১৯৩০ সাল থেকেই বলতে গেলে কাশ্মীরে প্রজা আন্দোলনের জন্ম।

হায়দ্রাবাদের কুখ্যাত নিজামের মতই দেশের শত্রু জাতির শত্রু গুলাব সিংও তার প্রভুদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে শ্বেতাঙ্গদের পাঞ্জাব অধিকারে সহায়তা করে।

এবং সেই দেশদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপই ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গরা গুলাব সিংকে কাশ্মীর বিক্রয় করে।

১৯৩০ সালেই শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ডোগরা ব্রিটিশ কায়েমী শয়তানী প্রথম আঘাত পেল।

এবং কাশ্মীরের সমস্ত শাসনতান্ত্রিক যন্ত্রই সে আঘাতে দুলে উঠলো।

যুদ্ধপূর্ব দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনীতিকে পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যুক্তিবাদী নেতৃত্বের অভাব, রাজন্যবর্গ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সুযোগ গ্রহণ এবং তারই পাশে পাশে ও সঙ্গে সঙ্গে অসীম বিপত্তি ও বহুবিধ দুর্দশার মধ্যেও

হতভাগ্য নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের ক্লান্তিহীন একনিষ্ঠ সংগ্রাম।

এবং সকল কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে বরাবর শ্বেতাঙ্গ সরকারের কুট সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি **Divide and Rule** !

১৯৩৮ সন থেকেই প্রজা আন্দোলন তার যথার্থ পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

১৯৪২এর ভারতব্যাপী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ঢেউ দেশীয় রাজ্যেও গিয়ে আঘাত হানে।

এবং অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরেও 'কাশ্মীর ছাড়' আন্দোলন দেখা দেয়।

যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে গণ-আন্দোলনও দাবাগ্নির মতই লেলিহ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হলো ভায়ালা, আলেপ্পীতে জনগণের মুক্তির জন্য অমর সংগ্রাম।

ত্রিবাঙ্কুরের কৃষক মজুরের দলও নবোদ্যমে সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

সংগ্রাম শুরু হলো হায়দ্রাবাদে এবং আগুন দেখা দিল কোচিনেও।

কাশ্মীরও সেই সঙ্গে রুখে দাঁড়াল।

১৯৪৬এ ট্রেড ইউনিয়ানের প্রাথমিক আন্দোলনকে সরকার হরণ করায় এগিয়ে এলো সাম্যবাদী নেতারা—আন্দোলনের পুরোভাগে।

বেআইনী! শ্বেতাঙ্গ সরকার বেআইনী বলে ঘোষণা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো সরকারের হাতের অগ্নিনালিকা।

সহস্র সহস্র শ্রমিকের বুকের রক্তে মাটি রাঙা হলো। অগণিত শ্রমিক কারাগারে হলো নিক্ষিপ্ত।

অন্ধ্র সম্মেলনের নেতা ও সংগঠক কোমারিয়াকে শ্বেতাঙ্গ সরকার নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল।

কৃষাণ মজুরের দল তাদের প্রিয় নেতার মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে শহরে নিয়ে গেল।

আন্দোলনের অগ্নিশিখা আকাশে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপা কুত্তার মত সরকারের চামুণ্ডারা সংগ্রামীদের উপরে দানবীয় জিঘাংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ধারালো নখর বিস্তার করে।

চললো অবাধে পৈশাচিক অত্যাচার।

গুলি বর্ষণ! লাঠি চার্জ—লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণ!

হায়দ্রাবাদে পরউচ্ছিষ্টলোভী দেশদ্রোহী নিজামকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচার ও অত্যাচারের যে দানবীয় তাণ্ডবনৃত্য বয়েছিল সেদিন, ভারতের মুক্তি-ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে।

শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার কাশ্মীরের আন্দোলন এবং তাঁর গ্রেপ্তারের পরে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ঘৃণিতচরিত্র রামচন্দ্র কাকের পাশবিক দমননীতি—সে ভোলবার নয়।

ডোগরারাজ কাশ্মীর কো ছোড় দো। বায়নানামা অমৃতসর তোড় দো।

কাশ্মীরের সে ডাক দিগ্‌-দিগন্তে ছড়িয়ে গেল।

অত্যাচারও চলতে লাগল পুরো মাত্রাতেই—ঐ সঙ্গে সঙ্গে।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে গোয়ালিয়র, আলোয়ার, খশলমমীর, বিকানীর, রামপুর, কাশ্মীর, রতলম, ভরতপুর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, জয়পুর, মাড়োয়ার, বেওয়া ও ইন্দোরের মাটি পঞ্চ সহস্রাধিক শহীদের বুকের রক্তে লাল হয়ে গেল।

ঐ সঙ্গে স্মরণ করি আজ তেলেঙ্গানার সেই দ্বাদশ বীর সৈনিককে।

দুঃখজয়ী দ্বাদশ মুক্তিযজ্ঞের হোমানলে আত্মসমর্পিত বীর তেলেঙ্গানা সন্তান—যাদের মাথার উপরে নেমে এসেছিল চরম দণ্ড।

কণ্ঠকে যাদের বেষ্টন করবার জন্য দ্বাদশটি ফাঁসির রজ্জু অপেক্ষমান হয়েছিল দীর্ঘদিন। সুপ্রীম কোর্ট বা আদালতে পর্যন্ত যাদের প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছিল, তারপর তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ মৃত্যুর বদলে দিয়েছেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দ্বাদশ সেই বীর সৈনিককে প্রণাম জানাই।

দ্বাদশ ঐ তেলেঙ্গানা বীরের মধ্যে আটজন মাত্র কুড়ি বৎসরের সামান্য কম বেশী বয়েসের এবং সর্বজ্যেষ্ঠ যে তাদের মধ্যে তার মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়স।

হিন্দু, মুসলিম ও ক্রিশ্চান দ্বাদশ জন।

কৃষাণ, মজদুর, ছাত্র, ছুতোর মিস্ত্রী ও দর্জি প্রভৃতি দ্বাদশটি অশিক্ষিত তেলেঙ্গানা সন্তান যাদের নাম আজ তেলেঙ্গানা কৃষাণ আন্দোলনের পুরোপৃষ্ঠায় জ্বল জ্বল করে রক্তাক্ষরে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের লৌহমুষ্টি যখন ভারতের বুক থেকে শিথিল হয়ে আসছে ক্রমে—৪২এর রক্তক্ষয়ী পরিপ্রেক্ষিতে চারিদিক কৃষক ও মজদুর আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ ও সেনাবিদ্রোহ, কাশ্মীর ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদে গণবিদ্রোহ—এই দ্বাদশ তেলেঙ্গানা ঐ হায়দ্রাবাদের কিষাণ বিদ্রোহের বহুজনার মধ্যে এসে দাঁড়াল।

ব্রিটিশ পদলেহী নিজাম।

শোষণে শোষণে জীর্ণ রক্তশূন্য হায়দ্রাবাদের কিষাণের দল মাথা উঁচু করে দাঁড়াল চিরাচরিত জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে।

কাশীম রাজভী ও তার রাজাকরদের উৎকট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে।

এবং কাশ্মীরের মত হায়দ্রাবাদেও জমির বা মাটির প্রশ্নটাই আন্দোলনের মূল কথা!

ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের নালিশ। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শোষিতের নালিশ।

বাঁচতে চায় তারা। ন্যায্য অধিকারে দেশের মাটিতে বেঁচে থাকতে চায়। চায় মুক্তি! চায় স্বাধীনতা!

জমির মালিক মূলত দেশমুখ ও জায়গীরদারদের দল।

শুধু কি তারা জমিরই মালিক, যারা ঐ জমিতে দেহের স্বেদ দিয়ে সোনার ফসল ফলায় তাদেরও মালিক।

দণ্ডমুণ্ডের কর্তা!

হায়দরাবাদের একটি অংশ তেলেঙ্গানা। তেলেঙ্গানার একটি জিলা নালগোণ্ডা।

নালগোণ্ডার গানগাঁও তালুকেই তেলেঙ্গানা কাহিনীর শুরু।

গানগাঁওয়ের জমিদার বিষ্ণু রেড্ডী তার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে ৮০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে গড়ে তোলে এক বাংলো।

অধীনস্থ কৃষাণদের কাছ থেকে ঐ বাংলোর সমস্ত কাঠ সংগৃহীত তো হলোই, তাদেরই গরুর গাড়িতে করে তাদের বাধ্য করা হলো তা বয়ে এনে দিতেও।

বিনিময়ে কাঠ বাবদ বা পরিশ্রম বাবদ তাদের একটি কপর্দকও মিলল না।

শতাধিক দুঃস্থ মজুরকে বিনা বেতনে খাটিয়ে জোর করে বাংলোটি গঠন করা হলো।

একশত সৈনিক নিয়ে বিষ্ণু রেড্ডীর এক সেনাবাহিনী তাদের সামনে খাড়া রেখে ঐ বাংলোর মধ্যেই বসাল বিচারালয় এবং মজুর কৃষাণদের আবেদন নিবেদন শোনবার বিচার করবার অজুহাতে প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা বিষ্ণু রেড্ডী হতভাগ্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিল।

তার উপরে প্রজাদের উপরে নানাবিধ ট্যাক্স ও জরিমানার তো কথাই নেই।

মেয়ের বিবাহ, পিতার শ্রাদ্ধ, নতুন মোটরগাড়ি ক্রয়—সব অবাধে সংগৃহীত হতে লাগল প্রজাদের কাছ থেকে জোর জুলুম করে ট্যাক্স আদায়ের অর্থের দ্বারা।

অত্যাচারে অত্যাচারে শোষিত জর্জরিত প্রজারা আর সহ্য করতে পারলে না, এবারে তারা সংঘবদ্ধ হলো।

অত্যাচারী জমিদার বিষ্ণু রেড্ডীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল। উভয় দলের প্রথম সংঘর্ষে বন্দাগীসাহেব নামে এক কৃষাণ ভাই বুকের রক্তে বিদ্রোহের রক্তরাঙা পতাকাকে উড্ডীন করে দিয়ে গেল।

নির্দোষ নিরীহ এক কৃষাণের রক্তে গানগাঁওয়ের মাটি রাঙা হয়ে উঠলো।

আগেকার দিন হলে হয়ত বন্দাগীসাহেবের মৃত্যুর ব্যাপারটা ধামা চাপাই পড়ে যেত, এবারে কিন্তু তা হলো না।

অন্ধ্র মহাসভা নামে জনপ্রতিষ্ঠান বিষ্ণু রেড্ডীর ঐ ঘৃণিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলো।

তারা এসে কৃষাণ ভাইদের ডেকে বললে, সব এক সাথে দাঁড়াও। শুধু বিষ্ণু রেড্ডীরই এ অত্যাচার নয়, সমস্ত জমিদারের চিরদিনের এ অত্যাচার আর আমরা সইবো না।

কৃষাণদের এক শোভাযাত্রা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে অন্ধ্র মহাসভা কার্যালয়ের দিকে এগিয়ে চলল—ওদিকে বিষ্ণু রেড্ডীর ভাড়াটে গুণ্ডার দল লাঠিসোঁটা বন্দুক নিয়ে শ্রমিক কৃষাণদের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

দুই দল মুখোমুখি হতেই শুরু হলো গুলিবর্ষণ!

অন্ধ্র মহাসভার অন্যতম কর্মী কুমারায়া বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল।

আগুনের মতই সে হত্যা-সংবাদ শ্রমিক ও কৃষাণদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। রক্ত! হত্যা! হাজারে হাজারে তারা হাতের কাছে যে যা অস্ত্র পেলে তাই

নিয়েই ছুটে এলো।

বন্যার মুখে কুটোর মতই রেড্ডীর ভাড়াটে গুণ্ডারা হাতের অস্ত্রশস্ত্র ঐখানেই ফেলে যে যেদিকে পারল প্রাণভয়ে ছুটে পালাল।

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে নিজাম সশস্ত্র পুলিস বাহিনী গানগাঁওয়ে প্রেরণ করল, কিন্তু প্রজাবৃন্দ তাদের বর্জন করায় বাধ্য হয়েই তাদের হটে যেতে হলো।

প্রাণভয়ে ভীত বিষ্ণু রেড্ডী হায়দ্রাবাদের দিকে পালিয়ে গেল।

তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের এই সূত্রপাত। পরবর্তীকালে প্রায় বিংশ সহস্র গাঁ নিয়ে ন্যূনাধিক পঞ্চ লক্ষ কৃষাণের মুক্তি-অভিযানের অঙ্কুর ঐভাবেই রক্তসিক্ত মাটিতে প্রথম রোপিত হলো।

তেলেঙ্গানা থেকে বিদ্রোহের আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল। আমরা কৃষাণ! জমি আমাদের!

বুকের রক্ত ঢেলে যারা জমি চাষ করে ফসল ফলায়, জমি সত্যিকারের তাদেরই; জমির মালিক জমিদাররা নয়, কৃষাণরাই তো সত্যিকারের জমির মালিক।

Land to the tiller!

পুঁজিবাদী ধনিকের প্রতি হৃতসর্বস্ব শ্রমিকের এ বিদ্রোহ জাতির মুক্তির রক্তক্ষয়ী ইতিবৃত্তের পাতায় এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা ঐ অগণিত জনগণের কল্যাণের অভিভাবকত্বের ছলে বহু কাল ধরে দেশে দেশে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতারই পরিচয় দিয়েছে, যারা নিজেদের পুঁজিকে ভরিয়ে তোলবার জন্য মাত্র জমির মালিকানা-স্বত্বে লক্ষ লক্ষ অসহায় শ্রমিক জনগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে আহুতিরূপে গ্রহণ করেছে তারা দেশের ও জাতির শত্রু তো বটেই, মানবতারও শত্রু! আগামী দিনের স্বাধীন ভারতের শত্রু!

বিস্তৃত বিদ্রোহের অনলকে নির্বাপিত করবার জন্য নিজামের এবং রাজাকরদের দানবীয় পশুশক্তি বিদ্রোহীদের উপরে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ ও অগ্নিদাহ চারিদিকে পৈশাচিক বর্বরতায় শুরু হয়ে গেল।

তথাপি মৃত্যুপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেলেঙ্গানারা হটে গেল না।

সম্মুখ-যুদ্ধে তারা দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জমির মালিক সত্যিকারের তারাই! চিরকালের ভোগদখলকারী রাজাকর বা দেশমুখের দল নয়।

এলো ১৯৪৭ সাল।

গ্রামে গ্রামে তখন বিদ্রোহের অনল ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে।

এমন সময় তেলেঙ্গানার বিদ্রোহীরা শুনতে পেল, ব্রিটিশ প্রভুরা সত্য সত্যই নাকি এতদিনে ভারত ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে—১৫ই আগস্টে।

যদিও তাতে করে হায়দ্রাবাদের জনগণের কোন পরিবর্তনই আসছে না,

কারণ তখনও থাকছে সেই নিজাম ও অত্যাচারী রাজাকরের দল দেশে।

কিন্তু অত্যাচারিত অশিক্ষিত কৃষাণের দল ভাবলে, এলো বুঝি সত্যিকারের তাদের মুক্তির দিন আরো অনেকের মতই!

কিন্তু কুখ্যাত শ্বেতাঙ্গ শাসকদলের ভারত ত্যাগের পূর্বে শেষ কূটনৈতিক চালে প্রলুব্ধ হয়ে নিজাম তখন হিন্দুস্থান ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে স্বীকৃত হলো না। সে তার হায়দ্রাবাদের পৃথক সত্তা নিয়েই দূরে থাকতে চাইল।

হায়দ্রাবাদের নিজামীয় পুলিস ও রাজাকরদের সম্মিলিত বর্বর প্রতিরোধের বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়াল।

বন্যার মুখে কুটোর মতই নিজাম ও রাজাকরদের সম্মিলিত বর্বর ও পৈশাচিক প্রতিরোধ জনগণের দুর্ধর্ষ সংগ্রামের মুখে ভেসে গেল।

বিজয়লক্ষ্মী জনগণের গলাতেই বিজয়মাল্য দুলিয়ে দিলেন।

তেলেঙ্গানা ইতিহাসের পাতায় সে এক সুবর্ণখচিত পর্ব! নতুন করে তারা গড়ে তুলল তাদের দেশকে।

তাদের শাসনপদ্ধতি, তাদের সৈন্যবাহিনী রচনা করলো এক নতুন ইতিহাস।

সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ছয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে তেলেঙ্গানাদেরও কম ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি।

৪০৯ জন কৃষাণ ভাই ও ১৭ জন কৃষাণী ভগ্নীকে তাদের ঐ মুক্তিযজ্ঞে আহুতি দিতে হয়েছে।

৭০৬ জন পুরুষ ও ৪১ জন স্ত্রীলোক আহত হয়েছে, এ ছাড়া বহু টাকা মূল্যের ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বিনিময়ে তারা পঞ্চ সহস্রাধিক গ্রাম হতে নিষ্ঠুর বর্বর চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিকতাকে লোপ করেছে, নিজামের করাল লৌহ মুষ্টি হতে ছিনিয়ে নিয়েছে।

মুক্ত স্বাধীন তেলেঙ্গানা।

সফল হয়েছে তাদের এতদিনের স্বপ্ন!

নিজেদের মধ্যে তারা জমি বণ্টন করে নিয়েছে, নিজেদের পঞ্চায়েত, বিচার বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, শাসন বিভাগ সব কিছুই তারা নতুন করে গড়ে তুলেছে।

১৩ হাজার বর্গমাইল ধরে বিস্তৃত ভূখণ্ডে চল্লিশ লক্ষের অধিক লোক নিয়ে গড়ে উঠেছে এক চিরসুখের রাজ্য। এক স্বাধীন ভূখণ্ড।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কংগ্রেসও দীর্ঘকাল ধরে ঐ স্বপ্নই দেখেছিল এবং দেশের অগণিত কৃষাণদের বহুবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও ঐ কথাই বলেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, তেলেঙ্গানার সুখের স্বপ্ন বুঝি মরীচিকার মতই মিলিয়ে গেল, চিরদিনের অত্যাচারী ধনিক শাসকের দল কৃষাণদের ঐ সাফল্য দেখে দেশের সর্বত্র আশঙ্কা ও ভয়ে যেন মরিয়া হয়েই রুখে দাঁড়াল।

হায়দ্রাবাদের দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে চলেছে তখন কৃষাণদের অভিযান।

সমস্ত বাধা ও আশংকাকে অতিক্রম করে তারা তাদের পুরুষ ও পুরুষানুক্রমের স্বেদসিক্ত প্রিয় মাটিকে বুকের পাঁজর ভাঙা প্রীতি দিয়ে আপনাদের করায়ত্ত করে চলেছে।

Land to the tiller !

জমির মালিক তারাই যারা চালায় জমিতে লাঙল!

রোদ জল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দেহভাঙা পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলায় যারা জমিতে, মাটিতে।

নিজাম কূটচক্রী জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কৃষাণদের সঙ্গে সন্ধি করলে।

সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হলো।

নিজাম কিছুটা সময় পেল সংগ্রামের বিরতির মধ্যে, কিন্তু তার দুরভিসন্ধি পূর্ণ হলো না।

সে চেয়েছিল ঐ ফাঁকে কৃষাণদের শেষ করে ফেলবে, কিন্তু সক্ষম হল না।

এবারে সে শরণাপন্ন হলো ভারত সরকারের।

এগিয়ে এলো এবারে ভারত সরকারের বিরাট সশস্ত্র বাহিনী।

এগিয়ে চলুক ভারত সরকারের সশস্ত্র বাহিনী পায়ে পায়ে।

স্বপ্নের শবের উপর দিয়ে শক্তি ও লোভের অভিযান চলুক, এই ফাঁকে আরো কয়েকটা বৎসর ভারতের ইতিহাসের পূর্ব সংগ্রামের পৃষ্ঠাগুলোতে একবার দৃষ্টি দিয়ে যাই।

১৯৩৪—৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার ময়দানে বিপ্লবীদের সংঘর্ষে লেবঙ্গে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে হত্যা করবার জন্য বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলা মজুমদার, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, রবীন ব্যানার্জী, মধু ব্যানার্জী ও সুকুমার ঘোষ দার্জিলিং যায়।

দার্জিলিংয়ের লেবঙ্গ ঘোড়দৌড়ের ময়দানে গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু গভর্নরের সৌভাগ্য সে অক্ষতই থেকে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার শুরু করে সরকারী চেলা-চামুন্ডারা। অনেকেই ধৃত হয়। শুরু হয় বিচার।

বিচারে ভবানী ভট্টাচার্যের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয় এবং মনোরঞ্জন, সুকুমার, উজ্জ্বলা ও মধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের প্রতি আদেশ হয় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড।

ঐ বৎসরেই—১৯৩৪ সনেই চট্টগ্রামের বাঘুয়াতে ডাকাতির অভিযোগে এক মামলা সরকার রুজু করে—বাঘুয়া ষড়যন্ত্র মামলা নাম দিয়ে।

মোক্ষদা ও প্রিয়দা চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদে বিচারে কারাদন্ডাদেশ হয়।

তার পরই ১৯৩৫ সাল।

সুদক্ষ সরকার বাহাদুর দেশের বিভিন্ন স্থান হতে নানা বয়েসী ২০-২১ জন যুবককে ধৃত করে 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা' নাম দিয়ে এক মামলার পত্তন করে।

দীর্ঘ দিন ধরে বিচার প্রহসন চালিয়ে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য কয়েকজনকে চার হতে চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হলো।

১৯৩৫এ হীরালাল চক্রবর্তীকে গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করার জন্য অমূল্য রায়কে নিয়ে যে বিচার প্রহসন হয় তাতে তার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ঐ বৎসরেই জুন মাসে ফরিদপুরের কোটালীপাড়া-মদনপুর গ্রামের গোয়েন্দা পুলিস কালিপদ ভট্টাচার্যকে ছোরার সাহায্যে আক্রমণ করবার অভিযোগে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

আরো কিছুকাল পরে ১৯৩৭ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে আবার চট্টগ্রামে একজন গুপ্তচরকে হত্যার প্রচেষ্টায় অমূল্য আচার্যের প্রতি দশ বৎসর কারাদণ্ডাদেশ হয়।

এবং প্রকৃতপক্ষে সাগর-পারের দেশগুলিতেও ঐ সময় থেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোপন তোড়জোড় চারিদিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে ও শোনা যেতে থাকে হুমকি।

১৯৩৫এ ভারতের দ্বৈতশাসনের অবসান, প্রাদেশিক শাসন-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ভিত্তিতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে একটি নতুন ভারত-শাসন আইন পাস হয়।

নতুন ভারত-শাসন আইনটি প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়, শ্বেতাঙ্গ সরকারের চিরাচরিত আর একটি ভড়ং মাত্র।

তারপর ১৯৩৭—১লা এপ্রিল যখন শ্বেতাঙ্গদের রচিত ঐ সব শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবর্তিত হলো, ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলেও ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগ দল প্রদেশে প্রদেশে অস্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে শ্বেতাঙ্গ সরকারকে সাহায্য করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে শুরু করে দিল।

পণ্ডিত নেহরু শ্বেতাঙ্গদের ঐ নতুন শাসন-তন্ত্রকে "দাসত্বের নূতন সনদ" নামে ব্যাখ্যা করলেন।

এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়েও কয়েক মাস যাবৎ দূরে দূরেই সরে রইলো কংগ্রেস, মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজী হলো না। অবশেষে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যখন এক ফতোয়া জারী করে কংগ্রেস নেতাদের আশ্বাস দিলেন যে, প্রদেশের দৈনন্দিন শাসন-কার্য পরিচালনায় প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুররা মন্ত্রীদের কার্যে হস্তক্ষেপ করবেন না, তখন জুলাই মাসে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ প্রদেশের

মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মত হলো এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করলো তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত।

কিছুদিন পরে অন্যান্য দলের সঙ্গে সিন্ধু ও আসাম প্রদেশেও কংগ্রেস দল যৌথ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে।

প্রথম মহাসমরের পরে ভার্সাই সন্ধিক্রমে জয়ী দেশগুলি পরাজিত জার্মানীর উপরে যে অন্যায় ও অবিচার করে এবং যে ভাবে একাধিক শক্তি সম্মিলিতভাবে পরাজিত জার্মানীর স্কন্ধে বিগত যুদ্ধের সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে সমস্ত জর্মান জাতিকে কোণঠাসা করে পঙ্গু করবার প্রয়াস পেয়েছিল, তার ফল ফলতে খুব বেশী দেরী হলো না।

হিটলার নতুন করে জার্মানীকে গড়ে তুলে তার দেশের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তলে তলে সংগোপনে যে বিপুল প্রস্তুতি করেছিল হঠাৎ সেকথা একদিন আশপাশের দেশগুলো জানতে পেরে চমকে উঠলো যখন, তখন সে অবশ্যম্ভাবী এক প্রলয়ের আশু আক্রোশ হতে কারোরই আর বাঁচবার উপায় নেই। এবং তা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গরা—ব্রিটিশ শুরু করে দিল প্রকাশ্যে জার্মানীকে তোষণ গোপনে যুদ্ধ-প্রস্তুতি।

১৯৩৮এর সম্পাদিত মিউনিক চুক্তি নব জার্মানীর সাম্রাজ্য-লিপ্সাকে নিবৃত্ত করতে পারল না।

বিনা রক্তপাতে জার্মানী চেকোশ্লাভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া গ্রাস করেও শান্ত হলে না।

ব্রিটিশের যুদ্ধ এড়াবার সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ১৯৩৯এ ৩রা সেপ্টেম্বর ইউরোপে সর্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো।

এবং জার্মানীর প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই ভারতে শ্বেতাঙ্গ ভারত সরকার প্রবর্তন করলো তাদের কুখ্যাত বর্বর ভারতরক্ষা আইন।

যে আইনের গ্রাসে পড়ে ভারতবাসীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমন কি দৈনন্দিন জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতের বিন্দুমাত্র স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কোন নেতার সঙ্গে কোন নেতার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিষদের কোন মত না নিয়েই ভারতের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের জন্মভূমি ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করে।

১৯৩৯এর ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি অধিবেশনে স্থিরীকৃত হলো যুদ্ধে যোগদান করবে কিনা, একমাত্র তা ভারতের জনগণই স্থির করবে এবং ভারতে বা অন্য কোথাও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করবার জন্য পরিচালিত কোন যুদ্ধে কংগ্রেস কোন প্রকার সহযোগিতাই তাদের পক্ষ থেকে দান করবে না।

নেতারা অতঃপর স্পষ্টাক্ষরেই তদানীন্তন ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল : to declare in unequivocal terms what their war aims are in regard to Democracy and Imperialism and the new order that is envisaged !

এবং পূর্ববর্তী ১০ই অক্টোবরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেস নেতারা শুধু যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যই ব্যাখা করতে বললে তা নয় তার সঙ্গে দাবী জানালো—ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। India must be declared an independent nation, and present application must be given to this status to the largest possible extent !

বড়লাট বাহাদুর লর্ড লিনলিথগো সাহেব নেতাদের ঐ প্রশ্নের জবাবে এক বিবৃতি দিল ১৯৩৯—১৭ই অক্টোবর : ঘাবড়াও : মাত্ মেরে বাচ্চে ! সব মিল যায়গা ! মুঠী ভর যায়গা !

At the end of war they will be very willing to enter into consultation with representatives of the several communities and interest in India, and with the Indian Prides, with a vew to securing their aid and co-operation in the framing of such modifications !

অহো !

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম !

কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশিল গো !

কেন ভাবছ বাছারা ! আগে যুদ্ধ শেষ হোক তারপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ভারতবাসীর প্রতি অন্তরের তাদের চিরদিনের সদ্ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়েই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবে।

আলোচনা !

অনেক আলোচনা অনেক বৈঠকই তো হয়েছে ইতিপূর্বে। হয়েছে তো সাক্ষাৎকার। অনেক শ্বেতাঙ্গ মহাত্মাই তো পূর্বে অনেক কথা বলেছেন সরকারের মুখপাত্র হিসাবে। জানতে আর বাকী নেই কিছু।

তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল বলেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতারা সর্ববাদী সম্মতিক্রমে ২২শে অক্টোবর শ্বেতাঙ্গদের জানিয়ে দিল—অক্ষম তারা এবারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে কোনপ্রকার সাহায্য দান করতে।

এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীকে নির্দেশ দিল—বর্জন করো মন্ত্রীত্ব।

১৯৪০—১৭ই জুলাই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের নিকটে এক প্রস্তাব পেশ করলো, অবিলম্বে তারা যদি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা Complete Independence ঘোষণা করে কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করতে দেয় তাহলে বিনিময়ে তারা ব্রিটিশকে যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য

দানে প্রস্তুত আছে, অন্যথায় পাদমেকং ন গচ্ছামি।

লর্ড লিনলিথগো প্রত্যাখ্যান করলো সে প্রস্তাব। এবং ৮ই আগস্ট পেশ করলো আর একটি পাল্টা প্রস্তাব—বলাই বাহুল্য কংগ্রেসও সে প্রস্তাবকে পাল্টা প্রত্যাখ্যান জানাল।

অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় প্রতিষ্ঠান সীমাবদ্ধভাবে মহাত্মার নেতৃত্বে পুনরায় সত্যাগ্রহ শুরু করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ইউরোপে ঐ সময় যুদ্ধের অবস্থাও সংকটজনক।

কংগ্রেস তাদের পরিকল্পনা মত একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্বাচিত সত্যাগ্রহীদের নিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতে শুরু করলে।

শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষেপে উঠলো এবং তাদের চিরাচরিত দমননীতির প্রয়োগ করে জওহরলাল ও কয়েক সহস্র সত্যাগ্রহীকে অবিলম্বে কারারুদ্ধ করলো।

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

১৯৪১—১১ই ডিসেম্বর জাপান অকস্মাৎ পার্লহারবার আক্রমণ করে অ্যাংলো-আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘোষণা জানাল যুদ্ধং দেহি!

১৮ই হংকংয়ের কোলং অধিকার করে নেয় জাপান—২৫শে হংকং আত্মসমর্পণ করে জাপানের কাছে।

১৯৪২—১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপানের হাতে ব্রিটিশের দুর্ভেদ্য নৌঘাটি সিঙ্গাপুরের পতন ও ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হয়।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের উপরেও যুদ্ধের কৃষ্ণছায়া ঘনিয়ে এলো।

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটির পর একটি দেশ ব্রিটিশের হস্তচ্যুত হতে থাকায় ভারতবর্ষ ব্রিটিশের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হলো।

ব্রিটিশ দেখল এবং উপলব্ধিও করলে, অপরিমেয় লোকবল, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতের কিন্তু ভারতবাসী যদি না স্বেচ্ছায় আন্তরিক ভাবে তাদের এই যুদ্ধের সময় সাহায্য করে তবে কেবলমাত্র ভাড়াটিয়া সৈন্যদের নিয়ে সামগ্রিক যুদ্ধ জয়ের কোন আশাই নেই। ভারতীয় নেতারা রীতিমত বেঁকে বসেছেন।

অতএব শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা আর এক চাল চালল।

পার্লামেণ্টের এক জরুরী অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয়ে তাদের পক্ষ হতে এক প্রস্তাব নিয়ে ক্রীপস্ এলো ভারতে।

ঐ প্রস্তাবগুলোরই নাম সুবিখ্যাত ক্রীপস্ প্রস্তাব।

ভারতের তদানীন্তন নেতারা দেখলো ব্রিটিশ শক্তির ভারতে অবস্থানের জন্য যুদ্ধের গতি যে ভাবে ভয়াবহ আকার ক্রমশঃ ধারণ করছে এতে করে বৈদেশিক

শক্তি কর্তৃক ভারত আক্রমণের সংকট অত্যাসন্ন।

গান্ধীজি বিশেষ ভাবেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

এবং এক সপ্তাহ কাল আলোচনার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪২—১৪ই জুলাই স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছলেন অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার প্রয়োজন এবং যাকে কার্যকরী করতে হলে ব্রিটিশকে অবিলম্বে 'ভারত-ছাড়' বলা ছাড়া আর অন্য কোন পথই নেই!

৮ই আগস্ট রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রস্তাব গ্রহণ করলো ঃ ভারত ছাড়ো—Quit India!

সাত

১৯৪২

৪২

বিয়াল্লিশ।

১৮৫৭, ১৯২০-২১, ১৯৩০ তারপরে এলো ১৯৪২।

ভারতের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ৪২ যেন একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

ইংরাজের কূটনৈতিক চাতুরীই সাম্রাজ্য বিস্তারে, শাসনে ও রক্ষণে এক মহান অস্ত্র।

ভারতের জনগণ যখনই মুক্তির জন্য কোন আন্দোলন করেছে—জনগণের সেই জাগরণ ও কর্মপ্রচেষ্টাকে, চেতনার সেই উন্মেষকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য চতুর ইংরাজ দরদের ভান দেখিয়ে ও মীমাংসার মিথ্যা অজুহাতে রাজকীয় কমিশন বা বেসরকারী ডেপুটেশন ভারতে পাঠিয়েছে। তারা এসে তদন্ত করে ও সমসাময়িক ভারতের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সাড়ম্বরে আলোচনা করে, বিরাট রিপোর্ট প্রণয়ন করে কালক্ষেপ করেছে। অবশেষে ধূর্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার কোন অজুহাত সৃষ্টি করে বা তাদের চিরাচরিত মোক্ষম অস্ত্র সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ধুয়া তুলে, ভারতবাসী স্বাধীনতা পেলেও তারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ এই সব আবোলতাবোল কারণ দেখিয়ে আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েছে কিংবা ঐ চিরাচরিত "Divide and Rule" নীতির আশ্রয় নিয়ে ভারতে আবার নতুন করে বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করেছে।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না কোন দিনই।

ওদেরও তা হয়নি।

ফলে বরাবরই দেখা গেছে শ্বেতাঙ্গের কুটনীতিরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত ধূর্ত শ্বেতাঙ্গের দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে অগণিত লোক, প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে জয়লাভে সাহায্য করে এবং যুদ্ধ অবসানে প্রতিদানে সে

পেয়েছিল—রাউলাট আইন, পাঞ্জাবের সামরিক আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস পাশবিক হত্যাকাণ্ড।

১৯৪২এ যখন দেশের তদানীন্তন নেতারা সেই কারণে শ্বেতাঙ্গের দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই দিতে চাইল না, মার্চ মাসের মাঝামাঝি ক্রীপস্ এলো ভারতে।

ক্রীপস্ বিলাতের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও উদার-মতাবলম্বী একজন রাজনীতিক।

২৩শে মার্চের পার্লামেন্টের ঘোষণানুযায়ী ক্রীপস্ নিয়ে এলো ভারতবাসীর কাছে এক প্রস্তাব। বহু অর্থহীন গালভরা বাক্য বিন্যাসে সে প্রস্তাবটি গঠিত।

রাষ্ট্রসংঘ, শাসনতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বাধীনতা, সন্ধিচুক্তি, শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের গঠন-প্রণালী, ভারতরক্ষা বিধান প্রভৃতি বহুবিধ আবোলতাবোল কথাই সে প্রস্তাবের মধ্যে ছিল, কেবল ছিল না আসল ও সত্যিকারের কথাটি কোথায়ও সে প্রস্তাবের মধ্যে—অর্থাৎ যা ভারতবাসী চাইছিল সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি।

সবই মহাত্মারা অকাতরে ভারতবাসীকে দেবেন, কেবল আরো কিছুকাল মানে যুদ্ধাবসান পর্যন্ত তাদের যা একটু সামান্য দেরী করতে হবে।

যুদ্ধাবসান পর্যন্ত তাদের চলতি শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করা যাবে না। সমস্ত দল সম্মিলিতভাবে দাবী করলেও ভারতরক্ষার ভার ভারতীয়দের হাতে দেওয়া যাবে না।

কারণ দেখাতেও তারা পশ্চাদপদ হয়নি—কারণ শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হলে ভারতের সমস্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় নাকি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে এবং তার ফলও হবে মারাত্মক!

অতএব ভারতরক্ষার ভার ইউরোপীয় জঙ্গীলাটের উপরেই ন্যস্ত থাকবে।

এবং প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে এবং প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘে যোগদান তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

সর্বশেষে শ্বেতাঙ্গ সরকারের প্রস্তাবগুলো পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য, ওতে কেউ কিছু যোগ দিতে পারবে না বা কেউ ওর অঙ্গচ্ছেদ করতে পারবে না।

দেশের নেতারা দেখলেন ক্রীপস্ প্রস্তাবে ভারতে নিরপেক্ষভাবে একাধিক সার্বভৌম রাষ্ট্রসংঘ গঠনের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার মানেই শ্বেতাঙ্গের সেই চিরাচরিত নীতি 'Divide & Rule'এর আর একটি চাল।

নতুন করে আবার রাষ্ট্রভেদের পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা।

ফলে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকবে এবং স্বাধীনতা পেলেও খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না।

এবং শুধু তাই নয়, ঐ প্রস্তাবের দ্বারা সাম্প্রদায়িক রাজ প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা ছিল।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধশেষ কত কালের মধ্যে হবে, দুই কি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বা দীর্ঘতর সময়ে ঐ প্রতিশ্রুতি পালিত হবে তাও প্রস্তাবে সুস্পষ্ট করে কিছুই বলা

হয়নি।

অতএব প্রত্যাখ্যান জানানো হলো ক্রীপস আনীত প্রস্তাবকে।

প্রত্যাখান করা হলো তার—তথা শ্বেতাঙ্গ সরকারের প্রস্তাবকে।

তারপরও কিছুদিন ধরে মৌলানা আজাদ ও ক্রীপসের মধ্যে পত্র বিনিময় চললো।

কিন্তু কোন ফলই হলো না।

মৌলানা আজাদ তাঁর শেষ চিঠিতে স্পষ্টই জানালেন,…দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গুরুতর সংকটজনক পরিস্থিতিতেও ব্রিটিশ সরকার যখন এই ধ্বংসাত্মক নীতি পরিহার করতে পারছেন না তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের আসন্ন বিপদ ও আক্রমণ হতে ভারতকে ফলপ্রদ ভাবে রক্ষা করা অপেক্ষা যতদিন সম্ভব ভারতে মতানৈক্য ও ভেদ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্য কায়েম রাখাই ব্রিটিশ বেশী জরুরী মনে করে।

মহাত্মাজী বললেন, প্রস্তাবটি Post dated chequeয়ের সমান এবং হাস্যকর।

জহরলাল বললেন, আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট আর ধর্না দেব না। আমরা স্থৈর্য ও জ্ঞানানুযায়ী বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হবো।

১৯৩৯এ ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে বিপ্লবী সুভাস সর্বপ্রথম সেখানকার অধিবেশন ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাবটি উথাপন করেন, কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীগণের বিরোধিতায় সেই প্রস্তাব সেদিন অনুমোদিত হয়নি।

অবশেষে বহু তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতার কণ্ঠে সুভাষের তিন বৎসর পূর্বে উচ্চারিত প্রস্তাবটি ধ্বনিত হয়ে উঠলো নতুন করে।

১৯৪২এর আটই আগস্ট।

বোম্বাই নগরীর মধ্যস্থিত বর্ষাবিধৌত গোয়ালিয়র ট্যাংক প্রান্তরে কংগ্রেসের ছাউনী পড়েছে।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামীরা নায়কদের নির্দেশের প্রতীক্ষায় রুদ্ধনিশ্বাসে দণ্ডায়মান। নেতারা মন্ত্রাকক্ষে সমবেত।

সংগ্রামের পন্থা নিরূপণের পর নেতারা সমবেত সংগ্রামীদের সম্মুখে তাঁদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে মহাত্মা বললেন, সংগ্রাম শুরু করবার পূর্বে তিনি আপোসের শেষ চেষ্টা হিসাবে শ্বেতাঙ্গ সরকারের প্রতিনিধির নিকটে পত্র লিখে তাঁদের অভিমত জানতে চান।

সকলেই একবাক্যে মহাত্মার প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

গভীর নিশীথে নেতারা স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে রাত্রির মত বিশ্রামের নিমিত্ত চলে গেলেন।

বিক্ষুব্ধ ভারতের মর্মবাণী যেন দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মধ্যে শোনা যায়।

মনে পড়ে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে এই বোম্বাই নগরীতেই ভারতের এই

জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল।

দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে ভারতের অন্যান্য মুক্তি-সংগ্রামীদের সঙ্গে এ'রাও পুরোভাগে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।

লাঞ্ছনায় পীড়নে মৃত্যুকে করেছে বরণ, কারাগারে কাটিয়েছে কত রাত্রি দিন।

মহাত্মা গান্ধীর বিঘোষিত শেষ পত্র প্রাপ্তি পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ শাসক-শক্তির ধৈর্য অটুট রইলো না। ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানেই তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং চলেছিল তলে তলে গোপন প্রস্তুতি।

৯ই আগস্টের সূর্যোদয়ের পূর্বেই পাঁচ ঘটিকায় বোম্বাইয়ে—মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সভ্যদের এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বহু সভ্যকে শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারত রক্ষা আইনের নাগপাশে বেঁধে ফেললে।

নিয়মিত ভাবেই ঐ দিন—৯ই আগস্ট ভোর চারটের সময় মহাত্মা তাঁর প্রার্থনা শেষ হতেই শুনলেন, দ্বারে সশস্ত্র পুলিস অপেক্ষমান।

তাঁকে, এবং মহাদেব দেশাই ও মীরা বেনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ওয়ারেণ্ট হাতে দ্বারে অপেক্ষা করছে বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার।

একখানা গীতা হাতে মহাত্মাজী মীরা বেনকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস কমিশনারের হেপাজতে তাদের আনীত গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠে বসলেন। সমস্ত সংবাদপত্রের উপরে জারী করা হলো সুকঠোর নিষেধাজ্ঞা।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের শুধু যে গ্রেপ্তার করা হলো তা নয় সমস্ত প্রকার প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলে ইংরাজ সরকার।

রক্ত-রাঙা প্রজ্বলিত বিয়াল্লিশ!

বিয়াল্লিশ! ভারত ছাড়! Quit India! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! করব না হয় মরব! Do or die!

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মৃত্যুপণে আবদ্ধ রক্তস্নাত অগ্নিশুদ্ধ একটি।

যে পরিচ্ছেদের পাতায় পাতায়—

ভক্তদেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কি রে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে॥
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরাল পঞ্চনদীর তীরে॥

যেন মহা উল্লাসে মৃত্যুপণ সে এক অভিনব অভিযান—

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

সংগ্রামের পুরোভাগে এগিয়ে এলো শ্বেতাঙ্গের শ্যেন চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ

করে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের চারজন নেতা। তিনজন পুরুষ ও একজন নারী।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টবর্ধন ও রামমনোহর লোহিয়া আর শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী।

তাদের বিপুল মনস্বিতা ও বিপুল সংগঠনের শক্তি নিয়োজিত করলে তারা ভারতের ঐ অভূতপূর্ব আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করতে।

শ্বেতাঙ্গ সরকারও তার চিরাচরিত পাশবিক দমননীতি নিয়ে সংগ্রামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনসাধারণের উপরে হিংস্র রক্তলোভী ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো।

লাঠি, বেয়োনেট, গোলা-গুলি চালিয়ে ভারতের মাটিকে রক্তরাঙা করে তুলল।

শিশু বালক কিশোর যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলের উপরেই চলতে লাগল লাঠি ও গোলা-গুলি। আর অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ সরকারের নিষ্ঠুর বর্বর দমননীতিকে তুচ্ছ করে বিপ্লবীরা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল।

প্রচারপত্র ও পুস্তিকা দলে দলে গোপনে বিলি হতে লাগল।

রোজকার সংবাদ জনসাধারণকে জানিয়ে দেবার জন্য বিপ্লবীরা স্থাপন করলে তাদের নিজস্ব গোপন 'স্বাধীন ভারত বেতার কেন্দ্র'—একটি কলকাতায় ও অন্যটি বোম্বাই মহানগরীতে।

বেতার কেন্দ্রকে পরিচালিত করবার জন্য নিজস্ব ট্রান্সমিটার, ট্রান্সমিটিং স্টেশন ও রেকর্ডিং স্টেশন স্থাপিত হলো।

'স্বাধীন ভারত বেতার কেন্দ্র' হতে দিকে দিকে ভারতের অন্ত-প্রত্যন্তে যখন বিপ্লবের বাণী আকাশপথে রক্তরাঙা পথের ইঙ্গিত ছড়িয়ে চলেছে এমন সময় আগষ্ট বিপ্লবীদের কানে ভেসে এলো অপূর্ব অগ্নিস্রাবী এক তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর—

In spite of British propaganda, it should be clear to all right-thinking Indians that in this wide world India has but one enemy, who has exploited her for one hundred years, the enemy who sucks the life-blood of Mother India,—British Imperialism···Azad Hind!

আজাদ হিন্দ্!

স্তম্ভিত বিস্মিত নির্বাক বিপ্লবীরা শুনতে লাগল :

To fight and win India's liberty, and then build up in India, with full freedom to determine her own future—with no interference!

Free India will have a social order based on the eternal principles of Justice, Equality and Fraternity!

কার কণ্ঠস্বর! কোথা হতে ভেসে আসছে ঐ সিংহনাদ!

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পরিব্যাপ্ত প্রচণ্ড অগ্নিশিখাকে অতিক্রম করে ভেসে এলো এ কার কণ্ঠস্বর!

বাংলার ঘর-ছাড়া অশান্ত বিপ্লবী চিরপ্রিয় যে সুভাষ ১৯৪১ সনের ২৬শে জানুয়ারী তার কলকাতার এলগিন রোডস্থিত বাসভবন হতে স্কন্ধে দুটো মামলার অভিযোগ নিয়ে জামীনে অবস্থানকালে অকস্মাৎ পরাধীনতার বেদনা বুকে নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের সতর্ক প্রহরীদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে অদৃশ্য হয়েছিল। যার খোঁজ তখন পর্যন্ত সরকার হাজার চেষ্টা করেও পায়নি।

এ সেই সুভাষের কণ্ঠস্বর।

নতুন ঊষার অভ্যুদয়ের সূচনা!

১৯৪২এ যখন ভারতে আগস্ট সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে।

সেই সময় সুদূর প্রাচ্যে ১৫ই জুন ব্যাংককে বৃহত্তর এশিয়ার এক অধিবেশন হয়। এবং সে অধিবেশনে একশত ডেলিগেট উপস্থিত হন।

তাঁরা এসেছিলেন জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচায়না, বোর্নিয়ো, মাঞ্চুকু, হংকং, মালয় ও জাপান থেকে।

মালয় ও সিংগাপুরের পতনের পর ব্রিটিশ বাহিনীর যে সব ভারতীয় অফিসার ও সৈনিক জাপানীদের হাতে বন্দী হয়ে তখন যুদ্ধবন্দী হিসাবে জাপানীদের বন্দী-শিবিরে ছিল তাদের মধ্যেও অনেকে ঐ অধিবেশনে উপস্থিত হয়।

সেই অধিবেশনেই ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগকে মেনে নেওয়া হয় যার উদ্দেশ্য ছিল: Unity, Faith and Sacrifice!

সেখানকার সকল ভারতীয় মিলিত হবে একটিমাত্র সঙ্ঘের অধীনে।

সেখানে হিন্দু নেই, মুসলিম নেই, ক্রিস্তান নেই! নেই জাতিভেদ বা ধর্মের কোন প্রশ্ন! সকলেই এক ভারতমাতার সন্তান! ভারত আমার জননী আমার!

সকলের এক ধর্ম! সকলের এক প্রতিজ্ঞা—ভারতের স্বাধীনতা! India's Liberty!

এবং ঐ অধিবেশনেই স্থির হয় ঐ লীগের অধীনে তৈরী হবে অপূর্ব এক বিরাট মুক্তি-ফৌজ যার নাম হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ!

স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাহিনীর মত সেই ফৌজের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং জাপানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের ঐ জাতীয় বাহিনীর কোন পার্থক্য থাকবে না।

ঐ ফৌজ—আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য মৃত্যুপণে বিদেশীর বিরুদ্ধে করবে সংগ্রাম।

লীগের কার্যকরী সমিতিতে থাকবে একজন প্রেসিডেন্ট এবং চারজন মেম্বার। এবং ঐ চারজনের মধ্যে দুইজন থাকবে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বোস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এন্‌. রাঘবন্‌, কে. পি. কে. মেনন, ক্যাপ্টেন্‌ মোহন সিং এবং কর্ণেল জি. কিউ. গিলানী।

ঐ পরিকল্পনানুযায়ী ব্রিটেনের অধীনস্থ যে সব ভারতীয় অফিসার ও সৈনিক

মালয় ও সিংগাপুরের পতনের পর জাপানীদের হাতে বন্দী হয় তাদের নিয়েই রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে ক্যাঃ মোহন সিং গড়ে তুলল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

কিন্তু পরে যখন কোন কারণবশতঃ সে বাহিনীকে ভালভাবে কার্যকরী করা গেল না তখন রাসবিহারীর ইচ্ছাতেই বার্লিনে অবস্থিত পলাতক সুভাষকে নিয়ে আসা হলো।

১৯৪৩এর ২রা জুলাই সুভাষ উড়োজাহাজে টোকিও হতে সাইনন (সিংগাপুর) এসে উপস্থিত হলেন। ৫ই জুলাই সাইননের টাউন হলের সামনে বিরাট এক জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানাল নতুন নামে, নেতাজী!

নেতাজী জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্!

কিন্তু তারও আগে ভারতের পোড়া মাটিতে ফিরে তাকাই আর একবার!

৪২এর সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিকে স্মরণ করি আর একবার।

বিয়াল্লিশের প্রচণ্ড অগ্নিদাহ তখন জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে।

১৪ই আগস্ট থেকে কলকাতা মহানগরীতে আগুন জ্বলতে শুরু হয়।

রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় মহানগরীর মধ্যে মিলিটারী ও পুলিস লরীর বহ্ন্যুৎসব। দিকে দিকে চলতে থাকে বিপ্লবীগণ কর্তৃক সরকারী ভবনে ভবনে হানা!

কলকাতা মহানগরী জুড়ে বিপ্লবের আগুন যেন লেলিহ শিখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। পার্শীবাগান, বিডন স্ট্রীট, আহিরীটোলা প্রভৃতি পোস্ট অফিস ও গড়িয়াহাটা, সার্কুলার রোড, বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের আবগারীর দোকান বিপ্লবীরা আগুন জেলে পুড়িয়ে দিল। রেল স্টেশন, ট্রামগাড়ি, ট্রেন তারা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে লাগল।

দল বেঁধে যুবা-কিশোরের দল শোভাযাত্রা করে নেমে এলো রাজপথে: করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

পুলিস ও মিলিটারীর গুলিতে ও লাঠির আঘাতে কত প্রাণ কত জনাই দিল!

রাজপথে বিপ্লবের চিহ্ন আঁকা পড়লো রক্তের আখরে।

কলকাতা শহরে প্রথম শহীদ হলো দিলীপ ঘোষ।

শুধু কলকাতাতেই নয় বিয়াল্লিশের বহ্নি দিক হতে দিগন্তে ভারতের অন্ত-প্রত্যন্তে দাউ দাউ করে শত শিখায় যেন ছড়িয়ে যেতে লাগল।

কলকাতা, মেদিনীপুর, বোম্বাইয়ে, সাতারা, যুক্তপ্রদেশে, বালিয়া এবং বিহারের ভাগলপুরে বিপ্লবীদের সে অভিযান স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় অগ্নির অক্ষরেই যেন লেখা হয়ে গেল।

সম্পূর্ণভাবেই ঐ সব জায়গায় বহু কালের বিদেশী শাসন লোপ পেল—জনগণের জাতীয় সরকার হলো প্রতিষ্ঠিত।

মেদিনীপুর। বিয়াল্লিশের মেদিনীপুর। ওই তো মেদিনীপুর।

পাঁজরে পাঁজরে হোমাগ্নি জ্বলে, স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়। নাচে ঝড়ো হাওয়া—আকাশে বজ্র হাঁকে, সেই তো সত্য ; সেই তো পথের সাথী।

বিয়াল্লিশের স্বাধীনতার সংগ্রামের অগ্নিদগ্ধ রক্তাক্ত ঐতিহাসিক কর্মকেন্দ্র—বিপ্লবীদের স্বপ্নভূমি মেদিনীপুর।

অগ্নি-আন্দোলন, সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলনই হোক স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঐ মেদিনীপুরবাসীরা যে অপরিসীম ধৈর্য, দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে ও সরকারী বর্বর নৃশংস অত্যাচার ও লাঞ্ছনা বারবার সহ্য করেছে তার বুঝি :সত্যিই তুলনা নেই।

প্লাবন ঝড় ও দুর্ভিক্ষের কঠোর ক্লেশে জর্জরিত হয়েও বিয়াল্লিশের অগ্নিযুদ্ধে মেদিনীপুরবাসী স্বাধীনতার জন্য মুক্তির জন্য যে ভাবে মৃত্যুপণে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল বিদ্রোহী ভারতের সে এক সত্যিই অভিনব পর্ব।

একদিকে দুর্ধর্ষ অস্ত্র ও লোকবলে বলীয়ান শ্বেতাঙ্গ সরকার ও তার চেলা-চামুণ্ডার দল, অন্যদিকে নিরস্ত্র উৎপীড়িত অসহায় জনসাধারণ।

সে সংগ্রামের তুলনা বুঝি নেই!

মেদিনীপুরের মধ্যে, বিশেষ করে তমলুক ও কাঁথি মহকুমায়, বিপ্লব এমন ব্যাপকভাবে আকার নিয়েছিল যা ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

তমলুক—তাম্রলিপ্ত।

সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া—তমলুক মহকুমার ছয়টি থানা।

৭৬টি ইউনিয়ান, ১২৪৫টি গ্রাম এবং সাড়ে সাত লক্ষ লোকের বাস।

যুদ্ধের ত্রাসে সশঙ্কিত ইংরাজ সরকার মেদিনীপুর জেলাকেই বিপজ্জনক এলাকা বলে ঘোষণা করে।

পাছে জাপানী ফৌজ অতর্কিতে সমুদ্রপথে মেদিনীপুর এসে অধিকার করে, সেখানকার মোটর-যান, নৌকা ও দ্বিচক্রযানগুলি অধিকার করে তাদের কাজে লাগায়, এই ভয়ে বাহাদুর সরকার আইন করে জোর-জবরদস্তি করে তমলুক মহকুমার, নন্দীগ্রাম ও ময়না থানার সকল শ্রেণীর নৌকা, পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার অধিকাংশ অঞ্চল হতে সাইকেল সরিয়ে ফেলবার কঠোর আদেশ দেয়।

কিন্তু ঐ আদেশ পালন করা কার্যত সম্ভব না হওয়ায় সরকার বাহাদুর জোর করে অধিকাংশ নৌকাকে পুড়িয়ে ফেলে ধ্বংস করে।

ফলে অসংখ্য লোককে জীবিকার একমাত্র উপায় হতে নিষ্ঠুর ভাবে বঞ্চিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবে ঐ সরকারী অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের মনে একটা আতঙ্ক জাগে। আত্মরক্ষা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য দেশবাসী সুতাহাটা ও মহিষাদল থানায় দুইটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে—সেই বাহিনীই বিদ্যুৎবাহিনী নামে খ্যাত।

বিদ্যুৎবাহিনী স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে গঠিত হয়।

একটি ভগিনী সেনা শিবিরও স্থাপিত হয়।

১৯৪১এ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মহকুমা থেকে ধান ও চালের রপ্তানী বন্ধ করবার জন্য তমলুকের নেতারা যখন জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাল—কর্তৃপক্ষ তাদের সে অনুরোধে কর্ণপাত তো করলই না বরং উল্টে রপ্তানীর ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহ দিতে শুরু করল।

এবং প্রতিবাদ করবার অপরাধে (?) কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীকে দণ্ড দিল।

বাংলার তদানীন্তন লাটবাহাদুর স্যার জন হার্বাটের জঘন্য শয়তানী বঞ্চনা-নীতির ফলে বিয়াল্লিশ সালে একমাত্র বাংলাদেশ থেকেই চার কোটি টাকা মূল্যের চাল গোপন সুড়ঙ্গপথে চোরাকারবারীদের মারফৎ উধাও হয়ে গেল।

ফলে ১৯৪২—৮ই সেপ্টেম্বর প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মেদিনীপুরের চালের কল থেকে চাল রপ্তানীতে বাধা দেওয়ায় পুলিস বেপরোয়াভাবে চালাল গুলি নিরস্ত্র অসহায় গ্রামবাসীদের উপরে।

তিনজন গ্রামবাসী গুলিতে প্রাণ দিল।

এরই কিছুদিন আগে 'ভারত ছাড়ো' বাণী ঘোষিত হয়েছিল।

তমলুকের অধিবাসীরাও এবারে ইংরাজের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ঘোষণা করল: ভারত ছাড়ো! Quit India!

শ্বেতাঙ্গ শক্তি বন্দুক নিয়ে এগিয়ে এলো: সাবধান!

জনগণ সদম্ভে ঘোষণা করলে, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

ঘোষণা করলে তারা যুদ্ধ সরকারের বিরুদ্ধে।

সর্বত্র হরতাল। প্রত্যেক থানা স্বাধীন বলে ঘোষিত হলো। সরকারী কার্যালয়কে করা হলো বয়কট। চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় বন্ধ করা হল। চৌকিদার ও দফাদারদের উর্দি পুড়িয়ে ফেলা শুরু হল।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সরকারী নৃশংস দানবীয় পীড়ন ও অত্যাচার।

গোলা-গুলি ও অগ্নিতে চারিদিক ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

২৯শে সেপ্টেম্বর বিপ্লবীদের এক সভায় স্থির হলো যুগপৎ স্থানীয় সরকারী কার্যালয়গুলোকে আক্রমণ করা হবে।

২৮শে সেপ্টেম্বর প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমান বিপ্লবী গুরুত্বপূর্ণ তমলুক, মহিষাদল ও নরঘাটের বহু রাস্তা গাছ ফেলে বন্ধ করে দিল।

পুল ভেঙে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, পোস্ট উপড়ে ফেলল ও বহু সরকারী অফিস ধ্বংস করা হলো আগুন দিয়ে।

বেলা তিন ঘটিকা। ভাদ্রের প্রখর সূর্যতাপে আকাশ তখনও ঝলসে যাচ্ছে।

এমন সময় বিরাট চারটি শোভাযাত্রা চারি দিক থেকে শহরের দিকে অগ্রসর হলো।

পূর্ব হতেই কর্তৃপক্ষ শোভাযাত্রাকে বাধা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে সশস্ত্র গোরা ও গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করে শহরের সব কয়টি রাস্তা আগলে বসে ছিল।

তৎসত্ত্বেও পশ্চিম দিক হতে আট হাজার বিপ্লবী এক শোভাযাত্রা করে সৈন্যদের বেপরোয়া লাঠিচালনা ও ও গুলিবর্ষণকে উপেক্ষা করে অগ্রসর হয়ে চলল থানার দিকে—আহত হলো অনেকে, রক্তে মাটি ভিজে গেল। রক্তাক্ত অবস্থায় বিপ্লবী রামচন্দ্র বেরা অচৈতন্য হয়ে ধরাশায়ী হলো।

…জ্ঞান যখন ফিরে এল রামচন্দ্র চেয়ে দেখলো শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তখন সে অতি কষ্টে রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহটা টানতে টানতে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনমতে থানার দরজা পর্যন্ত পেঁছে চিৎকার করে উঠলো, ভাই সব ! আমি এখানে, থানা দখল হয়েছে।

কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্রের নশ্বর আত্মা বায়ুতে মিলিয়ে গেল।

তিয়াত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা বিপ্লবী নায়িকা মাতঙ্গিনী হাজরা বিরাট এক শোভাযাত্রা নিয়ে উত্তর দিক হতে শহরে প্রবেশ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা গুলি বর্ষণ শুরু করে দলটির উপরে।

মাতঙ্গিনী হাজরার দুইটি হাতই গুলিবিদ্ধ হয়, তথাপি বিপ্লবের মহানায়িকা এগিয়ে চললেন জাতীয় পতাকা হাতে।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

সৈন্যদের মধ্যে যারা ভারতীয় ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে মাতঙ্গিনী বলেন, ভাই সব, তোমরা বিদেশীর চাকরী ছেড়ে দাও। দেশ তোমাদের, এগিয়ে এসো সংগ্রামে—দাও বুকের রক্ত।

দুম্ ! অগ্নিঝলক !

একটি গুলি এসে মাতঙ্গিনীর কপাল বিদ্ধ করল।

মাতঙ্গিনী হাজরা মরেননি।

বিয়াল্লিশের সংগ্রামের পাতায় তাঁর অগ্নিস্মৃতি চিরদিন বেঁচে থাকবে। অবিনশ্বর তিনি !

দক্ষিণ দিক হতে যে দলটি অগ্রসর হয় তাদের মধ্যেও সৈন্যদের গুলির মুখে বহুলোক আহত হয় এবং ১৭ ও ২২ বৎসরের দুইটি বিপ্লবী যুবক প্রাণ দেয়।

এইভাবে চারিদিক থেকে প্রায় বিশ সহস্রাধিক নিরস্ত্র সংগ্রামী নারী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ বালক কিশোর বীরের মতই স্বাধীনতার দুর্জয় সংগ্রামে সেদিন অত্যাচারীর সমস্ত অত্যাচারকে তুচ্ছ করে মৃত্যুপথে এগিয়ে গিয়েছিল। মহিষাদল ও সুতাহাটা থানায়ও একই দিনে বিপ্লবীদের অভিযান চলে।

মহিষাদলের অভিযানে দশজন বিপ্লবী ও বহু নিরীহ দর্শক নিহত ও ৪৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয় পুলিসের গুলিতে। সুতাহাটা থানা, খাসমহল অফিস, রেজেস্ট্রী অফিস ও ইউনিয়ন বোর্ড সব কিছুই বিপ্লবীরা আগুন জেবলে পুড়িয়ে দেয়। নন্দীগ্রাম থানাও আক্রান্ত হয় বিপ্লবীদের দ্বারা। সেখানকার সমস্ত সরকারী কেন্দ্রগুলিও ভস্মীভূত করা হয়।

সমস্ত মহকুমা যেন বিপ্লবের আগুনে লাল হয়ে ওঠে। প্রকৃতির বুকেও বুঝি জাগে ঝড়ের তাণ্ডব ঐ সঙ্গে।

এলো সোঁ সোঁ করে মত্ত প্রভঞ্জন! আর এলো মৃত্যুভয়ঙ্কর দুর্বার জলোচ্ছ্বাস—১৬ অক্টোবর।

কাঁথি ও তমলুকের হলো অবর্ণনীয় ক্ষতি।

অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকৃতির তাণ্ডব দুয়ে মিলে যেন ঘটালো এক নিষ্ঠুর বিপর্যয়।

প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ঘর বাড়ি সব ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে। চারিদিকে মানুষ ও পশুর মৃতদেহ। আর থৈ থৈ করছে জল।

সরকার মানুষের এই দুর্ভাগ্যকে, এই চরম ভাগ্যবিপর্যয়কে প্রতিহংসার অস্ত্ররূপে গ্রহণ করলে।

নিজেরা তো পীড়িতদের কোন সাহায্য করলই না, বাইরের থেকে কোন সাহায্যও পেঁছিতে দিল না।

অবশেষে বিপ্লবীরাই বিপ্লবাত্মক কার্য বন্ধ করে নিজেদের দেশবাসীর দুর্ভাগ্যের ভার নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিল।

১৯৪২—১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্তে বিপ্লবীদের দ্বারা জাতীয় নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় দীর্ঘ প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের অধীনতাপাশকে ছিন্ন করে পদদলিত করে।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩—সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুকের প্রতিটি থানায় বিপ্লবীরা একটি করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

বিদ্যুৎবাহিনীই হয় জাতীয় বাহিনী।

প্রথমে বিদ্যুৎবাহিনীতে সমর বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ অ্যাম্বুলেন্স বিভাগ গঠন করা হয়, পরে আরো দুটি বিভাগের সৃষ্টি হয়,—গেরিলা বিভাগ ও ভগ্নি বিভাগ।

সেদিন তাম্রলিপ্তের অধিবাসী বিদেশী সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আজও তারা মরে যায়নি। শতবর্ষের অত্যাচারে লাঞ্ছনায় ও শোষণেও তাদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তারা বুঝেছিল ভারত ভারতই। ভারতবাসীর একমাত্র পরিচয় ভারতবাসীই।

এই ভারতের মাটিতেই তারা কি জানে না কত আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূণ, মুঘল, পাঠান এসেছে গিয়েছে, যাদের জয়গান উন্মাদ কলরবে আবার একদিন থেমে গিয়েছে। এমনি করে শ্বেতাঙ্গকে এই ভারত হতে বিদায় নিতে হবে।

১৮৫৭ হতে শুরু করে যে হোমানল আজও জ্বলেছে এ যে তারই প্রস্তুতি।

তাই তো ভারতবাসী জানত—এ রজনী পোহাবে, মুছে যাবে ললাট হতে একদিন দুঃখের এ রক্তশিখা।

বিদ্রোহী ভারত আবার একদিন নতুন করে মহামানবের সাগরতীরে জন্ম নেবে।

তারপর শুরু হলো সরকারের বীভৎস পাশবিক দমননীতি, শুরু হলো

বেপরোয়া গুলিবর্ষণ, অগ্ন্যুৎসব, হত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ।

কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে যার নজির মিলবে না।

মহিষাদল, নন্দীগ্রাম ও তমলুকে গুলি-চালনার ফলে ৪৪ জন নিহত হয়, ৭৩ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক হতে ১২ বৎসর বালক পর্যন্ত ৯৯ জন আহত হয়। ১২৪টি গৃহ ভস্মীভূত করা হয়। ১০৪৪টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। ৭৪টি নারীকে সৈন্যরা ধর্ষণ করে। সে বীভৎস অত্যাচারের ফিরিস্তি সঠিকভাবে দিতে যাওয়া দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তমলুক জাতীয় সরকারের পর পর নেতার আসন গ্রহণ করে, সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সাহু ও বরদা কুইতি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কাঁথি মহকুমায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্বর অত্যাচারের বিবরণী যা জানা যায়—গুলিমুখে নিহত ৩০ জন ও আহত ১৭৫ জন, ২২৮ জন নারীকে ধর্ষিত করেছে বর্বর সৈন্যেরা। ৯৬৫টি বাসগৃহ আগুন জেলে ভস্মে পরিণত করেছে। ২০৫৯টি গৃহ লুণ্ঠন করেছে। ৩০০০০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও অত্যাচারের তালিকায় অনেক কিছুই ছিল।

বিপ্লবের আগুন বালুরঘাট দিনাজপুরে ছড়িয়ে গেল।

১৩ই সেপ্টেম্বর আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে বালুরঘাট শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে মধ্য রাত্রিতে ১০০টির অধিক বিপ্লবী দল সমবেত হয় কণ্ঠে নিয়ে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে। Quit India! ভারত ছাড়।

সত্যাগ্রহী নেতা বিপ্লবী সরোজরঞ্জন সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

১৪ই সেপ্টেম্বর ভোরে বিপ্লবীরা নদী পার হয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হলো। Do or die! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

জনতা আদালত, ট্রেজারী, রেজিস্ট্রী অফিস ও ডাকঘর প্রভৃতি সরকারী ভবনে হানা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। টেলিগ্রাফ বিকল করে দেয়।

বেলা এগারটার সময় বিপ্লবীরা আবার প্রত্যাবর্তন করে।

২৪ ঘণ্টার জন্য উক্ত অঞ্চল হতে বিদেশী শাসনকে দূর করা হয়।

উড়তে থাকে সগৌরবে তেরঙ্গা পতাকা স্বাধীনতার প্রতীক বিজয়-গৌরবে।

১৫ই থেকেই সরকারের সৈন্য আমদানী হয় ও নৃশংস বেপরোয়া দমননীতি চলতে থাকে। পুলিস ৬৬ বার গুলি চালায়।

তিন ব্যক্তি নিহত হয়, তাদের মধ্যে একজনের বয়স ছিল সত্তর বৎসর। বহু ব্যক্তি আহত হয়।

৭৫ হাজার টাকার পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। বহু গৃহ ধ্বংস করা হয় এবং প্রচুর খাদ্যশস্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সরকার লুণ্ঠন করে।

বাংলাদেশে—বর্ধমান, বোলপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিং, সরকারী নৃশংস বর্বর নীতি নিষ্ঠুর নির্যাতন, হত্যা,

লুণ্ঠন ও ধর্ষণ নির্বিবাদে চালিয়ে যায়।

সাতারা—৪২এর অগ্নিবজ্ঞের তীর্থভূমি।

সাতারা জেলা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। একদা ঐ সাতারাতেই মহারাষ্ট্রীর কুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজী রাজত্ব করতেন।

স্বাধীনতার জন্য যে বীর বারংবার বিদেশীর বিরুদ্ধে আজীবন অস্ত্রমুখে নিজের ক্ষাত্রধর্মের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তাঁরই সহস্র স্মৃতিবিজড়িত ঐ সাতারা।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাতারা শ্বেতাঙ্গের পদানত হয়।

১৯৩১এর জুলাই মাসে বন-আইন অমান্য আন্দোলনে সাতারার বিলাসী গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বনের একটি বড় গাছ কেটে জাতীয় পতাকা উড়িয়েছিল এবং সরকার সেই সময় সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ক্ষুদ্র বিলাসী গ্রামকে চারিদিক থেকে অবরোধ করে গুলি চালিয়েছিল। দুইটি কিশোরের রক্তে সেদিন রঞ্জিত হলো ধরণী।

৪২এর অগ্নিপ্রস্তুতির মুহূর্তে সাতারার অধিবাসীরাও মৃত্যুপণে এগিয়ে এলো।

মোরচা বাহিনী—কৃষণ বাহিনী ২৪শে আগস্ট কারাদগ্রামে মামলতদারের কাছারিতে হানা দিয়ে জাতীয় পতাকা উড়াল।

দ্বিতীয় মোরচা বাহিনী পাটানে ও তৃতীয় মোরচা বাহিনী তাসগাঁয়ে কাছারিতে হানা দেয়।

ভাদুজায় সরকারী পুলিস বাহিনী সহস্রাধিক নিরস্ত্র অসহায় নরনারীর উপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। বিপ্লবী নেতা পরশুরাম বাজে পর পর তিনটি গুলি বিদ্ধ হওয়ায় স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ দেয়।

পুলিসের বর্বর নির্যাতনে বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা বা সংগ্রামলিপ্সা এতটুকুও প্রশমিত হয় না, তারা অতঃপর গোপনে গোপনে সংগ্রাম চালাতে শুরু করে।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল সাফল্যের সঙ্গে আন্দোলন চলেছিল। ঐ উপলক্ষে বিপ্লবীরা ডাকবাংলো, রেলস্টেশন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রভৃতি ধ্বংস করে।

নেতাদের মধ্যে ছিল সেদিন নানা পাতিল, পাণ্ডু মাস্টার, কিষাণ বীর, আপ্পা মাস্টার, শ্রীনাথলাল ও ডাঃ উত্তম রাও। নানা পাতিলই ছিল সর্বময় কর্তা।

আপ্পা মাস্টার মেদিনীপুরের বিদ্যুৎ বাহিনীর মত তুফান সেনা বাহিনী গঠন করেছিল।

তারপর আসাম।

আসামের অধিবাসীরাও সেদিন বিয়াল্লিশের ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

১৫ই আগস্ট পুলিস গোয়ালপাড়ায় একটি ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপরে

বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়। ফলে নয়জন আহত হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী জোড়হাট জেলের মধ্যে আবদ্ধ অসহায় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সরকার বেপরোয়া লাঠি চালায় যার ফলে ১৮১ জন বন্দী গুরুতর রূপে আহত হয়েছিল।

জনসাধারণ সেই বর্বরোচিত সংবাদে অত্যন্ত তিক্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

পুরুষ-নারী বালক-বালিকার এক বিরাট দল দরং জিলার গোপুর, বেহালি ও ঢেকিয়া থানা আক্রমণ করে। প্রত্যেক জায়গাতেই সরকার প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ করে, কিন্তু বিপ্লবীরা মৃত্যু ভয়ে এতটুকুও কম্পিত হয়নি, অবিশ্রাম গুলিবর্ষণের মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে জাতীয় পতাকা থানায় উত্তোলন করে।

বন্দেমাতরম! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

গোপুর থানার সম্মুখে। ২০শে সেপ্টেম্বর।

নর-নারী ও বালক-বালিকার দল দৃঢ় সংযত পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

ইংরাজ ভারত ছাড়ো! Quit India!

অগ্রবর্তিনী এক তরুণী কনকলতা।

রাইফেলধারী চিৎকার করে বললে, 'সাবধান, এগিও না আর। আর এগুলেই গুলি করা হবে।'

'তোমরা গুলি করতে পার, আমি আমার কর্তব্য পালন করবোই।'

হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা জাতীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসে তবু কনকলতা, নির্ভীক স্থির অকম্পিত।

Fire! চালাও গুলি! দুম্! দুম্! দুড়ুম! গর্জে উঠলো ব্রিটিশের অগ্নিনালিকা মৃত্যুরোষে।

লুটিয়ে পড়লো রক্তাক্ত কনকলতার সোনার দেহ মাটিতে। ধরিত্রী বক্ষ পেতে নিলেন শহীদ নারীর দেহখানি সযতনে।

এবারে এগিয়ে এলো মুকুন্দ কাওতি, তুলে নিল কনকলতার হাত হতে জাতীয় পতাকা, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

দুম্—দুম্!

লুটিয়ে পড়লো মুকুন্দ কাওতির প্রাণহীন দেহ।

এবারে দলবদ্ধভাবে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণের মধ্যেও সকলে গিয়ে উড়িয়ে দিল জাতীয় পতাকা থানা ভবনের শীর্ষে।

২০শে সেপ্টেম্বরই বিশ হাজার নরনারী ঢেকাইজুলি থানায় আক্রমণ চালায় —এখানেও সরকারী বাহিনীর নৃশংস গুলিবর্ষণের মুখে কুড়িজন সংগ্রামী হাসি মুখে দৃঢ়চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। তা সত্ত্বেও থানায় উড়িয়েছিল সেদিন তারা জাতীয় পতাকা।

ক্ষিপ্ত সরকার সংগ্রামীদের দমনকল্পে নিষ্ঠুর দানবীয় অত্যাচার চালায় সর্বত্র।

নিরীহ নরনারী শিশু কেউই সে অত্যাচার হতে বাদ যায় না।

জরিমানা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, লাঠি-চালনা ও গুলিবর্ষণ নির্বিবাদে সর্বত্র চলে সরকার বাহিনীর।

সরকারী নির্যাতনে সংগ্রামীদের প্রচেষ্টা গুপ্তপথে চলতে শুরু করে।
এবং দীর্ঘ চার মাস আসামে সরকারী প্রতিপত্তি ও শাসন লুপ্ত হয়েছিল।

বিয়াল্লিশের বহ্নি উড়িষ্যাতেও লেলিহান হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এবং সেখানেও সরকারী নির্যাতন ও অত্যাচার নির্মমভাবে দেখা দিয়েছিল।

কোরাপুট জেলের মধ্যে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার সরকার চালিয়েছিল সভ্যজগতে কোথায়ও তার নিদর্শন মিলবে না।

রুদ্র বিয়াল্লিশ!
দিক হতে দিগন্তে রুদ্রের প্রতি পদবিক্ষেপে জ্বলছে আগুন।
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কি ভীষণ অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে

* * *

মত্তশ্রমে শ্বাসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণু রাশ
মত্তশ্রমে শ্বাসিছে হুতাশ॥

উদ্বেলিত সমগ্র ভারতের আত্মা। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দেশ। মুক্তি-সংগ্রামের রক্তে লাল বিয়াল্লিশ।

মহাত্মার চম্পারণ সত্যগ্রহের লীলাভূমি বিহার! বিয়াল্লিশের বহ্নিশিখা বিহারেরও এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দাবানল জেলে দিল।

গুলি-গোলায় কামানে বন্দুকে ভেসে গেল বিহার-ভূমি। রক্তে রাঙা হয়ে গেল বিহারের মাটি।

চম্পারণ, কাটিহার, রাঁচি, পাটনা, সীতামারি, বাঁকিপুর, বিদপুর, ভাগলপুর, সাহাবাদ, লাহেরিয়াসরাই সর্বত্রই দেখতে দেখতে বিপ্লবের হোমাগ্নি ছড়িয়ে পড়ে।

বিপ্লবীর দল পাটনার পরিষদ ভবনে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে সাতজন প্রাণ দেয়।

ক্ষিপ্ত জনসাধারণ অতঃপর দুর্বার ও দুর্মদ হয়ে ওঠে। টেলিগ্রাফ টেলিফোন সব ধ্বংস করে ফেলে।

বাঁকিপুর জেলের সামনে বিপ্লবীদল ও পুলিসদলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী হয় সম্মুখ যুদ্ধ।

রক্তে পাটনা শহর লাল হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত এলো মিলিটারী। চললো বেপরোয়া গুলি - হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন।

বিহারের বহু স্থানে শ্বেতাঙ্গ শাসন লোপ পায়, জনগণই প্রতিষ্ঠিত করে তাদের গণরাজ।

প্রায় ছয় শতাধিক লোক বিহারের মুক্তি-সংগ্রামে গুলিতে প্রাণ দেয়। পরে বহু বিপ্লবীর ফাঁসিও হয়। বহু টাকার পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়।

যুক্তপ্রদেশেও জ্বলে ওঠে বিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখা।

এলাহাবাদ, আলিগড়, কাশী ও লক্ষ্ণৌ সর্বত্র নির্মম হত্যানুষ্ঠান ও গোলাগুলি চলে বিপ্লবীদের দমনকল্পে।

মাদ্রাজও নিশ্চুপ থাকেনি সেই আন্দোলনের মুহূর্তে।

১৭ই আগস্ট মাদ্রাজ স্টেশনে ও সরকারী ভবনে বিপ্লবীরা আগুন ধরিয়ে দেয়।

১৩ই বাঙ্গালোরে পুলিসের গুলিতে ৭ জন নিহত ও ৭০ জন হয় আহত।

মাদ্রাজের লবণগোলা ও নীলগিরিতেও চলে অভিযান।

মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লীতেও ছড়িয়ে যায় বিপ্লবের আগুন।

অথ অস্তি ও চিমুর কাহিনী।

মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা জেলায় অস্তি ও চন্দা জেলায় চিমুর গ্রাম।

৪২এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অস্তি ও চিমুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

১৬ই আগস্ট অস্তি ও চিমুর থানা বিপ্লবীরা আক্রমণ করে এবং শ্বেতাঙ্গের পদাশ্রিত দারোগা ও কনস্টেবলদের নির্মমভাবে হত্যা করে তারা তাদের অগ্রগমনে বাধা দেওয়ায়।

১৯শে আগস্ট চন্দার ডেপুটি কমিশনার সেই সংবাদ পেয়ে ২০০ ব্রিটিশ সৈন্য, ৫০ জন ভারতীয় সৈন্য ও ৫০ জন সশস্ত্র পুলিস সহ চিমুরে এসে আবির্ভূত হয়। তারপর শুরু করে তারা পাশবিক অত্যাচার।

বেপরোয়া গুলি-চালনা, লুণ্ঠন, হত্যা, গৃহ-ভূমিসাৎ, নারী-ধর্ষণ ও গ্রেপ্তার চালাতে থাকে ২৬শে আগস্ট পর্যন্ত।

অতঃপর যখন তারা চিমুর ত্যাগ করে চলে যায় চিমুরে স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া একটি পুরুষও ছিল না।

বোম্বাই কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক পরমধার্মিক ঋষিতুল্য জে. পি. ভানসালি চিমুরের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিকারার্থ দিল্লীস্থিত তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রিসভার সদস্য মিঃ এম. এস. আনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও কোন সাহায্য বা প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি না পেয়ে অনশন শুরু করেন মিঃ আনের বাড়িতেই।

অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লী জেলে নিয়ে গিয়ে জোর করে খাওয়ানো হয় এবং ৭ই নভেম্বর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

পুনরায় ১১ই তিনি অনশন শুরু করেন চিমুরে গিয়ে এবং এবারে তাঁকে বলপূর্বক সেবাগ্রামে ধরে আনা হয়।

কিন্তু লৌহকঠিন প্রকৃতির লোক ভানসালি; ১৯শে আবার তিনি পদব্রজে অনশন অবস্থায় একান্ত দুর্বল দেহেই কোনক্রমে চিমুরে গিয়ে পৌঁছান।

সরকার আবার তাঁকে ধরে স্ট্রেচারে করে সেবাগ্রামে প্রেরণ করে। দুই পক্ষকাল পরে ভানসালি চিমুর অভিমুখে যাত্রা করেন, তাঁর কণ্ঠে সেই এক বাণী: যাহাতে এই মুনিঋষির দেশে কোন নারীর মর্যাদা-হানি না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি।

অতঃপর সরকারের প্রতিশ্রুতি আদায় করে ১২ই জানুয়ারী দীর্ঘ ৬১ দিবস পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

অস্তি ও চিমুরের মামলায় শ্বেতাঙ্গের বিচারে তাদের নিম্ন আদালতে ২০ জনার প্রতি ফাঁসি ও ২৫ জনার প্রতি দণ্ডাদেশ হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের।

উচ্চ আদালতে ১৫ জনার ফাঁসির হুকুম বহাল থাকে, পরে অবশ্য মহাত্মার আবেদনে শ্বেতাঙ্গ সরকার ফাঁসির হুকুম মকুব করে।

৪২এর আন্দোলনকে, মুক্তি-সংগ্রামকে নির্বাপিত করবার জন্য শ্বেতাঙ্গ সরকার যে জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়েছে, যে পাশবিক অত্যাচারের স্রোত বইয়েছে, যে বেপরোয়া ও ব্যাপক গোলাগুলি বর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, গৃহদাহ, পাইকারী জরিমানা করেছে এবং কারাদণ্ড ও ফাঁসি দিয়েছে তার নজির একমাত্র হয়ত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদের নথিপত্রেই মিলবে।

নেতৃহীন অবস্থায় ভারতের জনগণ যে দৃঢ়তা, সংঘবদ্ধতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, যে ভাবে নির্ভীক চিত্তে অকুণ্ঠ তারা একের পর এক মৃত্যুকে বরণ করেছে, বুকের রক্তে মাটি লাল করে দিয়ে গিয়েছে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের পাতায় তা চিরদিনের ও চিরকালের জন্যই লেখা হয়ে গিয়েছে।

শত শত কম্বুকণ্ঠে সেই নিনাদ: করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! Do or die! ইংরাজ ভারত ছোড় দো! Quit India!

আট

আজাদ হিন্দ্! জয় হিন্দ্!

ভারতের মাটিতে যখন জ্বলছে বিপ্লবের হোমাগ্নি-শিখা দাউ দাউ করে—রক্তাক্ত ভয়াল, প্রশান্ত মহাসাগরের তীর্থে পূর্ব এশিয়ায় তখন ঘরছাড়া বিপ্লবী সুভাষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠছে: Friends! let the slogan of the three million Indians in "East Asia" be "Total Mobilisation for a Total war."

ভেসে আসছে ঘরছাড়া বিপ্লবীর অগ্নিক্ষরা বাণী! আজীবন লালিত স্বপ্নের ডাক!

It is not mere arms that decide the issue of a war; it is the Spirit of the Army that wins a war; we have to develop that Spirit and with that unbreakable Spirit, we must win this war of India's liberation.

* * *

What we want is a Blood Bath and then we are sure to free India We must have the blindest faith in out ultimate Victory.

রক্ত ! রক্তস্নানে আসবে সেই আমাদের চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ! প্রশমিত হবে আমাদের পৌনে দুইশত বৎসরের পরাধীনতার মর্মন্তুদ জ্বালা। আমাদের কোটি কোটি জনগণের স্বপ্ন !

আমাদের স্বাধীন ভারত ! হামারা হিন্দুস্থান !

We can take blood, only if we are prepared to give blood. The blood of our heroes in this war will wash away our sins of the past. The blood of our heroes will be the price of our liberty. Therefore, I call for a blood bath !

রক্তস্নানে শুচি হও ! প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর।

আজকে নয়, যে প্রদীপ-শিখাগুলি তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা ও রক্ত দিয়ে জ্বালাবে অদূর ভবিষ্যতে, একদিন সেই শিখাগুলিই হাজার হাজার লাখো লাখো হয়ে জ্বলে উঠে চিরতিমির রাত্রির ঘটাবে অবসান !

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মহানায়ক, চিরঅশান্ত, চিরবিপ্লবী সুভাষচন্দ্র সমগ্র ভারতের নেতাজী—১৯৪০এর ১৩ই ডিসেম্বর মোটর যোগে কলকাতা থেকে বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে পাঞ্জাব মেলের এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে বসেন।

ঘরের বাঁধন তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি, স্বাধীনতার অগ্রদূতের বুক ভরে জন্মাবধি যে স্বাধীনতার অগ্নিদাহ চলছিল তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঘরছাড়া করলে। নতুন পথের সন্ধানে তিনি এগিয়ে চললেন।

দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত পেশোয়ারী বেশভূষায় সুভাষকে সেদিন বাঙালী বলে কারও চিনবারও উপায় ছিল না।

পেশোয়ারে পৌঁছে সুভাষ টোঙ্গায় চেপে পাঁচ মাইল যান, সেখান থেকে হাঁটা-পথে কাবুল।

কাবুলে পৌঁছে সুভাষ রুশের সাহায্যলাভের আশায় রুশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তি তখন প্রায় ভাঙনের মুখে, রুশ সরকার ইংরেজকে চটাতে সাহস করলে না।

সুভাষ রুশের কাছ হতে কোন সাহায্য পেলেন না।

অবশেষে এক জার্মানের সাহায্যে বার্লিনে সংবাদ প্রেরণ করে বিমানযোগে রাশিয়ার উপর দিয়ে উড়ে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে—জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ভারতীয় জাতীয়

বাহিনীর ইউরোপীয় কমাণ্ড গঠন করেন।

১৯৪৩এর ২রা জুন সুভাষ সিঙ্গাপুরে (সাইননে) উড়োজাহাজে করে এসে নামলেন। এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের নবদূত !

৫ই জুন সাইননের টাউন হলের সামনে বিরাট জনতা সুভাষকে জানাল অভিনন্দন : নেতাজী ! আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সেনানী শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।

সেদিন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো : হে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক, তোমাদের অভিনন্দন জানাই।

আজকের এই দিনটি জীবনে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর গৌরব অনুভব করা উচিত যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর হলো নতুন করে অভ্যুদয়। বন্ধুগণ, সৈনিকগণ, যাত্রীগণ, আজ একমাত্র সমর-নিনাদে গগন বিকম্পিত করে ধ্বনিত হোক—দিল্লী চলো, দিল্লীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা ওড়াও আর সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সমাধিক্ষেত্র রচনা কর।

এই আমাদের মৃত্যুপণ। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। Battle for freedom ! It does not matter who among us will live to see India free. It is enough that India shall be free and that we shall give our all to make her free !

একথা নিশ্চিত যে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে পর্যন্ত না পুরাতন লালকেল্লা আমাদের অধিকৃত হয়, যে পর্যন্ত না লালকেল্লার শিখরে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা ওড়াতে পারি, যে পর্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদ শ্মশানে পরিণত করতে পারি, আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না। আমরা কখনো যুদ্ধে বিরত হবো না, পিছিয়ে আসবো না। যেদিন আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লী অভিযান শুরু করবো, যেদিন দিল্লীর সরকারী ভবনে আমাদের জাতীয় পতাকা ওড়াতে সমর্থ হবো, যেদিন সেই সুপ্রাচীন লালকেল্লার অভ্যন্তরে আমাদের স্বাধীনতার সৈনিকেরা বিজয়-উৎসবে উল্লসিত হয়ে উঠবে—কেবলমাত্র সেই দিনই আমাদের অভিযান সম্পূর্ণ হবে।

আমার বন্ধু, ভাই ও সহকর্মীর দল—ভারতের জাতীয় গৌরব, জাতীয় সম্মান, জাতীয় প্রতিষ্ঠা আপনাদেরই হাতে ন্যস্ত, তাই আপনারা এমনভাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন যেন আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আপনাদের স্মরণ করতে গিয়ে গৌরববোধ করতে পারে যে কতবড় স্বার্থত্যাগী, স্বাধীনতা-কামী বীরপুরুষদের বংশধর তারা। আপনাদের সুখে দুঃখে জয়-পরাজয়ের আনন্দে আপনাদের পাশে পাশেই আমি আছি এবং থাকবোও। দুর্যোগের ঘনান্ধকারেই হোক, বিজয়ের গৌরবেই হোক, আপনাদের সহকর্মী হিসাবে আমাকে আপনারা সর্বদাই পাশে পাশে পাবেন। কিন্তু আপাততঃ আমার দেবার মত আপনাদের কিছুই নেই। এমন কিছু আমাদের নেই যা দিয়ে আপনাদের মনে এতটুকু আনন্দও দিতে পারি।

আমাদের পথ দুর্গম, অর্ধাশন বা অনশনেই হয়ত অনেকদিন আমাদের কাটাতে হবে। হয়ত এমন অবস্থা আমাদের আসবে যে আমরা ক্ষুধায় এক মুঠি অন্ন পাবো না, তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল পাবো না। কষ্টের হয়ত আমাদের অবধি থাকবে না। কখন কোথায় আমাদের যেতে হবে নিশ্চয়তা নেই, কেউ বলতে পারে না কখন মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়াবে, তবু আমাদের গৌরব যে ভারতের মুক্তিবাহিনীর আমরা সৈনিক। We are soldiers !

Comrades ! you have voluntarily accepted a mission that is the noblest the human mind can conceive of For the fulfilment of such a mission, no sacrifice is too great, not even the sacrifice of one's life. You are today the custodians of India's hopes and aspirations. So conduct yourself that our countrymen may bless you and posterity may be proud of you.

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের অন্তরে সেদিন যেন স্বাধীনতার লাগি প্রতিজ্ঞার মৃত্যুপণের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়ে গেল। ৮ই জুলাই সুভাষ সমগ্র জগতের সামনে বজ্রকণ্ঠে আজাদ হিন্দ নামে এক অপূর্ব ফৌজের সংগঠনের কথা ঘোষণা করলেন।

৯ই জুলাই সাইননে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয়ের উপস্থিতিতে এক বিরাট সভা হয়, সেদিন তিনি জানালেন সেই অগণিত জনগণের সামনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সকলের ধন জন ও সম্পদ অর্পণের সামগ্রিক দাবী। ২৫শে আগস্ট ব্যক্ত হলো তাঁর ভাষণে বৃটিশ শক্তিকে আক্রমণের অভিপ্রায়।

Comrades, Officers and Friends —

There in the distance beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills and dales lies the promised Land, the sacred Land form which we sprang—the Land to which we shall now return. Hark, India is calling···Blood is calling to Blood. Rise, we have no time to lose. Take up your arms··· we shall make our way through the enemy's ranks or if God wills, we shall die a martyr's death. And in our last step we shall kiss the road that will bring our Army to Delhi. The road to Delhi, the road to Freedom.

১৯৪৩ সালে ২১শে অক্টোবর ঝান্সীর সেই বিপ্লবী রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্মদিবসে রানী ঝান্সী রেজিমেন্টের গোড়াপত্তন হলো সিঙ্গাপুরে।

নেতৃত্ব দেওয়া হলো মদ্রদেশীয় প্রবাসী মেয়ে ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের উপর।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী।

দলে দলে স্বেচ্ছাসেবিকারা এসে যোগ দিতে লাগল রেজিমেন্টে।

ক্রমে আরো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহের কেন্দ্র ও শিক্ষাশিবির স্থাপিত হয়।

ড্রিল, অস্ত্রচালনা, রণকৌশল, মানচিত্র পর্যবেক্ষণ ও সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা ঐসব স্থানে দেওয়া হতো।

ঝান্সীর রানী রেজিমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের তরুণীদের এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে করে তারা ভাই ও স্বামীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে।

সামরিক শিক্ষা ছাড়াও তারা সেবা-শুশ্রূষা, জন-কল্যাণ, সমাজ-সেবা প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষা লাভ করত। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের সামরিক শিক্ষা-দানের জন্য সুদক্ষ সামরিক বিশেষজ্ঞদের অধীনে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রও খোলা হয়।

১৯৪৩—২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সামনে অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হলো।

রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমরসচিব, পররাষ্ট্রসচিব এবং আজাদ হিন্দ সৈন্য-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি—শ্রীসুভাষচন্দ্র, নেতাজী!

প্রচার-সচিব—মিঃ এস. এ. আয়ার। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী—মহিলা দপ্তর। অর্থসচিব—লেঃ কঃ এ. সি. চ্যাটার্জী।

রাসবিহারী বসু—প্রধান উপদেষ্টা।

সেক্রেটারী—আনন্দমোহন সহায়। উপদেষ্টাবৃন্দ—দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান প্রভৃতি এবং সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিবৃন্দ নিযুক্ত হলো: লেঃ কঃ আজিজ আহমদ, লেঃ কঃ এন. এস. ভগৎ, কঃ জে. কে. ভোঁসলা, লেঃ কঃ গুলজারা সিং, লেঃ কঃ এম. জেড্. কিয়ানী, লেঃ কঃ এ. পি. লোকনাথন, লেঃ কঃ আহসান কাদির ও লেঃ কঃ শাহ্ নওয়াজ।

মূলত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার সব কিছুই গড়ে উঠেছিল প্রবাসী ভারতীয়দেরই অর্থে, সাহায্যে, সহানুভূতিতে ও পরিশ্রমে।

আজাদ হিন্দ সরকার ১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ঐ বৎসরেরই শেষের দিকে আজাদ হিন্দ সরকারের হেড্-কোয়ার্টার সাইনন থেকে বর্মাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে নেতাজী সুভাষও রেঙ্গুনে চলে আসেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব প্রচারকার্যের জন্য প্রথম দিকে সাইননে একটি বেতারকেন্দ্র ছিল, পরে বর্মায় হেড্-কোয়ার্টার স্থানান্তরিত হবার পর ইন্দোবর্মা ফ্রন্টিয়ারে আরো একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

১৯৪৩এর ৫ই ও ৬ই নভেম্বর বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন জাতিদের প্রতিনিধিদের টোকিওতে এক সম্মেলন হয়।

আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজী সুভাষও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এবং ঐ বৈঠকেই জাপানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী তোজো আজাদ হিন্দ সরকারকে মেনে নেন এবং তাদের হাতে ব্রিটিশ কবলমুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসন ও কর্তৃত্ব ভার তুলে দেন।

আজাদ হিন্দের পক্ষ হতে নেতাজী সুভাষ কর্নেল লোকনাথনকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কমিশনার নিযুক্ত করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপ দুটির নতুন নামকরণ করা হল শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় সে একটি স্বর্ণাঙ্কিত দিন।

১৯৪৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কর্নেল লোকনাথন তাঁর কাজ শুরু করেন ঐ দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্তা হিসাবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের হিংসানলে বাংলায়—সোনার বাংলায় এসেছে তখন পঞ্চাশের মন্বন্তর। ধান চাল পেটিতে পেটিতে গাঁটরীতে গাঁটরীতে বস্তায় বস্তায় ভরে রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে খাল বিল নদী পথে নৌকায় চাপিয়ে, ট্রেনের ওয়াগনে ওয়াগনে ঠেসে বাংলার সমস্ত গ্রামগুলো থেকে চোরাকারবারীদের সাহায্যে সরকারের গুদামে নিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধের জঠরানল নির্বাপিত করতে।

শহরবাসী মুনাফাখোর চোরাকারবারীদের সিন্দুক রজত মুদ্রায় ভরে উঠেছে আর ওদিকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘনিয়ে এসেছে ক্ষুধার করাল ছায়া।

দুর্ভিক্ষ! মন্বন্তর!

ম্যায় ভুখা হুঁ! শ্বেতাঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছে: যুদ্ধের দরুন সাহায্য অসম্ভব।

ক্ষুধার অন্ন নেই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই—হাহাকারে হাহাকারে বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

দলে দলে ক্ষুধার জ্বালায় সব গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছোটে।

কিন্তু অন্ন কোথায় শহরে! মৃত্যু আসে এগিয়ে।

কালো হাত বিষাক্ত নখর বিস্তার করে ঝাপটে ধরে।

মৃত্যু! ভয়াবহ মৃত্যু!

চিরশস্যশ্যামলা বাংলার সবুজ ওড়নায় বুভুক্ষার অগ্নিপরশ; বাংলার নীলাকাশে মৃত্যুবিষের ধোঁয়া। পথে পথে ভয়াবহ বুভুক্ষার ও মৃত্যুর মিছিল।

মৃতদেহগুলো নিয়ে টানা-হেঁচড়া করে শৃগাল সারমেয় শকুনী গৃধিনী।

পূর্ব এশিয়ার তীরে অস্ত্র শানাচ্ছে নেতাজীর অধীনস্থ মুক্তি ফৌজ, জাতীয় বাহিনীর সেনানীরা।

গেয়ে চলেছে, সৈনিক! মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক আমরা। দাসত্বের আটা ঘি পাওয়ার চাইতে হাজার হাজার গুণে শ্রেয় খাদ্য মুক্তির দূর্বাদলও—

কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে যা,
খুসী কি গীত গায়ে যা
ইয়ে জিন্দগী হ্যায় কৌম কি
কৌম পর লুটায়ে যা—

আর ওদিকে উচ্ছিষ্টলোভী একদল ভারতীয় সৈনিক শ্বেতাঙ্গের সাম্রাজ্য-লিপ্সার আগুনে সামান্য আটা রুটি ও বেশী তংকার লোভে নিজেদের আত্মহত্যা

করে চলেছে নির্বিবাদে। তাদের কানে পৌঁছায় নি সে অগ্নিক্ষরা নেতাজীর বাণী ঃ

I remember having read years ago a book written by an Englishman called Meredith Conrad, referring to India he remarked in that book that once the Indian people are united, it would be impossible to the British to continue this domination over India. And in the course of his remarks, he said that an Empire which rose in a day will vanish in night!

শুনতে পায় নি কি হতভাগ্যের দল।

পশে নি কি তাদের কানে সেই অগ্নিগর্ভ ডাক ঃ

What we want is a Blood Bath and them we are sure to free India! Give me Blood! I will give you Freedom!

১৯৪৪-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতরক্ষী ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হলো প্রথম অভিযান।

এই আক্রমণ শুরু হয় আরাকান অঞ্চলে।

এবং ঐ আরাকান যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য মেজর মিশ্রকে সর্বাধিনায়ক নেতাজী সর্দার-ই-জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেন।

২৭শে মার্চ নেতাজী এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ দুইদিন পূর্বে সীমান্ত অতিক্রম পূর্বক ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে।

পরে আবার ৪ঠা জুলাই নেতাজী এক বেতার ভাষণে বলেন ঃ India's last war of independence began on the 4th February 1944, in the Arakan region of Burma. It was on the historic day units of our Azad Hind Fauj went into action against the forces of our enemy. The Arakan fight—though it may not be a big episode in history—has for us a special significance and for two reasons. Firstly, it was in this Arakans that our offensive against the enemy began. Secondly, it was in the Arakan fight that our troops received their first "Baptism of Fire."

জয় হিন্দ্!

কুটচক্রী শ্বেতাঙ্গ সরকার সেদিনকার সুভাষের সেই স্বাধীনতার নবোদ্যমকে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক চির-স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সুভাষকে দেশের শত্রু কুইসলিং প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে সুভাষের নামে ও কার্যকলাপে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের অনেক চেষ্টাই করেছিল। চেষ্টার ত্রুটি করেনি সুভাষকে ও তাঁর কার্যকলাপকে ভারতবাসীর কাছে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করতে। সেই সময়কার ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতারাও সুভাষকে ও তাঁর কর্মপদ্ধতি ও

প্রয়াসকে সুচক্ষে দেখতে পারেনি।

দুর্ভাগ্য! হায়রে দুর্ভাগা দেশ!

১৯৪৪ সনের ৬ই জুলাই নেতাজীর মহাত্মাকে সম্বোধন করে সুদূর পূর্ব-এশিয়া থেকে বেতার-ভাষণ হয়ত তারই জবাব।

Mahatmaji,

- ...I am taking the liberty of addressing a few words to you with a view to acquainting you with the plans and the activities of Patriotic Indians outside India.

...There are Indians outside India and also at home, who are convinced that Indian Independence will be won only through the historic method of struggle. These men and women honestly feel that the British Government will never surrender to persuasion or moral pressure or non-violent resistance Nevertheless, for Indians outside India. differences in method are like domestic differences.

...For the world-public, we Indian nationalists are all one having but one goal, one desire and one endeavour in life.... There is no Indian, whether at home or abroad, who would not be happy if India's Freedom could be won through the method that you have advocated all your life and without shedding human blood. But things being what they are, I am convinced that if we do desire freedom we must be prepared to wade through blood

আমি জানি এবং আমার কানেও আসে যে আমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও কুৎসিত প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে আমারই দেশে আমাকে হেয় ও বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করবার জন্য। কিন্তু এও আমি জানি, আমার দেশবাসী যাঁরা আমাকে বেশ ভাল করেই চেনেন তাঁদের মনকে কেউই আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিতে পারবে না।

One who has stood for national Self-respect and honour all his life and has suffered considerably in vindicating it, would be the last person in this world to give in to any other foreign power. Having received the highest honour possible for an Indian at the hands of my own Countrymen, what is there for me to receive from a foreign power!

একমাত্র অন্যের হাতে ক্রীড়নক হতে পারে সে-ই যার নিজের আত্মসম্মান বলে কোন বোধ নেই বা যে নিজের উন্নতির জন্য পরমুখাপেক্ষী, অন্যের পদাশ্রয়ী।

Not even my worst enemy can ever dare to say that I am

capable of selling national honour and self-respect And not even my worst enemy can dare to assert that I was nobody in my own Country and that I needed foreign help to secure a position for myself···Can it be possible that I heve been deceived by Axis Powers ? I believe that it will be universally admitted that the cleverest and the most cunning politicians are to be found amongst Britishers One who has worked with and faught British politicians all his life, cannot be deceived by any other politician in the world. If British pclitician have failed to coax or coerce me, no other politician can succeed in doing so. And if the British Government, at whose hands I have suffered long imprisonment, persecution and physical assault, has been unable to demoralise me, no other power can hope to do so···

মহাত্মাজি ! আজাদ হিন্দ প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে আপনাকে কিছু আমি বলতে চাই। যে মুহূর্তে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ থেকে আমাদের শত্রুরা বিতাড়িত হবে, দেশে আবার ফিরে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও শৃংখলা, আজাদ হিন্দ সরকারের কাজও শেষ হবে সেই মুহূর্তে।

It will then be for the Indian People themselves to determine the from of Government that they choose and also to deceide as to who should take charge ot the Government. I can assure you, Mahatmaji, that I and all those who are working with me, regard themselves as the servants of the Indian people.

আমাদের কাজের জন্য আমাদের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা মৃত্যু ও ত্যাগের জন্য যদি কিছু থাকে, একটি মাত্র পুরস্কারই আমরা আশা করি—আমাদের দেশের মুক্তি, চল্লিশ কোটি নর-নারীর স্বাধীনতা। মুক্তি !

হে আমাদের জাতির পিতা !

In this holy war for India's liberation we ask for your blessings and good wishes !

জয় হিন্দ্ !

১৯৪৪ সনের বসন্ত-সমাগমে নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতীয় মুক্তিফৌজ বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের ইম্ফল অভিযানের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং সৈন্যদলকে নতুনভাবে সংগঠিত করে নবোদ্যমে ভারতভূমি অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়।

এতকাল তারা বিদেশের বেতনভোগী হয়ে নিজেদের জন্মভূমির শৃংখলকে দৃঢ় করবার জন্যই বিদেশী প্রভুর আজ্ঞায় অস্ত্রধারণ করেছে, মৃত্যুকেও বরণ করে

নিয়েছে, কিন্তু আজ তারা চলেছে সেই বিদেশী শত্রুকেই জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করতে।

সোনার মাটিতে প্রোথিত করতে জাতীয় পতাকা !

Union Jack এর বদলে আজ তারা দিল্লীর লালকেল্লায় উড্ডীন দেখতে চায় নিজেদের তেরঙ্গা জাতীয় পতাক।

তাই তাদের কণ্ঠে আজ তূর্যনিনাদ।—চলো চলো, দিল্লী চলো। চলো দিল্লী চলে হাম ! কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুসীকি গীত গায়ে যা। দেশ হামারা হিন্দুস্থান। বন্দেমাতরম্। জয়হিন্দ্।

চলেছে হাজারে হাজারে সৈন্য দেশের জন্য আজ কোরবানী হতে।

দুর্ধর্ষ সৈন্যের দল মুক্তিফৌজের সেনানীরা ও জাপবাহিনী ব্রহ্ম-সীমান্ত অতিক্রম করে আসামের পূর্ব-সীমান্তস্থিত মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করল ঃ

এবং একদিকে রাজধানী ইম্ফল ও অন্যদিকে কোহিমা হলো আক্রান্ত।

এদিকে নব আষাঢ়ের সূচনায় আকাশে মেঘের দল হয়ে উঠেছে ঘন।

গুরু গুরু ডাক ! বিদ্যুতের চকিত ইসারা !

ঝম···ঝম···ঝম। বৃষ্টি হলো শুরু।

রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত পিচ্ছিল ও অগম্য হয়ে উঠলো। ফেব্রুয়ারী মাসে বসন্তকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান শুরু হয়েছিল আর ছয় মাস পরে জুলাই মাসে আসামের বর্ষার দুর্যোগে, খাদ্য ও পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে জাপানের অক্ষমতায় নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গতি তাদের প্রতিরুদ্ধ হলো।

নেতাজীর রণ-পরিকল্পনায় আকস্মিক বিঘ্ন এসে দেখা দিল।

একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হলো। জাপবাহিনীও তখন পশ্চাদপসরণ শুরু করেছে।

এই সুযোগে বিটিশ বাহিনী ব্রহ্মের পথে অগ্রসর হলো দ্বিগুণ উৎসাহে।

বস্তুত মণিপুর অভিযানের ব্যর্থতাই যে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই, তথাপি মনের বল তারা সেদিন হারায়নি। ভেঙে পড়েনি তারা হতাশায়।

নেতাজীর সামনে এসে যখন তারা দাঁড়াল, শোনালেন তাদের তিনি নতুন আশার বাণী। বললেন, আবার নতুন করে, আরো শক্তিশালী সৈন্যদল আমরা গড়ে তুলবো, দিল্লী আমাদের পৌঁছতে হবেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যুদ্ধের গতি তখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

জাপানীদের মনোবলে ধরেছে ভাঙন। এবং কোহিমা হতে পশ্চাদপসরণের কিছু পূর্ব হতেই তারা প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ হতে অনেকটা বিনাযুদ্ধেই পিছিয়ে আসতে শুরু করেছে। ব্রহ্ম থেকেও তারা পিছনের দিকে চলল।

দ্রুতগতিতে ব্রিটিশ সৈন্য এগিয়ে আসছে রেঙ্গুনের দিকে।

নেতাজী তখনও রেঙ্গুনে।

মন্ত্রীরা, পদস্থ সেনানীরা প্রত্যেকেই নেতাজীকে রেঙ্গুন ত্যাগের জন্য বারংবার অনুরোধ জানাতে লাগল, তিনি কিন্তু অচল অটল।

রেঙ্গুন ত্যাগ করে তাঁর সৈন্যদের ছেড়ে নিজ হাতে গড়া ঝান্সী বাহিনীকে আসন্ন ব্রিটিশ সৈন্যের মুখে ফেলে কিছুতেই তিনি কোথাও যাবেন না।

অবশেষে ২৪শে এপ্রিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের ও জাপানীদের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে তিনি রেঙ্গুন শহর ত্যাগ করতে এক প্রকার বাধ্য হলেন।

জাপানীদের একজন জেনারেল নেতাজীকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বয়ং এসেছে।

জেনারেল বললে, 'নেতাজী, আর দেরী করবেন না। ব্রিটিশ সৈন্য এগিয়ে আসছে একেবারে দরজায়।'

কিন্তু এদের এমনি করে অসহায়ের মত ফেলে আমি কোথায় যাবো? এরাই যে আবার জীবনের সব, আশা আকাঙ্ক্ষা—

বিপ্লবীর চোখেও বুঝি দেখা দেয় অশ্রু।

'না না—আপনাকে যেতেই হবে—'

'না, যাবো না। এদের সকলের সঙ্গে যদি আমার যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তবেই যাবো, নচেৎ আমি যাবো না। মরতে হয় এদের সঙ্গেই আমি মরবো।'

'এখানে থেকে আর কোনই লাভ হবে না নেতাজী! টোকিওতে গিয়ে হয়ত এদের কোন একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আপনি এখানে থাকলে সে সব কিছুই সম্ভব হবে না।'

রাত্রি গভীর। ২৪শে এপ্রিলের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি।

একটু পরে সকলের প্রিয় আদরের নেতাজী চলে যাবেন।

সকলে এসে চারপাশে নেতাজীকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সকলের মনই অশ্রুভারে পীড়িত।

মেয়েরা নেতাজীকে যেন আঁচলের তলায় সমস্ত আসন্ন বিপদ থেকে আড়াল করতে চায়।

কে একজন তাদেরই মধ্যে নেতাজীর প্রিয় গানটি গেয়ে উঠল।

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে।
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার—

হুঁশিয়ার যাত্রী! হুঁশিয়ার!

রেঙ্গুন শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ও ভারতীয় অধিবাসীদের ধনপ্রাণের নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য কর্নেল লোকনাথনের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি দল রেঙ্গুনে নেতাজীর আদেশে থেকে গেল।

জাপানী হাওয়াই জাহাজে নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করে ব্যাঙ্ককে যান, সেখান

হতে যান সিঙ্গাপুরে।

সিঙ্গাপুর জাপানীরা যখন বিনা যুদ্ধে ত্যাগ করে গেল, নেতাজী বিমান-যোগে আবার টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৯৪৫এর ২৩শে আগস্ট জাপ নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করে বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ফলে হাসপাতালে নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ।

কিন্তু সত্যিই কি সেই মহামানবের দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে? সত্যিই কি নেতাজী নেই?

নেতাজী সুভাষের মৃত্যু ভারতের জাতীয় জীবনের এক শোচনীয়তম অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনা। ভারতের আত্মা আজও ঐ মর্মান্তিক দুঃসংবাদকে সত্য বলে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি।

নেতাজীর মৃত্যু হতে পারে না।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় নেতাজীর অমর অবদান—তার তো মৃত্যু নেই! শেষ নেই!

সুভাষ শুধু নেতাজীই নন, অগণিত জনগণের আপন জন—পরমাত্মীয়।

তিনি ভারতের লেনিন ও ওয়াশিংটন।

এগিয়ে গিয়েছেন নেতাজী :

তু শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়—
মরনে সে ফির ভী তু ন ডর,
আসমানতক উঠাকে শির
জোরসে বতন বঢ়ায়ে যা—

নয়

ভারতে ইংরাজ শাসনের সত্যিই তুলনা নেই। ভগবানের গলাতেও তারা ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছে।

কায়েমী শ্বেতাঙ্গ শক্তির পদতলে অত্যাচারিত, দুঃসহ লাঞ্ছনা অবমাননা ও উৎপীড়নে রক্তাক্ত ভারতের দীর্ঘ পৌনে দুই শত বৎসরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে সব অবিস্মরণীয় কীর্তির আখর পড়েছে তাদেরই অন্যতম দিল্লীর লালকেল্লার মধ্যে যুদ্ধশেষে আত্মসমর্পিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনানীদের হাস্যকর বিচারের প্রহসন-পর্ব।

অপরাধ তাদের গুরুতর, রাজদ্রোহ, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার অভিযোগ।

কর্নেল শাহ নওয়াজ, ক্যাঃ পি. কে. সাইগল ও ক্যাঃ ধীলন প্রভৃতি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে শ্বেতাঙ্গ সরকার—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও খুন বা খুনের সহায়তা।

মকদ্দমা চলতে থাকাকালেই ২৬শে নভেম্বর বুধবার কলকাতা শহরে ছাত্রদের বিরাট এক শোভাযাত্রা ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে বের হয়ে কয়েকটি রাস্তা ঘুরে

কলেজ স্ট্রীটে যাবে বলে স্থিরীকৃত হয় নিজেদের মধ্যে এক সভায়।

পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী শোভাযাত্রা ঐদিন ধর্মতলা স্ট্রীট হয়ে যেমন ম্যাডান স্ট্রীটের মোড়ে এসে হাজির হয়েছে, সশস্ত্র পুলিস এসে শোভাযাত্রার পথ রোধ করে দাঁড়াল অপরাহ্ণ চার ঘটিকায়।

শোভাযাত্রা সেইখানে থেমে কয়েকজন নেতার উপদেশ চেয়ে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানায়, কিন্তু ইতিমধ্যেই পুলিসের হস্তধৃত অগ্নিনালিকা-মুখে মৃত্যু গর্জন করে ওঠে।

দুম! দুম্! দুড়ুম!

ছাত্রনেতা রামেশ্বর ব্যানার্জী প্রমুখ তিনজন সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এবং তাদেব শেষ নিঃশ্বাস বায়ুস্তরে মিলিয়ে যায়।

সম্মুখে তাদের তিনটি সাথীর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ ধুলায় পথের মধ্যে পড়ে আছে—সকলে স্থির নির্বাক অকম্পিত।

ক্রমে জনতা চারপাশে এসে হাজারে হাজারে লাখে লাখে জড়ো হয়। ট্রাম বাস লোক-চলাচল বন্ধ।

শ্বেতাঙ্গ পুলিস শোভাযাত্রীদের মধ্যে এসে তাদের দুই ভাগে বিভক্ত করে দেবার চেষ্টা করে—একদল পূর্বদিকে একদল পশ্চিমদিকে।

এবং যে মুহূর্তে তারা মিলিত হবার চেষ্টা করে তাদের নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে পুলিস ছাত্রদের উপরে একদফা লাঠি চালিয়ে নেয়।

অনেকেই লাঠির আঘাতে আহত হয়, কিন্তু তথাপি তারা কোন প্রতিরোধ জানায় না।

অহিংস।

ঐ সময় কোথা হতে দু-একটি ইষ্টকখণ্ড ঐ স্থানে এসে পড়ায় পুলিস আবার গুলি চালায়।

আবার কয়েকটি ছাত্রের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহ মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ে।

ঐ দুঃসংবাদ পেয়ে কিরণশঙ্কর, শ্যামাপ্রসাদ, রাধাবিনোদ পাল প্রভৃতি দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন।

রাত্রি এগারটায় বাংলার তদানীন্তন গভর্নর কেসিও ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়।

সকলেই ছাত্রদের ফিরে যেতে অনুরোধ জানায়, কিন্তু ছাত্রের দল সংকল্প হতে চ্যুত হয় না।

ইংরাজ শাসনে অনেক বর্বর নীতিরই স্বাক্ষর পড়েছে, কিন্তু নিরস্ত্র অহিংস ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপরে গুলিবর্ষণ করা বোধহয় একমাত্র ভারতে শ্বেতাঙ্গ শাসন-নীতিতেই স্থান পেয়েছে।

পরের দিন ২২শে শোভাযাত্রা আবার অগ্রসর হয় এবং সেদিনও পুলিসের দু-এক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও তারা নিজেদের নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে যায়।

রক্তদানের পর্ব কি শেষ হবে না?

এমনি করেই কি তা চলবে অব্যাহত ?

মাস্টারদা ! সৃষ্টিধর সান্যাল তার কলকাতার মেসের ঘরে গভীর নিশীথে একাকী মোমবাতির আলোর সামনে বসে ডাইরী লিখছে ।

পালিয়ে এলাম ! মৃণালের ওখান থেকে পালিয়ে এলাম !

মনে পড়ছে আজ ওদের সকলের কথাই—নীলাঞ্জন, দিদি হিরণ্ময়ী, বিনয়, সতীশ, সতী, মৃণাল, সন্তোষ আর মহাশ্বেতা !

আশ্চর্য লাগলো ঐ মেয়েটিকে—মহাশ্বেতা—শ্বেতা ।

সতীও নয়, মৃণালও নয়, মহাশ্বেতা—শ্বেতা ।

আগামী ১৫ই আগস্টকে ওরা মানে না ।

১৫ই আগস্টকে নাকি ওরা চায়নি । শ্বেতাঙ্গ পরিকল্পিত দ্বিখণ্ডিত ভারতকে ওরা চায়নি, চেয়েছিল অখণ্ড ভারত । কারণ ওরা বলে, এই দ্বিখণ্ডিত ভূখণ্ড নিয়েই অদূর ভবিষ্যতে আবার ভারতে জ্বলে উঠবে অগ্নিশিখা । তারই পূর্ব সূচনা—তারই বীজ রোপণ করে যাচ্ছে শ্বেতাঙ্গরা ।

মহাশ্বেতা তো স্পষ্টই বললে, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই তো শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায় । পলাশী থেকে শুরু করে এই ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয়ই আমরা করবো । আর সেই দিনের যজ্ঞে আপনাকেও আমরা আমাদের পাশে পাশে চাই সৃষ্টিধরবাবু !

মৃদু হেসেছিলাম ।

মহাশ্বেতা কিন্তু বলে উঠলো, হাসছেন যে, জানেন, পাকা সৈনিক আপনারা । আপনাদেরই তো সেনাপতি করে সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড় করাবো !

তারও কোন প্রয়োজন হবে না মহাশ্বেতা ! আগামী দিনের সৈনিক ঘরে ঘরে তৈরী হচ্ছে, তারাই এসে অস্ত্র ধরবে দেখো । দুই শত বৎসর ধরে যারা প্রাণ দিয়ে গেল, সঞ্জীবনী জীবনসুধা যারা ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে বিলিয়ে দিয়ে গেল সে কি এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে !

আশ্চর্য সন্তোষ !

সেও যেন এই বয়সে মহাশ্বেতার ডাকে সাড়া দিয়েছে ।

দীর্ঘ দিনের রণক্লান্ত সৈনিক যেন নতুন করেই আবার যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে ।

সন্তোষকে মহাশ্বেতা ডাকে কমরেড বলে । মহাশ্বেতাও সন্তোষকে ডাকে, কমরেড । কর্মীরা নাকি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কমরেড । সাম্যের পূজারী ওরা সকলেই ।

সাম্যবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায় ওরা ।

আসবার সময় বার বার করে বলে দিয়েছে ওরা সময় পেলেই যেন কলকাতায় ওদের সঙ্গে গিয়ে দুটো দিন কাটিয়ে আসি ।

প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি ।

অত্যাসন্ন স্বাধীনতা-উৎসবের জন্য সমগ্র কলকাতা মহানগরী জুড়ে চলেছে উৎসবের আয়োজন। সতীকে নিয়ে তাই চলে এসেছি গ্রামে।

শেষবারের মত গ্রামে কটা দিন বাস করে যেতে চাই। কে জানে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের পর এখানে আর বাস করা চলবে কি না।

মনে পড়ছে কত দিনের কত কথা!

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে স্বাধীনতার জন্য ভারতভূমিতে যে নৌসেনাদের বিদ্রোহ হয়ে গেল মনে পড়ছে সেই নৌবিদ্রোহের কথাই।

নৌবলেই বলীয়ান ছিল ব্রিটিশ। এবং বহুবার তারা ব্যক্ত করেছে, যতদিন ভারতে নৌশক্তি তাদের অক্ষুণ্ণ থাকবে কাউকে তারা ডরায় না।

১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে সেই নৌবাহিনীই যখন শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, ভারতে মুমূর্ষু শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের শেষ ভিতটাও যে নড়ে উঠেছে তা বুঝতে আর কারোই বাকী ছিল না।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সন—শহরের সর্বত্র সংবাদপত্রের বিশেষ সান্ধ্য সংস্করণে যেন সচকিত হয়ে উঠলো।

দাবাগ্নির মতই একটা সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ। নৌবিদ্রোহ! নৌসেনারা বিদ্রোহী!

বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌসেনারা অনেকগুলো জাহাজ দখল করে ফেলেছে এবং কাস্‌ল ব্যারাকের মধ্যে ঘাঁটি করে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই চালাচ্ছে।

Open fight!

কাস্‌ল ব্যারাকের অস্ত্রাগারটিও বিদ্রোহী নৌসেনারা নিজেদের দখলে নিয়েছে।

ইংরাজ বুঝতে পেরেছিল ঠিক ১৯৪৬ সনে নৌবিদ্রোহ ভারতে কুইট্ ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়োর অন্য একটি অধ্যায়।

বহুদিন থেকেই ভারতীয় পদাতিক ও নৌসৈন্যদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে এসেছে শ্বেতাঙ্গ কর্তারা। বহুজনকে প্রলোভন দেখিয়ে যুদ্ধের দরুন সামরিক বাহিনীতেও টেনে আনা হয়েছিল। অতঃপর যুদ্ধ যখন থেমে গেল দেখা গেল সব ভুয়ো। সব ফাঁকি। স্রেফ ইংরাজ সরকারের ভাঁওতা।

সাম্রাজ্যরক্ষার তাগিদে ইংরাজ সৈন্যদলে ভর্তি করবার সময় সকলকে অনেক আশ্বাসই দিয়েছিল। এখন হতভাগ্যদের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি না দিয়ে সৈন্যদল ভেঙে দিতে শুরু করল।

তারপর সৈন্যদের মধ্যে সাদা ও কালার পার্থক্য! শ্বেতাঙ্গের চিরাচরিত ঘৃণিত নীতি!

'তলোয়ার'এর যে নৌ-শিক্ষার্থীরা প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের প্রধান অভিযোগই ছিল শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের তারতম্য।

যেমনি দৃষ্টিকটু তেমনি বিসদৃশ।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কর্তারা সৈন্যদের অভিযোগে কোনরূপ দৃষ্টিদান করাটাও প্রয়োজন মনে করলে না চিরদিন যেমন তারা কখনো করে আসেনি ঠিক তেমনি করেই।

ভুলে গিয়েছিল হয়ত তারা প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর আগেকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল ও মালেকান স্বত্বই বুঝি চলে আসছে এখনো।

ইংরেজ সোলজার ও দেশী সেপাইতে অনেক তফাত।

তলোয়ারের শিক্ষার্থীদের আরো একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল নৌনায়ক—শ্বেতাঙ্গ কমাণ্ডার কিংয়ের বিরুদ্ধে।

কিং ভারতীয় সৈনিকদের কুলীর বাচ্চা ছাড়া কখনো সম্বোধনই করত না।

১৮ই ফেব্রুয়ারী 'তলোয়ার' নৌশিক্ষা কেন্দ্রে ধূমায়িত অসন্তোষের বহ্নি আর চাপা রইলো না।

এগার শত কর্মী ধর্মঘট শুরু করল।

এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'তলোয়ার' এর পদাঙ্ক অনুসরণ 'নাসিক', 'কলাবতী', 'আউধ' ও 'নিলাস' জাহাজও।

অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে যেতে লাগল এবং দেখতে দেখতে এগার শত ধর্মঘটীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল বিশ হাজারে।

'ফিরোজ', 'আকবর' ও 'মার্চালিমার' নৌশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা ও ডকইয়ার্ডের সিগন্যাল স্টেশনের কর্মীরাও ধর্মঘটীদের সঙ্গে এসে হাত মিলাল। পাশে এসে দাঁড়াল।

বিরাট শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ ধরে এগিয়ে চললো।

যে সব লরী ও ট্রাক ধর্মঘটীদের অধীনে ছিল তার উপরে কংগ্রেস, লীগ ও মজদুরদের লালঝাণ্ডা পত্ পত্ করে উড়তে লাগল।

ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

তু শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়।

মরনে সে ফির্ ভী তু ন ডর।

২রা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় নৌবহরের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি ভাইস অ্যাড্‌মিরাল গডফ্রে যখন 'তলোয়ার' পরিদর্শনে গিয়েছিল তখন পদ ও শক্তিগর্বে গর্বিত সেনাপতি কি বুঝতে পারেনি যে সামরিক বাহিনীর গতানুগতিক চিন্তা ও নীতিতে একটা পরিবর্তনের রক্তরাঙা ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে?

টেলিগ্রাফিস্ট পি. সি. দত্ত তো স্পষ্টই দেওয়ালের গায়ে লিখে দিল: ভারত ছাড়ো! জয় হিন্দ্!

শ্বেতাঙ্গ গডফ্রে আক্রোশে যেন একেবারে বোমার মতই ফেটে পড়লো।

অবিলম্বে দত্তকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ জারী হলো।

মূর্খ সেনাপতি ভেবেছিল পি. সি. দত্তর কণ্ঠরোধ করতে পারলেই এবং তাকে কারারুদ্ধ করতে পারলেই বুঝি শত শত লাখো লাখো কণ্ঠের দাবী 'ভারত ছাড়ো' দাবিয়ে রাখতে পারবে। জয় হিন্দ্ ধ্বনিকে থামিয়ে দিতে পারবে।

১৮ই ফেব্রুয়ারীই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটীরা বহু ইউরোপীয় পুলিস অফিসার ও সৈনিককে প্রহার করলো। বহু ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের উপরে হামলা করলো। দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত আক্রোশ লকলকে শিখায় যেন জ্বলে উঠলো।

২১শে ফেব্রুয়ারী দেখা গেল পুরোপুরি ভাবেই বিদ্রোহ চারিদিকে।

'তলোয়ার', 'নাসিক', 'কলাবতী' প্রভৃতি কুড়িখানা জাহাজের মাস্তুল-শীর্ষে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা তো পত্‌পত্‌ শব্দে সগৌরবে উড়ছেই, এমন কি সেনাপতি গডফ্রের নিজস্ব ফ্ল্যাগ্‌শিপ 'নর্মদা' পর্যন্ত বিদ্রোহীদের করতলগত।

'নর্মদা'র মাস্তুল-শীর্ষেও উড়ছে না আর শ্বেতাঙ্গের ইউনিয়ন জ্যাক্‌—উড়ছে সেখানে কংগ্রেসের তেরঙ্গা পতাকা!

নৌ-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই নগরীতে শুরু হয়ে গেল ব্যাপক হাঙ্গামা! চারিদিকে আগুন!

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী;
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী!

বোম্বাই নগরীর কলহাবাও ও গিরগাঁও অঞ্চলে বিদ্রোহী জনতা ট্রাম বাস আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে সরকারী অফিস ও দোকান লুঠ করে রাস্তায় ব্যারিকেড বানিয়ে ফেলল।

শ্বেতাঙ্গের সশস্ত্র পুলিস বাহিনী মুহুর্মুহু গুলি চালাতে লাগল।

ধোঁয়া-বারুদের গন্ধে ও রক্তে মহানগরীর আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠলো।

বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভ ও আন্ধেরীতেও নৌ-সেনারা অন্যান্য নৌ-কর্মীদের প্রতি সমর্থনে করল ধর্মঘট।

বোম্বাই থেকে আগুন কলকাতায়, মাদ্রাজে এবং করাচীতেও ছড়িয়ে গেল।

কলকাতার বেহালাস্থিত শিক্ষাকেন্দ্র 'হুগলী'র শিক্ষার্থীরা, মাঝেরহাটের নৌ-সেনারা এবং মাদ্রাজে 'আদিয়ার' নামক রণতরীর সৈনিকেরা কাজ বন্ধ করে অন্যান্য ধর্মঘটীদের সঙ্গে সাড়া দিল।

করাচী নৌ-ঘাঁটিতে বিদ্রোহের আগুন ভীষণাকারে দেখা দিল: 'হিমালয়' ও 'বাহাদুর' জাহাজের শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আর 'হিন্দুস্থান' জাহাজের নৌ-সেনারা সিগন্যাল ছড়িয়ে দিল: আমরা চরম ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছি সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে সরকার আমাদের দাবী যদি না মেনে নেয় তাহলে অগ্নিনালিকা মুখেই আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করব।

'হিন্দুস্থান' এসে দাঁড়াল সকলের পুরোভাগে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে।

এবং সর্বত্র হিন্দুস্থানের নৌ-সেনারা সিগন্যাল মেসেজে অন্যান্য বিদ্রোহীদের নির্দেশ পাঠাতে শুরু করল। বিদ্রোহ! নৌ-বিদ্রোহ!

সামরিক পুলিস 'হিন্দুস্থান'কে লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই প্রচণ্ড শব্দে কামানের মুখে অগ্ন্যুদ্গার দেখা দিল। ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে বিলাতের কমন্স সভায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেট অ্যাটলী এক বিবৃতি দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ভারতের যে নৌ-সেনাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ ব্রিটিশ নৌ-বহরের কতকগুলো জাহাজ বোম্বাই অভিমুখে ইতিমধ্যেই রওনা করে দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লীর হেডকোয়ার্টার থেকেও সগৌরবে জানান হল: ভয় নেই! বেশ বড় রকমের একটা নৌ, স্থল ও বিমানদল বোম্বাই, পুণা ও করাচীর দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে।

ভারতের প্রধান নৌ-সেনাপতি গডফ্রে বোম্বাই বেতারকেন্দ্র হতে হুমকি দিল, বিদ্রোহীরা যদি মনে করে থাকে যে গভর্নমেণ্টের শক্তি এই সামান্য বিদ্রোহকে দমন করতে পারবে না, তবে মহা ভুলই তারা করেছে। এবং প্রয়োজন হলে তারা (গভর্নমেণ্ট) তাদের আজকের এই গৌরবের নৌ-বহরকে ধ্বংস করে ফেলতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না। অতএব বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না। তবে হ্যাঁ, যদি সব শান্ত হয় তবে নৌ-সেনাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ও প্রতিবিধানের সম্পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি।

অভাব-অভিযোগের সম্পর্কে তদন্ত আর প্রতিবিধানের আশ্বাস!

শ্বেতাঙ্গের ঐ ধরনের নীতিবচন আওড়ানো নতুন নয়। তাই নৌ-সেনারা কোন কর্ণপাতই করল না গডফ্রের কথায় এবং গডফ্রের কথাও যে একেবারে নেহাত একটা মৌখিক ভীতি-প্রদর্শন নয় তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ঐ রাত্রেই।

বোম্বাইয়ের পোতাশ্রয়ে ভারতীয় নৌ-বহরের একটা অংশ এসে বিদ্রোহী নৌ-বহরের পাহারায় নিযুক্ত হলো। রাত্রির নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ জুড়ে চলতে লাগল বোমারু ও জঙ্গী বিমানগুলোর প্রপেলারের ক্রুদ্ধ অঁ-অঁ শব্দ জাগিয়ে সদম্ভ সতর্ক প্রহরা।

এবং সমস্ত রাত্রি ধরেই প্রায় উভয় পক্ষে কামান ও মেসিনগানের মুখে মুখে বিনিময় চলতে লাগল গোলাগুলির।

গোলাগুলি-মথিত ২১শে ফেব্রুয়ারীর দুর্যোগময়ী রাত্রি প্রভাত হলো।

২২শে ফেব্রুয়ারী।

বোম্বাই নগরীতে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নগরীর পথে পথে বিক্ষুব্ধ জনতা—শ্রমিক, ছাত্র, সর্বসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

কলহবা, ভুলেশ্বর ও গিরগাঁওয়ে সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যবাহিনী সমস্ত দিনে কুড়িবার গুলি চালাল বিদ্রোহীদের উপরে বেপরোয়া।

ষাটজন সেই গুলিবর্ষণের মধ্যে প্রাণ দিল এবং ছয় সহস্রাধিক বিদ্রোহী হলো আহত।

রক্তে ভিজে গেল কলহবা, গিরগাঁও, ভুলেশ্বরের পথের ধুলি।

বিদ্রোহীরাও ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের তিনটি শাখায় হানা দিয়ে ভেঙেচুরে সব তচনচ লণ্ডভণ্ড করে দিল।

চল্লিশটা সামরিক লরী দিল আগুন জেবলে পুড়িয়ে, বারটা ডাকঘর ও সরকারের ত্রিশটা র‍্যাশন-শপ লুঠ করে নিল।

একজন পুলিস হলো নিহত এবং সাঁইত্রিশজন অফিসার ও নব্বুইজন কনস্টেবল হলো আহত।

নৌ-সেনাপতি গডফ্রের বেতার হুমকির উপযুক্ত প্রতিবাদ।

বিদ্রোহীরা জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল।

বোম্বাইয়ের সমাজতন্ত্রী নেতা পুরুষোত্তম দাশ শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শক্রমে ও তাঁর আশ্বাসদানে বিদ্রোহী নেতারা আত্মসমর্পণে রাজী হলো।

২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে 'তলোয়ার'এর কেন্দ্রীয় বৈঠকে কাসুল ব্যারাক ও বিদ্রোহী অধিকৃত জাহাজগুলিকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশ দেওয়া স্থিরীকৃত হলো।

২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে ৬টা ১৩ মিঃ সময়ে সর্বত্র আত্মসমর্পণের সাংকেতিক বার্তা প্রেরিত হলো। একে একে বিদ্রোহী জাহাজগুলো আত্মসমর্পণ করল।

সৃষ্টিধর লিখে চলেছে তখনও।

এতদিনে বোধ হয় শ্বেতাঙ্গ শক্তি সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছিল যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে এই দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর ধরে তাদের শাসনযন্ত্র দাঁড়িয়ে ছিল এবারে তা নড়ে উঠেছে।

কসাইখানা থেকে আজ আর গরুতে গরুর মাংস বয়ে নিয়ে আসতে রাজী নয়।

সৈন্যবাহিনীর যে অন্ধ চির-আনুগত্যকে আশ্রয় করে শ্বেতাঙ্গের নির্মম শাসন ও রক্তশোষণের লৌহকঠিন কাঠামো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আজ আর বুঝি তার উপর নির্ভর করা চলে না।

আজ আর ভারত ছাড়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথই নেই।

এবারে মানে মানে বিদায় নেওয়াই ভাল।

১৮৫৭র অগ্নিমুহূর্তে বিপ্লবের যে অগ্নিশিখা সর্বপ্রথম ভারতে যত শ্বেতাঙ্গ শক্তিকে বিদূরিত করবার জন্য দেখা দিয়েছিল তাই পরে ১৯০৫—১৯০৮ সনে যে বিদ্রোহের অগ্নিনালিকা মুখে গর্জন শোনা গিয়েছিল ক্রমে সেটাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমগ্র ভারতব্যাপী জাগরণ আনে এবং ক্রমে সেই জাগরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিপ্লবের হুতাশন জবালিয়ে তুলল। সেই শিখার সঙ্গে যুক্ত হলো পৃথিবীব্যাপী নির্যাতীত ও পরাধীন মানুষের অত্যুগ্র মুক্তি-কামনা। মধ্য-প্রাচ্যের ভূমধ্যসাগরের তীর হতে এশিয়ার পূর্ব দিগন্তের প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কূল পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের তূর্যনিনাদে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসে পড়ল।

১৯১৭ সালে ইউরোপের আকাশে রুশের গণবিপ্লবের যে রক্তছায়া পড়েছিল,

ধনিকসমাজ তাতেই ভীত ও চকিত হয়ে ওঠে।

প্রণাম জানাল সেই রক্তাক্ত গণবিপ্লবকে দূর হতে ভারত ও চীনের অগণিত বিপ্লবী জনগণ।

অলক্ষ্যে রুশ, এশিয়া ও ভারতের নাড়ীতে যেন একটা বন্ধন পড়লো।

এবং ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সেই অলক্ষ্য নাড়ীর টানেই বিজয়ী রুশকে কেন্দ্র করে এশিয়ার অগণিত মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ দুর্গ-প্রাকারের মূলে দুঃসাহসিক আঘাত হানবার প্রেরণা যোগাল।

ব্রিটেনের সমাজজীবনেও এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে গেল।

গোঁড়া রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রবাদী শ্রমিক দলের রাষ্ট্রিক অভ্যুত্থান হলো এবং যার ফলে অবশ্যম্ভাবী গণবিপ্লবের সম্মুখীন না হয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে আপোস ও শান্তির পথ খুঁজলো।

আগামীকাল ১৯৪৭এর ১৫ই আগস্ট সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার দিন। এবং ঐ পনেরই আগস্টই ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সর্বপ্রকার শাসন ও শোষণের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে আপন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতায় হবে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের মানচিত্র হতে দীর্ঘ পোনে দুইশত বৎসর পরে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য-চিহ্নের লাল বর্ণ ১৫ই আগস্ট মুছে যাবে এবং চল্লিশ কোটি মানুষের দেশে ব্রিটেনের ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে সর্বত্র প্রাসাদ-শীর্ষে উড্ডীন হবে অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ভারতের নবপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় পতাকা।

পৃথিবীর চাকা অবিশ্রাম ঘুরে চলে।

ভারত-ইতিহাসের দুইশত বৎসর ব্যাপী রক্ত-অশ্রু-অত্যাচার চিহ্নিত কলংক-কালিতে রেখাংকিত অধ্যায়টি শেষ হলো।

ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো।

সুদীর্ঘকাল পরে আজ জাহাজ বোঝাই হয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা—যাদের পূর্ব-গামীরা একদিন ক্লাইভের সঙ্গে সঙ্গে বেয়োনেট উঁচিয়ে ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিল, যারা দীর্ঘকাল ধরে বেপরোয়াভাবে শাসনেব নামে হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাচার নির্বিচারে করে গিয়েছে দলে দলে,—তারা আজ ফিরে চলেছে।

জাহাজের সিটি বাজছে—ভোঁ! ভোঁ…!

স্মৃতির পটে কি অদের দুইশত বৎসরের রক্ত-স্মৃতি ভেসে উঠছে না?

সত্যি, বিচিত্র আশ্চর্য এই ভারতবর্ষ!

সুনীল জলসমাধি হতে একদিন এই বিচিত্র ভূখণ্ড মহাবিস্ময়ের মত জেগে উঠেছিল।

কোথায় কোন্ সুদূর অন্ধকার পর্বতগুহা হতে এসেছিল সর্বপ্রথম ভ্রাম্যমাণ যাযাবরের দল। তারপর আরো কত এলো, কত গেল।

শক হুন গ্রীক মুঘল পাঠান—কত না জাতি, কত না সংস্কার, কত না ধর্ম!

কিন্তু কেউ চিরস্থায়ী হতে পারল না এই বিচিত্র ভারতভূমিতে।

ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গকেও তাই বুঝি আজ সুদীর্ঘকাল পরে বিদায় নিয়ে যেতে হলো একই নিয়মে।

পশ্চাতে রেখে গেল তারা বহুবিস্তীর্ণ পোড়ামাটি।

সিরাজ, মহারাজ নন্দকুমার, কাশেম আলি, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, বাঘাযতীন, রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র, যতীন, সূর্য সেন, তারকেশ্বর, মাতঙ্গিনী, কনকলতা, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু বিপ্লবীর বক্ষরক্তে সিক্ত এই ভারতের বহুবিস্তীর্ণ পোড়ামাটি কি আবার নতুন মানুষের পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে না ?

অন্নহীন বস্ত্রহীন আচ্ছাদনহীন বাস্তুহারা অগণিত নির্যাতীত বঞ্চিত ভারতবাসীর মর্মভাঙা হাহাকারে দিকদিগন্ত বিষিয়ে উঠছে।

তাই তো বিদ্রোহী ভারতের তামস-তপস্যা চলেছে আজও নবযুগের সেই নীলকণ্ঠের জন্য, যে আঁজলা ভরে এই মৃত্যু-হলাহল আকণ্ঠ পান করে পরিবর্তে এই অগণিত বুভুক্ষিত নরনারীকে দেবে মৃতসঞ্জীবনী সুধা।

নতুন মানুষ রচনা করবে নতুন ইতিহাস। হ্যাঁ, রচিত হবে নতুন ভারতের ইতিহাস।

বিদ্রোহী ভারতের রক্ত-তপস্যার তাই এখনো শেষ পাই না।

দিক্‌ হতে দিগন্তে তাই ভয়াল বিদ্রোহের রক্তিম অগ্নিশিখা।

হবে। তিমিররাত্রির অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে।

পলাশীর জনশূন্য প্রান্তরে আম্রকাননের নিবিড় বিষণ্ণ ছায়ায় মোহনলালের আত্মার দুই শতাব্দব্যাপী মহানিদ্রাভঙ্গের মহালগ্ন অত্যাসন্ন হয়ে এলো।

হবে না। বিদ্রোহী ভারতের মৃত্যুপণ ব্যর্থ হবে না।

যারা চলে গেল এই বিদ্রোহী ভারতের পৃষ্ঠায় রক্তস্মৃতি রেখে তাদের জানাই প্রণাম, আর জানাই সেই সঙ্গে আহ্বান—সেই অনাগতদের যারা আগামীকাল রচনা করবে নতুন ইতিহাস নতুন স্বাধীন ভারতের।

উদ্‌যাপন করবে বিদ্রোহী ভারতের মুক্তি-সংকল্প।

প্রণাম। বিদ্রোহী ভারত প্রণাম।

শেষ